রাষ্ট্রবিজ্ঞান

(Political Science)

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যক্ষ ডক্টর সুব্রত কুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ. পি. এইচ. ডি.

ও

অধ্যাপক শচীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য এম. এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) : এম. এ. (অর্থনীতি),

প্রকাশক
ভারতবাণী প্রকাশনী
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

বিক্রয়কেন্দ্র
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং
কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৫৭সি, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
এস. ভট্টাচার্য বি. এ.
ভারতবাণী প্রকাশনীর পক্ষে
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

নভেম্বর, ১৯৬৫

মুদ্রাকর ঃ
এস. ভট্টাচার্য
ভারতবাণী প্রকাশনী প্রেস
৮।১।১ বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

(c) **Social Contract Theory**

(d) **Evolutionary Theory**

Sovereignty ; its characteristics.

3. **Nationality**, **Nation** and Nationalism ; Right **of self determination, Nationalism** and **Internationalism**.

4. **The** United **Nations**—Objectives, **structure and functions.**

5. **Law** : Definition **of** Law : Sources **of Law—Concept of Liberty ; safeguards** of **Liberty—Law** and **Liberty.**

6. Citizenship ; **Definition of** a **citizen—Acquisition and Loss** of **citizenship** ; Rights **and duties of a** citizen—**Civil and Political Rights** ; **Fundamental** Rights of **an Indian** citizen—**Economic and** Social **Rights** : **Directive** Principles in the **Indian Constitution.**

Paper II (Full Marks—100)

7. Constitution—Classification—Nature of **the Indian Constitution** : Salient **features of the Indian** Constitution.

8. Forms of Government—Unitary and Federal ; Nature of the Indian Federation--Presidential and Parliamentary ; Nature of the Indian Government ; Presidential or Parliamentary ?—Monarchy—Republic—India as a Republic.

9. Democracy—Its different forms—Merits and Demerits—Condition for the success of Democracy—Dictatorship—Merits and Defects.

10. Organs of Government ; Functions of the different orangs of Government—Theory of separation of powers—Executive—Single—Plural—Union and State Executives in India—President of India ; Powers and position—Prime Minister—Powers and position of the Prime Minister—Legislature ; Unicameral and Bi-cameral—Union legislature of India ; Its composition and functions—West Bengal State Legislature ; Its composition and functions—Process of Law making—Judiciary. Independence of the Judiciary—The Indian Judiciary—Bureaucracy ; its importance and functions.

11. Public opinion ; its importance in a Democracy—Different organs of public opinion—Party system—Functions of political Parties ; Merits and Demerits—One party—Bi-party and Multiparty system—Importance of the party system in Democracy.

12. Adult Franchise ; Arguments for and against

Total No. of pages of the book 400—450

সূচীপত্র

অধ্যায় | পৃষ্ঠা

প্রথম : সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও সম্পর্ক : ১

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গোড়ার কথা : ১ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি : ৫ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা : ৭ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু : ৯ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি : রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান : ১৩ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি : ১৬ ; অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস : ১৯ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা : ২১ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র : ২২ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান : ২৪ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান : ২৫ ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতা : ২৬ ।

দ্বিতীয় : রাষ্ট্র, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব : ২৯

রাষ্ট্র : ২৯ ; রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : ২৯ ; রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য : ৩৩ ; রাষ্ট্র ও সরকার : ৩৯ ; রাষ্ট্র ও সমাজ : ৪০ ; রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন : ৪২ ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা পশ্চিমবঙ্গ কি রাষ্ট্র ? : ৪৩ ; রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ : ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ : ৪৪ ; বলপ্রয়োগ মতবাদ : ৪৮ ; সামাজিক চুক্তি মতবাদ : ৫১ ; ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ : ৬৩ ।

তৃতীয় : সার্বভৌমিকতা ও ইহার বৈশিষ্ট্য : ৭২

সার্বভৌমিকতার অর্থ ও সংজ্ঞা : ৭২ ; সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের বিকাশ : ৭৪ ; সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য : ৭৯ ।

চতুর্থ : জাতিতত্ত্ব : ৮৫

জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতি : ৮৫ ; জাতি গঠনের বিভিন্ন উপাদান : ৮৯ ; জাতীয়তাবাদ : ৯১ ; জাতির অধিকারসমূহ : ৯১ ; জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, একজাতি একরাষ্ট্র : ৯২ ; ভারতের জাতীয় চরিত্র : ৯৬ ; জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ : ৯৭ ; আন্তর্জাতিকতাবাদ : ১০১ ।

পঞ্চম : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ : ১০৭

আন্তর্জাতিকতাবাদের রূপরেখা : ১০৭ ; জাতিসংঘ : ১০৯ ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ : ১১১ ; জন্ম :১১১ ; প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য :১১৩ ; গঠন : ১১৬ ; সাধারণ সভা : ১১৭ ; নিরাপত্তা পরিষদ : ১১৯ ; আন্ত-র্জাতিক বিচারালয় : ১২২ ; অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ : ১২৪ ;

অছি পরিষদ : ১২৬ ; কর্মদপ্তর : ১২৭ ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থাসমূহ : ১২৯ ; মানবিক অধিকার : ১৩৮ ; এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন : ১৪০ ; ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন : ১৪১ ; স্বায়ত্ত শাসনহীন অঞ্চল : ১৪২ ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা : ১৪২ ; জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ : ১৪৫ ।

ষষ্ঠ : আইন ও স্বাধীনতা : ১৪৮

আইনের প্রকৃতি : ১৪৮ ; আইনের সংজ্ঞা : ১৫০ ; আইনের প্রকারভেদ : ১৫২ ; আইন ও নীতি : ১৫৪ ; আইন মান্য করা হয় কেন ? : ১৫৬ : আইনের উৎস : ১৫৬ স্বাধীনতার ধারণা : ১৫৯ ; স্বাধীনতার বিভিন্নরূপ : ১৬২ ; স্বাধীনতার রক্ষাকবচ : ১৬৪ ; আইন ও স্বাধীনতা : ১৬৭ ।

সপ্তম : নাগরিকত্ব, অধিকার ও কর্তব্য : ১৭১

নাগরিকত্ব : ১৭১ ; নাগরিকত্ব অর্জন ও বর্জনের পদ্ধতি : ১৭৩ ; ভারতের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব অর্জনের ও বর্জনের পদ্ধতি : ১৭৫ ; সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক : ১৭৯ ; অধিকার ও কর্তব্য : ১৮১ ; অধিকারের প্রকারভেদ : ১৮৩ ; নাগরিকের মূলকর্তব্যগুলি : ১৮৫ ; সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার : ১৮৭ ; অর্থনৈতিক অধিকার : ১৯১ ।

অষ্টম : মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি : ১৯৪

মৌলিক অধিকার : ১৯৪ ; ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার : ১৯৫ ; রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মকনীতি : ২১৩ ।

নবম : শাসনতন্ত্র ও ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ২২৭

শাসনতন্ত্র : ২২৭ ; সংজ্ঞা : ২২৮ ; উপাদান : ২৩০ ; সুশাসনতন্ত্রের লক্ষণ : ২৩১ ; শাসনতন্ত্র প্রয়োজন হয় কেন : ২৩১ ; শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ : ২৩২ ; ভারতের সংবিধানের জন্ম ও উহার প্রকৃতি : ২৩৫ ; ভারতের স্বাধীনতা আইন : ২৩৮ ; উৎস : ২৩৯ ; প্রকৃতি : ২৩৯ ; ভারতের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য : ২৪১ ।

দশম : সরকারের বিভিন্নরূপ ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র : ২৪৯

রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ : ২৪৯ ; স্বৈরতন্ত্র : ২৫৫ ; অভিজাততন্ত্র : ২৫৭ ; একনায়কত্ব : ২৫৯ ; গণতন্ত্র : ২৫৯ ; এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা : ২৬২ ; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি : ২৭৪ : পার্লামেন্টীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার : ২৯১ ; প্রজাতন্ত্র : ৩০৫ ; প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারত : ৩০৫ ।

একাদশ : গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র : ৩০৯

গণতন্ত্র : ৩০৯ ; গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : ৩১৪ ; বিভিন্নরূপ : ৩১৪ ; গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ : ৩১৭ ; গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্তাবলী : ৩২০ ; গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ : ৩২২ ; গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব : ৩২৩ ; সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র : ৩২৬ ; একনায়কতন্ত্র : ৩২৯ ।

দ্বাদশ : সরকারের বিভিন্ন বিভাগ : ৩৩৮

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ : ৩৩৮ ; ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি : ৩৪০ ; শাসন বিভাগ : ৩৪৫ ; একক শাসন কর্তৃপক্ষ : ৩৪৭ ; বহু পরিচালিত শাসন কর্তৃপক্ষ : ৩৪৮ : শাসন বিভাগের কার্যাবলী : ৩৪৮ ; রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দ : ৩৫০ ।

ত্রয়োদশ : ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও আইন ব্যবস্থা : ৩৫৩

যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা : ৩৫৩ ; রাষ্ট্রপতি : ৩৫৪ ; ক্ষমতা ও পদমর্যাদা : ৩৫৭ ; ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি : ৩৬১ ; উপরাষ্ট্রপতি : ৩৬২ ; রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা : ৩৬৩ ; ভারতের প্রধানমন্ত্রী : ৩৬৭ : প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদার : ৩৬৯ ; ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী : ৩৭১ ; রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা : ৩৭২ ; রাজ্যপাল : ৩৭২ · মন্ত্রিসভা-মর্যাদা ও কার্যাবলী : ৩৭৬ ; মুখ্যমন্ত্রী : ৩৭৮ ।

চতুর্দশ : ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার বিভাগ : ৩৮১

আইন বিভাগ : ৩৮১ ; এক পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে এবং দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার বিপক্ষে যুক্তি : ৩৮৩ ; দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে ও এক পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার বিপক্ষে যুক্তি : ৩৮৫ ; ভারতীয় ইউনিয়নের ব্যবস্থাবিভাগ : ৩৮৬ ; রাজ্যসভা : ৩৮৬ ; লোকসভা : ৩৮৮ ; স্পীকার : ৩৯১ ; পার্লামেন্টের ক্ষমতা : ৩৯২ : বিরোধীদলের ভূমিকা : ৩৯৪ ; ভারতীয় পার্লামেন্টে বিরোধীদলের ভূমিকা : ৩৯৫ ; পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা : ৩৯৬ ; আইন তৈয়ারীর পদ্ধতি : ৪০০ ; ক্ষমতা ও কার্যাবলী : ৪০২ ; বিধান সভার স্পীকার : ৪০৪ ; বিচার বিভাগ : ৪০৫ ; বিচার বিভাগের কার্যাবলী : ৪০৬ ; ভারতের বিচার ব্যবস্থা : ৪০৯ ; হাইকোর্ট : ৪১২ ; সুপ্রীমকোর্ট : ৪১৪ ; পশ্চিমবঙ্গের বিচার ব্যবস্থা : ৪১৭ ; ন্যায় পঞ্চায়েত : ৪১৮ ; আমলাতন্ত্র : ৪১৯ ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১ | সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও সম্পর্ক (Definition, Scope and Relation)

(রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ? সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও আলোচনা ক্ষেত্র। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্ক : ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্র।)

[What is Political Science ? Definition, Nature and Scope—Relation with other Social Sciences ; History, Economics, Sociology, Psychology and Ethics.]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের বিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু ও শেষ রাষ্ট্রকে লইয়া। ইহা একটি রাষ্ট্রশাস্ত্র। রাষ্ট্রই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা সমাজ হইতে শুরু করিতে হয় বলিয়া গোড়ায়ই সমাজ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া রাখা ভালো। সমাজ হইতেই রাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে। আবার এই সমাজ সৃষ্টির মূলে আছে মানুষ। মানুষ একা বাস করিতে পারে না। একা বাস করাটা তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাই তাহাকে সংঘবদ্ধ হইয়াই বাস করিতে হয়। সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করাটা তাহার সমাজ প্রবণতার নজির। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, "মানুষ সামাজিক জীব। যে ব্যক্তি সমাজে বাস করে না, হয় সে পশু, নয় সে দেবতা"। *

(১) মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র

মানুষ একা বাস করে না এবং করিতে পারেও না। ইতিহাস, প্রাণিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, কোন জীবই একা বাস করিতে পারে না। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী সবাই দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। এই পৃথিবীতে যাহারা দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতে পারে নাই তাহারাই বিদায় লইয়াছে। এই দলবদ্ধতাই সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। বলা হয় যে, মানুষের পূর্ব পুরুষের সামাজিক প্রবৃত্তির দরুনই মানব জাতির জন্ম হইয়াছে। পুরুষের সহিত নারীর মিলন প্রকৃতিজ জৈব আকর্ষণের ফল। ইহারই ফলে বংশ বৃদ্ধি, পরিবার ও গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজ গঠনের ইহাই অন্যতম

(২) মানুষ একা বাস করে না, ইহাই সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি

* "Man perfected by society is the best of all animals. If he finds himself an individual who cannot live in society, or who pretends he has need of only his own resources does not consider him as a member of humanity ; he is a savage beast or a God".—Aristotle.

মূল ভিত্তি। আবার প্রয়োজনের তাগিদেও মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়াছে। একাকী কেহ হিংস্র পশুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে পারে নাই। তাই আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে সংঘবদ্ধ হইতে হইয়াছে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, প্লাবন ও ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রতিকূল দুর্যোগের বিরুদ্ধেও মানুষকে সংঘবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করিয়া নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখিতে হইয়াছে। আবার একজনের পক্ষে তাহার সকল চাহিদা মিটানো যেহেতু সম্ভব নয় তাই পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual Aid) ভিত্তিতেই পারস্পরিক অভাব মিটানো সম্ভব। পারস্পরিক অভাব মিটানোর তাগিদেও মানুষকে সংঘবদ্ধ হইতে হইয়াছে।

(৩) মানুষের জন্ম, সমাজের জন্ম

সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ ছিল অসহায় ও দুর্বল। তাহার জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল দুর্বিষহ। বন-বনান্তরে সে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার চাপে মানুষ বিভিন্নস্থানে সংঘবদ্ধভাবেই স্থায়ীভাবে বাস করিতে শুরু করে। হাজার হাজার বৎসরের চেষ্টায় প্রতিকূল পরিবেশে ঘেরা মানুষ নিজ বুদ্ধি ও যুক্তি বলে প্রতিকূল প্রকৃতিকে নিজ বশে আনিয়াছে এবং সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন আদিম মানুষ, অপরিচ্ছন্ন বুদ্ধি ও সীমিত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রকৃতির রুদ্ররূপকে বুঝিতে পারে নাই। একদিকে তাহারা যেমন প্রকৃতির রুদ্ররূপকে ভয় করিয়াছে আবার তাহারা প্রকৃতির প্রসন্ন প্রকাশের দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছে। তাহারা প্রকৃতির শক্তিতে দেবত্ব আরোপ করিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য ও তারাকে পূজা করিয়াছে। তাহারা কখনো একেশ্বরবাদকে বিশ্বাস করিয়াছে, আবার কখনো বহু ঈশ্বরের পূজা করিয়াছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৪) আদিম যুগে দেবতার স্থান

মানুষ ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হইয়াছে। মানুষের জীবন বহুমুখী। চাহিদা তাহার অনেক। মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের চাহিদা পূরণের জন্য মানুষের বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে। মানুষ ধর্মীয় জীবনের প্রয়োজনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, গির্জা, মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে। সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য সাহিত্য বাসর সৃষ্টি করিয়াছে। এমনি ভাবে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গঠিত হইয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমবায়কেই সমাজ আখ্যা দেওয়া হয়। ম্যাকাইভার বলেন, "বিভিন্ন কারণে মানুষ পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে।" * রামায়ণ ও মহাভারতে মানুষের সমাজ বন্ধনের অনেক কথা লেখা আছে।

(৫) সমাজ গঠন

সমাজ বিবর্তনের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। এই বিবর্তনে যুদ্ধের একটা ভূমিকা রহিয়াছে। মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল। যুদ্ধের তাগিদে

*"Whenever living being entered into willed relations with one another there society exists."—Maciver

মানবগোষ্ঠী শাসনবন্ধনে নিজেদের বাঁধিয়াছে। তারপর সমাজ বিবর্তনের একটা স্তরে মানুষ তাহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের তাগিদে সমাজের মধ্যেই রাষ্ট্র নামক একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে। রাষ্ট্র একদিনে আসিয়া হাজির হয় নাই, সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্র আসিয়া হাজির হইয়াছে। মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের এই ধারাগুলিকে কয়েকটা যুগে ভাগ করিয়া দেখানো হইল ঃ

(৬) রাষ্ট্রের জন্ম

(১) শিকারের যুগ ঃ শিকারের যুগে মানুষ-বন বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। বনের নিকটেই তাহারা বাস করিত। শিকারলব্ধ পশু-পক্ষী ফল-মূল দলের সকলেই সমান ভাবে ভাগ করিয়া ভোগ করিত। তখনও তাহারা সঞ্চয় কাঁতে শেখে নাই। ব্যক্তির কোন ক্ষমতা ছিল না। ব্যক্তির পরিচয় ছিল গোষ্ঠীর একজন হিসাবে। গোষ্ঠীভুক্ত সকল পুরুষ ও নারীই ছিল শিশুদের নিকট পিতা ও মাতার মতো। এই যুগে খাদ্যের যোগান শিকারের উপর নির্ভর করিত বলিয়া খাদ্যের যোগান ছিল অনিশ্চিত। আবার গোষ্ঠীজীবনে লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। শিকার ক্ষেত্রের মালিকানা লইয়া দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিত। এই যুদ্ধের সময় একজন গোষ্ঠী নায়ক নির্বাচিত হইত। এই গোষ্ঠী নায়ক হইতেই রাজার উদ্ভব হয়। এই যুগে মানুষ ছিল যাযাবর। রাষ্ট্রের তখনো জন্ম হয় নাই।

(৭) শিকারের যুগ

(২) পশুপালনের যুগ ঃ মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগ হইল পশুপালনের যুগ। এই যুগে মানুষ বন হইতে যে সকল পশু ধরিয়া আনিত তাহাদের সবটাই খাইয়া ফেলিত না। তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে তাহারা লালন পালন করিত। এই পালিত পশু হইতে তাহারা দুধ, মাংস ও পশম পাইত। পশম দিয়া পোশাক তৈয়ারি করিত। শিকারের যুগে খাদ্যের সরবরাহ ছিল অনিশ্চিত। কারণ কোন্ দিন শিকার পাওয়া যাইবে আর কোন্ দিন শিকার পাওয়া যাইবে না—তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। পশুপালনের যুগে খাদ্যের সরবরাহ কিছুটা নিশ্চিত হইল। কারণ, কিছু পশুকে সর্বদা রাখিয়া দেওয়া হইত। এই যুগেও মানুষ ছিল যাযাবর। রাষ্ট্র তখনও জন্মায় নাই।

(৮) পশুপালনের যুগ

(৩) কৃষিকার্যের যুগ ঃ মানব ইতিহাসের তৃতীয় যুগ হইল কৃষিকার্যের যুগ। শিকারের যুগে পুরুষেরা যখন শিকার করিতে যাইত স্ত্রীলোকেরা তখন স্থায়ী বাসস্থানে থাকিয়া বীজ বপন করিত। এই বীজ হইতে যেদিন শস্য উৎপন্ন হইল সেদিন মানব ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। চাষাবাদ শুরু হইয়া গেল। মানুষ তাহার চাষের ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তুলিল স্থায়ী বাসস্থান। তাহার খাদ্য আহরণের জীবন (food-gathering life) খাদ্যোৎপাদনের জীবনে (food-producing life) পরিণত হইল। এই সময়ে পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠিল। প্রচলিত হইল বিবাহ প্রথা। ইহার পূর্বে বিবাহ প্রথা বলিয়া কিছু ছিল না। কৃষিকার্যের যুগেই মানুষ স্থায়ীভাবে একস্থানে

(৯) কৃষিকার্যের যুগ

বসবাস করিতে শুরু করে। নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করায় **গ্রাম-ব্যবস্থার** উদ্ভব হয়। গ্রামীণ সমাজে সকলেই কৃষিকার্য করিত না। কেহ কেহ কৃষিকার্য করিত আবার কেহ কেহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করিত। ইহার ফলে পারস্পরিক অভাব মিটানোর জন্য **পণ্যবিনিময়** প্রথার উদ্ভব হইল। আবার এক গ্রামে সকল সামগ্রী উৎপাদন করা হইত না বলিয়া বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা প্রসারিত হইল। বিভিন্ন গ্রামের মধ্যবর্তী যে স্থানে দ্রব্যসামগ্রী বিনিময় করা হইত তাহাকে বলা হইত **বাজার**। এই বাজারকে কেন্দ্র করিয়াই **নগর (City)** গড়িয়া উঠিল। লোকসংখ্যাও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। গ্রামসংস্থা বিভিন্ন নিয়মকানুন প্রণয়ন করিল। গ্রামীণ নিয়মকানুনের ভিত্তিতে মানুষ যে গোষ্ঠী জীবন শুরু করে তাহাকে **উপজাতি (Tribe)** বলা হয়। এই উপ-জাতির স্তরে দ্বন্দ্ব অনবরত লাগিয়াই ছিল। দ্বন্দ্বই ছিল সমাজের বৈশিষ্ট্য। দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য এক কর্তৃত্বের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই উপজাতির স্তরেই দ্বন্দ্ব মীমাংসকের ভূমিকায় **রাষ্ট্র** নামক একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। উপজাতিদের সহিত যাযাবরদের প্রায়ই যুদ্ধ হইত। যুদ্ধের সময় একজন যুদ্ধনায়ক সৃষ্টি করা হইত। পরে এই যুদ্ধনায়কই রাজারূপে গণ্য হইত। যুদ্ধই রাজা সৃষ্টি করে ("War begot the king".)। রাষ্ট্র সৃষ্টি হইল। রাজা রাষ্ট্রের নায়ক হইলেন।

শিল্পের যুগ: শিল্প বিপ্লবের ফলে পুরাতন গ্রাম ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর তারই ধ্বংসাবশেষের উপর গড়িয়া উঠিল বর্তমান শিল্প সমাজ বর্তমানে মানুষ সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ এক সার্বিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। এমনকি পৃথিবীর মানুষ আজ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাইবার জন্য নিয়ত প্রচেষ্টা চালাইতেছে। মানুষের সমাজজীবনকে উন্নত সমৃদ্ধ ও সুখকর করিয়াছে।

(১০) শিল্পযুগ

মানব সমাজের যেমন বিবর্তন হইয়াছে, রাষ্ট্রেরও তেমনি বিবর্তন হইয়াছে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও পাল্টাইয়াছে। কৃষিযুগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করিয়াছে **সামন্তগণ** ও জমিদারগণ আর শিল্পযুগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করিয়াছে **পুঁজিপতিগণ**। সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্র বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন-কালে প্রাচ্যজগতে বিরাট **সাম্রাজ্য** সৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রীসে আবার নগরকে কেন্দ্র করিয়া ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতেও বৈশালীর মতো নগররাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। রোমে এক বিরাট সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তারপর ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়-সত্তার অনুভূতি প্রবল হইয়া উঠিলে **জাতীয় রাষ্ট্রেরও** সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে রাষ্ট্রের বিবর্তনে সামন্তরাষ্ট্র এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

(১১) রাষ্ট্রের রূপ বদল

আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শ

প্রসার লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রের চৌহদ্দি পার হইয়া মানুষ আজ মিলনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গোড়ার কথা বলিবার সময় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সমাজ সৃষ্টির কথা, রাষ্ট্রের জন্মের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার যেহেতু প্রধানতঃ রাষ্ট্রকে লইয়া সেইহেতু রাষ্ট্রের জন্মের কথা প্রথমেই কিছুটা জানিয়া রাখা ভালো।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি? (What is Political Science)ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি? এই প্রশ্ন দিয়াই যেহেতু আমাদের আলোচনা শুরু করিতে হইয়াছে সেইহেতু প্রথমেই আমাদের জানিয়া রাখা ভালো যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল একটি শাস্ত্রের নাম, যে শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্র। অধ্যাপক **গেটেল** "রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রকে বর্তমানে আমরা যে রূপে দেখি প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের রূপ এরূপ ছিল না। বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র বর্তমান রূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের আয়তন ছিল ক্ষুদ্র। ইহা নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন গ্রীস, রোম ও ভারতে এই জাতীয় **নগররাষ্ট্রের (City State)** অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীকগণ ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া নাগরিকত্ব লাভ করিত। অন্যান্য সকলে ছিল ক্রীতদাস, দিনমজুর ও স্ত্রীলোক। ইহারা নাগরিকত্ব পাইত না। নগররাষ্ট্র ও নাগরিকদিগের জীবনের আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এই শাস্ত্রের নাম **পৌরবিজ্ঞান**।

পৌরবিজ্ঞান শব্দটি ইংরেজী সিভিক্স (Civics) শব্দের বাংলা তর্জমা। ব্যুৎপত্তিগতভাবে ধরিলে **সিভিক্স** শব্দটি ল্যাটিন শব্দ যথাক্রমে **সিভিটাস্ (Civitas)** ও **সিভিস (Civis)** শব্দ হইতে আসিয়াছে। বাংলা **পৌরবিজ্ঞান** শব্দটিও সংস্কৃত **পুর** শব্দ হইতে আসিয়াছে। ল্যাটিন সিভিটাস শব্দের অর্থ নগররাষ্ট্র আর সিভিস শব্দের অর্থ নাগরিক। তেমনি পুর শব্দের অর্থও নগর। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগতভাবে পৌরবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র যাহা পুর অর্থাৎ নগর এবং পৌরজন অর্থাৎ নাগরিকদের লইয়া আলোচনা করে। সিভিক্সও ব্যুৎপত্তিগতভাবে সিভিটাস অর্থাৎ নগর আর সিভিস অর্থাৎ নাগরিকদিগের আলোচনা শাস্ত্র। আবার ইংরেজী **পলিটিক্স (Politics)** শব্দটিও গ্রীকশব্দ **পলিস (Polis)** শব্দ হইতে আসিয়াছে। সিভিটাস শব্দের অর্থ যেমন নগর তেমনি পলিস শব্দের অর্থও নগর। নগরই ছিল গ্রীকদের কাছে রাষ্ট্র। সুতরাং পলিটিক্স যাহা নগরের বিজ্ঞান তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান। সিভিক্স ও পলিটিক্স উভয়েই রাষ্ট্রনীতিগতভাবে সংগঠিত মানুষ লইয়া আলোচনা করে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল

(১) **সিভিটাস, সিভিস, সিভিক্স, পুর, পৌরবিজ্ঞান, পলিস, পলিটিক্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান**

তাঁহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন পলিটিক্স বা রাষ্ট্রনীতি। বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামটি তাহারই আধুনিক সংস্করণ মাত্র।

অ্যারিস্টট্‌ল প্রদত্ত **রাষ্ট্রনীতি** নামটি ব্যবহৃত হইত প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্র ও তার অনুসৃত নীতিকে বুঝাইবার জন্য। গ্রীক রাষ্ট্রনীতিতে আলোচিত হইত শুধু গ্রীক নগররাষ্ট্রের নীতি। বর্তমানে এই শাস্ত্রের আলোচনা ক্ষেত্র ব্যাপক। শুধু নগররাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতিই ইহাতে আলোচিত হয় না। আর প্রাচীন এথেন্স ও বৈশালীর মতো ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রেরও অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ রাষ্ট্রনীতি বলিতে বর্তমানে বুঝায় সরকারের সাম্প্রতিক সমস্যাবলী ও তার সমাধানের জন্য অনুসৃত নীতিকে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র শুধু সাম্প্রতিক কোন বিশেষ নীতির আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। তাই জেলিনেক, পোলক ও সিজউইক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ অ্যারিস্টট্‌ল প্রদত্ত নামটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাষ্ট্রনীতি শব্দটিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; যথা, (ক) **তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি** এবং (খ) **ফলিত রাষ্ট্রনীতি**। ইঁহাদের মতে তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্রের আইন, সরকার, রাষ্ট্রের কর্তব্য, তাৎপর্য, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক। আর রাষ্ট্রনীতির ফলিত বিভাগে আলোচিত হয় রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন রূপ, কূটনৈতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধি প্রভৃতি। কিন্তু অনেকে আবার রাষ্ট্রনীতি শব্দটি ব্যবহার করার ঘোর বিরোধী। কারণ বোধ হয় এই যে, সরকারের নীতি ও শাসন-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা ছাড়া রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত অন্যান্য বহুবিষয়ের আলোচনা এই শাস্ত্রে হয়। এই সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই শাস্ত্রের নাম দিয়াছেন **রাষ্ট্রদর্শন**।

(২) রাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রদর্শন বলিতে রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্বকেই বোঝানো হয়। রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় তত্ত্বকথা আলোচনা করাই রাষ্ট্রদর্শনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আলোচ্য শাস্ত্রে শুধু রাষ্ট্রের তত্ত্বকথাই আলোচিত হয় না। এই শাস্ত্রে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, তাৎপর্য, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতির আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা হইতে রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও কতকগুলি মূল-সূত্র নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনাও আলোচ্য শাস্ত্রে হইয়া থাকে। এই কারণে অনেকে এই শাস্ত্রের নাম রাষ্ট্রদর্শন দিবার পক্ষপাতী নন। তাঁহাদের মতে আলোচ্য শাস্ত্রের নাম যদি **রাষ্ট্রতত্ত্ব** রাখা হয় তবে সমগ্র আলোচনা ক্ষেত্রকেই ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

(৩) রাষ্ট্রদর্শন

রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রের নীতিগত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করে। রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উপাদানেরও আলোচনা করে। তবে ইহা রাষ্ট্রের গঠন বৈচিত্র্যের আলোচনা করে না। বিভিন্ন শ্রেণীর রাষ্ট্রের গুণাগুণের বিশ্লেষণও করে না। রাষ্ট্রতত্ত্ব বর্তমানে রাষ্ট্রের আলোচনা করে এবং রাষ্ট্র সাধারণতঃ কি প্রকারের হইয়া থাকে তাহারও ইংগিত দিয়া থাকে কিন্তু রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রের উন্নতির ঐতিহাসিক দিকেরও আলোচনা করে না বা আদর্শরাষ্ট্রের চিত্রও অঙ্কিত

(৪) রাষ্ট্রতত্ত্ব

করে না। ইহা রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতিরও আলোচনা করে না। অতএব দেখা যায় 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' নামটি বিশেষ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এই কারণে অনেকে এই শাস্ত্রের নাম দিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামের ব্যুৎপত্তিগতভাবে বিচার করিলে দেখা যায় গ্রীক শব্দ **পলিস** (Polis) হইতে আসিয়াছে ইংরেজী শব্দ **পলিটিক্স** (Politics)। পলিস শব্দের অর্থ নগর। নগরই ছিল প্রাচীনকালে রাষ্ট্র। নগর ও রাষ্ট্র সমার্থক ছিল। নগর ও তার নাগরিকদিগের জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনাশাস্ত্রের নাম দেওয়া হইত পলিটিক্স। শব্দগত অর্থের দিক ছাড়িয়া আসল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলেও দেখা যায় বর্তমানে এই শাস্ত্রটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান** তত্ত্বগত ও ফলিত এই দুই প্রকারের রাষ্ট্রনীতিরই আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একদিকে আলোচনা করে রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যপদ্ধতি, আর অপর দিকে আলোচনা করে কতকগুলি মূল সূত্রের, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। আর তত্ত্বগত দিকে ইহা আলোচনা করে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তাৎপর্য ও রাষ্ট্রকর্তব্য সম্বন্ধে। রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বস্তু মৌলিক আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান মৌলিক তত্ত্ব ও তাহার ব্যবহারিক রূপেরও আলোচনা করে। ফরাসী দার্শনিক **পল জাঁনে** বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমাজ বিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি ও সরকারের নীতিসমূহের আলোচনা করে।" * রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল বিশেষীকৃত বিজ্ঞান। ইহা রাষ্ট্রের বিশেষ একটি দিকের আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্র ও সরকারের গঠন ও কার্যপদ্ধতির আলোচনা করে না, ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যেরও আলোচনা করে। অতএব রাষ্ট্রনীতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহার আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হয়; রাষ্ট্রের দার্শনিক ব্যাখ্যাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রাষ্ট্রতত্ত্বের বিষয়বস্তুও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তু অনুসারে উহার নামটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাখাই বাঞ্ছনীয়।

(৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি? এই প্রশ্নের আরও পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যাইবে **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা** আলোচনাকালে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (What is Political Science? Definition of Political Science): রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি? এই প্রশ্নের আরও ভালো জবাব পাওয়া যাইবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হইতে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। অধ্যাপক **গেটেল** "রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এই বিজ্ঞান রাষ্ট্ররূপী

*"Political science is that part of the social science which treats of the foundations of the State and the principles of the Government."—Paul Janet

মানুষের সংগঠন, তার শাসনযন্ত্র অর্থাৎ সরকার এবং তার কার্যাবলীর আলোচনা করে।

(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

অধ্যাপক **গার্ণার** বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ রাষ্ট্রকে লইয়া।" **গিলক্রাইস্টের** ভাষায় "রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকারের আলোচনা শাস্ত্র।"* ফরাসী দার্শনিক **পল জাঁনে** লিখিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি ও সরকারের নীতিসমূহের আলোচনা করে।" আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু শুধু অতীত ও বর্তমানকে লইয়াই নয়, ইহা ভবিষ্যতেরও ইংগিত দেয় সেইহেতু **"এইরূপ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের আলোচনা হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞান।"**** অতীত ও বর্তমানের সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নির্ণয় করে রাষ্ট্রজীবনের গতি। অধ্যাপক গেটেল তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিবার সময় বলিয়াছেন, **"রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল রাষ্ট্র কি ছিল তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বর্তমান রাষ্ট্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কি হওয়া উচিত তার রাষ্ট্রনৈতিক নীতিশাস্ত্র-সম্মত আলোচনা।"*****

* রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি রাষ্ট্রশাস্ত্র। ইহা রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে। ইহা সমাজ বিজ্ঞানের একটি অংশ হিসাবে রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি সম্বন্ধেও আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সম্পর্কেরও আলোচনা হয়। আবার সরকার যেহেতু রাষ্ট্রের মূর্ত প্রকাশ অতএব ইহা সরকার সম্বন্ধেও আলোচনা করে। রাষ্ট্র, সরকার ও আইন ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। অতএব যে শাস্ত্র পাঠ করিলে রাষ্ট্র, সরকার, আইন, আন্তর্জাতিক আইন ও সম্পর্ক, রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি ও সরকারের নীতিসমূহ সম্পর্কে জানিতে পারা যায় তাহাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা হয়।

আবার রাষ্ট্র মূর্ত হইয়া উঠে শাসনপদ্ধতির মধ্যে। এই শাসনপদ্ধতিই যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত না হয় তবে রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে বুঝিতে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গে **পল জাঁনে** বলেন ঃ "সমাজ বিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্রের সামগ্রিক ভিত্তিস্বরূপ শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে।"

মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হয়। রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের সম্পর্ক, রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল একটি রাষ্ট্রশাস্ত্র যে শাস্ত্রে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনা হয় এবং রাষ্ট্র ও মানুষের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ থাকে।

---

*"Political Science deals with the State and Government."—Gilchrist

**"It is thus a study of the State in the past, present and future."—
R. G. Gettel.

***"Political Science is a historical investigation of what the State has been, an analytical study of what the State is, and a politico-ethical discussion of what the State should be."—R. G. Gettel

*** রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু (What is Political Science? Scope of Political Science):** রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি তাহা ভালোভাবে বুঝিতে হইলে ইহার আলোচ্য বিষয় জানিতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইলে পৌরবিজ্ঞান বা সিভিক্স-এর আলোচ্য বিষয়গুলিকে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। পৌর-বিজ্ঞান হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম স্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল ব্যাপক ও বিশাল। সেই তুলনায় পৌরবিজ্ঞান ছোট আকারের রাষ্ট্রবিজ্ঞান। পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইল নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের পর্যালোচনা। আগে নাগরিক জীবনের একটিমাত্র দিক ছিল তাহা হইল নাগরিক মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের সভ্য। তখন ছিল নগররাষ্ট্র। রাষ্ট্রের মধ্যে আর কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান থাকিত না। তাই মানুষকে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে দেখাই যথেষ্ট ছিল। তখন রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করা, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং উভয়ের প্রত্যেকের সহিত সংযুক্ত সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, পৌর-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

কিন্তু আজ মানুষকে মাত্র রাষ্ট্রের নাগরিক বা সভ্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না। মানুষ আজ যেমন রাষ্ট্রের সভ্য তেমনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংগঠনেরও সভ্য। রাষ্ট্রের সমস্যা লইয়া আজ সে বিব্রত ; স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা লইয়াও সে কম বিব্রত নয়। সুতরাং এই পরিবর্তিত অবস্থায় পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি যখন বাড়িয়া যায় তখন আমরা তাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, পৌরসভা ও পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে।

বর্তমান যুগে নাগরিক জীবনের উপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। দেশব্যাপী ধর্মঘট আমাদের বিশেষ চিন্তার কারণ। তাই আজ নাগরিককে শুধু রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখিলেই চলিবে না, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবেও দেখিতে হইবে। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পরস্পরের আর্থিক নির্ভরতার জন্য বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে। বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিতে পারে না। ফলে নাগরিক জীবনের উপরে আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রভাব কম নয়। মধ্য প্রাচ্যের কোন ঘটনা, ইজরায়েলের যুদ্ধ ও তৈল সমস্যা যে কোন দেশের নাগরিকের সুখ হরণ করিতেছে।

(২) রাষ্ট্র বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ব্যাপক

বিষয়বস্তু ঃ (১) পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই **সমাজবিজ্ঞান**। সমাজ গঠনের প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতিগত। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সংঘ বা সংগঠন থাকে। শ্রেষ্ঠ সামাজিক সংগঠন হইল রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষ ও রাষ্ট্রের**

বহুবিধ দিক ও সম্পর্কের আলোচনা করে। রাষ্ট্র হইল সমাজবদ্ধ মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের মূর্ত প্রকাশ। এই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ তাহার আত্মবিকাশের সন্ধান করিতেছে।

(২) মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। আবার রাষ্ট্র ও মানুষের আলোচনা করিতে গেলে বহু সংশ্লিষ্ট আলোচনার অবতারণা করিতে হয়; যেমন, (ক) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা, (খ) স্বরাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক, (গ) রাষ্ট্রের গঠন ও প্রকৃতি, (ঘ) রাষ্ট্রনীতি ও কার্যাবলী, (ঙ) রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও কর্তব্য, (চ) শাসনপদ্ধতি এবং (ছ) রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী প্রভৃতি।

(৩) সমাজের বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত মানুষ সংযুক্ত থাকে। মানুষ সম্বন্ধে বিশেষতঃ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই সব প্রতিষ্ঠানেরও আলোচনা করিতে হয়। দেশ পার হইয়া বিদেশের সহিতও যেহেতু মানুষের সম্পর্ক থাকে সেইহেতু আন্তঃরাষ্ট্রীক সম্পর্কের কথাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। আজ মিশর বা প্যালেস্টাইনের তৈল সরবরাহের গোলযোগে ভারতের মানুষকে চিন্তায় পড়িতে হয়, ইজরায়েলের যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের রূপ লইবে কি না তাহা অনেকেরই চিন্তার কারণ। সুতরাং বিশ্বের নানা সমস্যার সহিত যেহেতু সকল মানুষই জড়িত সেইহেতু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

(৪) গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল বলিয়াছেন যে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে একাকী বাস করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করিতে হয়। সমাজবদ্ধ জীবনে ব্যক্তির সহিত সমষ্টির একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যক্তির সহিত সমষ্টির সম্পর্ক আলোচিত হয়। আবার রাষ্ট্র ব্যক্তির আত্মবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্কও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

(৫) রাষ্ট্র ও মানুষের এই বহুবিধ দিক ও সম্পর্কের আলোচনা সুষ্ঠুভাবে করিতে গেলে স্বভাবতঃই রাষ্ট্র যাহার মধ্যদিয়া মূর্ত হইয়া উঠে সেই সরকারকেও বুঝিতে হইবে; কারণ সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র কার্যকর করে তাহার মহান উদ্দেশ্যকে। সরকারই রাষ্ট্রের মূর্ত প্রকাশ। অতএব রাষ্ট্রের আলোচনা কালে স্বভাবতঃই সরকারের আলোচনা আসিয়া পড়ে। সরকারকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। অধ্যাপক গার্ণার, ব্লান্টস্‌লি প্রমুখ চিন্তাবীর সরকারকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী। অধ্যাপক গার্ণার বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ হইল রাষ্ট্রকে লইয়া।"* আবার সরকারকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে যাহারা আছেন তাহাদের মধ্যে গেটেল, গিলক্রাইস্ট, ল্যাস্কি, উইলসন প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

*"Political Science begins and ends with the State."—Garner

অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকারের আলোচনা করে।* অধ্যাপক গেটেল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমে বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা যায়।" তিনি আবার বলেন, এই বিজ্ঞানে রাষ্ট্ররূপী মানুষের সংগঠন, তার শাসনযন্ত্র অর্থাৎ সরকার এবং তার কার্যাবলীর আলোচনা করে। **পলজাঁনে** বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি ও সরকারের নীতিসমূহের আলোচনা করে।"

(৬) ইহাছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান সরকার প্রণীত আইনকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সংক্ষেপে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে তিনটি বিষয়ের আলোচনা করে তাহা হইল "**রাষ্ট্র, সরকার ও আইন**" ("State, Government and Law.")।

বস্তুতঃ সরকার ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনাও করা যায় না। সরকার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে, রাষ্ট্রের পক্ষে আইন প্রণয়ন করে, শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখে। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্যের বাস্তবরূপ দান করে। সরকারের রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে রাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি প্রকাশিত হয়। যেমন, ভারত সরকারের গণতান্ত্রিক নীতি ভারতরাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতির নির্দেশ দেয়। বস্তুতঃ সমাজের শান্তি ও শৃংখলা এবং সার্বিক উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারই করিয়া থাকে। অতএব সরকারের কাজ রাষ্ট্রের কাজের নামান্তর মাত্র। রাষ্ট্র ও সরকারের নীতি অভিন্ন। রাষ্ট্র কর্তৃত্বের আওতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্থান নির্ণয় করিতে হইলে সরকারকে আলোচনা ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতেই হয়। অন্যথায় নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে বিশ্লেষণ করা যায় না।

(৭) আদিমকাল হইতে শুরু করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে পুরাতন কাঠামোর সংস্কার সাধন করিয়া সমাজ ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন করিয়াছে। এই পরিবর্তন মানুষের আত্মবিকাশের কতটা সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে বর্তমানকালের রাষ্ট্রনীতির কার্যাবলীর পর্যালোচনা, ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ণয় এবং সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আবার বর্তমানের রাষ্ট্রসংগঠন, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও তাহার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলী মানুষকে আত্মবিকাশের কতখানি সুযোগ দেয় তাহার বিচার-বিশ্লেষণও রাষ্ট্রবিজ্ঞান করিয়া থাকে।

(৩) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রাষ্ট্র বিজ্ঞানে পাওয়া যায়

বর্তমানের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাবলীর সমালোচনা না করিলে সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয় এবং তাহাদের সমাধানের পথ নির্দেশ করাও সম্ভব নয়। সুদূর অজ্ঞাত অতীতে মানুষের জগতে যে চিন্তা ও ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা না জানিতে পারিলে বর্তমানের রাষ্ট্রদর্শনকে সঠিক ভাবে বোঝাও সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কি বলেন, "ইতিহাসের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ছাড়া আমাদের অনুসন্ধান ক্ষেত্রকে সঠিক ভাবে বুঝিতে পারা

---

* "Political Science deals with the State and Government."—Gilchrist

যায় না।"* রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই ইতিহাসের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শুধু অতীত ও বর্তমানকে লইয়াই নয়। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেমন বর্তমানের নীতি নির্ধারিত হয়, তেমনি আবার অতীতের আলোচনা ও বর্তমানের সমালোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ইংগিত দেয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান। গেটেলের ভাষায় বলা যায়, "এইরূপ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের আলোচনা হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞান।"**

(৮) ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (United Nations Economic Social and Cultural Organisation : UNESCO) এক সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করা হয় : (ক) রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও তাহার ইতিহাস, (খ) রাষ্ট্রের সংবিধান, বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, (গ) রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক সংস্থা, নীতি ও বিধান।

(৯) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিস্তৃত আলোচনাক্ষেত্র এই কথাই প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু সমালোচনাই করে না ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গতি নির্ধারক। অতীত ও বর্তমানের সাহায্যে নির্ণয় করে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গতি কোন দিকে প্রবাহিত হইতেছে। কোন্ দিকের গতি কোন্ দিকে প্রবাহিত হইলে উহা ব্যক্তির আত্মবিকাশে ও মানুষকে সুখী করিতে কতদূর সমর্থ হইবে, তাহারও ইংগিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতি-শাস্ত্রের মতো দিয়া থাকে। এই কারণেই গেটেল বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল রাষ্ট্র কি ছিল তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বর্তমান রাষ্ট্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কি হওয়া উচিত তার রাষ্ট্রনৈতিক নীতিশাস্ত্র সম্মত আলোচনা"***

(১০) রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা শুধু রাষ্ট্রের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্র হইল সামাজিক বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শাস্ত্রের আলোচনার প্রধান বিষয় হইল মানুষ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে এই মানুষেরই রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনের আলোচনা করে, ফলে মুখ্য আলোচ্য বিষয় এক হওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া আলোচনা করা যায় না। আবার সমাজচিন্তা শূন্যে সৃষ্টি হয় না। সমাজচিন্তা সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সামাজিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করিতে হইবে।

---

*"Nothing in the field of investigation is capable of being rightly understood save as it is illustrated by the process of its development."—Laski

**"It is thus a study of the State in the past, present and future."—
R. G. Gette

*** "Political Science is a historical investigation of what the State has been, an analytical study of what the State is and a politico ethical discussion of what the State should be."—R. G. Gettel

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপরোক্ত আলোচনার ক্ষেত্র হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি : রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান ? (Nature of Political Science : Is Political Science a Science ?) : রাষ্ট্রবিজ্ঞান যাহা আলোচনা করে এবং যে পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়া সমস্যার সমাধান করে তাহা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা ও তার সমস্যা অনেক সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ঠিক করিয়া দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে যখন স্বৈরাচারী শাসন চলিতেছিল রুশো তখন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করেন। ব্রিটিশ সরকার যখন দীর্ঘদিন ধরিয়া ভারতকে শাসন ও শোষণ করিতেছিল তখন মহাত্মা গান্ধী তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কার্লমার্কস ইওরোপীয় শিল্প পরিস্থিতি এবং শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে নূতন এক বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করেন। এমনিভাবে রুশোর বৈপ্লবিক নীতি, গান্ধীজীর অহিংস ও অসহযোগ নীতি এবং মার্কসের বৈপ্লবিক নীতি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি হইল **সমসাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্রকে তুলিয়া ধরা এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা।**

(১) সমসাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্রকে তুলিয়া ধরা এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা

উপরে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল তাহা হইতে বলা যায় যে, এই সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতবাদের প্রকৃতি বৈপ্লবিক। রুশোর সাম্যবাদ ফরাসীদেশে বিপ্লব ঘটাইতে সাহায্য করিয়াছে, গান্ধীজীর অহিংস মতবাদ ব্রিটিশকে ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছে। মার্কসের সাম্যবাদ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শাসন-পদ্ধতির চরিত্র পাল্টাইয়াছে, দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনের ক্ষেত্রে মঁতেসকিউয়ের মতবাদ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি রাষ্ট্রসংস্কারকের ইচ্ছাদ্বারা প্রভাবিত হয়। প্লেটো লিখিত **'The Republic'** এবং অ্যারিস্টটল লিখিত **'Politics'** গ্রন্থ দুইখানিতে বিশিষ্ট আদর্শ প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পলিবিয়াস রোমের প্রজাতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেন। এই সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতবাদের উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি নির্ভর করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চরিত্র নানাপন্থী হইয়া থাকে। ইতিহাস যেমন অতীতের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তেমনি বর্তমানকালের ঘটনাকে আলোচনা করে। অর্থবিদ্যা যেমন কোন ঘটনার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দেয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানও তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্লেষণ দেয়। সমাজবিদ্যা সামাজিক দিক হইতে সব কিছুর বিচার করে আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের দিক হইতে তার সমস্যার বিচার করে। এমনিভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার প্রকৃতি অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াও বুঝিতে পারা যায়।

(২) চরিত্র নানা পন্থী

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি আধা বৈজ্ঞানিক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি উদ্ঘাটন করিতে

হইলে ইহা বিজ্ঞান কি-না জানা দরকার। কি কি অনুসন্ধান পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করে তাহাও জানা দরকার। ইহার কারণ অনুসন্ধান পদ্ধতি হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতিও কিছুটা ধরা পড়িবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান ? (Can Political Science be called a Science ?) ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান কি-না তাহা উল্লেখ করার আগেই বিজ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংজ্ঞা আমাদের জানা দরকার। কারণ, বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা না জানিতে পারিলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত কিনা বলা সম্ভব নহে। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ **বিশেষরূপ জ্ঞান**। কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য লইতে হয়। আবার এই জ্ঞানকে সুশৃংখল ও সুসংবদ্ধ হইতে হইবে। তাহা না হইলে ঐ জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সংক্ষেপে বলা যায় ঃ **"বিজ্ঞান হইল কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়বস্তুর সুসংবদ্ধ জ্ঞান"**। এই সুসংবদ্ধ জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানী কতকগুলি সাধারণ সূত্র বাহির করেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে এই সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য নিরূপণ করেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিকে বিজ্ঞান পদবাচ্য করা যায়। কারণ, তাহাদের বিষয়-বস্তুগুলির বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ ও পর্যবেক্ষণ করিয়া একটি সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লব্ধজ্ঞান হইতে কতকগুলি সূত্র নির্ধারণ করা যায়।

এখন প্রশ্ন হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায় কি-না। ফরাসী দার্শনিক বাক্‌ল (Buckle), কোঁৎ (Comte) এবং মেটল্যান্ড প্রমুখ নিম্নলিখিত যুক্তিতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পদবাচ্য করিতে চান না।

বিপক্ষে যুক্তি ঃ (১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত জটিল এবং অনিশ্চয়তা-পূর্ণ। ফলে অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর পরীক্ষাকার্য, গবেষণা এবং শ্রেণী বিভক্তিকরণ যতটা সহজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ততটা সহজ নহে।

(২) অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে যতটা ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে ততটা ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় না।

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অর্থাৎ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্রের সমস্যাবলীর সঠিক পরিমাপ করা বা অপরিবর্তনীয় রাখিয়া স্বরূপ নির্ণয় করাও সম্ভব নহে। **ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন** মানুষকে লইয়া গবেষণাগারে পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। গবেষকের গবেষণার বিষয় যদি সকল অবস্থায়ই অপরিবর্তিত থাকে তবেই গবেষকের পক্ষে সাধারণ সূত্র বাহির করা সম্ভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সদা পরিবর্তনশীল। সুতরাং অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ইহার পরীক্ষাকার্য চলে না। ফলে ইহা বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয় না।

(৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বাহ্যিক পরিবেশের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়। এই সকল কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিকে অনুমান সিদ্ধ বলিয়া আখ্যায়িত

করেন। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নির্ভরশীল। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞানের পদবাচ্য করা যায় না। লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়াছেন এবং ইহাকে আবহ-বিদ্যার (Meteorology) সহিত তুলনা করিয়াছেন।

আবার অ্যারিস্টটল, বোড্যাঁ, হবস্, পোলক প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে চান। স্যার ফ্রেডারিক পোলক বলেন ঃ "যাহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করেন না, তাহারা বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা জানেন না।" ইহাদের যুক্তি হইল ঃ

সপক্ষে যুক্তি ঃ (১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষেও শ্রেণী বিভক্তিকরণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়।

(২) লর্ড ব্রাইস এই মত পোষণ করেন যে, মানুষের আচরণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় এবং এই সুসমঞ্জস আচরণ হইতে সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভও করা যায়। তাহা ছাড়া মানুষের এই আচরণ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাধারণ নিয়মও বাহির করিয়া থাকেন। এই নিয়মগুলির সাহায্যে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যারও সমাধান করা যায়।

(৩) অধ্যাপক গার্ণারের মতানুসারে বলা যায়, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বস্তুর যেহেতু বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভক্তিকরণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি করা যায় এবং শ্রেণী বিভক্ত জ্ঞান হইতে সাধারণসূত্রের প্রতিষ্ঠাও যেহেতু সম্ভব সেইহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানও বিজ্ঞান পদবাচ্য।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গভীর শৃংখলা দৃষ্ট হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহ হইতে কতকগুলি সূত্রও নির্ধারণ করেন এবং এই সূত্রগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তুলনামূলক, পরীক্ষামূলক, ঐতিহাসিক ও আইনমূলক পদ্ধতির সাহায্যে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী প্রগতিশীল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই প্রগতিশীল মানব জীবনের আলোচনা করে। তাই লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রগতিশীল বিজ্ঞান।"* অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ইংগিত দিয়া থাকেন তার অধিকাংশই নির্ভুল প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক গেটেল বলিয়াছেন যে, যদি বিজ্ঞান বলিতে এই বোঝায় যে, শৃংখলিত পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে আহৃত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান ও আলোচনা এবং ইহা এক সুসংবদ্ধ বিষয়ের বিশ্লেষণ ও শ্রেণী বিভক্তিকরণ, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকেও বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।"**

(৩) প্রগতিশীল বিজ্ঞান

---

*"Political Science is a progressive Science."—Bryce

**"If, however, a science be described as a mass of knowledge concerning a particular subject, acquired by systematic observation, experience and study and analysed and classified into a unified whole, then political science may justly claim to be a science."—Gettel R. G.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন উপায়ে সূত্র নির্ধারণ করেন। যেমন, বিপ্লব কেন হয়? শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কেন হইয়া থাকে? এই দুইটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা যাক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একটি শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর দেখেন যে, উহা জনসাধারণ কর্তৃক কি পরিমাণ সমর্থন লাভ করিয়াছে। যদি ঐ শাসনতন্ত্র সর্ব অবস্থায়ই অগ্রাহ্য হয়, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐ শাসনতন্ত্রের রদবদল করেন এবং ঐ শাসনতন্ত্রকে বিপ্লবের কারণ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষাক্ষেত্র বিরাট হইলেও অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় এই শাস্ত্রে পরীক্ষাকার্য চলে এবং পরীক্ষার পর সূত্র নির্ধারিত হয়। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি দিক আছে; যথা, বিজ্ঞান, কলা, দর্শন ও আইন প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় সর্বদা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা সম্ভব নয় বলিয়া এই শাস্ত্রকে কেহ কেহ অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের অনুসন্ধান পদ্ধতি (Methods of Study of Political Science) : পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হইত না; কারণ তার প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক বলিয়া কেহ স্বীকার করিত না। কিন্তু পরে দেখা গেল রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। তাই প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন তার গবেষণার একটা পদ্ধতি থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও অনুরূপ নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। বিজ্ঞানের কাজ সূত্র নির্ণয় করা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানও সূত্র নির্ণয় করে। এই সূত্র নির্ণয় করিবার জন্য কতগুলি অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি না থাকিলেও তাহার কতকগুলি অনুসন্ধান পদ্ধতি আছে। এই অনুসন্ধান পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণা করে। নিচে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(১) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method) : এই পদ্ধতির অর্থ হইল কোন বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া কিছু সিদ্ধান্ত করা হয়। এই পরীক্ষার সময় প্রতিকূল বিষয়গুলিকে বাদ দিতে হইবে আর অনুকূল ঘটনাগুলিকে পরীক্ষা করিতে হইবে। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার বিষয় গবেষণাগারে পরীক্ষা করা যায়। যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস কোন পাত্রে মিশাইলে জল তৈয়ার হইবে। এমনভাবে পরীক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে করা যায় না। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যদি একটি রাষ্ট্র বাছিয়া লইয়া তাহাতে সমাজতন্ত্র চালু করিয়া দেখেন যে জনগণ উহা গ্রহণ করিল কিনা তাহা হইলে তিনিও একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিবেন। তবে ইহা সহজ নয়, কারণ মানুষ লইয়া ইহার কারবার। আবার এই মানুষের মন সর্বদা স্থির থাকে না। সেইহেতু নিশ্চিত ফল পাওয়া খুবই মুশকিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের উপকরণ সচেতন মানুষ। তাহার ধ্যান-ধারণা সব সময়ই পাল্টাইতেছে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

(২) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method) : এই পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাজ এবং নীতি লক্ষ্য করিতে হইবে এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শাসন ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। পর্যবেক্ষণকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহিরের

দিক হইতে বাহ্য সাদৃশ্য এবং সামান্যিকরণ যথাসম্ভব ত্যাগ করিতে হইবে। মানুষ সামাজিক জীব। তাহার স্বভাবের প্রবণতা সর্বত্রই সমান। কিন্তু পরিবেশের পার্থক্যের দরুন তাহার প্রকৃতি বিভিন্ন রূপ হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিবার সময় মানুষের প্রবণতার এই বিষয়টি মনে রাখিতে হইবে। যেমন, পর্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে, শুধু আইন পাস করিয়াই স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন সতর্কতার।

(৩) **পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical Method)** ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন সূত্র নির্ধারণ করিতে হইলেই কোন বিষয়ের পরিসংখ্যান গ্রহণ করিতে হয়। যেমন, লোকসংখ্যা কত না জানিতে পারিলে রাষ্ট্রের কোন নীতি ঠিক করা যায় না। অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বিভিন্ন সমস্যার সূত্র বাহির করিতে হয়।

(৪) **তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)** ঃ এই পদ্ধতির অর্থ হইল দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তুলনা করিয়া দোষ ত্রুটি নির্ণয় করা যায়। অতীত ও বর্তমান রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিয়া রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করিয়াছে কিনা বুঝিতে পারা যায়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করিবার সময় শুধু তুলনীয় বিষয়গুলিই লইতে হইবে। অ্যারিস্টটল ১৫৮টি রাষ্ট্রের কার্যাবলীর তুলনামূলক আলোচনা করিয়া কতকগুলি সূত্র বাহির করেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি নির্ণয় করেন। তুলনীয় বিষয়গুলির মধ্যে পরিবেশের মিল দেখিয়া লইতে হইবে।

(৫) **ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)** ঃ ঐতিহাসিক পদ্ধতির সার কথা হইল ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই বর্তমান রাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করা। পোলক বলেন ঃ ঐতিহাসিক পদ্ধতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা এবং উহার ভবিষ্যত গতি কিরূপ হইবে তাহা ব্যাখ্যা করে। অতীতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিরূপ ছিল এবং কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে সে সম্বন্ধে তথ্য লইয়া রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করা হয়। প্লেটো, হেগেল ও মার্কস এই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৬) **জীববিদ্যা-মূলক পদ্ধতি (Biological Method)** ঃ এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা হয়। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে কোথায় মিল আছে তাহার বর্ণনা করিয়া জীবেরই মতো রাষ্ট্র কিভাবে জন্মগ্রহণ করিল তাহার ব্যাখ্যা করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া **ডারউইন** আবিষ্কার করিলেন যে, যোগ্যরাই একমাত্র বাঁচিবার অধিকারী (Survival of the fittest)। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার অর্থ দাঁড়ায় একমাত্র শক্তিমান রাষ্ট্রেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। এই পদ্ধতি অনুসারে সাম্রাজ্যবাদই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইহা ঠিক যে রাষ্ট্রের

সহিত জীবদেহের কিছু মিল আছে। কিন্তু বাহিরের দিক হইতে মিল দেখিয়া রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ব্যাখ্যা করিলে অনেক সিদ্ধান্ত ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৭) **সমাজ বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method)** : এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকে একটি সমাজদেহ বলিয়া কল্পনা করা হয়। সমাজদেহের কোষ হইল ব্যক্তি। দেহের কোষগুলির গুণাগুণের উপর যেমন সম্পূর্ণ দেহের গুণাগুণ নির্ভর করে, সেইরূপ নাগরিকের গুণাগুণের উপরও রাষ্ট্রের গুণাগুণ নির্ভরশীল। ইহা বিবর্তনবাদ অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করে। স্পেনসার এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

(৮) **আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method)** : অধ্যাপক গার্ণার বলেন, এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে প্রধানতঃ একটি আইনমূলক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা হইযাছে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আইনের নীতির বিজ্ঞান হিসাবে ধরা হইয়াছে। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা। "The state is the child of law". "The state is the parent of Law". "রাষ্ট্র আইনের সন্তান"। "রাষ্ট্র আইনের পিতা"। এই কথা দুইটি হইতে বুঝা যায় আইনের গণ্ডীর বাহিরে রাষ্ট্রের কোন সত্তা নাই। রাষ্ট্রই আইন সৃষ্টি করে আবার আইনও রাষ্ট্র সৃষ্টি করে।

(৯) **মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি (Psychological Method)** : রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ। কিন্তু মানুষের কোনও কাজের পিছনে যে উদ্দেশ্য থাকে তাহার ব্যাখ্যা করে মনোবিদ্যা। সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাহা মনোবিদ্যা হইতে জানা যায়। গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহের কারণগুলি মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়।

(১০) **দর্শনমূলক পদ্ধতি (Philosophical Method)** : এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি মনঃকল্পিত ধারণা করা হয়। এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কর্তব্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন নীতি স্থির করা হয়। এই স্থির করা নীতিগুলির সহিত রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। প্লেটো ও হেগেল এই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ইহাদের ব্যবহার এককভাবে করা বিপজ্জনক। পদ্ধতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া ইহাদের ব্যবহার করিতে হইবে।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation with other Social Sciences) : প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান—এই দুই ভাগে মানুষের জ্ঞানকে বিভক্ত করা যায়। মানুষ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে, সেই পরিবেশের বিশ্লেষণ করে **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Sciences)**। আর সমাজবদ্ধ মানুষের সমাজ জীবনের আলোচনা করে **সামাজিক বিজ্ঞান (Social Sciences)**। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয় প্রাণিবিদ্যা, ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা

প্রভৃতি। আর সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান এবং ইতিহাস প্রভৃতি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সকল বিজ্ঞানই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। সুতরাং ইহাদের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত প্রাণিবিদ্যা ও ভূবিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে। প্রাণিবিদ্যা আলোচনা করে প্রাণী হিসাবে মানুষের শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি আর ভূবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের বাসভূমির আয়তন, অবস্থান ও জলবায়ু প্রভৃতি। মানুষের জীবনের সহিত যেহেতু ইহাদের সম্পর্ক আছে সেইহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিতও ইহাদের সম্পর্ক আছে। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধান বিষয় হইল মানুষ ও তার রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের আয়তন ছোট হইলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়, ছোট রাষ্ট্রের মানুষের স্বাধীনতা প্রায়ই লুপ্ত হয়। ভূবিজ্ঞান রাষ্ট্রের আয়তন লইয়া আলোচনা করে, সুতরাং ভূবিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।

(১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান

সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইল সমাজবদ্ধ মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানে** আলোচিত হয় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। **নীতিশাস্ত্রে** আলোচিত হয় মানুষের নৈতিক জীবন। আর **ধনবিজ্ঞানে** আলোচিত হয় মানুষের আর্থিক জীবন। এইভাবে মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা কোন-না-কোন সামাজিক বিজ্ঞানে হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে **সিজউইক** বলেন, "কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা লাভ করিতে হইলে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত আলোচ্য শাস্ত্রের সম্পর্কটি ভালোভাবে বুঝিতে হইবে। আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে, কোন শাস্ত্র অপরাপর শাস্ত্র হইতে কতখানি দান বা গ্রহণ করিয়াছে।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মন্তব্যটি খুবই প্রযোজ্য। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সকল সামাজিক বিজ্ঞানই যেহেতু মানুষের জীবনের কোন-না-কোন দিকের আলোচনা করে সেইহেতু সামাজিক বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই পরস্পর সম্পর্কিত। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় দেখানো যাইতে পারে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার সম্পর্ক কিরূপ। নিচে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা এবং নীতিশাস্ত্রের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক দেখানো হইল ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History) ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে অতীতের ঘটনাবলী, অতীতের আন্দোলন এবং তাহার কারণ ও ফলাফল। মানব সমাজের ক্রমবিকাশ যে ধারায় হয় তাহার আলোচনা ইতিহাসে হইয়া থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইতিহাস হইতে তাহার প্রয়োজনীয় মালমসলা সংগ্রহ করেন এবং এই সংগৃহীত তথ্য হইতে রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র নির্ধারণ করেন। ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে ঋণী। সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ ও তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনপ্রণালী

ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতেই পায়। অতএব এই দুই শাস্ত্র পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্যার জন সিলি এই জন্যই বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাস আলোচনা যেমন নিষ্ফল তেমনি ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন।"*

সমাজ বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের জন্ম হইয়াছে। ইতিহাস সমাজবিবর্তনের ধারার বর্ণনা দেয়। ইতিহাস হইতেই জানা যায় রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ধারা। ইতিহাস সুদূর কাল হইতেই মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বর্ণনা দেয়। তাই ইতিহাসের সাহায্য না লইয়া অতীতকালের মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন জানা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হইল বর্তমান রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনের উপায় নির্ধারণ করা। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বর্তমানের ত্রুটি ধরা সহজ হয়। ইতিহাসই অতীতের তথ্যের যোগান দেয়। অতীতকালের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা কেমন ছিল, কিভাবেই বা তার সমাধান করা হইত—এই সকলের সহিত তুলনা করিয়াই বর্তমানকালের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাকে বুঝিতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। এই জন্য তার ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজন। ইতিহাস মানুষকে কল্যাণের পথে চালিত করিবার জন্যই অতীতের অভিজ্ঞতাকে জানাইয়া সতর্ক করিয়া দেয়। আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাও ইতিহাসের আদর্শ। এই আদর্শকে ফলবতী করিতে হইলে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই ইতিহাসকে আলোচনা করিতে হইবে। যেমন, ভারতে কংগ্রেসের কাজ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কাজকে বাদ দিয়া ভারত ও তার জনগণের ইতিহাস রচনা করা যায় না, অতএব ইতিহাস লিখিতে হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রয়োজন হইবে। গেটেল তাই বলিয়াছেন এই দুইটি শাস্ত্রের আলোচনাই "পরস্পর সহায়ক ও পরিপূরক"।

(২) ইতিহাস তথ্যের যোগান দেয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহা হইতে সূত্র নির্ধা- :' রে

আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক পার্থক্যও আছে। নিচে এই পার্থক্যগুলি দেখানো হইল ঃ

(১) ইতিহাসের সবটাই প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি নহে। ইতিহাসে কলা, সাহিত্য, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি অনেক কিছুরই বর্ণনা থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শুধু তার প্রয়োজন মতো রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সহিত সম্পর্কিত তথ্যই ইতিহাস হইতে গ্রহণ করেন। লিয়াকক তাই বলেন, ইতিহাসের কিছুটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ ; সবটাই নয়।**

(২) ইতিহাসের আলোচনা ক্ষেত্র বড়। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র ছোট। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় থাকে তত্ত্ব আর ইতিহাসের আলোচনায় থাকে তথ্য।

---

*"History without Political Science has no fruit,
PoliticalScience without His ory has no root."—John Seely

**"Some history is part of Political Science."—Leacock

(৩) অনেক সময় বলা হয়, "ইতিহাস অতীতকালের রাষ্ট্রনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বর্তমানকালের ইতিহাস"।* অবশ্য, এই উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু কোন এক সময়ের মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনাই করে না, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান মানুষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেরও ইংগিত দেয়। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের কোন্ সমস্যা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তাহারও ইংগিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেয়। কিন্তু ইতিহাসে কোন ভবিষ্যৎ কল্পনা লেখা হয় না। যেমন, প্লেটো তাঁহার (The Republic) গ্রন্থে যে সাম্যবাদের ছবি আঁকিয়াছেন তেমন সাম্যবাদ গ্রীসের নগররাষ্ট্রে ছিল না। ইহা একটি আদর্শ মাত্র। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাদৃশ্য সম্পন্ন নয়।

উপসংহারে ন্যায়তই বলা যায় যে, এই দুই শাস্ত্র যদিও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক-যুক্ত, কিন্তু বর্তমানে ইহাদের স্ব স্ব আলোচ্য বিষয় এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে. ইহারা পরস্পর হইতে আলাদা হইয়া পড়িয়াছে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা (Political Science anu Economics) : প্রাচীন ভারতে **কৌটিল্যের** অর্থশাস্ত্রে অর্থবিদ্যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে আলাদা করিয়া দেখানো হয় নাই। উভয়ের আলোচ্য বিষয়ই অর্থশাস্ত্রে লেখা হইয়াছিল। গ্রীসের দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টট্ল প্রমুখ তাঁহাদের লেখায় অর্থবিদ্যাকে একটি আলাদা শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করেন নাই। তাঁহাদের ভাষায় এই শাস্ত্রের নাম রাষ্ট্রনৈতিক অর্থবিদ্যা (Political Economy)। তাঁহারা মনে করিতেন যে রাষ্ট্রকে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখিতে হয়, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হয়। এই কারণে রাষ্ট্রের অনেক রাজস্বের প্রয়োজন। অর্থবিদ্যা আলোচনা করে রাষ্ট্রের কতকগুলি বিষয়ের, সেইহেতু ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ মাত্র। রাষ্ট্র অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আয় বাড়ায়। অর্থনৈতিক দিক হইতে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিবার আলোচনাও অর্থবিদ্যায় হইয়া থাকে। তাই অর্থবিদ্যাকে রাষ্ট্রশাস্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যেই ধরা যাইতে পারে। সরকার প্রতি বৎসর আয়ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট তৈরী করে এবং বাজেটের বরাদ্দ অর্থ দিয়াই রাষ্ট্রের সব কাজ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোন কাজ করিতে হইলেই টাকার দরকার—আর টাকার আলোচনা করে অর্থবিদ্যা এবং রাষ্ট্রের কাজের আলোচনা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। অতএব একটা ছাড়া আর একটা আলোচনা করা যায় না। তাই এই দুই শাস্ত্রকে অভিন্ন বলা চলে। অর্থ-বিদ্যার প্রধান লক্ষ্যবস্তু দুইটি ; যথা, (১) শাসনকার্য চালানোর জন্য রাজস্ব আদায় করার নীতি নির্ধারণ করা ; (২) জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য যাহাতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা যায় তাহার উপায় ঠিক করা। রাষ্ট্র ও জনগণকে ধনশালী করিয়া তোলাই অর্থবিদ্যার লক্ষ্য।

(৩) রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

বর্তমানে অর্থবিদ্যা শুধু রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ই আলোচনা করে। অর্থবিদ্যা, উৎপাদন, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিময়, বণ্টন সংক্রান্ত সমস্যারও আলোচনা করে। অর্থবিদ্যার

*"History is the past politics and politics is the present History."

এই সকল বিষয়ের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বিশ্লেষণও অনুধাবনের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যাকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়। কিন্তু এই দুই শাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই দুই শাস্ত্রই মানুষের সমাজ জীবনের কাজ কারবার লইয়া আলোচনা করে। উভয়েরই লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধন।

(৪) অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেশের শান্তি রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি লইয়া আলোচনা করে। দেশের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা, দেশের শান্তি রক্ষার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। দেশ শান্ত থাকিলে অর্থনৈতিক কাজ ভাল হয়। অশান্ত দেশে অর্থনৈতিক কাজ কারবার ভালো চলে না। আবার উল্টা করিয়া ধরিলে অর্থনৈতিক কারবারের উপরও দেশের শান্তি অনেকটা নির্ভর করে। যেমন, দেশে যদি এমন অর্থব্যবস্থা চালু হয় যাহাতে দেশের গরীব আরও গরীব হয় তবে দেশে বিপ্লব ও অশান্ত অবস্থা দেখা দিবে। ধনোৎপাদন ব্যাহত হইলেও দেশে বিশৃংখলা দেখা দেয়। অতএব এই উভয় শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ই একে অপরকে প্রভাবিত করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্র। পূর্বে ছিল পুলিশ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল শান্তিরক্ষা করা। সুতরাং অর্থবিদ্যার সহিত প্রত্যক্ষভাবে ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্র হইল কল্যাণকর রাষ্ট্র। এই কল্যাণকর রাষ্ট্র সমাজের উন্নতি বিধান করে। রাষ্ট্র আজ নিজেই ব্যবসা করে। ধনোৎপাদনক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই রাষ্ট্রের আলোচনা প্রসঙ্গে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান একদিকে কর ধার্য করিয়া কিভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহারও আলোচনা করে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্র আর্থিক ব্যবস্থার সুবিধার জন্য এবং শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য অনেক আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহাও আলোচনা করে। অতএব অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের কাজের উপর এবং নীতি নির্ধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক আলোচ্য বিষয় অর্থবিদ্যায়ও হইয়া থাকে।

উপসংহারে বলা যায়, এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইহারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।✓

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Political Science and Ethics) ঃ প্রাচীন দার্শনিকগণ বলেন, নীতিশাস্ত্র মূলশাস্ত্র, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহার শাখা। প্লেটো যে কল্পিত আদর্শ সমাজের বর্ণনা তাহার রিপাবলিকে (The Republic) গ্রন্থে দিয়াছেন তাহা নৈতিক আদর্শ ভিত্তিক। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, "মঙ্গলময় সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে"। রাষ্ট্রই নাগরিকের চরিত্র নির্ণয় করে। প্রাচীন ভারতে রাজা ও প্রজার দায়িত্ব ও কর্তব্য নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হইত। যে রাজা নীতিবান নয় প্রজাগণ তাহাকে বধ করিতে পারিত।

ষোড়শ শতাব্দীতে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে আলাদা করিয়া দেখান। হবস্, লক ও রুশো সামাজিক চুক্তিবাদ প্রচার করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখান।

এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে যে পার্থক্যও মিল আছে তাহা নিচে দেখানো হইল ঃ

(১) নীতিশাস্ত্র আলোচনা করে মানুষের মনের চিন্তা ও তাহার বাহ্যিক আচরণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে শুধু বাহ্যিক আচরণের। মনের চিন্তা লইয়া তাহার কারবার নহে। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের সকল বাহ্যিক আচরণের আলোচনা করে না, শুধু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণের আলোচনা করে।

(২) নীতিশাস্ত্রের নীতি ন্যায় ভিত্তিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি ন্যায় অন্যায়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। ইহা রাষ্ট্রের সুবিধাদ্বারাই নির্ধারিত হয়।

(৩) নীতিশাস্ত্র মানুষের সমগ্র জীবনের আলোচনা করে বলিয়া ইহার বিষয় বস্তু বড় আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনা করে তাই তার আলোচনাক্ষেত্র ছোট।

(৪) নীতিশাস্ত্রের নীতি পালন বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আইন বাধ্যতামূলক। পিতামাতাকে ভক্তি না করিলে কোন দৈহিক শাস্তি পাইতে হয় না, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘনকারীকে দৈহিক শাস্তি পাইতে হয়।

উপরোক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না। উভয় শাস্ত্রই মানুষকে সুন্দর করিয়া গড়িতে চায় এবং মানুষকে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে অবহিত করে। রাষ্ট্র যে সকল আইন প্রণয়ন করে তাহার বৈধতা নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে স্থির করা হয়। নীতিবিরুদ্ধ আইন জনগণ মান্য করিতে চায় না। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানও অনেক সময় মানুষের নীতিজ্ঞানের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন, ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। সতীদাহ প্রথা নীতিশাস্ত্র সম্মত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু পরে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া ইহা রোধ করে। তারপর জনগণের নৈতিক জ্ঞানের পরিবর্তন হওয়ায় তাহারা আর সতীদাহ প্রথাকে সমর্থন করে না। বর্তমানে সতীদাহ প্রথাটি নীতিবিগর্হিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য নৈতিক আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র না হইলে কিছুদিন পরেই রাষ্ট্র ধ্বংস হইয়া যায়। অধ্যাপক আইভর ব্রাউন বলেন, নীতিশাস্ত্রের ধারণা সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রতিফলিত না হইলে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ অর্থহীন হইয়া পড়ে। আবার রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ বর্জিত নৈতিক মতবাদ অসম্পূর্ণ। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল এমন এক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারে। এই আদর্শকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র যে সকল কার্য করে তাহার অধিকাংশই নীতিশাস্ত্রের নির্দেশে সম্পাদিত হয়।

নীতিশাস্ত্রের নৈতিক আদর্শ যখন মানুষের আচার-ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং উহা সমাজবদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রীতিনীতি হইয়া দাড়ায় তখন তাহা মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজে যখন নীতিশাস্ত্রের সূত্রগুলি বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন আবার এইগুলি আইনরূপেও প্রণীত হয়। অধ্যাপক গেটেল বলেন, রাষ্ট্রের কাজ ঠিক হয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মঙ্গল সাধনের জন্য নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। এই দুই শাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক।

(৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (Political Science and Sociology) ঃ সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। এই বহুমুখী জীবনের আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান। আদিম যুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের কার্যকলাপ, সংগঠন ও তাহার ক্রমবিকাশের আলোচনা করিয়া সমাজ সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র ও তত্ত্ব নির্ধারণ করে সমাজবিজ্ঞান (Sociology)। সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক জীবনের সকল রকম অবস্থার আলোচনা করে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানের একটি শাখা বিজ্ঞান।

(ক) সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র বিরাট। ইহা সমাজবদ্ধ মানুষের সমগ্র জীবনের আলোচনা করে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধির তুলনায় ক্ষুদ্রতর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে সামাজিক মানুষের শুধু রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। গিলক্রাইস্টের ভাষায় বলা যায়ঃ "সামাজবিজ্ঞান সমাজের বিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে সামাজিক মানুষের জীবন এবং একপ্রকার বিশিষ্ট সামাজিক সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের আলোচনাও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর বিশেষীকৃত বিজ্ঞান।*

(খ) সমাজবিজ্ঞান শুধু সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনই আলোচনা করে না। ইহা অসংগঠিত অবস্থার মানব সম্প্রদায়কে লইয়াও আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু সমাজবদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষকে লইযাই আলোচনা করে। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন তাহার সমাজবদ্ধ জীবন অপেক্ষা নবীনতর। কারণ, সমাজ সৃষ্টির অনেক পরে রাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে।

(গ) সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয় সমাজ জীবনের সূত্রপাত হইতে আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইতে।

(ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক জীব হিসাবে গ্রহণ করে আর সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের সামাজিক জীবে পরিণতি সম্বন্ধে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বহু আলোচনায় বিধৃত সমাজবিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করিয়া মানুষের রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট কাজের আলোচনা করে। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে প্রথমেই সমাজবিজ্ঞানী হইতে হইবে। অধ্যাপক গিডিংস বলেন ঃ "যাহারা সমাজ-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি জানেন না তাহাদিগকে রাষ্ট্রতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া, আর নিউটনের গতি সম্পর্কে কিছুই জানে না এমন ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া একই কথা।"

সমাজবিজ্ঞান যেমন উপাদান যোগায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানও উপাদান যোগায় সমাজবিজ্ঞানের। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান হইতেই রাষ্ট্র জীবনের গোড়ার

*"Sociology is the science of society. Political science is the science of the State or political society. Sociology studies man as a social being, and as political organisation is a special kind of social organisation, Political Science is a more specialised science than Sociology."—Gilchrist

প্রথা গ্রহণ করে। আর সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে গ্রহণ করে রাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি ও কার্যবলী। তাই উভয়েই উভয়ের কাছে ঋণী।

গিডিংস্-এর মতে যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সহিত মিশিয়া যায় নাই। উভয়ের মধ্যে একটা সীমারেখা টানা যাইতে পারে। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি এতো ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাকে অনেকেই একটা সম্পূর্ণ আলাদা শাস্ত্র হিসাবে ধরিয়া থাকেন। অবশ্য, ইহা সত্ত্বেও এই দুই শাস্ত্র ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Psychology and Political Science) ঃ মানুষ মাত্রই ভাবপ্রবণ। ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে অনেক কাজ করে। মনোবিজ্ঞান মানুষের ভাবোচ্ছ্বসিত কাজের আলোচনা করে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানুষের শুধু রাষ্ট্রনৈতিক কাজের। রাষ্ট্রনৈতিক কাজের মধ্যে কতকগুলি কাজ মানুষ ভাবের আবেগে করিয়া থাকে। এই ভাবভিত্তিক ও উত্তেজনা-প্রসূত কাজের আলোচনা মনোবিজ্ঞানের আওতার মধ্যেও পড়ে। বর্তমানে গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র জনমতের উপর নির্ভরশীল। এই জনমত আবার মানুষের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই কারণে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বের অনুধাবন প্রয়োজন।

৬) মনোবিদ্যার বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞনীকে সাহায্য করে

সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আলোচনা কালে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষের মনস্তত্ত্বের অনুশীলন প্রয়োজন হয়। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রের প্রতিভূ হইল সরকার। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের মানসিক ধারণা ও নৈতিক বিশ্বাসের উপর। মনোবিজ্ঞান পাঠ করিয়া মানুষের মানসিক ধারণা সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। এই জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে মানুষের ধারণা, মনোবৃত্তি ও ভাবপ্রবণতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য মনোবিজ্ঞান পাঠ করিতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র নির্ধারণের জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানলাভের বিশেষ প্রয়োজন। তাই লর্ড ব্রাইস বলেন ঃ "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় আছে মনোবিজ্ঞানের মধ্যে"।*

বর্তমানে জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। এই জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত সমস্যা ও তার সমাধানের সূত্রগুলি মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। মানুষের ভাবপ্রবণতা, মনোবৃত্তি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের গৌরব প্রভৃতি জাতীয়তাবাদের উপাদানগুলি মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এই দিক হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

আবার দল ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় না। এই দলগঠনের পশ্চাতে মানুষের মনের ভাব ও সহজাত প্রবৃত্তি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং রাষ্ট্র-

*"Political Science has its roots in psychology" Bryce.

বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনস্তত্ত্বের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। আধুনিক যুগে দলগঠনে, সেনাবাহিনী গঠনে, বিচারালয়ে বহু মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বার্কার বলেন, "রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাবলীর ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানের সমাধান-সমূহের ব্যবহার যেন বর্তমান দিনের রীতি হইয়া দাড়াইয়াছে।" রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন সংস্কারের দাবিতে যে গণআন্দোলন শুরু হয়, তাহা কি ভাবাবেগ-প্রসূত না সত্যই কোন প্রকৃত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা-সম্ভূত তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। এই বিশ্লেষণ কার্যে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। বেজহট, ম্যাকডুগাল, গ্রাহাম ওয়ালাস্ ও স্পেনসার প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদগণ দেশের শাসন ব্যবস্থার উপর মনস্তত্ত্বের প্রভাব ও গুরুত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বিভিন্ন দেশের শাসন ব্যবস্থার পার্থক্যের পশ্চাতে রহিয়াছে সংশ্লিষ্ট দেশের গঠন, প্রকৃতি ও মনোভাবের পার্থক্য। যেমন, সুইজারল্যান্ডে বা ইংল্যান্ডে যে শাসনব্যবস্থা সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহা অন্য দেশে সাফল্যলাভ করিতে না পারার কারণ হইল অন্য দেশের জনসাধারণের মানসিক গঠন, প্রকৃতি ও মনোভাবের সহিত এই দুই দেশের জনসাধারণের মানসিক গঠন, প্রকৃতি ও মনোভাবের পার্থক্য আছে। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকালে মনস্তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

(৭) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত

উপসংহারে বলা যায়, মনোবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত বটে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে **অবস্থার** আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে **আদর্শের**। মনোবিজ্ঞান রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ঔচিত্য ও অনৌচিত্য লইয়া আলোচনা করে না রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে অবস্থা ও আদর্শের এবং নির্দেশ দেয় কি হওয়া উচিত বা কি হওয়া উচিত নয়। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজন অনুসারে তাহার ব্যবহার করে কিন্তু অন্ধভাবে তাহা অনুসরণ করে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতা (Utility of the Study of Political Science): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা সমাজের বহু উপকারে আসে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই বিরাট তথ্যবহুল আলোচনা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রগুলি রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতির সংস্কার সাধনে বিশেষ সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। রাষ্ট্রের সহায়তায় সে যুগযুগান্তর ধরিয়া আত্মবিকাশের সুযোগ খুঁজিতেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্র ও মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করিয়া মানুষ তাহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে এবং নাগরিক তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়। ইহার ফলে মানুষ স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সমাজে পরস্পরকে ভালবাসিতে শিক্ষালাভ করে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু নানা সমস্যার আলোচনা করে, সেইজন্য বলা যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠে মানুষ নানা বিষয়ে চিন্তাশীল হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ পায়।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলীর আলোচনা করে। সমাজবদ্ধ মানব জীবনের চরম পরিণতি লাভ হয় রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিবরণ জানা যায় এবং রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়।

সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হিসাবে, সমাজের নীতি নির্ধারক হিসাবে, মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করিয়া বিশ্বশান্তির সহায়ক হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিরাট ভূমিকাকে কেহই অস্বীকার করে না।

বর্তমানে ভারত স্বাধীন। ভারতীয় নাগরিকের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রশাস্ত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আবার ভারতের মানুষ আজ সার্বজনীন ভোটাধিকারের সুযোগ ভোগ করিতেছে। সুতরাং তাহাদের নাগরিক হিসাবে কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া উচিত। ভারত তাহার নিজ সংবিধান রচনা করিয়াছে। এই সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে তাহার দৈনন্দিন চলার পথের নির্দেশ দেয়। নাগরিক যদি এই মূল্যবান সংবিধান সম্পর্কে অবহিত না হয়, তবে স্বাধীন দেশের নাগরিকের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হইয়াছে তাহা পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই সকল কারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি? রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রদর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নামকরণ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা: রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের বিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ রাষ্ট্রকে লইয়া।

আলোচ্য বিষয়: ইহা রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক ও সম্পর্কের আলোচনা করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশের ধারা, স্বরাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের গঠন ও প্রকৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও কার্যাবলী, রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ইহা মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনা করে। অতীত ও বর্তমানকে আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের ইংগিত দেয়।

প্রকৃতি: সমসাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাকে তুলিয়া ধরা এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান?: অনেকে নানা যুক্তিতে ইহাকে বিজ্ঞান পদবাচ্য করেন আবার অনেকে করেন না। তবে ইহা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি: (১) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, (২) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, (৩) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি, (৪) তুলনামূলক পদ্ধতি, (৫) ঐতিহাসিক পদ্ধতি, (৬) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (৭) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (৮) আইনমূলক পদ্ধতি, (৯) মনোবিজ্ঞামূলক পদ্ধতি এবং (১০) দর্শনমূলক পদ্ধতি।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস : উভয় শাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক হইলেও ইতিহাসের সবটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নহে এবং সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস নহে। ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের উপাদানের যোগান দেয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা : ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান : সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখারূপে কল্পনা করা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিদ্যা : মনোবিদ্যা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের মনের কথা জানিতে পারে এব সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র : রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শমূলক বিজ্ঞান। নৈতিক ভিত্তির উপর ইহা দাঁড়াইয়া আছে।

প্রশ্নাবলী

1. রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ?

(What is Political Science ?)

2 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনা কর।

(Discuss the nature of Political Science)

3 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

(Define Political Science)

4. রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা যায় ?

(Can Political Science be regarded as a Science ?)

5. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the scope and subject matter of Political Science)

6 রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাসের আলোচনা নিষ্ফল, আবার ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন এই উক্তির যথার্থতা বিচার কর।

("History without Political Science has no fruit ,
PoliticalScience withoutHistory has no root."—Seely Examine the statement

7 অর্থবিদ্যার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the relation between Economics and Political Science)

8. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর।

(Discuss the relation of Political Science to Ethics, Socioloy and Psychology)

অতিরিক্ত পাঠ্য

R. G Gettel : Political Science—chs. I and II

R. N. Gilchrist ; Principles of Political Science—ch. I. Pollock : Introduction to the History of the Science of Politics ch. I

ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য : রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

২ | রাষ্ট্র : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব

(State : Definition, Characteristics and Origin)

(রাষ্ট্র- রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ; রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে মতবাদ : (ক) ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ,) বলপ্রয়োগ মতবাদ, (গ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ, (ঘ) বিবর্তনবাদ।)

[The State—Definition of the State, Characteristics of the State ; Theories the State Origin ; (a) Divine Origin Theory, (b) Force Theory, (c) Social ontract Theory, (d) Evolutionary Theory.]

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র (State) : রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজ অনেক তিষ্ঠানের সমবায় বিশেষ। সমাজে থাকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। রাষ্ট্র হইল সমাজের মধ্যে একটি রাষ্ট্রনৈতিক তিষ্ঠান। রাষ্ট্র লইয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার। সুতরাং আলোচনার গোড়ায়ই ষ্ট্র সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। কিন্তু অসুবিধা ইল যে, এই বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত দিয়াছেন। রাষ্ট্র সম্বন্ধে য় প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই একটি করিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of the State) : প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ ্দ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বাস করিত। তাহাদের এই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি সীমাবদ্ধ ছিল। াই ইহাদের বলা হইত নগর রাষ্ট্র (City State)। এই নগর রাষ্ট্রগুলিকে বুঝাইতে গ্রীক ও রোমানগণ **সিভিটাস (Civitas)** এবং **পলিস (Polis)** শব্দ দুইটি ব্যবহার করিত। টিউটনযুগে রাষ্ট্রের চেহারা যখন বড় আকার ধারণ করিল তখন রাষ্ট্রকে বুঝানোর ন্য **স্ট্যাটাস (Status)** শব্দটি ব্যবহার করা হইত। **রাষ্ট্র (State)** শব্দটি থম ব্যবহার করেন ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় চিন্তাবীর **ম্যাকিয়াভ্যালী**। র্তমানে রাষ্ট্রশব্দটি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যকে বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয় ; যেমন শ্চিমবঙ্গ (State of West Bengal)।

১) সিভিটাস নগররাষ্ট্র

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সংখ্যাতীত। রাষ্ট্র সম্বন্ধে সংজ্ঞার এই বিভিন্নতা লেখকদের ত ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হইতেই উদ্ভূত হয়। সমাজতাত্ত্বিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইতে রাষ্ট্র কাঠামোকে বিচার করিয়া রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেন। আইনবিদ আইনের ৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্র কাঠামোর বিচার করেন এবং সেই মতো সংজ্ঞা দেন। আন্ত- র্জাতিক আইনবিদ্—আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেন। ষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়াও দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ফলে ষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধেও ঐক্যমত বড় একটা দেখা যায় না।

রাষ্ট্র একটি বিশিষ্ট সামাজিক সংগঠন। প্রত্যেক সামাজিক সংগঠনেরই এক একটি করিয়া লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে; যেমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল ধর্ম রক্ষা করা; শ্রমিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা। এই সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্ররূপ বিশিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও একটি উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্য হইল বিশৃংখল সমাজকে সুশৃংখল করিয়া মানুষের জীবনকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর পর্যায়ে উন্নীত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। আবার রাষ্ট্র যেহেতু অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান সেইজন্য স্ট্রং বলিয়াছেন, রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা সমাজ হইতে শুরু করিতে হয়, কারণ রাষ্ট্র হইল অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের জন্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জীবিকার্জনের তাগিদে বা প্রকৃতিগত কারণে যখনই কিছু সংখ্যক লোক পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে তখনই সমাজের আবির্ভাব হইয়াছে। আবার এই সমাজের বিবর্তনের এক বিশেষস্তরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সমাজ সৃষ্টির মূলে ছিল মানুষের এক বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য। এই সামাজিক উদ্দেশ্য হইল সামাজিক উন্নতি। উন্নত সমাজ জীবন উন্নততর হইবে। এই উন্নততর, সুন্দর জীবনের চির আকাংক্ষাই মানুষকে সঙ্গপ্রিয় করিয়াছে। এই সঙ্গপ্রিয়তা মনুষ্যের প্রকৃতিগত। অন্যান্য জীবের মত ক্ষুধাতৃষ্ণার পরিপূর্তিতেই মানুষ সন্তুষ্ট নয়। সে প্রগতিশীল জীব, সে চায় জীবনকে সুন্দরতর করিতে, সে চায় উন্নত জীবনকে উন্নততর করিতে। এই কাজ তাহার পক্ষে একক ভাবে করা সম্ভব নয় বলিয়া সে সংঘবদ্ধ হয়। আদিমযুগের পরিবার সংঘবদ্ধ জীবনের একটি ধাপ।

(২) রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান

পরিবারে বিকশিত সমাজে মানুষের জীবন ছিল বিশৃংখল। পরিবারের পর আসিল গোষ্ঠী জীবন। পূর্বপুরুষের বংশধরগণ এক একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইত। গোষ্ঠী জীবনেও মানুষের জীবন বিশৃংখল ছিল। গোষ্ঠীর পর সমাজ বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে আসিল উপজাতি। এই স্তরেই রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। রাষ্ট্রের সৃষ্টির পূর্ববর্তীস্তরে সমাজ ছিল বিশৃংখল। এই বিশৃংখল জীবনকে সুশৃংখল করার জন্য এবং মানুষের জীবনকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। সার্বিক উন্নতিসাধন এবং মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

ইউরোপীয় রাস্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলিয়া পরিচিত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ "স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে যখন অনেকগুলি পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হয়, তখনই তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়।"* তিনি নগররাষ্ট্রকে মানুষের সমাজ-গঠনের এক চরম বিকাশ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের উপরই জোর দিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্র কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে পরিবার ও গ্রামকে গ্রহণ

*"A union of families and villages having for its end a perfect and self sufficing life by which we mean a happy and honourable life."—Aristotle

রিয়াছেন। রাষ্ট্রকে তিনি মঙ্গলকর সংগঠন হিসাবেই দেখিয়াছেন। অ্যারিস্টট্‌লের সংজ্ঞাকে অনেকে সমালোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে রাষ্ট্রের এলাকার য় বহু পরিবার থাকে ; প্রতিষ্ঠানের সমবায় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই। আবার ষ্ট্রকে বিভিন্ন পরিবারিক ও সামাজিক সংগঠনের স্বার্থের রক্ষক বলিয়াও ধরিয়া য়া ঠিক নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুধু পারিবারিক ও সামাজিক সংগঠনের স্বার্থ-ার গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহার উদ্দেশ্য আরও মহত্তর। রাষ্ট্র হইল াজের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান। ইহা সমাজ জীবনের সমস্ত গলদ দূরীভূত রিয়া সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের জীবনকে সুন্দরতর ও সুশৃংখল রিয়া তোলে। অ্যারিস্টট্‌লের আমলের গ্রীক নগররাষ্ট্র ছিল রাষ্ট্র ও সমাজ য়ই। তাই তাঁহার সংজ্ঞার মধ্যে সমাজরাষ্ট্রের ধারণা পাওয়া যায়।

রোমান পণ্ডিত সেনেটর সিসেরো (Cicero) বলেন, "রাষ্ট্র হইল অধিকার ধ্যে সমচেতনায় ও সুযোগ সুবিধায় পারস্পরিক অংশ গ্রহণে ঐক্যবদ্ধ বিপুল-খ্যক জনসমষ্টি।"* তাহার কাছে রোমান নাগরিকত্ব একটি কাম্য বস্তু। তিনি নুষের অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন। প্রতিরক্ষার স্থার জন্য, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং সুন্দরতর সমাজ গঠনের জন্যই সংস্থার জন্ম হইয়াছে। রেঁনেসাস যুগের লেখক গ্রোসিয়াস বলেন, "সকলের কার ও অধিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন মানুষের পূর্ণাঙ্গ সমাজ হইল রাষ্ট্র।" র ফরাসী লেখক বোডঁ্যা ১৫৭৬ সালে বলেন, "রাষ্ট্র হইল পরিবারবর্গ ও াদের সাধারণ ধনসম্পত্তির একটি মিলিত সংস্থা যাহা একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা ও চ দ্বারা পরিচালিত হয়।"** বোডঁ্যার সংজ্ঞায় দুইটি বিষয় গুরুত্ব পাইল। র একটি হইল চূড়ান্ত ক্ষমতা আর অপরটি হইল শাসনের ধারণা।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যই রাষ্ট্রকে এক বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। ক্ষমতার নাম সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্র এই ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন করে। আইন বাধ্যতামূলক। তাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি **উইলসন** ন, "রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী জন-ষ্ট।" **ম্যাকাইভার** আরও পরিষ্কার করিয়া বলেন, "রাষ্ট্র হইল একটি ঠন। ইহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সমাজে সামাজিক শৃংখলা আইনের ক্ত বজায় রাখে। আইন রাষ্ট্রের সরকারকে তাহা বলিয়া দেয়। এই সরকারের য়োগ করিবার অধিকার আছে।"*** কোন কোন লেখক রাষ্ট্রকে সমাজের

A numerous society "united by a commonsense of right and a mutual partici-on in advantages."—Cecero

*"An association of families and their common possessions governed by a eme power and by reason."—Bodin.

**"A State is an association which, acting through law as promulgated by a ernment endowed to this end with coercive power, maintains within a munity territorially demarcataed the universal external conditions of social r."—MacIver

অন্যান্য শ্রেণীর উপর একটি শ্রেণীর প্রভুত্ব করিবার সংগঠনরূপে দেখিয়াছেন। কাহারও দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নিতান্তই ক্ষমতার সংগঠন (Power System)। কাহার নিকট ইহা জনকল্যাণের ব্যবস্থা (Welfare System)। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন "বর্তমান রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমাজ, যাহ শাসকমণ্ডলী প্রজার মধ্যে বিভক্ত, যাহা নিজস্ব নির্ধারিত প্রাকৃতিক অঞ্চলে মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের উপর চরম ক্ষমতা দাবি করে। প্রকৃতপক্ষে ই সামাজিক ইচ্ছার চূড়ান্ত আইনগত আধার। ইহা অন্যান্য সংগঠনের ভূমি পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইহা যে মানবিক কর্মকাণ্ডকে নিজের নিয়ন্ত্র আনা বাঞ্ছনীয় বোধ করে সে সকলকেই নিজের এলাকার মধ্যে আনে। আর যা কিছু ইহার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে রহিল তাহা ইহার অনুমতিসিদ্ধ রূপে রহিল রাষ্ট্র হইল সমাজের মূল বুনিয়াদ। ইহা অসংখ্য মানুষের জীবনধারণের দায়ি গ্রহণ করে। ইহা মানবজীবনের আকৃতি ও তাৎপর্যকে রূপায়িত করে।

ব্লুন্টস্‌লি বলেন, রাষ্ট্র হইল "কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিক ভা সংগঠিত জনসমাজ।" সিডেলের মতে, "রাষ্ট্রের সূত্রপাত তখনই হয়, যখন ব সংখ্যক লোক পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া কোন উচ্চশক্তি অধীনে সম্মিলিত হয়।" বার্জেস বলেন, "রাষ্ট্র হইল কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজ।" এমনি ভাবে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রে অনেক সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই সংজ্ঞাগুলিকে মিলাইয়া অধ্যাপক গার্ণার রাষ্ট্রে একটি আধুনিক সংজ্ঞা দিয়াছেন।

গার্ণার রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন: **"রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রি আইনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, রাষ্ট্র হইল অল্পাধিক্তর বহুসংখ জনসমষ্টি লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এ যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে—যে শাসন-ব্যবস্থার প্র অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বভাবগত আনুগত্য স্বীকার করে।"****

ভাববাদীদের ধারণায় রাষ্ট্র একটি বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে। ভাববাদী হেগেলে ভাষায় রাষ্ট্র হইল, "অন্যতম আত্মসচেতন নৈতিক বস্তু এবং আত্মসচেতন আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি।"*** আবার তিনি রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব আরোপ করি

*"An organisation of one class dominating over the other classes."—Marx

**"The State, as a concept of Political science and Public Law is a commun of persons more or less numerous permanently occupying a definite portion territory, independent or nearly so, of external control, and possessing a organised government to which the great body of inhabitants render habit obedience."—Garner

***"Self-conscious ethical substance and a self-knowing and self-actuali individual."—Hegel

ান : "রাষ্ট্র পৃথিবীতে মঙ্গলময় ঈশ্বরের জয়যাত্রার অন্যতম প্রকাশ।"* বাদ অনুসারে বাহ্যবস্তু-সমূহ ভাব মাত্র। আমরা যাহা দেখি তাহা ভাবেরই শ মাত্র। এই অনন্তলোক এক ভাবরাজ্য। রাষ্ট্র তাহার একটি অংশ। রাজ্য অবচেতন কিন্তু ঈশ্বরের পদক্ষেপে ইহা চেতন হয়। যেখানে রাষ্ট্র সৃষ্টি সেখানেই ঈশ্বরের অর্থাৎ চেতনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। হেগেলের ভাষায় াই বিশ্বে ঈশ্বরের বা চেতনার পদক্ষেপ। রাষ্ট্রও একটি ভাব। ইহা মনুষ্য াজের সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the State) : উপরে রাষ্ট্রের যে কল সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাদের বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের ছয়টি বৈশিষ্ট্য বা পাদান পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হইল : (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট খণ্ড, (৩) শাসন ব্যবস্থা বা সরকার, (৪) সার্বভৌমিকতা বা চূড়ান্ত ক্ষমতা,) স্থায়িত্ব এবং (৬) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

(১) **জনসমষ্টি (Population) :** সমাজের মধ্য হইতেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়। নুষ ছাড়া আবার সমাজ হয় না। সংঘবদ্ধভাবে মানুষ যখন বাস করে তখনই মাজ গড়িয়া উঠে। সুতরাং মানুষ না থাকিলে কাহাকে লইয়া সমাজ ও রাষ্ট্র ঠিত হইবে? তখন প্রশ্ন উঠিতে পারে কতলোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে? ীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টট্ল প্রমুখ নগররাষ্ট্রের জনসংখ্যার সীমা বাঁধিয়া বার কথা ভাবিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের রক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সর্বাঙ্গীণ সুখের কথা চিন্তা করিয়া নগররাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে কাম্য জনসংখ্যা কত হইবে এ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা রিয়াছিলেন। পূর্বে দশ হাজার জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রের কাম্য জনসংখ্যা বলিয়া নে করা হইত। বর্তমানে এই ধারণা পাল্টাইয়াছে। রাষ্ট্রের সুশাসনের জন্য ম জনসমষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা আজ আর কেহ মনে করে না। সুশাসনের থে প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ দেশের আছে কিনা তাহার উপরও দেশের জনসংখ্যা াম্য কি অকাম্য বিচার করা নির্ভর করে। বর্তমানে চীনের মতো ৯০ কোটি নুষ লইয়াও রাষ্ট্র গঠিত হইতে দেখা যায়, আবার মোনাকোর মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও খা যায়। সুতরাং জনসংখ্যাকে আর রাষ্ট্র গঠনের মাপকাঠি বলিয়া ধরা হয় না। বশ্য গার্ণার, ল্যাস্কি, ম্যাকাইভার প্রমুখ প্রায় সকলেই রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে ল্পবিস্তর বহুসংখ্যক জনতার কথা বলিয়াছেন। তবে রাষ্ট্র গঠনের উপাদান িসাবে জনসংখ্যার কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই।

৩) জনসমষ্টি

রাষ্ট্রে যাহারা বাস করে তাহারা সকলেই এক জাতির লোক নয়। কেহ স্থায়ীভাবে াষ্ট্রে বাস করে এবং রাষ্ট্রের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে, রাষ্ট্রের আইনসম্মত ভ্য এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। ইহাদের বলা হয় রাষ্ট্রের পূর্ণ

*"The State is the March of God on Earth."—Hegel

নাগরিক। আবার রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মধ্যে যাহারা রাষ্ট্রের কাজে অংশ লইতে পারে না তাহারা **অসম্পূর্ণ নাগরিক**। শিশুরাই হইল এই শ্রেণীর রাষ্ট্রের বাসিন্দা। ইহা ছাড়া কিছু **বিদেশীও** রাষ্ট্রে বাস করে। তাহারা বৈদেশিক। তাহারা রাষ্ট্রে বাস করিলেও রাষ্ট্রের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। আবার নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড যদি অপর রাষ্ট্রের অধীন ঔপনিবেশ হয় তবে তাহার জনগণকে **প্রজা** (Subject) বলা হয়। আবার রাষ্ট্রে যদি এমন কিছুসংখ্যক লোক থাকে যাহারা বিদেশীও নয় আবার নাগরিকও নয় কিন্তু যদি ইহাদেরও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য থাকে তবে তাহাদের বলা হয় **স্বজাতীয় (National)**। এইভাবে রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের ভাগ করিয়াও বিশ্লেষণ করা যায়। তবে জনসমষ্টি ছাড়া যে রাষ্ট্র হয় না এ বিষয়ে সকলেরই একমত। এই জনসমষ্টির গুণাগুণ অনুসারে, তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে রাষ্ট্রেরও প্রকৃতি ঠিক হয়।

[৪] (ক) পূর্ণ নাগরিক
(খ) অসম্পূর্ণ নাগরিক
(গ) বিদেশী
(ঘ) প্রজা
(ঙ) স্বজাতীয়

(২) **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory)** : শুধু জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি যদি সংঘবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় তবে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। তাই ভ্রাম্যমাণ যাযাবরেরা রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। এই কারণেই যতক্ষণ না জনসমষ্টি একটি কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস না করে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। পূর্বে ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া ছিল। ইহারা যখন ইজরায়েলে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিল তখনই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, শিকারের যুগে ও পশুপালনের যুগে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই, কারণ মানুষ তখন ছিল যাযাবর। কিন্তু কৃষি যুগে মানুষ যখন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল তখনই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল। এঙ্গেলস (Engels) তাই বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হইল ভূখণ্ড অনুসারে প্রজাবর্গের বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়া।"*

(৫) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে শুধুমাত্র ভূমির বহিঃপৃষ্ঠটুকুই বোঝায় না; ইহার অন্তর্গত নদী, পাহাড়, খনি, উপরকার আকাশপথ এবং সমুদ্রোপকূল হইতে কয়েক মাইল পর্যন্ত সমুদ্রকেও রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে ধরা হয়। আবার সাগরে ভাসমান জাহাজকেও রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া ধরা হয়। এক রাষ্ট্রের দূত যখন অপর রাষ্ট্রে বাস করে তখন অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত তাহার দূতাবাস এলাকা ঐ দূতের রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া গণ্য হয়। কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে ইহাও যেমন নির্দিষ্ট কোন সংখ্যাদ্বারা স্থির হয় নাই। তেমনি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আয়তনেরও

(৬) নদী, সাগর, পাহাড় প্রভৃতি ভূখণ্ড

---

*"As against the ancient gentile organisations, the primary distinguishing feature of the State is the division of the subjects of the State according to territory."—Engels

কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থির হয় নাই। প্রাচীন গ্রীকদের রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র আর রোমকদের রাষ্ট্র ছিল বড়ো। প্লেটো এবং রুশো মানুষের দেহের সহিত রাষ্ট্রের চেহারার তুলনা করিয়া বলেন যে, রাষ্ট্রের আয়তনের স্থূলতাই কাম্য নয়, কাম্য হইল তাহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য এবং সক্রিয়তা। প্রকৃতি নরদেহের বৃদ্ধির যেমন একটা সীমা টানিয়া দিয়াছে তেমনি রাষ্ট্রের সীমাও প্রকৃতি ঠিক করিয়া দিয়াছে। অতি-ক্ষুদ্ররাষ্ট্র স্বনির্ভর হইতে পারে না। আবার অতি বড়ো রাষ্ট্রে সামাজিক যোগাযোগও ঠিকমতো রক্ষা করা যায় না, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও শিথিল হয়। রুশো বলেন, রাষ্ট্রের আয়তনের সাথে রাষ্ট্রীয় সরকারের একটা সম্পর্ক আছে। পূর্বে ধারণা ছিল যে, অতিবড়ো রাষ্ট্রে রাজতান্ত্রিক, মাঝারি রাষ্ট্রে অভিজাততান্ত্রিক এবং ক্ষুদ্র-রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই কাম্য। এমনকি মঁতেসক্যু (Montesquieu) বলেন যে, গণতন্ত্র ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্রের সহিতই খাপ খায়। আবার জার্মান দার্শনিক ট্রিটসকে বলেন, "রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রত্ব রাষ্ট্রের পাপেরই প্রতীক"।

ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্রের সপক্ষে যুক্তি হইল অধিবাসিগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সাধন করা সহজ হয়। জনমত গঠন করাও সহজ হয়। ক্ষুদ্ররাষ্ট্রে গভীরতর একতা ও দেশপ্রেম লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্রেই সম্ভব। ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের আবার বিপদও অনেক। ক্ষুদ্ররাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়া দুর্বল হয়। বড়ো রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়। বড়ো রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক স্ফুরণ হয়। বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ব্রিটেনের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিযাছিল। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাপান আর্থিক ও সামরিক শক্তিতে অনেক বড়ো রাষ্ট্র অপেক্ষা শক্তিশালী। আবার ভারত, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড়ো রাষ্ট্রও সর্বদিকে উন্নত এবং গণতন্ত্রকে সাফল্যের সহিত প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অতএব রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রত্ব বা বিশালতা কোন সমস্যা নয়। রাষ্ট্র বড়ো হইলেও যেমন সমস্যা আবার রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হইলেও তেমনি সমস্যা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পাহারায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মোনাকোও যেমন টিকিয়া আছে আবার বৃহৎ রাষ্ট্র চীনও তেমনি টিকিয়া আছে। অতএব রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটা সমস্যা নয়। তবে সামাজিক কোন সংগঠনকে রাষ্ট্র সংজ্ঞাবাচ্য হইতে হইলে তাহার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকা চাই।

(৩) সরকার বা শাসনযন্ত্র (Government): নাবিকহীন পোত যেমন অচল, শাসকহীন রাষ্ট্রও তেমনি বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার শাসনযন্ত্র বা সরকার। সরকার হইল রাষ্ট্রের ইচ্ছার রূপকার। মানুষ যখন যাযাবর ছিল তখন রাষ্ট্রের জন্ম হয় নাই। রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে তখনই যখন বিচ্ছিন্ন মানুষ সুসংবদ্ধ হইযাছে। আবার বিচ্ছিন্ন মানুষকে সুসংবদ্ধ করিয়াছে এই সরকার। জনগণকে আইন ও শৃংখলার পাশে আবদ্ধ করিবার সংগঠন হইল সরকার। সমিতি বা ক্লাবের যেমন নিয়ম কানুন থাকে এবং তাহাকে কার্যকর করে কার্যকরীকমিটির

(৭) সরকার

সদস্যগণ (Executive Committee), তেমনি রাষ্ট্রের আইন কানুনকে কার্যকর করে সরকার। সরকারের মারফতই জনসাধারণের ইচ্ছা রূপ পায়। সরকার যে রাষ্ট্রের আইন তৈয়ার করে তাহা রাষ্ট্রেরই ইচ্ছা প্রকাশ করে। সরকারের ইচ্ছা তথা রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে যাহারা মানে না তাহারা রাষ্ট্রদ্রোহী। অবশ্য সরকারের বিরোধী পক্ষ থাকিতে পারে। এই বিরোধীপক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকারের ক্ষমতা অধিকার করিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারবিরোধী থাকে, কিন্তু যখন বিরোধীপক্ষ আবার সরকার গঠন করিয়া আইন পাস করিবে তখন তাহাই হইবে রাষ্ট্রের ইচ্ছা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা। শাসনযন্ত্র হইল রাষ্ট্রের একটি বিশেষ শক্তি সংস্থা। রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র এমনভাবে মিশিয়া আছে যে, হব্‌সের মতো অনেকেই সরকারকে রাষ্ট্র বলিয়া ভুল করিয়াছেন। রাষ্ট্রকে যাহারা চালায় তাহারাই শাসক অর্থাৎ যাহারা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহারাই রাষ্ট্রের শাসক।

(৮) সরকারের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা

সরকার বা শাসনযন্ত্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করিয়া বোঝানো হয়। অর্থাৎ সরকারের মোট কাজগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখানো হয়। সরকারের তিনটি ভাগ হইল (১) ব্যবস্থা বিভাগ, (২) শাসন বিভাগ এবং (৩) বিচার বিভাগ। এই তিনটি বিভাগের কর্মচারীদের লইয়াই সরকার গঠিত হয়।

(৪) রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা (Sovereignty) ঃ শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা। সরকার আইন প্রণয়ন করে এবং আইন অনুসারে শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালায়। সকল রাষ্ট্রবাসীই এই ব্যবস্থা মানে। আর সরকারের কোন ব্যবস্থা পছন্দ না হইলে তাহারা অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারকে চাপ দেয় এবং প্রয়োজন বোধে সরকারকে বদলায়। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ কোন-না-কোন শাসকমণ্ডলী থাকিবেই। জনগণকে তাহাদের শাসন মানিয়া চলিতে হইবে।

(১) সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চরম ইচ্ছা। ইহাই হইল সার্বভৌমত্বের অর্থ। রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যকর করিতে হইলে রাষ্ট্রকে একটি অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে। এই চূড়ান্ত অপ্রতিহত ক্ষমতাকেই বলা হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা। অর্থাৎ অন্য যে কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার নিকট মাথা নত করিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদিগকে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইবে বা শাস্তি দেওয়া হইবে। রাষ্ট্রের শাস্তি দিবার ক্ষমতা আছে, বলপ্রয়োগের ক্ষমতাও আছে। রাষ্ট্রের এ ক্ষমতা না থাকিলে সকল দেশবাসী আইন মানিত না, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইত না।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে দুই দিক হইতে বুঝিতে হইবে, যথা, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পর্ক। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই সার্বভৌমত্বের নিকট সকলে বশ্যতা স্বীকার করে আর অপর দিকে রাষ্ট্রের বাহিরের কোন নিয়ন্ত্রণ তাহারা মানে না। কারণ, এক রাষ্ট্রের নাগরিক যদি অপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মান্য করে তবে নিজ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে অপমান করা হয়। তখন বাহিরের কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আসিয়া স্বরাষ্ট্রের উপর

খবরদারী করিবে এবং নিজ রাষ্ট্রের আর কোন চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে না। কারণ বাহিরের নিয়ন্ত্রণ-কর্তাকেই তখন অধিকতর ক্ষমতাশালী বলা হইবে। বাহিরের নিয়ন্ত্রণ হইতে স্বাধীনতা ও আভ্যন্তরীণ দিক হইতে চরম ক্ষমতা—সার্বভৌমত্বের এই যে রূপ ইহাই রাষ্ট্রকে তাহার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। সুতরাং

(১০) সার্বভৌমত্বের উপর কোন ক্ষমতা নাই

রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা শুধু আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা নহে, বহিঃশক্তির অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত অবস্থা বুঝাইবার জন্যও এই সার্বভৌম ক্ষমতা কথাটি ব্যবহার করা হয়। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত জন-সাধারণের নিকট একক ও পূর্ণ আনুগত্য দাবি করিতে পারে। এই ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের ভিতরে অবস্থিত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানেব উপর প্রভুত্ব করিতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন শক্তি থাকিতে পারে না, যে শক্তি রাষ্ট্রের কোন কার্যকে অবৈধ বলিয়া অমান্য করিতে পারে। রাষ্ট্রের এই আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের **আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা** (**Internal Sovereignty**) বলা হয়। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অধিকারী রাষ্ট্র বাহ্যিক **সার্বভৌমিকতার অধিকারী** হইলে সে রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। রাষ্ট্রের এই বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত অবস্থাটিও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আর একটি প্রকাশ। ইহা হইল রাষ্ট্রের **বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা** (**External Sovereignty**)।

ডাঃ গার্ণার বলেন, "আন্তর্জাতিক আইনের ভাষ্যে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ও স্বাধীন সমাজ হইতে হইবে। যাহার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার আইনসঙ্গত যোগ্যতা রহিয়াছে"।* বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রায় অনুরূপ ভাবে মুক্ত হইলেই তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায়। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি রাষ্ট্র আছে যেমন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যেগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম কিন্তু বৈদেশিক ব্যাপারে কিছুটা ইংল্যাণ্ডের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহাদের রাষ্ট্র পদবাচ্য কবা যায়, কারণ ইহাদের উপর ইংল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ খুব সামান্য। আজ বিশ্বে এমন রাষ্ট্র খুব কমই আছে যে বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত। অনেক রাষ্ট্রই হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নয় রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণের অধীনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আছে। আবার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাও বহুলাংশে খর্বিত।

আবার যাহারা সরকার আর রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না তাহারা বলেন সরকারই সার্বভৌমিকতার মালিক কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রেরই উপাদান। রাষ্ট্র হইল ইহার আধার। সরকার রাষ্ট্রেব পক্ষে ইহা ব্যবহার করে মাত্র।

যে সংগঠনের নিকট মানুষ ব্যক্তিগত, পরিবারগত, শ্রেণীগত এবং সংগঠনগত-ভাবে তাহার সমস্ত অভাব ও দাবি লইয়া হাজির হয় ; যে সংগঠনের মধ্যে মানুষ

*"A State in the sense of international law must be a fully sovereign and independent community with a legal capacity to enter into international relations."—Garner

পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে এবং দ্বন্দ্বের যথাসম্ভব নিরসন করিতে পারে সেই সামাজিক সংগঠনের নামই রাষ্ট্র। কাজে কাজেই মানুষ তাহার আনুগত্য নিবেদন করিবে এই চূড়ান্ত রাষ্ট্র-সত্তার নিকট। ম্যাকাইভার সার্বভৌমত্বের ভিত্তি হিসাবে সমষ্টিগত ইচ্ছাকে দেখিয়াছেন। এই সমষ্টিগত ইচ্ছা রাষ্ট্রের ইচ্ছা নয়, ইহা হইল রাষ্ট্রের জন্য ইচ্ছা ও রাষ্ট্রকে বজায় রাখিবার ইচ্ছা।*

(৫) স্থায়িত্ব (Permanence)ঃ রাষ্ট্রকে স্থায়ী হইতে হইবে। যে রাষ্ট্র ক্ষণভঙ্গুর তাহা রাষ্ট্রের পদবাচ্য নয়। রাষ্ট্রের সরকার পাল্টাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন হয় না। অবশ্য, রাষ্ট্রের সীমানা কখনো বাড়িতে পারে বা কমিতে পারে কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্র বিনষ্ট হয় না। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বলিতে চিরন্তন কিছু বোঝায় না। রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইতে পারে। কোন রাষ্ট্র যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অন্য রাষ্ট্রের অধীন হইতে পারে বা স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইতে পারে অথবা নিজ রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া অনেক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত হইল মাত্র। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে পুরাতন রাষ্ট্র আর রহিল না। সুতরাং স্থায়িত্ব কথাটিকে ঐতিহাসিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে হইবে। যে কালে যে রাষ্ট্র স্থায়ী তখন সে কালে সেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব একটি বৈশিষ্ট্য। তবে সরকার ক্ষণস্থায়ী, সেই তুলনায় রাষ্ট্র স্থায়ী। সরকার সর্বদাই পাল্টায়, রাষ্ট্র সেই তুলনায় কম পাল্টায়। সরকারের বদল রাষ্ট্রের বদল নহে।

(১১) স্থায়িত্ব

(৬) অপর রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি (Recognition)ঃ গার্ণার বলেন, "যাহার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার আইনসঙ্গত যোগ্যতা রহিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব পালন করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাকেই রাষ্ট্র বলা হয়। এই ক্ষমতাগুলি হইল ঃ—

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের আইনসঙ্গত যোগ্যতা ;
(খ) আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা ও ইচ্ছা ;
(গ) আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক স্বীকৃতি ;
(ঘ) অন্যান্য রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা।

একটি দেশকে রাষ্ট্র পদবাচ্য হইতে হইলে তাহাকে অপর রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি পাওয়া চাই। কোন রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত না অপর রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আর রাষ্ট্র পদবাচ্য হয় না। ভিয়েতনাম আজও অনেক রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। ভিয়েতনাম তাহাদের কাছে রাষ্ট্র নয়।

*"This is not so much the will of the State as the will for the State.. the will to maintain it."—MacIver

উপসংহারে বলা যায় রাষ্ট্রের উপাদানগুলি আজ আর একটা ধরা বাঁধা নিয়মে গৃহীত হয় না। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও তাহার উপাদান অনেক পাল্টাইয়াছে। একদিন যখন বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য ছিল তখন বহু রাষ্ট্রকে লইয়াই সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিত। তবে একটি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে সকল রাষ্ট্র থাকিত তাহারা ছিল ঔপনিবেশ, তাহারা রাষ্ট্র ছিল না, কারণ সাম্রাজ্যের প্রধান রাষ্ট্রের অধীন রাজ্য ছিল তাহারা। তাই সাম্রাজ্যটিকে একটি মাত্র রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইত, তাহার ঔপনিবেশগুলিকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইত না। কিন্তু আজ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার ঔপনিবেশগুলি স্বাধীন হইয়া রাষ্ট্রপদবাচ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশ, সে আজ স্বাধীন রাষ্ট্র। জার্মানী ছিল একটি রাষ্ট্র সে আজ হইয়াছে দুইটি রাষ্ট্র। ভারতের ক্ষেত্রেও, সে আর পূর্বের ভারতবর্ষ নাই, তাহা ভাঙ্গিয়া একখণ্ড হইয়াছে ভারত, আর একখণ্ড হইয়াছে পাকিস্তান। আবার পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া হইয়াছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। এমনিভাবে শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিও রাষ্ট্র সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government) : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা লইয়া আলোচনা করিবার সময় সরকারের কথা বারংবার আসিয়া পড়িয়াছে তাই রাষ্ট্রের সাথে সরকারের পার্থক্য কোথায় তাহা একটু বোঝা দরকার। রাষ্ট্রের ধারণা তত্ত্বগত। রাষ্ট্রের বাস্তবরূপ প্রকাশ পায় সরকারের মাধ্যমে। সেজন্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রায় প্রাতশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হবস্ তাঁহার লেভায়াথান পুস্তকে রাষ্ট্র ও সরকারকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র" ("I am the State")। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র ও সরকারকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়।

পার্থক্য : (১) রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে মুক্ত সংগঠিত জনসমাজ, যাহার একটি সরকার থাকিবে। আর সরকার হইল রাষ্ট্রের অনেকগুলি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান। সরকারেব মাধ্যমে রাষ্ট্র তাহার কাজ করে এবং উদ্দেশ্যকে কার্যকর করে।

(২) রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সকল লোককে লইয়া। রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার কাজে যাহারা নিযুক্ত থাকে একমাত্র তাহারাই শাসকমণ্ডলী বা সরকার। রাষ্ট্রের অন্য বাসিন্দারা সরকার নয়। শুধু আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্মচরীরাই সরকার।

(৩) রাষ্ট্র একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভূখন্ডকে বোঝায় আব সরকার বলিতে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে বোঝায় না।

(৪) রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সরকার কোন স্থায়ী চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। আজ গণতান্ত্রিক সরকার আছে, কালই হয়ত স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

(৫) রাষ্ট্র ছয়টি উপাদান লইয়া গঠিত, যথা (ক) জনসমষ্টি ; (খ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড,

(গ) সরকার, (ঘ) সার্বভৌমত্ব, (ঙ) স্থায়িত্ব এবং (চ) আন্তর্রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি। এই ছয়টি উপাদানের মধ্যে সরকার হইল একটি। অতএব সরকার হইল রাষ্ট্রের একটি অংশমাত্র ; সবটা নয়। অংশ যেমন সমগ্রের সমান হয় না তেমনি সরকারও রাষ্ট্র নয়।

(৬) রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই। রাষ্ট্র হইল একটি মনঃকল্পিত ধারণা মাত্র। কিন্তু সরকারের একটি বাস্তব রূপ আছে।

(৭) সরকারের মধ্যেই রাষ্ট্র মূর্ত হইয়া উঠে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাহারও অভিযোগ থাকিতে পারে না, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিতে পারে। সরকার যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে ঠিকমতো কার্যকর না করে তবেই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিতে পারে।

(৮) গার্ণারের ধারণায় রাষ্ট্র জীবদেহের মতো। রাষ্ট্রকে জীবদেহ মনে করিলে সরকার হয় উহার মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের পরিচালনায় যেমন মানুষ চলে তেমনি সরকারের পরিচালনায় রাষ্ট্র চলে। আবার মস্তিষ্ক বলিতে যেমন সম্পূর্ণ মানুষটাকে বোঝায় না, তেমনি সরকার বলিতে সমগ্র রাষ্ট্রকে বোঝায় না।

(৯) আবার রাষ্ট্রকে যদি একটি যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ধরা হয় তবে সরকারকে ইহার পরিচালকমণ্ডলী বলা যায়। কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীকে যৌথ প্রতিষ্ঠান বলিয়া ধরা যায় না, তেমনি সরকারকেও রাষ্ট্র বলা যায় না।

অবশ্য, এই সিদ্ধান্ত খুবই স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্র কোন চিরন্তন বা অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্রেরও পরিবর্তন হয় এবং সরকারেরও পরিবর্তন হয়। রাষ্ট্রও ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। আবার অনেক ছোট ছোট দেশ একত্র হইয়া বড়ো রাষ্ট্র গঠন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। বহু পুরাতন রাষ্ট্র ধ্বংস হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন রাষ্ট্র হইতেছে বিমূর্ত ভাববস্তু (abstract idea)। আর সরকার হইতেছে তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ (concrete expression)। সরকার যেহেতু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সেহেতু সার্বভৌমিকতা সরকারের নয়, উহার মালিক রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্র ও সরকার সমার্থক নয়

রাষ্ট্র ও সমাজ

রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা অনেক পাল্টাইয়াছে। আগে সমাজকেই রাষ্ট্র বলা হইত কিন্তু এখন আর সমাজকে রাষ্ট্র বলা হয় না। জৈব ধর্মের প্রেরণায় সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির অনেক আগে সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজের তাৎপর্য অনেক বড়ো ও গভীর। জৈব প্রেরণায় মানুষ যখন একে অপরের সহিত একাত্মবোধের ভিত্তিতে মিশে তখনই সমাজ গড়িয়া উঠে। আর রাষ্ট্র হইল এক বিশেষ ধরনের মানবিক সামাজিক সংগঠন। আদিম মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত তখন রাষ্ট্র জন্মায় নাই। রাষ্ট্র আসিয়াছে সমাজের অনেক পরে, মানুষের স্নেহ প্রেম প্রীতি ঈর্ষা দ্বেষ খ্যাতির লোভ প্রশস্তির মোহ এ সব কিছুই

(১২) রাষ্ট্র ও সমাজ

মানুষের জীবনকে মথিত করে। এই সব প্রেরণার উৎস সমাজ, রাষ্ট্র নয়। মানুষ তাহার প্রয়োজনে সমাজে নানরকম সংগঠন গড়িয়া তোলে। রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। রাষ্ট্র আইন করিয়া মানুষের লালসা কামনাকে চরিতার্থ করিতে বা উহা রোধ করিতে পারে মাত্র। তাই বলিয়া রাষ্ট্রকে সমাজ বলা বা সমাজকে রাষ্ট্র বলা ভুল। রাষ্ট্র সমাজের সন্তান, সমাজকে সে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে কিন্তু সে তাহার সহিত এক হইয়া যাইতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্যগুলি হইল ঃ (১) রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান। সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সমগ্র জীবন আর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে শুধু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন।

(২) সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাষ্ট্র সৃষ্টির বহু আগেই সমাজ গঠনের সূত্রপাত হয়। সমাজ সৃষ্টির বহু পরে রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

(৩) সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান। কিন্তু সমাজের এইরূপ কোন উপাদান বা শাসনযন্ত্র নাই।

(৪) ভূখণ্ড রাষ্ট্রের একটি উপাদান কিন্তু সমাজের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নাই। সারা দুনিয়া ব্যাপিয়া রোমান চার্চ—ক্যাথলিক সমাজ বিস্তৃত রহিয়াছে। নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ গড়িয়া উঠে না।

(৫) সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের একটি উপাদান কিন্তু সমাজের এইরূপ কোন উপাদান নাই। সমাজ যদিও রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপক কিন্তু সার্বভৌমিকতা ছাড়াই সমাজের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।

(৬) "মানুষের স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সমষ্টিকে একত্রে সমাজ বলা হয়। আর রাষ্ট্র হইল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত গঠিত একটি আবশ্যিক সংগঠন।" রাষ্ট্র যে আইন তৈরী করে তাহা বাধ্যতামূলক এবং তাহা অমান্য করিলে রাষ্ট্র এমন কি দৈহিক শাস্তি পর্যন্ত দিতে পারে, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা বাধ্যতামূলক নয় এবং ইহা অমান্য কবিলে সমাজ দৈহিক কোন শাস্তি দিতে পারে না।

(৭) অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, রাষ্ট্রকে সমাজ আর সমাজকে রাষ্ট্র বলিলে ভুল হইবে। সমাজে যে ধর্মীয় সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে তাহা রাষ্ট্র হইতে জন্মায় নাই। সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে।

উপসংহারে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, রাষ্ট্র যদিও সমাজের অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু ইহাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সুতরাং রাষ্ট্র ক্ষমতাবলে সকল সামাজিক সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া রাষ্ট্র কিছু করিতে পারে না। রাষ্ট্রকেও সামাজিক রীতিনীতি মান্য করিয়া চলিতে হয়। রাষ্ট্র যেমন সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি সমাজও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। উভয়ের উপরই উভয়ের প্রভাব বর্তায়। অতএব উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। অধ্যাপক বার্কার বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য একই

যদিও বিভিন্নভাবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উভয়েই পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, "রাষ্ট্র সমাজজীবনের মূলসূত্র নির্ধারণ করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজজীবন অভিন্ন নহে।" রাষ্ট্র সমাজের রীতিনীতি মান্য করিলে তবেই জনগণ রাষ্ট্রের আইন মান্য করিবে। সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েই যদি উভয়ের রীতিনীতির উপর শ্রদ্ধাবান হয় তবেই সংঘর্ষ এড়ানো যাইবে। তাই পরস্পর সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম করা। কিন্তু এই কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় সামাজিক কুসংস্কার দূর করিতে হয়। রাষ্ট্রের এইরূপ কাজ যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তবে উহা মঙ্গলকর। আর অন্যায় হইলে সমাজের সহিত রাষ্ট্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হইবে। এইভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়াই উভয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না।

রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন : উপরে সমাজের সহিত রাষ্ট্রের পার্থক্য দেখানো হইয়াছে, এখন রাষ্ট্রের সহিত সমাজের অন্যান্য সংগঠনের পার্থক্য দেখানো যাইতেছে।

(১) রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোন এক বিশেষ স্তরে। আর সামাজিক সংগঠন জন্মলাভ করে মানুষের স্বেচ্ছামূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে। রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আনুগত্য বাধ্যতামূলক। আর অন্যান্য সংগঠনের সদস্যপদ মানুষের ইচ্ছাধীন।

(২) মানুষ একযোগে অনেকগুলি সংগঠনের সদস্য হইতে পারে। কিন্তু একই সময়ে সে একটির বেশী রাষ্ট্রের সদস্য বা নাগরিক হইতে পারে না।

(৩) রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে। কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। যেমন, রোমান চার্চ সারা পৃথিবীতেই ছড়াইয়া আছে।

(৪) সামাজিক সংগঠনগুলির এক একটি করিয়া নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে আর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য থাকে ব্যাপক ও বহু বিস্তৃত।

(৫) সামাজিক সংগঠনগুলির তুলনায় রাষ্ট্র অনেক বেশী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অবশ্য, ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠান শতরাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের সাক্ষ্য বহন করিয়া আজও টিকিয়া আছে।

(৬) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্র প্রণীত আইন সকলকেই মান্য করিতে হয়। রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। অতএব রাষ্ট্র পীড়নমূলক ক্ষমতার অধিকারী। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা নাই কিন্তু রাষ্ট্রের তাহা আছে।

(৭) রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে ও ধ্বংস করিতে পারে। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা পারিবে কিনা

সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম রাষ্ট্রের সম্মতি সাপেক্ষ কিন্তু কাহারও নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা পশ্চিমবঙ্গ কি রাষ্ট্র? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিরোধ করা ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে উন্নত করা এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করাই ইহার লক্ষ্য। সাধারণ রাষ্ট্রের মতো ইহারও আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ আছে। বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে ইহা যে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র পদবাচ্য হইতে হইলে যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তাহার সবকয়টি ইহার নাই; যেমন, (১) রাষ্ট্র হইতে হইলে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকা চাই, কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এমন কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নাই।

(২) বলা হয় যে, রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের মতো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেরও শাসনযন্ত্র আছে কিন্তু এই শাসনযন্ত্রের বিধিনিষেধগুলির প্রয়োগ অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতি সাপেক্ষ।

(৩) সমমর্যাদাবিশিষ্ট সকল রাষ্ট্র নিজেদের সার্বভৌমত্ব ত্যাগ না করিয়া এবং নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করিয়াছে। ফলে ইহাকে কাজ করিতে হয় প্রত্যেকটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্মতি লইয়া এবং তাহাদেরই মারফত। এই কারণে কোন রাষ্ট্রের উপর চরমতম কোন আইনগত ক্ষমতা রাষ্ট্রপুঞ্জের নাই। ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জকে আব বাষ্ট্র বলা যায় না। ইহাকে অনেকে অভিভাবক রাষ্ট্র (Super State) বলেন।

(৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোন সার্বভৌমত্বও নাই। কিন্তু রাষ্ট্র হইতে হইলে সার্বভৌমত্ব থাকা চাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে কিন্তু ইহার অর্থ হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে মাত্র। কিন্তু সদস্য রাষ্ট্র তাহার এই সুপারিশ মান্য নাও করিতে পারে। যদিও ইহার নিজস্ব সামরিক বাহিনী আছে কিন্তু তাহাও সদস্য রাষ্ট্রের দানে গঠিত। তাহার ব্যবহার যদিও জাতিপুঞ্জ করিতে পারে কিন্তু তাহাও অনেক সর্ত সাপেক্ষ। কোন সদস্যরাষ্ট্র তাহার সার্বভৌমত্ব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সমর্পণ করে নাই। যে কোন সদস্য রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারে। কাজেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিবার কারণ আজও ঘটে নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ২২টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে একটি অঙ্গরাজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যকে রাষ্ট্র বলা হইবে কি না তাহা নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের উপর। ভারতের সংবিধান কোন অঙ্গরাজ্যকেই রাষ্ট্রের পদবাচ্য করে নাই। আবার রাষ্ট্র হইতে হইলে যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের তাহা নাই। ভারতের সার্বভৌমত্ব একক শুধু ভারতেরই; উহার

কোন অঙ্গরাজ্যকে সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। অঙ্গরাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকার আছে, জনসমষ্টি আছে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে কিন্তু যেহেতু সার্বভৌমত্ব নাই সেইহেতু পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নয়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ
(Theories regarding the Origin of the State)

সুদূর অতীতে মানব জীবনের যখন অতি প্রত্যুষকাল সেই সময় হইতে মানব জীবনের ক্রমবিবর্তনের পথে কি করিয়া রাষ্ট্র আসিয়া হাজির হইল সে সম্বন্ধে প্রমাণসিদ্ধ কোন তথ্য আজও সংগ্রহ করা যায় নাই। রাষ্ট্রিক চিন্তা জগতে বহু মনীষী নানা যুক্তি দিয়া রাষ্ট্রের জন্ম ইতিহাস লিখিয়াছেন। বিবর্তনের রথচক্র তলে যখন একযুগ পার হইয়া আর এক যুগ আসিয়া হাজির হইয়াছে তখন প্রথম যুগের ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এমনিভাবে কাল হইতে কালান্তরে নানা তর্কবিতর্কের ভিতর দিয়া মত ও যুক্তি তমসাচ্ছন্ন অতীতের বিভিন্ন দিক পরিচিতির আলোকে উদ্ভাষিত হইয়াছে। সমাজতত্ত্ব ((Sociology)), নৃতত্ত্ব (Anthropology), মানব সমাজের কুলগত বিশ্লেষণ ((Ethnology), তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative philology) প্রভৃতি বিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তির সমস্যায় বিভিন্ন আলোকপাত করিয়াছে। তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন মতবাদই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। নূতন মতবাদ আসিয়া পুরাতন মতবাদকে সরাইয়াছে। এই সকল মতবাদ সমকালীন চিন্তা জগতে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে চারিটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য তাহারা হইল : (১) ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, (২) বলপ্রয়োগ মতবাদ, (৩) সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং (৪) ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ। এই চারিটি মতবাদ ছাড়া পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ বলিয়া আরও একটি মতবাদ আছে, তাহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

(১৩) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ
(Theory of Divine Origin) :

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্ব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই তত্ত্বের সহজ কথা হইল ঈশ্বর স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রাষ্ট্রপ্রধান ঈশ্বরের নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অতএব রাষ্ট্রনায়ক রাজা হইতেছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁর কাজের হিসাব নিকাশ একমাত্র ঈশ্বরের দরবারেই হইতে পারিবে। পার্থিব মানুষের নিকট তিনি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। রাজাই মর্তে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজার হুকুমনামাই ঈশ্বরের হুকুমনামা।

(১৪) সার কথা

ইহার প্রতিবাদ ঘোরতর গর্হিত পাপ। মানুষের ধর্মবিশ্বাস রাষ্ট্রশক্তিকে সংহত করিয়াছিল। হিন্দু পুরাণে বহু রাজারই দেব অংশে জন্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাভারতে আছে যে, মানুষ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছে, "হে প্রভু নায়কবিহীনে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের নিকট একজন নায়ক পাঠাও যাহাকে আমরা পূজা করিব এবং যিনি আমাদের রক্ষা করিবেন।" প্রাচীন মিশরে রাজাই ছিলেন ধর্মযাজক। প্রজাগণ তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। ইহুদিরাও ধর্মীয় অনুশানকেই রাজ্যশাসনের ভিত্তি বলিয়া মনে করিতেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে অবশ্য এই মতবাদের প্রচলন দেখা যায় না। গ্রীসে সোফিস্ট নামে পরিচিত দার্শনিকগণ ঐশ্বরিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাহাদের নিকট রাষ্ট্র ছিল এক মানবিক প্রতিষ্ঠান।

যীশুখ্রীষ্টের বাণীতে আছে—"সীজারের (রাজার) যাহা প্রাপ্য তাহা সীজারকে দাও আর ঈশ্বরের যাহা প্রাপ্য তাহা ঈশ্বরকে দাও।"* যীশুর এই বাণীতে ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করিয়া দেখার একটা ইঙ্গিত ছিল। পরবর্তী-কালে সেণ্টপল্ বলিলেন, "প্রত্যেকেই উচ্চতর শক্তির বশ্যতা মানিয়া লউক, কারণ ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও শক্তি নাই। যে শক্তি বর্তমান তাহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। যে এই বর্তমান শক্তির বিরোধিতা করে সে ঈশ্বরেরই অনুজ্ঞার প্রতিরোধ করে। যাহারা তাহা করে তাহাদের জন্য নির্ধারিত আছে অনন্ত নরক।" সেণ্টপলের সময় হইতেই রোমান সম্রাটদের সহিত খ্রীষ্টধর্মের বোঝাপড়া শুরু হয়। ইহারই জের টানিয়া মধ্যযুগে ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ও রাজাদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। এই বিরোধের সময় উভয় পক্ষই এই মতবাদটিকে স্ব স্ব পক্ষের স্বার্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করেন। রাজাকে ঈশ্বরে. প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করেন রাজার সমর্থকেরা আর পোপের সমর্থকগণ পোপকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করেন। পরিশেষে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে পোপের পরাজয় হয়। পোপের পরাজয়ের পর সম্রাট নিজ ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। মার্টিন লুথার, জুইংলি, ক্যালভিন প্রমুখ প্রোটেস্টাণ্টগণ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার শুরু করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ এক চরমরূপ ধারণ করে। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেমস্ ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অর্থ যেমন ঈশ্বর দ্রোহিতা, অনুরূপভাবে রাজকর্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ করাও ধর্মদ্রোহিতার সামিল। রাজার অন্যায় কাজ আসলে প্রজাদের শাস্তি। ঈশ্বর যখন রাজার মারফত প্রজাদের শাস্তিবিধান করিতেছেন তখন প্রজাদের কর্তব্য হইল মাথা পাতিয়া সেই শাস্তি মানিয়া লওয়া। ধর্মপ্রচারক থোমাস এ্যাকুইনাস একটু ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন রাজা ঈশ্বরের নিকট হইতে সকল

(১৫) রাজা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি

* "Render therefore unto Caeser the things which are Caeser's and unto God the things that are God's."

ক্ষমতা পাইয়া থাকেন জনগণের মাধ্যমে। জনসাধারণই তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যযুগেই এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। তখনো ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ চরমরূপ ধারণ করে নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ এক চরমরূপ ধারণ করে। এই যুগে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া কল্পনা করা হইত এবং বিশ্বাস করা হইত যে, রাজা একমাত্র ভগবানের নিকটই তাঁহার কাজের জন্য দায়ী থাকিবেন। প্রজাদিগের উপর তাহার কোন কর্তব্য নাই। এইরূপ বিশ্বাসের ফলে রাজতন্ত্র এক চরম স্বৈরাচারী হইয়া উঠে।

বৈশিষ্ট্য ঃ উপরোক্ত আলোচনা হইতে এই মতবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হইল ঃ (১) রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি একটি সংগঠন, (২) রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, (৩) রাজতন্ত্রই একমাত্র ঈশ্বরানুমোদিত শাসন পদ্ধতি, (৪) রাজার অবর্তমানে তাঁহার পুত্র রাজা হইবেন, (৫) রাজা তাঁহার কাজের জন্য একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়ী, (৬) সুতরাং রাজা তাঁহার কাজের জন্য প্রজাদিগের নিকট দায়ী নহেন, (৭) প্রজাদিগকে বিনা বিচারে রাজ আজ্ঞাপালন করিতে হইবে এবং রাজা প্রজাদিগের মতামত ও আইন কানুনের ঊর্ধ্বে।

সমালোচনা ঃ-(১) এই মতবাদের বিপক্ষে বহু যুক্তি দাঁড় করানো হইয়াছে। বর্তমানে কেহই বিশ্বাস করেন না যে, রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান। মানুষ নিজের ইচ্ছা মতো এবং নিজের প্রয়োজনেব তাগিদেই রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) এই মতবাদ বিজ্ঞান বিরোধী। চোখ বুজিয়া ইতিহাসের পাতা উল্টায়। অর্থাৎ ইতিহাসকে অস্বীকার করে। কোন যুক্তি মানে না, বিচার ও বিশ্লেষণকে অস্বীকার করে। ইহা কেবল রাজকীয় কর্তৃত্বকেই সমর্থন কবে। শুধু বশ্যতা স্বীকার করা, হুকুম তামিল করা,—সাধারণ মানুষের জন্য এই একটি মাত্র কর্তব্যের নির্দেশ দেয়। ঈশ্বর একটার পর একটা রাষ্ট্র বানাইয়া একের পর এক রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন, এই ধরনের মতের সমর্থনের দাবিদারদের উচ্চ চীৎকার ছাড়া আর কোন প্রমাণ নাই। বরং ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, কিভাবে যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, হিংস্রতা ও হীনতার ভিতর দিয়া রাজারা সিংহাসন দখল করিয়াছে। আবার যদি কোন রাজাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত বলিয়া কল্পনাও করা যায়, তাহা হইলেও রাজার পুত্র বংশানুক্রমিক ভাবে ঈশ্বরের দূত হইবে কোন্ আদর্শবাদে বা যুক্তিতে? রাজ্য লইয়া দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে প্রজারা ঈশ্বরের ইচ্ছা বিচার করিবে কোন রাজার আদেশে? ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কে ব্যাখ্যা করিবে—পোপ-না—রাজা? বহু ধর্মাবলম্বী যে রাষ্ট্রে বাস করে সে রাষ্ট্রে রাজধর্মের বিরোধীদের কি দশা হইবে? ভিন্ন ধর্মীয় রাজাকে তাহাদের ধর্মগুরু বলিয়া মানিতে পারিবে কি? ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজা প্রথম চার্লসের যুদ্ধে পরাজয়, তাহার বিচার ও মৃত্যুদণ্ড ঈশ্বরের রাজকীয় মর্যাদায় দারুণ আঘাত হানিয়াছে। তাই দেখা যায় চুক্তিবাদীদের যুক্তির আঘাতে এই মতবাদ শীঘ্রই রাষ্ট্রীয় চিন্তাজগৎ হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে।

(৩) এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় একমাত্র রাজতন্ত্রে। প্রজাতন্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে হইবে সে সম্বন্ধে এই মতবাদ কোন ইংগিত দেয় না।

(৪) এই মতবাদ রাজতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করে। ফলে রাজা এবং রাজ আজ্ঞায় যে সকল আইন কানুন প্রণীত হয় তাহাকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখিতে হয়। এই মতবাদ অনুসারে রাজাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করা হয়। কিন্তু অত্যাচারী নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী ও প্রজাপীড়ক রাজাকে কেহই ভক্তি করিতে চায় না। অত্যাচারী রাজার অত্যাচারে যখন মানুষ নিপীড়িত হয়, তখন কেহই বিশ্বাস করিতে চায় না যে রাজার ভোগবিলাসের জন্য ঈশ্বর তাহাদের প্রতি এত নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারেন। মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে, কল্যাণকামী রাজাকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হইত, কিন্তু যে রাজা প্রজা রক্ষার আশ্বাস দিয়া প্রজা পালন করেন না তাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।

(৫) এই মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। ইহা শুধু স্বৈরাচারিতার পক্ষপাতী। কালক্রমে রাষ্ট্র হইতে চার্চ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল তখন গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইল। এই মতবাদও বিদায় লইল।

(৬) ধর্মযাজকগণের মধ্যে হুকার বলেন, ধর্মের ব্যাপারেই ঈশ্বরের কল্পনা করা যায়, লৌকিক ব্যাপারে নহে। অতএব ঈশ্বরের নামে রাজার যে সব কিছু পাইবার অধিকার নাই ধর্মযাজকগণও তাহা স্বীকার করেন।

ঐতিহাসিক মূল্য : আদিম কালে মানুষ ছিল অসভ্য, সমাজ ছিল বিশৃংখল। মানুষ অশরিরী ঈশ্বরকে ভয় করিত। তাই ঈশ্বরেব নামে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাজার পক্ষে সমাজে শৃংখলা আনা সহজ হইয়াছিল। এই বিষয়ে এই মতবাদের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে। জনসাধারণের নৈতিক উন্নতি সাধন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ এই নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করে। শাসকদেরও যে, নৈতিক দায়িত্ব আছে এই মতবাদ তাহা প্রচার করে।

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহাব যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। এই মতবাদ এক ধর্মবিশ্বাসী মানুষ লইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা যোগায়। এই মতবাদের ভিত্তিতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পাকিস্তান ও ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। কিছুদিন আগেও পাকিস্তান নিজেকে ইসলামীয় প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ইসলামীয় নীতিব ভিত্তিতেই শাসনকার্য পরিচালনা করা হইবে বলিয়া তাহাদের সংবিধানে লেখা হইযাছে। ইহা হইতে সুস্পষ্ট হয় যে, পশ্চাৎপদ চিন্তার প্রভাব মানুষের মনে আজও প্রবল। এই মতবাদ যখন সৃষ্টি হইয়াছিল তখন হযত ইহার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আজ ইহার প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না।

বলপ্রয়োগ মতবাদ
(The Theory of Force)

বলপ্রয়োগ মতবাদকে দুইদিক হইতে ব্যাখ্যা করা যায়—একদিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় আর একদিকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায়। এই মতবাদটিকে জোরালো ভাবে উপস্থিত করেন ওপেনহাইমার, জেন্‌কস ও লীকক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ।

মতবাদের ব্যাখ্যা ঃ মানুষ সমাজবন্ধ জীব। মানুষের চরিত্র কলহপ্রিয়, আক্রমণমুখী। মানুষ একে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চায়। আদিমকালে বলবান ব্যক্তি দুর্বলকে বাহুবলের দ্বারা পরাজিত করিয়া তাহার হুকুম মানিয়া চলিতে বাধ্য করিত। তখন দলপতি পরাজিত লোকেদের লইয়া যে দল তৈরী করিত তাহারা আবার অপর দলকে আক্রমণ করিয়া অপর দলের সকলকে পরাজিত করিয়া দলপতির বশ্যতা স্বীকার করাইত। এমনি ভাবে এক একটা এলাকায় দলপতির প্রভুত্ব কায়েম হইত। আর দলপতির আজ্ঞাই হইত আইন। এই আইন মান্য না করিলে দলপতি আইন অমান্যকারীকে দণ্ড দিতেন। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ বলেন, রাষ্ট্রের উৎপত্তির গোড়ার দিকে বলশালী গোষ্ঠী (clan) দুর্বল গোষ্ঠীকে পরাভূত করিয়া গোষ্ঠীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিত। এই ভাবে গোষ্ঠীবন্ধ মানুষ লইয়া উপজাতির উদ্ভব হইল। তারপর এক উপজাতির সহিত আর এক উপজাতির সংঘর্ষ বাধিত। বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতির উপর প্রভুত্ব করিত। আর বিজয়ী উপজাতির নেতাকে নরপতি বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইত। এইভাবে এক উপজাতি অধ্যুষিত নির্দিষ্ট এলাকায় উপজাতির প্রভুত্বাধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

(১৬) মতবাদের বর্ণনা

বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের জন্ম হইবার পর রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে বলপ্রয়োগের ভাব একচেটিয়া ভাবে থাকিত, কারণ তাহা না হইলে রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যান্য শক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। আবার বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্যও জোরালো শক্তির ব্যবহার রাখিতে হয়।

"জোর যার মুল্লুক তার" নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা নূতন নয়। প্রাচীনকালেও এই মতবাদ অনেকে বিশ্বাস করিতেন। হেরাক্লিটাস প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকগণ বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষকে সুপথে চালানোর জন্য বল-প্রয়োগের দরকার। জার্মান দার্শনিক ট্রিট্‌স্কে (Heinrich Von Treitschke) রাষ্ট্রশক্তির উপাসনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কার্ল মার্কসের মতে রাষ্ট্র শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর নিপীড়ন চালানোর যন্ত্র, ইহা শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যে শৃঙ্খলা শ্রেণী সংঘর্ষকে সীমাবন্ধ ও সংযত করিয়া

(১৭) রাষ্ট্র বলের উপরই দাঁড়াইয়াছে

এই নিপীড়নকেই আইনসিদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী করে।* মার্কস রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন যে, রাষ্ট্র জন্মায় তখনই যখন সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর উপর নিপীড়ন শুরু করে। রাষ্ট্র এই দমন, পীড়ন ও শোষণকে কার্যকর করে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে। অতএব সমাজের একশ্রেণীর দমনের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের ব্যবহার হয়।

সব লেখকই বলপ্রয়োগ মতবাদকে এক উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করেন নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই মতবাদকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক চার্চ পোপের ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের উপরে বসানোর জন্য প্রচার করিত যে, চার্চের শক্তি ধর্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আর রাষ্ট্র আসিয়াছে হীন বাহুবল হইতে সুতরাং চার্চকে সকলকে মান্য করিতে হইবে। হার্বার্ট স্পেনসার ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পূজারী। তিনি বলিলেন সরকারের জন্ম পাপ হইতে, অশুভজন্মের চিহ্ন সে বহন করিতেছে ("Government is offspring of evil bearing about it the marks of its parentage.")। অতএব ব্যক্তি জীবনে সরকারের হস্তক্ষেপ চলিবে না। রাষ্ট্র সবলের স্বার্থে দুর্বলকে ব্যবহার করিতে সাহায্য করিবে। রাষ্ট্রের মালিকানায় শিল্প গড়িয়া উঠিলে ঐ শিল্পের শ্রমিককে বলপ্রয়োগ করিয়া ন্যায্য মজুরি হইতে বঞ্চনা করা হয়। তাই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব লুপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে যোগ্যতমের জয় অনিবার্য (Survival of the fittest)। সমাজে যাহারা যোগ্য তাহারাই বাঁচিবে। একমাত্র তাদেরই বাঁচার দাবি আছে। দুর্বলকে সাহায্য করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। একমাত্র শক্তিমানই বাঁচিবে, কর্তৃত্ব করিবে, আর দুর্বল মরিবে। রাষ্ট্র যদি দুর্বল, রুগ্ন, যক্ষ্মাক্রান্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করে তবে সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করিবে। রাষ্ট্র একটি অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। মার্কস-বাদীরা বলেন শ্রেণী নিপীড়নের যন্ত্র হইল রাষ্ট্র। কিন্তু সমাজে যেদিন শ্রেণীবৈষম্য থাকিবে না তখন রাষ্ট্রকে আর হাতিয়ারের কাজ করিতে হইবে না। রাষ্ট্রও আর থাকিবে না। ব্লুণ্টসলি বলেন ঃ সার্বভৌম চরম ক্ষমতাই হইল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এই মতবাদ এই বৈশিষ্ট্যকেই গুরুত্ব দেয়।

সমালোচনা ঃ সপক্ষে যুক্তি ঃ (১) ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, তরবারির দ্বারাই অনেক রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় আছে যুদ্ধের কাহিনী। বিংশ শতাব্দীর দুইটি যুদ্ধ অনেক রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়াছে। আবার নূতন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়াছে। আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপেক্ষায় আছি। যদি আবার সেই নরহত্যাকারী যুদ্ধ আসে তখন দেখা যাইবে আবার অনেক রাষ্ট্র ধ্বংস হইয়াছে, আবার অনেক নয়া রাষ্ট্র জন্ম লইয়াছে। অতএব এই মতবাদ বাস্তব সত্য। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা। এই সার্বভৌমিকতা শক্তির উপর

*"According to Marx, the State is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another, it creates 'order' which legalises and perpetuates this oppression by moderating the collisions between the classes."—Lenin

প্রতিষ্ঠিত। ল্যাস্কি বলেন, সামরিক শক্তির মধ্যেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নিহিত।* রাষ্ট্র তার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখে পুলিশ ও সামরিক শক্তির সাহায্যে। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে সামরিক বলে। জরিমানা, জেল, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী—এই সব কি? এইগুলি কি বলপ্রয়োগের মতবাদকে সমর্থন করে না? এই সব কি বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? রাষ্ট্রের জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি ও তার অস্তিত্ব রক্ষা বলপ্রয়োগের দ্বারাই হইয়া থাকে।

(২) শক্তি সর্বদাই যে অকল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হইবে এমন কথা বলা যায় না। স্বেচ্ছাচারী রাজাকে উচ্ছেদ করার কাজে, রাষ্ট্রকে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত করিতে বিপ্লব, যুদ্ধ ও শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন রহিয়াছে। মানুষের মধ্যে যদি শুভ বুদ্ধি না জাগে, সে যদি সমাজের অকল্যাণ করে তবে শক্তি দিয়াই তার শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইবে। অতএব এই মতবাদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা যায় না।

বিপক্ষে যুক্তি: (১) অনেকে আবার উপরোক্ত যুক্তিকে মানিতে নারাজ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "বাহুবল পশুর বল। প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান, নহিলে তাহার নিজ বাহুতে বল কত?" ম্যাকাইভার বলেন, "একমাত্র পাশবিক বল বেশীদিন জনতাকে সংঘবদ্ধ রাখিতে পারে না। কারণ জনসাধারণের সম্মতি না পাইলে পাশবিক শক্তি বিভেদ সৃষ্টি করে" ("Forces always disrupts unless it is made subservient to common will."—*MacIver*)। এই প্রসঙ্গে টি. এইচ. গ্রীণ বলেন, "রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল জনগণের সম্মতি, আসুরিক বল নয়" ("Will, not force is the basis of the State."—*T H Green*)। নিপীড়নমূলক শক্তি হইলেই চলিবে না। এই শক্তি যদি মানুষের অধিকারগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য আইনসম্মত ভাবে ব্যবহৃত হয় তবেই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। রাষ্ট্রের শক্তিকে মানুষ মান্য করে তখনই যখন দেখে যে, এই শক্তি মানুষের অধিকারকে বজায় রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। রাষ্ট্রের প্রতি বশ্যতার ভিত্তি—ভয় নহে, যুক্তি ও বিচার। রাষ্ট্রের ভিত্তি পাশবিক শক্তি নহে। রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল নৈতিক শক্তি। আইন ও অধিকার রক্ষার জন্য মঙ্গলময় সংকল্পের শক্তি। অবশ্য, রাষ্ট্রের আইন লোকেরা মানে অভ্যাসবশতঃ, আলস্যবশতঃ, অজ্ঞানতাবশতঃ এবং যুক্তি দিয়া বুঝিয়া। সর্বদাই ভয়ে মান্য করে না।

(২) তাহা হইলে শক্তিই রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব করিয়াছে? শক্তিই যদি সব হয় তবে রাষ্ট্রনীতিতে যুক্তি, নীতি, আদর্শ এবং জনগণের সম্মতি কি কিছু নয়? অবশ্য রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে শক্তির একটা জোড়ালো অংশ আছে বটে, তাই বলিয়া শক্তিই সব নয়। রাষ্ট্রের শক্তিতে পাশবিক বল ছাড়া আছে ধর্মের বন্ধন, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা মানুষের সামাজিক প্রকৃতি প্রভৃতিও জোরালোভাবে রাষ্ট্র সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। লীকক্ বলেন, রাষ্ট্র সৃষ্টিতে শক্তি অন্যতম উপাদান বটে, কিন্তু অন্যতমকে একমাত্র উপাদান বলা যায় না।

* "In the armed forces lies the heart of sovereignty"—Laski

(৩) নীতিগতভাবেও এই মতবাদ বর্জনীয়। কারণ এই মতবাদ স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করে। এই মতবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্রে মানুষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের আদর্শ স্বৈরাচারী বাহুবলে বলীয়ানের পদতলে লুণ্ঠিত হয়।

(৪) এই মতবাদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির বিরোধী। ইহা যুদ্ধবাদকেই ডাকিয়া আনে ও বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধের দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। যুদ্ধের সাহায্যেই স্থির হইবে কাহারা বাঁচিয়া থাকিবে আর কাহারা মরিবে এবং কাহারা প্রভুত্ব করিবে। ইহা শুধু মানুষের চরিত্রের যাহা কলঙ্ক, যাহা নীচতা, যাহা ঘৃণ্য তাহার উপরই আলোক সম্পাত করে।

উপসংহারে বলা যায় মানুষের চরিত্রে শুধু নীচতারই সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব, উদারতা প্রভৃতি গুণও আছে। অতএব এই মতবাদের সবটাই সমর্থনযোগ্য নয়। রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা যায় না। কারণ সব সমাজেই কিছু লোক আছে যাহা আইন ভঙ্গ করে। তাই আইন ভঙ্গকারীদের দমন করার জন্যই শক্তি প্রয়োগের দরকার। আবার যে সম্মতিতে রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করে সেই সম্মতিরও দরকার আছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

(Social Contract Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের প্রতিবাদ হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সজোরে ঘোষিত হইলেও এই মতবাদ কোন নূতন একটা কিছু নয়। এই মতবাদ অতি প্রাচীন। এমন কি মহাভারতের শান্তিপর্বে এই মতবাদের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন যখন আরম্ভ হয় তখনই মানুষ অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক ব্যক্তিক রাজা নির্বাচিত করিল। আর সেই রাজাকে প্রজাগণ নিয়মিতভাবে কর দিত এবং রাজাও প্রজাদের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিতেন। এমনিভাবেএকটা চুক্তির ধারণা সে যুগেও ছিল।

গ্রীসের সোফিস্ট সম্প্রদায়ও মনে করিতেন রাষ্ট্র একটা চুক্তির ফল। প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল চুক্তিবাদের কথা বলিয়াছিলেন চুক্তিবাদকে অস্বীকার করার জন্য। বাইবেলেও চুক্তিবাদের উল্লেখ আছে। এমন কি রোমান আইনেও চুক্তিবাদের উল্লেখ আছে। সামন্ত যুগে রাজা ও সামন্তদিগের মধ্যে চুক্তিই সামন্ত যুগের ভিত্তি ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে এই মতবাদ বেশ দানা বাঁধিয়া উঠে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ম্যানেগোল্ডের রচনায় ইহা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই মতবাদের এত দীর্ঘ ইতিহাস থাকিলেও যে ত্রয়ী চিন্তাবীরের লেখার মধ্যদিয়া এই মতবাদ জাগিয়া উঠিয়াছে, দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিন্তার খোরাক যোগাইয়াছে তাহারা হইলেন হবস্ (১৫৮৮-

১৬৭৯), জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) এবং জাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-৭৮)। এই ত্রয়ী চিন্তাবীরকে বলা হয় চুক্তিবাদী।

মতবাদের বর্ণনা ঃ এই মতবাদ বর্ণনা দেয় রাষ্ট্র কিভাবে হইল, কেমন করিয়া শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক হইল। আদিতে কোন রাষ্ট্র ছিল না। তখন যে অবস্থায় মানুষ বাস করিত সেই অবস্থাটাকে হবস্ বলিলেন **প্রাকৃতিক অবস্থা (State of Nature)**। ইহা ছিল প্রাক্ সামাজিক অবস্থা। এই অবস্থায় রাষ্ট্র বলিয়া কিছু ছিল না। হবস্ প্রাক্ সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন, প্রাক্ সামাজিক অবস্থা ছিল ঘৃণ্য, দরিদ্র ও পাশবিক (Poor, nasty and brutish)। এই অবস্থায় রাষ্ট্র যখন ছিল না তখন রাষ্ট্রিক আইনও ছিল না, রাষ্ট্রিক কোন ব্যবস্থাও ছিল না। মানুষ ছিল সদা স্বাধীন। লক্ অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল প্রাক্ রাজনৈতিক অবস্থা (Pre-political) বটে, কিন্তু মানুষের জীবন হবসের বর্ণনা মতো ঘৃণ্য ও কদর্য ছিল না, ইহা ছিল শান্তি ও শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। রুশো আরও একটু আগাইয়া বলিলেন, প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল মর্তের স্বর্গ। তবে মোটামুটি ভাবে এই ত্রয়ী মানিয়া লইয়াছেন যে, আদিকালে মানুষের জীবন প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে কাটিয়াছে। তখন রাষ্ট্র বলিয়া কোন কিছু ছিল না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থায় রাষ্ট্রের জন্ম হয় নাই।

(১৮) **প্রাকৃতিক অবস্থা**

আবার প্রাকৃতিক অবস্থায় যেহেতু রাষ্ট্র ছিল না, সেহেতু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বও ছিল না, রাষ্ট্রীয় আইনও ছিল না। তাই হবস্ বলেন মানুষ যথেচ্ছ ভাবে জীবন কাটাইত। হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থার বিধি ছিল যাকে পাও তাকেই মার, যাহা পাও তাহাই কাড়িয়া লও ("Kill whom you can, take what you can.")। এই অবস্থায় মানুষ যে আইন মানিয়া চলিত তাহাকে বলা হইত প্রাকৃতিক আইন বা স্বাভাবিক আইন (Natural Law)। মানুষের চলা ফেরা, খাওয়া-পরা এবং বাঁচিযা থাকিবার জন্য কোন-না-কোন নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত—তাহাই ছিল স্বাভাবিক আইন। প্রকৃতি হইতে মানুষ যে নিয়ম শৃঙ্খলা বুঝিয়া জীবনে প্রয়োগ করিত তাহাই ছিল স্বাভাবিক আইন। প্রকৃতি-দত্ত আইন মানিয়া মানুষ যতটুকু স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করিত ততটুকুই ছিল **স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights)**।

(১৯) **প্রাকৃতিক আইন স্বাভাবিক অধিকার**

চুক্তিবাদের প্রবক্তাগণের মতে মানুষ এইভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বাস করিবার কালে স্বাভাবিক আইন ও অধিকার ভোগ করিয়া যখন বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইল তখন মানুষ নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আওতায়, রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের নিয়ন্ত্রণে এক রাষ্ট্রীয় জীবন শুরু করিল।

এই চুক্তিবাদ সম্বন্ধে সকল চুক্তিবাদীই একরকম ধারণা পোষণ করিতেন না। হবসের মতে চুক্তি হইয়াছিল প্রজাবর্গের মধ্যে এবং প্রজাবর্গ নিজেদের মধ্যে চুক্তি

সম্পাদন করিয়া সকল ক্ষমতা ও অধিকার রাজার হস্তে সমর্পণ করে। লক্ আবার এই মত পোষণ করিতেন যে, চুক্তি হইয়াছিল দুইটি। প্রথম চুক্তি হয় জনসাধারণের মধ্যে এবং সকল ক্ষমতা সর্বসাধারণ্যে সমর্পণ করা হয়। প্রথম চুক্তিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আর দ্বিতীয় চুক্তিতে রাষ্ট্রযন্ত্র বা সরকার গঠিত হয়। এই চুক্তি হইয়াছিল ব্যক্তিসংসদ বা রাজার সহিত। হবস্ ও লক উভয়েই ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। হবস্ ছিলেন চরম রাজতন্ত্রের সমর্থক আর লক্ ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। অবশ্য, লক্ সকল ক্ষমতা সর্বসাধারণ্যে সমর্পণের এবং সার্বভৌমের ক্ষমতা জনগণের অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এমন কি প্রজার স্বার্থে প্রজাবিদ্রোহের সমর্থন করেন। এইভাবে লক্ জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব ও গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেন। এবং রাজাকে চুক্তির অংশীদার করিয়া রাজাকে চুক্তির সর্ত পালনে বাধ্য করানোর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করেন।

রুশো যদিও হবসের মতো বলেন যে, চুক্তি হইয়াছিল একটি, কিন্তু তিনি রাজাকে চুক্তির অংশিদার করেন নাই। কারণ তাঁহার ধারণায় রাজতন্ত্রের কোন স্থান নাই। **সমষ্টিগত ইচ্ছাকেই (General will)** তিনি সার্বভৌম বলিয়া আখ্যায়িত করেন। রুশোর ধারণায় প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ ছিল সুখী ও স্বাধীন। কিন্তু ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে এবং চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতার অধিকারী হইল তাহা সর্বদাই সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করিত। ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীনে থাকিবে। রুশোর বর্ণিত সামাজিক চুক্তি সমষ্টিগত ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ সমষ্টিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। হবস্ সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছিলেন রাজার হস্তে, লক্ সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছিলেন সংসদের হস্তে, আর রুশো সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করিলেন সমাজের নিকট, যে সমাজ ছিল সুবিপুল গণশক্তির আধার। রুশোর মতে সরকারও চুক্তির পক্ষ নহে। সুতরাং সরকারও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। গণসার্বভৌম ইচ্ছা করিলে সরকারকে রদবদল করিতে পারে। অবশ্য চুক্তির প্রকৃতি যাহাই হোক এবং চুক্তির সংখ্যা এক বা একাধিক হউক ইহা সকল চুক্তিবাদীই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থার সকল অসুবিধার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জনাই আদিম মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল।

সামাজিক চুক্তিবাদের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। ইহার একটি হইল রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা আর অপরটি হইল শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের নির্দেশ দেওয়া। চুক্তিবাদ যে সময়ে প্রচারিত হয় সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের ফলে অরাজকতা আরম্ভ হয়।

হবস্ তাহার লেভায়াথান গ্রন্থে রাজতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য এই চুক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি চুক্তিবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেন এবং সেই প্রসঙ্গে রাজা ও প্রজার মধ্যে সম্পর্কের নির্দেশ দান করেন। অন্যান্য চুক্তিবাদীদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব বিশ্লেষণ দিবার সময় শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের নির্দেশ দেন।

চুক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) প্রাকৃতিক অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করা, (২) চুক্তি হইয়াছিল মানুষের স্বেচ্ছাকৃত, (৩) প্রাকৃতিক অবস্থায় রাষ্ট্র ছিল না, (৪) স্বাভাবিক আইন ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক আইন ছিল না, (৫) স্বাভাবিক অধিকার ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া কিছু ছিল না, কারণ রাষ্ট্রের তখনও জন্ম হয় নাই, (৬) পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে।

চুক্তিবাদের তিনজন প্রধান প্রবক্তার বক্তব্যকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইতেছে ঃ

(ক) **হবসের অভিমত ঃ** হবস্ ছিলেন ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক। ১৬৫১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁহার রচিত গ্রন্থ লেভায়াথান। হবসের সময়ে ইংল্যাণ্ডে প্রজাবিদ্রোহ ও ক্রমওয়েলের সাধারণতন্ত্র ইংল্যাণ্ডবাসীদের জীবন-বিপর্যস্ত করিয়া তোলে। এই সময়ে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। হবসের মতে মানুষ চরিত্রগত ভাবে স্বার্থপর, লোভী, ধূর্ত, নির্দয় ও আক্রমণমুখী। অতএব প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ ছিল স্বেচ্ছাচারী। "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতিতেই স্বাভাবিক আইন পর্যবসিত হইয়াছিল। অতএব স্বাভাবিক অধিকার ছিল শক্তিনির্ভর। এই অবস্থার মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই ছিল। এই সময়ে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিত। তাই মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে লাগিল। সুতরাং তাহাদের জীবন হইয়া উঠিল নিঃসঙ্গ, ঘৃণ্য, দরিদ্র, পাশবিক ও অনিশ্চিত।* হবসের মতে এই প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল প্রাক্ সামাজিক অবস্থা।

অতএব মানুষ স্বাভাবিক কারণেই মুক্তির সন্ধান খুঁজিতে লাগিল। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেকে তাহার স্বাভাবিক অধিকার চূড়ান্তভাবে কোন এক ব্যক্তিবিশেষ বা সংসদের হস্তে সমর্পণ করিল। এইভাবে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিবার পর ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কোন অধিকার রহিল না। আর এইভাবে জন্ম গ্রহণ করিল সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি সংসদ। ইহাই বিশাল লেভায়াথান, বা শ্রদ্ধাভরে বলা যায় মরণশীল দেবতা, যিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে ও নির্দেশে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার সর্বময় নিয়ন্তা।

* "Conditions in the state of nature made man's life solitary, poor, nasty, brutish and short."—Hobbes

হবসের মতবাদ ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায়, (১) রাজা বা কোন ব্যক্তিসংসদ হইলেন চরম ক্ষমতার অধিকারী। (২) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজা চুক্তির কোন পক্ষ নহে, সে চুক্তির উর্ধ্বে। চুক্তির ফলেই সার্বভৌম ক্ষমতাশালী ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, চুক্তির পূর্বে নহে। (৩) তাই যে প্রজারা নিজেরা চুক্তি করিয়া রাজার হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করিল এবং যে রাজা চুক্তির কোন পক্ষ নহে সেই রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ করার আর কোন অধিকার রহিল না। রাজা যেহেতু চুক্তির পক্ষ নন এবং চুক্তির শর্তপালনের দায়িত্ব তাহার যেহেতু নাই সুতরাং প্রজাদের তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকারও নাই। এইভাবে স্টুয়ার্ট রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবিরার অধিকার যে প্রজাদের নাই, তাহা তিনি প্রমাণ করিলেন। (৪) সার্বভৌমের আদেশই হইল আইন। (৫) প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা সার্বভৌমের আজ্ঞা অথবা আইন দ্বারা সীমিত অর্থাৎ সার্বভৌম যতটা প্রজাসাধারণরকে অধিকার দান করেন ততটাই তাহাদের স্বাধীনতা। অবশ্য প্রজাগণ নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার সমর্পণ করে নাই বলিয়া তাহাও প্রজাদের অন্যতম স্বাধীনতা। (৬) হবসের মতে অবাধ রাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা।

সমালোচকগণ বলেন, প্রথমতঃ, হবস্ চরমতন্ত্রকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই চরমতন্ত্র রাজতন্ত্রের মাধ্যমেও হইতে পারে আবার প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমেও হইতে পারে। তাই তিনি চরম রাজতন্ত্রের সমর্থনে বলিতে যাইয়া কার্যক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধ কাজই করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, হবস্ সরকার আর রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন না করিয়াও যে সরকারের পরিবর্তন সম্ভব, তাহা তিনি বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক অনুমোদন করেন নাই। তৃতীয়তঃ, হবস্ কল্পিত চুক্তিতে একটি মাত্র পক্ষই ছিল। কিন্তু একটিমাত্র পক্ষ একাকী কোন চুক্তি করিতে পারে না। একজন লোক নিজেই নিজের সহিত কোন চুক্তি করিতে পারে না। হবসের চুক্তিতে যাহাকে অপর পক্ষ ধরা যাইতে পারে তাহাকে আবার চুক্তির উর্ধ্বে রাখা হইয়াছে।

আইভর ব্রাউন বলেন, "হবস্ হইলেন নিয়মানুবর্তিতার প্রথম দার্শনিক" ("Hobbes is the first philosopher of discipline.")। হবস্ ছিলেন লক্ ও রুশোর মতবাদের পথ প্রদর্শক। তিনি আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা ও রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যের ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(খ) **জন লকের অভিমত :** ১৬৯০ সালে প্রকাশিত হয় লক্ রচিত Two Treatises on Civil Government গ্রন্থ। লকের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ছিল বিপ্লব মুখর। ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় জেমসের রাজ্যচুতি ও বিদেশী উইলিয়ামের সিংহাসনারোহণকে অনেকেই সমর্থন করেন নাই। এই সময়ে যে বিপ্লব ঘটে তাহা ১৬৮৮ সালের বিপ্লব নামে খ্যাত। লক্ শুধু দ্বিতীয় জেমসের সিংহাসনচ্যুতির যৌক্তিকতাই প্রমাণ করেন নাই, সকল অত্যাচারী রাজারই সিংহাসনচ্যুতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রশক্তি শাসিতের ইচ্ছার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাক্ সামাজিক অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর প্রাক্ রাষ্ট্রনৈতিক ছিল। এই প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। তাঁহার মতে মানুষ মূলতঃ আত্মসর্বস্ব অসামাজিক জীব নহে। সে স্বাভাবিক আইন মানিয়া চলে।

হবসের মতো লক্‌ও বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। অতএব প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন রাষ্ট্রীয় আইন ছিল না। যাহা ছিল তাহাকে স্বাভাবিক আইন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাই স্বাভাবিক আইনের অর্থ প্রাকৃতিক নিয়ম বা আইন। মানুষের সহজাত ন্যায়বোধের উপর এই আইন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হইত। ন্যায়বোধ ও প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা মানুষের কার্য নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রাকৃতিক অবস্থায় সব মানুষই ছিল স্বাধীন। লকের মতে স্বাধীনতা হবস্ বর্ণিত অনিয়ন্ত্রিত হিংস্র উচ্ছৃংখলতা নহে। ইহা ছিল স্বাভাবিক আইন ও যুক্তির শৃংখলে আবদ্ধ। মানুষ চায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্পত্তির নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষে মানুষে সাম্য ও সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হইত। এই অধিকার ছিল বাস্তব, সার্বজনীন, চিরন্তন এবং অবাধ। ইহা স্থান, কাল ও অবস্থা নির্বিশেষে স্বীকৃত হয়। প্রত্যেকেই এই অধিকার মান্য করিয়া চলিত। ফলে প্রাকৃতিক অবস্থায় সাম্য, স্বাধীনতা, সুখ ও শান্তি বিরাজ করিত।

(২০) প্রাকৃতিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকার

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, তবে কেন মানুষ এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল? লক্ বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক অবস্থায় তিনটি অভাব ছিল; যথা, (১) ন্যায় ও অন্যায়ের নির্দেশক. সকল বিরোধ নিষ্পত্তির মানদণ্ড, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও সর্বজনস্বীকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত সুনির্দিষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত আইন ছিল না; অর্থাৎ স্বাভাবিক আইনের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না;* (২) পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান বিচারক ছিল না; আইনের ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থা ছিল না; (৩) ন্যায় বিচারকে কার্যকরী করিবার মতো কর্তৃত্ব ছিল না; অর্থাৎ আইন বলবৎ করিবার কোন উপায় ছিল না। অতএব জীবনকে সুন্দরতর ও নিরাপদ করিবার জন্য এবং স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে ভোগ করিবার জন্য মানুষ প্রতিষ্ঠা করিল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ। মানুষ আইন প্রণয়ন করিল। প্রতিষ্ঠিত হইল শাসন যন্ত্র। এই শাসন যন্ত্র মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিল। তাঁহার মতে "প্রাকৃতিক অবস্থার দায়িত্ব সামাজিক জীবনে অবলুপ্ত হইয়া যায় না।" আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, আইনের

* "First, the want of an established, settled, known law received and allowed by common consent to be the standard of right and wrong and the common measure to decide all controversies between them".—Locke

উদ্দেশ্য হইল স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং তাহার পরিধিকে বিস্তৃত করিয়া লওয়া, তাহাকে ধ্বংস করা বা খর্বিত করা নহে।

এইভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আদিম মানুষ দুইটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। প্রথম চুক্তিটি হইয়াছিল আদিম মনুষ্যসম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে। এই চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। প্রথম চুক্তিতে কতকগুলি মাত্র অধিকার সর্বসাধারণ্যে সমর্পণ করা হয়। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসংসদের হাতে সমর্পণ করা হয় নাই। কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্যই এই চুক্তি হইয়াছিল। দ্বিতীয় চুক্তি সম্পাদিত হয় সমগ্র সম্প্রদায়ের সহিত রাজা বা সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত কোন প্রধানের সহিত। এই চুক্তিতেই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকারের প্রতিষ্ঠা হইল। লকের মতে শাসকের ক্ষমতা এই দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা সীমিত হইয়াছে। এই শাসককে সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত আইনকে বলবৎ করিতে হইবে। আর যে বিশেষ উদ্দেশ্যে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে কার্যকরী করিতে হইবে। কিন্তু সরকার যদি এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়, সরকার যদি অক্ষম হয় তবে নিশ্চয়ই জনসাধারণের এই সরকারকে গদীচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। কারণ, চুক্তির বলে যে গদিতে সমাসীন হইয়াছে, সে যদি চুক্তিব সর্ত পালন করিতে না পারে, তবে যে আসনে সে আসীন হইয়াছে সেই আসনে বসিবার অধিকার আর তাহার থাকিবে না। এইভাবে লক্ রাজার সিংহাসনচ্যুতি সমর্থন করেন। সরকারেব উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা। আর সবকারের ভিত্তি হইল জনসাধারণের সম্মতি। অতএব প্রজার অধিকার ও স্বধীনতার দ্বারা সবকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। রাজআজ্ঞাকে লক্ আইন বলিয়া স্বীকাব কবেন নাই। প্রচলিত প্রথাগত আইনকে বিধিসম্মত ব্যবস্থার মাধ্যমে রূপদান করিতে হইবে। চুক্তি সম্পাদনের পর যে মূল অধিকাব সকলের হাতে রহিয়া গেল তাহা হইল জীবনের অধিকার আর স্বাধীনতা ভোগ করিবার ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার।

(২১) দুইটি চুক্তি

লক্ জনগণের সার্বভৌমিকতার নীতিব একজন প্রবক্তা। তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠতার নীতি সমর্থন করেন। সরকারী কাজের সুবিধার জন্য তিনি সরকারী যন্ত্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন; যথা, (১) আইনপ্রণয়ন বিভাগ, (২) কার্যকরী বিভাগ এবং (৩) ভিন্নরাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যকরী বা ফেভারেটিভ বিভাগ। এইভাবে লক্ গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন।

বৈশিষ্ট্য ঃ (১) লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা জঘন্য ছিল না বটে, কিন্তু কতকগুলি অসুবিধা ছিল; (২) প্রাকৃতিক অবস্থায় স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকার ছিল; (৩) রাষ্ট্র গঠিত হইল চুক্তির মাধ্যমে; (৪) চুক্তি হইয়াছিল দুইটি; প্রথম চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় আর দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা সরকার গঠিত হয়; (৫) চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইল নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র। রাজাকে চুক্তির অংশীদার হিসাবে ধরা হয়। অতএব তিনি চুক্তির সর্ত পালনে বাধ্য; (৬) রাজার আজ্ঞাই আইন নহে; প্রচলিত

প্রথাগত আইনই আইন ; (৭) রাজা প্রজার প্রতি কর্তব্য পালন না করিলে প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারিবে। রাজার রাজত্ব প্রজার সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত ; (৮) লক্ জনগণের সার্বভৌমিকতার নীতি প্রচার করেন ; (৯) সরকারী কার্যকে তিন ভাগে ভাগ করেন ; (১০) প্রজাবর্গ রাজাকে সকল অধিকার সমর্পণ করে নাই।

সমালোচকগণ বলেন, লক্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। রাষ্ট্রের ইচ্ছা সরকারের ইচ্ছা ও কার্যাবলীর সীমা ঠিক করিয়া দেয়। সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের, সরকারের নয়। তিনি রাষ্ট্রকে সরকারের উপরে স্থান দিয়াছেন।* রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল প্রজাসাধারণের ইচ্ছা—জনমত। রাজার ক্ষমতা জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ, রাজা জনমতের অনুশাসন অনুসারে শাসনকার্য করিয়া থাকেন। অতএব জনমত উপেক্ষিত হইলে রাজাকেও সিংহাসনচ্যুত করা অন্যায় হইবে না। তিনি প্রজাদের বিদ্রোহ করিবার অধিকারকে এইভাবে সমর্থন করেন। যে সরকার ব্যক্তিকে সুখী করিতে পারিবে না এবং নিরাপত্তা রক্ষা করিতে পারিবে না সেই সরকারের প্রয়োজন নাই এবং তাহার পরিবর্তন আইনসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত।

তিনি সরকারের ক্ষমতাকে সংকুচিত করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পথ রোধ করেন এবং জননিয়ন্ত্রণে, গণইচ্ছায় যেহেতু সরকার পরিচালিত হইবে সেহেতু জনতার সার্বভৌমিকতার নীতি কার্যকর হইবে। অবশ্য লক্ সার্বভৌমিকতার নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নাই। তাহার এই সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার নামান্তর মাত্র। আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই।

রুশোর অভিমত (১৭১২-১৭৭৮) (Rousseau) : ১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয় ফরাসী দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুশোর বিশ্ববিশ্রুত সামাজিক চুক্তি গ্রন্থ (Contract Social)। হবস্ ও লকের মতবাদের পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। রুশোর মতবাদের পিছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। রুশো ব্যক্তিগত ধারণার বশবর্তী হইয়াই মতবাদ প্রচার করেন। হবস্ চাহিয়াছিলেন বিদ্রোহ দমন করিতে এবং রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিতে, লক্ চাহিয়াছিলেন বিদ্রোহের রসদ যোগান দিতে, রুশো ঠিক তেমন কিছু চান নাই। কিন্তু রুশোর লেখা ফরাসী দেশে বিপ্লব ঘটায়। ফরাসী দেশে তখন ছিল নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র। রাজা ছিলেন অত্যাচারী।

(২২) ঐতিহাসিক পরিবেশ

প্রাকৃতিক অবস্থার অস্তিত্ব তিনজনই স্বীকার করেন ; তবে রুশো বলেন প্রাকৃতিক অবস্থায় হিংসা, নিষ্ঠুরতা হানাহানির দ্বন্দ্ব ও কপটতার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই অবস্থাকে তিনি শুভ ও কল্যাণময়ীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহাকে মর্তের স্বর্গ (**Paradise on Earth**) বলিয়াছিলেন। হবসের মতে

*"Sovereignty of the State is not sovereignty of the ruler and the will of the State may limit the will and actions of a ruler".—Locke

প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল দুর্বিষহ। মানুষের জীবন ছিল বীভৎস, স্বল্পস্থায়ী, পাশবিক। লকের মতে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থায় সুখে শান্তিতেই ছিল। রুশো হবস্ ও লকের মধ্যে একটি মিলন সেতু রচনা করেন। তিনি বলেন প্রাকৃতিক অবস্থা প্রথমে লক্ বর্ণিত অবস্থার মতোই ছিল। কিন্তু পরে লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় খাদ্যাভাব দেখা দিল এবং ফলে সংঘাত শুরু হইয়া গেল। আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে মানুষের আদিম সরলতাপূর্ণ সাম্য চলিয়া গেল আর ভেদবুদ্ধির আবির্ভাব হইল। ভেদবুদ্ধি মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্মকলহ ও নানারূপ নীচতা সৃষ্টি করিল, ফলে উহা হবস বর্ণিত অবস্থায় পরিণত হইল। মানুষের প্রকৃতিকে রুশো মহান, মুক্ত ও বন্য বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের বাণী (Voice of the people is the voice of God.)

(২৩) প্রাকৃতিক অবস্থা

রুশো বলেন, প্রাকৃতিক অবস্থায় আইন ছিল কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত। প্রাকৃতিক আইন কল্যাণকর মৌল প্রেরণা হইতে উদ্ভূত হয়। হবস্ বলেন, প্রাকৃতিক অবস্থায় মনুষ্যকৃত কোন আইন ছিল না। বাহুবলই ছিল একমাত্র অধিকার আর প্রাণবাঁচানোর মন্ত্রই ছিল প্রাকৃতিক আইন। অর্থাৎ যাকে পাও তাকেই মার। হবসের প্রাণ বাঁচানোর মন্ত্রকে রুশো কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের জীবন পরিচালিত হইত। লক্ মানুষের বিবেকে যে নীতিবোধ রহিয়াছে তাহাকেই প্রাকৃতিক আইন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ছিল নীতি নির্ভর। আর রুশো লকের নীতি নির্ভর প্রাকৃতিক আইন যে ভাবে স্বেচ্ছাচারিতাকে সীমিত করিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করে তাহা ব্যাখ্যা করিলেন।

(২৪) প্রাকৃতিক আইন

এই প্রাকৃতিক অবস্থার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করিল। রুশোর মতে সকলে মিলিয়া চুক্তি করিয়া মানুষ তার সকল অধিকার যৌথ ব্যক্তিত্বের হাতে সমর্পণ করিল। এই যৌথব্যক্তিত্বকেই রুশো সমষ্টিগত ইচ্ছা (General will) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হবসের মতো তিনিও বলেন, চুক্তি হইয়াছিল একটি এবং ইহা একতরফা চুক্তি। ইহা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি। অতএব এই চুক্তির মধ্যে রাজার কোন স্থান নাই। রুশো বলেন জনগণ রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া তারপর আইন প্রণয়ন করিয়া সরকার গঠন করে। জনগণের এই আইন প্রণয়নকে দ্বিতীয় চুক্তি হিসাবে ধরা যাইতে পারে। লক্ বলেন চুক্তি হইয়াছিল দুইটি। প্রথম চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় আর দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা সসীম রাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। হবস্ বলেন চুক্তির দ্বারা সকল অধিকার রাজাকে সমর্পণ করা হয়। কিন্তু রাজা চুক্তির কোন পক্ষ নন। রুশো একদিকে হবসের একতরফা চুক্তিকে

(২৫) চুক্তির প্রকৃতি

সমর্থন করেন আবার রুশোর প্রতিনিধি কর্তৃক আইন প্রণয়ন করিয়া শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে যদি দ্বিতীয় চুক্তি ধরা হয় তবে তিনি লকের দ্বিতীয় চুক্তিকেও সমর্থন করেন। এইভাবে তিনি হবস্ ও লকের মতবাদের মিলন ঘটান।

হবসের মতো রুশোও সার্বভৌমকে চূড়ান্ত, অপ্রতিহত এবং চুক্তির ঊর্ধ্বে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রুশোর মতে সার্বভৌম কোন রাজা নন। ইহা হইল **সমষ্টিগত ইচ্ছা**। এই সমষ্টিগত ইচ্ছা হইল প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। **সমষ্টিগত ইচ্ছা হইল প্রত্যেকের সর্বাধিক সাধারণ প্রকৃত শুভ ইচ্ছার সমন্বয়।** সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে রুশো হবস্‌কে সমর্থন করিলেন। আবার সমগ্র নাগরিকের সমষ্টিগত ইচ্ছাতে সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করিয়া লকের জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতিকে সমর্থন করিলেন।

(২৬) সার্বভৌম কে?

রুশোর চুক্তিবাদের দুইটি দিক আছে; যথা, (১) সামাজিক সচেতনতা, (২) ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ। রুশো সার্বভৌমত্বের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার সমন্বয় সাধন করিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই মানুষ অধীনতা পাশে আবদ্ধ ("Man is born free, but everywhere he is in chains.")। রুশো বলেন, "প্রত্যেকেই তাহাদের ব্যক্তিগত সত্তা ও সমস্ত ক্ষমতাকে সমষ্টিগত ইচ্ছার নির্দেশে সমর্পণ করিয়াছিল: কিন্তু তাহাদের যৌথ ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা তাহারা প্রত্যেকেই সমগ্র সমাজের সভ্য হিসাবে ফিরিয়া পাইল।"* "রুশো আরও বলেন, "আমাদের জন্য প্রণীত আইনকে মান্য করার অর্থ স্বাধীনতা।"** প্রত্যেক ব্যক্তি সমষ্টিগত ইচ্ছায় সব অধিকার সমর্পণ করিবে কিন্তু প্রত্যেকেই আবার যৌথ ব্যক্তিত্বের অংশীদার হিসাবে তাহাদের সমর্পিত অধিকারকে ফিরিয়া পাইবে। মানুষ চুক্তির পূর্বে ও পরে স্বাধীন ছিল। এইভাবে রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিশ্লেষণে হবসের যুক্তি (premises) এবং লকের সিদ্ধান্তকে (conclusion) যুক্ত করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থিত করিয়াছেন।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন: সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক চুক্তি মতবাদ এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। হবস্, লক ও রুশোর মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন স্পিনোজা, মতেঁস্কু্য, টমাস্, পেইন। রুশোর মতবাদ ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াই এই মতবাদ তীব্র সমালোচনার আক্রমণে পরাস্ত হয়। দার্শনিক হিউম, বেন্থাম্, বার্ক, অষ্টিন, লিবার, উলসি, মেইন, গ্রীণ, ব্লুন্টস্‌লি এবং পোলকের

---

*"Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the 'general will' and in our corporate capacity we receive each member as an individual part of the whole."—Rousseau

**"Obedience to a law which we prescribe to ourselves is liberty."—Rousseau

ধারালো যুক্তির আঘাতে সামাজিক চুক্তিবাদ পর্যুদস্ত হয়। এই সকল দার্শনিকের বক্তব্য নিচে দেওয়া গেল ঃ

(১) সামাজিক চুক্তিবাদ প্রকাশিত হইবার আগেই হিউম বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ চুক্তির প্রমাণ ইতিহাস হাজির করিতে পারে নাই। এমন কি হবস্‌ও বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ চুক্তির কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ইহা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে কেহ কেহ বলেন ১৬২০ সালে ইংল্যান্ড হইতে যে মে ফ্লাওয়ার জাহাজ যোগে একদল অভিযাত্রী উত্তর আমেরিকায় ঔপনিবেশ পত্তন করিতে যায়, তাহাদের চুক্তিকে এই মতবাদের নজির হিসাবে দাঁড় করানো হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নয়। কারণ, যাহারা স্বাধীন দেশ হইতে অপর দেশে গিয়াছিল তাহারা কেহই প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করিত না। আর ১৬২০ সালে নিশ্চয়ই ইংল্যান্ডে হবস্‌-বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল না।

(২) এইরূপ চুক্তি অসম্ভব। আদিমযুগে মানুষেরা ছিল অজ্ঞ। তাহাদের মনে চুক্তির ধারণা আসাটাই অস্বাভাবিক। চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করার পক্ষে ইতিহাসও কোন সাক্ষ্য দেয় না। আদিম যুগের মানুষেরা চুক্তি কাহাকে বলে তাহাই জানিত না। বাণিজ্য জগতেই চুক্তির ধারণা বিকাশলাভ করে। আদিম যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বড়ো একটা হইত না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারণাও জন্মায় নাই। আদিম মানুষেরা ছিল সদা স্বাধীন। তাহারা পাকাপোক্ত চুক্তির বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে যাইবেই বা কেন? তাহারা যদি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইত তবে রাজনৈতিক চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিত। কিন্তু তাহাদের কোন রাজনৈতিক চেতনাই ছিল না। আবার তাহাদের সম্মুখে এমন কোন চুক্তির নজিরও ছিল না যাহা দেখিয়া তাহারা চুক্তি করিতে পারে। সুতরাং সবটাই কল্পনা মাত্র।

(৩) বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ ছিল পূর্ণ স্বাধীন। তাই স্বাধীনতা সম্বন্ধে চুক্তিবাদীরা একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। তার কারণ রাষ্ট্রনৈতিক আইন ছাড়া স্বাধীনতার অর্থ-স্বেচ্ছাচারিতা। প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাভাবিক আইন ছিল তাহা ছিল নৈতিক আইন। রাষ্ট্রিক কোন আইন ছিল না। আবার নৈতিক আইনকে মান্য করানোর জন্য কোন রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। সুতরাং প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাধীনতা ছিল তাহা স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া কিছু নয়।

(৪) সামাজিক চুক্তিবাদীরা বলেন, মানুষেরা ব্যক্তি হিসাবে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল কিন্তু ইতিহাস বলে যে, প্রাথমিক মানুষের জীবন ছিল যৌথজীবন। যৌথজীবনে যূথের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই মানুষের স্থান নির্দিষ্ট থাকিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের চেতনা আসিয়াছে অনেক পরে। ফলে ব্যক্তিরা সচেতন ভাবে স্বকীয় ইচ্ছার ভিত্তিতে চুক্তি করিতেছে। এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে সমাজ জীবনের অনেকখানি অগ্রগতির পর।

(৫) প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাভাবিক অধিকারের কল্পনা করা হইয়াছে তাহা নৈতিক অধিকার ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যেখানে অধিকার স্থির করার মতো

সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আইন নাই এবং সে আইনকে কার্যকর করার মতো কোন কর্তৃত্ব নাই সেখানে অধিকার থাকিবে কি করিয়া। আবার **আইনই স্বাধীনতার সর্ত** (**"Law is the condition of Liberty".**)। আইন না থাকিলে স্বাধীনতাই বা থাকে কি করিয়া ? কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় রাজনৈতিক আইন কি ছিল ? আবার অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই অধিকার ও কর্তব্য জন্মায় তখনই যখন মানুষ সমাজে বাস করে, তার আগে নয়। গ্রীণ বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হইয়া না উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, আবার এই সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা সমাজ আরম্ভ হইবার পরেই হয়, তার আগে নয়। অতএব এই চুক্তিবাদ সমাজ সৃষ্টির পূর্বে যে স্বাভাবিক অধিকারের কল্পনা করিয়াছে তাহা মিথ্যা।

(৬) চুক্তি মানুষ স্বেচ্ছায় করে আবার স্বেচ্ছায় সে চুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসে। কিন্তু রাষ্ট্রের সহিত যে চুক্তি হয় তাহা হইতে কি কেহ বাহির হইয়া আসিতে পারে ? রাষ্ট্র তো একটা যৌথ মালিকানার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মাত্র নহে। রাষ্ট্রের বশ্যতা সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে মান্য করিতে হয়। বিপ্লব করিয়া সরকার বদলানো যায় কিন্তু রাষ্ট্র ঠিকই থাকে। বেন্হাম প্রশ্ন তোলেন পূর্বপুরুষেরা যে চুক্তি করিয়াছিল তাহা শুধু তাহারাই মান্য করিতে বাধ্য। বর্তমানের মানুষ তাহা মানিবে কেন ? বর্তমানের মানুষেরা রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে মান্য করে কারণ, অন্যথায় তাহাদেরই অনিষ্ট। বার্কারের কাছে সামাজিক চুক্তিবাদ একটি অরাজকতার সংক্ষিপ্ত-সার (digest of anarchy)। গার্ণার বলেন, "ইহা মানুষের কল্পনা প্রসূত একটি নিছক মতবাদ।" এই মতবাদ রাষ্ট্রকে মানুষের খেয়ালের ফলে সৃষ্ট এইরূপ কল্পনা করে বলিয়া ইহাকে "যতটা কল্পনা করা যায় ততটাই বিপজ্জনক।"

ঐতিহাসিক মূল্য ঃ সামাজিক চুক্তিবাদের বিরুদ্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, ইহা অন্ততঃ দুইটি বিষয় মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে। ইহার একটি হইল স্বাধীনতার আদর্শ আর অন্যটি হইল ন্যায়ের আদর্শ।

এই মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে গূঢ় ধর্মতত্ত্বের জটিল জটাজাল হইতে মুক্ত করিয়াছে নূতন ধারায় ইহাকে প্রবাহিত করিয়াছে। চুক্তিবাদের যুক্তির আঘাতে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদও শিথিল হইয়া পড়িল। এই মতবাদ সজোরে ঘোষণা করিল রাষ্ট্র মূলতঃ মনুষ্য প্রয়াস উদ্ভূত মানবিক সংগঠন। এই মতবাদের আঘাতে অবাধ রাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। গণতন্ত্র আসিয়া তাহার স্থান দখল করিল। এমন কি হবস্‌ও রাজতন্ত্রকে বাঁচাইতে গিয়া তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি বলিলেন প্রজার ইচ্ছায়ই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। প্রজার নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই চুক্তি। লক্ ও রুশো বলিলেন, "শাসিতের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি"। চুক্তিবাদীরা অবাধ রাজতন্ত্রের পাষাণ প্রাচীরে ফাটল ধরাইয়া দিলেন।

এই মতবাদ রাষ্ট্র ও সরকারকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করে। সার্বভৌমিকতার মতো বড় অধ্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত এই সামাজিক চুক্তি মতবাদ হইতেই হয়।

হবস্ বলেন আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার কথা লক্ বলেন রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার কথা আর রুশো বলেন জনগণের সার্বভৌমিকতার কথা।

স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, জনগণের সার্বভৌমিকতা, মানুষের অধিকার এবং স্বশাসনের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক ধারণার বিবর্তনে এই মতবাদের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে।

উপসংহারে বলা যায়, রাষ্ট্রের ভিত্তি বাহুবলে নয় বা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, ইহা যে শাসিতের ইচ্ছায়ই সৃষ্টি হইয়াছে এই কথাই চুক্তিবাদেব প্রধান বক্তব্য।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ

(Historical or Evolutionary Theory)

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে কয়টা মতবাদ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তার একটিও রাষ্ট্রের উদ্ভবের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়, কোন মতবাদই এককভাবে যথেষ্ট নয়। তাই সবকয়টি মতবাদকে মিলাইয়া যদি একটি মতবাদ দাঁড় করানো যায় অর্থাৎ সব কয়টি মতবাদেব সত্যটুকু লইয়া বা মিথ্যাটুকু বাদ দিয়া যদি কোন মতবাদ সৃষ্ট করা যায় তবে সেই মতবাদই রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্ণার এইরূপ ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই বলিয়াছিলেন: "রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করে নাই, পাশবিক শক্তির ফলও ইহা নহে, প্রস্তাব বা চুক্তি করিবাও কোন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নাই, আবার শুধু পরিবারের সম্প্রসারণ হিসাবেও ইহাকে ধরা যায় না।"* তবে একটা প্রশ্ন থাকিয়া যায়, তাহা হইল রাষ্ট্র কেমন করিয়া জন্মাইল? এ প্রশ্নের জবাব দেয় ঐতিহাসিক মতবাদ। দীর্ঘকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনা ও অনুশীলনের ভিতর হইতে মাত্র একটি সত্যই আসিয়া হাজির হইয়াছে তাহা হইল রাষ্ট্রের জন্মের কোন সরল সূত্র নাই। অনেক উপাদানের জটিল সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া সমাজ রথের অনেক চাকা ঘুরিবার পর আদিম সমাজের একটি অংশ বর্তমান রাষ্ট্র রূপে আসিয়া হাজির হইয়াছে। রাষ্ট্র মানব সমাজের ক্রমপ্রগতির ফল। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানব সমাজজীবন আদিম অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে বহু স্তর পার হইয়া বর্তমান রাষ্ট্ররূপ গ্রহণ করিয়াছে। বার্জেস বলেন, "রাষ্ট্র হইতেছে মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ, ইহার উদ্ভব হইয়াছে মোটা দাগের একটি আকার লইয়া। ইহার বৃদ্ধি হইয়াছে

(২৭) ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদ

* "The State is neither the hand work of God, nor the result of Superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family."—Garner

ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া মানবের ত্রুটিহীন বিশ্বজনীন সংগঠনের পথে কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ ।*

একটি কথা এখানে সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, রাষ্ট্র মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল। অত্যন্ত সত্য কথা হইল অসম্পূর্ণও ত্রুটিবহুল সামাজিক সংগঠনের রূপে একদিন রাষ্ট্র ছিল কিন্তু জীবনযাত্রার সামগ্রিক প্রসারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ইহা আসিয়া বর্তমান রূপে দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্র একদিনে এরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় নাই, হাজার হাজার বৎসরেব সমাজ বিবর্তনের ফলে ইহা নয়া রূপে দেখা দিয়াছে।

(২৮) বিভিন্ন কারণ

রাষ্ট্রের সূত্রপাত কেমন করিয়া হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত। তবে নৃতত্ত্ব, ভাষা-তত্ত্ব প্রভৃতি হইতে যাহা জানা যায় তাহাতে দেখা যায় জীবনধারার বিবর্তনে ক্ষুদ্রকায় মানুষ পৃথিবীর বুকে একদিন সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিয়াছিল। মানুষ নিজেকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। মানুষকে বাঁচিতে হইবে তাই তাহাকে খাবার যোগাড় করিতে হইবে, বিরূপ প্রকৃতি ও আততায়ী পশু হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। জৈবিক প্রেরণায় বংশবৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে মনুষ্যজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ না পায়। জৈব প্রেরণার বশে মানুষ যূথবদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। প্রকৃতির রুদ্র শক্তিকে নিজ বশে আনিয়াছে। মানুষ একাজ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই সে আজ বিশ্ববিজয়ী, সে আজ আরও কিছু বেশী, সে আজ পৃথিবী পাড়ি দিয়া চাঁদে যাইয়া হাজির হইয়াছে। অতি মহাবলশালী জীবও যাহা পারে নাই, মানুষ আজ তাহা পারিয়াছে বলিয়াই মানুষ টিকিয়া আছে। আর মহাবলশালী সব জীব বিদায় লইয়াছে। মানুষের এই বিজয় রথকে আগাইয়া দিয়াছে তার বাঁচার তাগিদ, বুদ্ধি ও চেষ্টা। যৌথ জীবনের আশীর্বাদের মাধ্যমেই মানুষ তার সমাজ জীবনকে ক্রমাগত পরিবর্তন করিয়াছে। তাহার গতিপথকে সুগম করিয়াছে, মসৃণ করিয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে যদি এই ধারণা হয় যে, মানুষ সচেতনভাবে পরি-কল্পনা মতো সব কিছু করিয়াছে তবে কিন্তু মহা ভুল হইবে। কারণ, তাহা হইলে ত সামাজিক চুক্তিবাদে ফিরিয়া যাইতে হয়। মোট কথা হইল নানা উপাদানের সংমিশ্রণে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাদ্বারা মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে এবং সমাজ বিবর্তনের একটা স্তরে আসিয়া প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের সমাজ জীবন রাষ্ট্ররূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সমাজ জীবনের রূপান্তরে যে সকল উপাদানের অংশ রহিয়াছে তাহারা হইল :

* "The State is a continuous development of human society, out of a grossly imperfect beginning though crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organisation of mankind."—Burgess

(১) রক্তের সম্বন্ধ বোধ (Kinship) : (ক) মানুষ যূথবদ্ধ জীব। মানুষের এই যূথবদ্ধ জীবনযাপনের প্রকৃতির মধ্যেই রাষ্ট্রগঠনের বীজ উপ্ত আছে। রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান হইল পারিবারিক সংগঠন। প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পুরুষ ও নারী মিলিত হয়। এই পুরুষ ও নারীর মিলন হইতেই সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করে। অতএব সন্তান উৎপাদন মানুষের আদি ও মৌলপ্রেরণার ফল। এই সন্তানকে বাঁচাইয়া বড় করিবার প্রয়োজনে সমগ্র যূথকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য এই দায়িত্বভার প্রধানতঃ পড়ে নারীর উপরে। অতএব সমাজে নিয়ম শৃংখলা প্রয়োজন হয়। আবার বংশবৃদ্ধির সাথে সাথে সন্তান প্রতিপালনের তাগিদে একটা নৈকট্যবোধ জাগ্রত হয়। অতএব দেখা যায়, আদিম সমাজে রক্ত-সম্পর্কের বন্ধন মানুষকে পরিবার গঠন করিয়া একত্রে বাস করিতে এবং নিয়মশৃংখলা রক্ষা করিয়া সন্তান সন্ততির প্রতিপালন করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। আবার এই পরিবার ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইয়া উপজাতি বা জাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

(খ) আবার পরিবারের সংখ্যা যখন বাড়িয়া গেল তখন গৃহকর্তার পক্ষে সকল পরিবারের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইল না। এই বিভক্ত পরিবার বা উপজাতির মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক রহিল রক্তের। এই সকল পরিবারের সভ্যদের মধ্যে একই পূর্ব পুরুষদের মাধ্যমে ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। গেটেলের ভাষায় এব্রাহামের সন্তান সন্ততিদের ভগবানের নির্ধারিত ব্যক্তি হিসাবে মনে করা হইত, আর সকলে ছিল জেন্টাইল।* এই পূর্বপুরুষরাই ছিল সংহতির প্রতীক।

(গ) এই ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন পরিবারকে সামগ্রিকভাবে বলা হইত গোষ্ঠী (Clan)। সমগ্র গোষ্ঠীর পরিচালনা করিতেন গোষ্ঠীপ্রধান। ম্যাকাইভার বলেন, "উত্তর পুরুষের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ ধীরে ধীরে ব্যাপকতর সামাজিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে রূপান্তরিত হইল। গৃহকর্তার কর্তৃত্ব গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হইল। তারপর রাজতন্ত্রের অধীনে সমাজের উদ্ভব হইল। এই রাজতন্ত্র সৃষ্টি করিল সমাজ। সমাজ সৃষ্টি করিল রাষ্ট্র।

(২) ধর্মের বন্ধন (Religion) : (ক) রক্তের বন্ধনের পরেই আসে ধর্মের বন্ধনের কথা। রাষ্ট্রপতি উইলসন বলেন, "ধর্ম ছিল রক্তের বন্ধনের চিহ্ন ও প্রতীক। ইহা ঐক্যের পবিত্রতার ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।"** আদিম মানুষের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে এবং মানুষ বহু পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়িলে তাহাদের মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপন করে ধর্ম। ধর্ম ও রক্তের সম্বন্ধ উভয়ই গোষ্ঠীজীবন গঠিত করিতে সহায়তা করে। প্রাচীনকালে এই গোষ্ঠীজীবনকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য যে ধর্ম সহায়তা করে তাহা রাষ্ট্র গঠনেও সাহায্য করে। কারণ ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী-জীবনই রাষ্ট্রগঠনের গোড়াপত্তন।

---

*"The children of Abraham considered themselves God's chosen people—all others were gentiles."—Gettel

**"Religion was the seal and sign of common blood the expression of its oneness, its sanctity, its obligation."—Wilson

(খ) গোষ্ঠীজীবনে দেখা যায় গোষ্ঠীপ্রধান গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের পূজা অর্চনা করিত। আবার প্রতিকূল পরিবেশে ঘেরা আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির ভয়ে ভীত হইয়া প্রাকৃতিক শক্তি যথা ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতিকে পূজা করিত, আদিম মানুষ এই দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যাখ্যা করিতে পারিত না—সেই যুগে সমাজের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত চতুর ব্যক্তি এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত কবিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়া সমাজের অপরাপর লোকের উপর তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিত। সমাজতত্ত্বের ভাষায় ইহাদিগকে যাদুকর (Magician) বলা হয়। পরবর্তীকালে যখন জাতীয় সংগঠনগুলির সৃষ্টি হইল তখন ইহারা অনেকে পোপ ও খলিফা প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া সমাজের ধর্মগুরুর পদমর্যাদা লাভ করে। প্রাচীনকালে গোষ্ঠীপতির আধিপত্য ছিল প্রচণ্ড। তখনকার লোকেরা বিশ্বাস করিত যে পূর্বপুরুষদের আত্মার সহিত প্রাচীন ব্যক্তিদের আত্মার যোগাযোগ আছে। অতএব শ্রদ্ধাভরে আদিম মানুষ গোষ্ঠীপতির নির্দেশে সকলে পরিচালিত হইত এবং সকলেই তাহার প্রতি বশ্যতা দেখাইত। বর্তমান যুগেও ইংল্যাণ্ডের রাজা ধর্মমহামণ্ডলের অধিকর্তা হিসাবে পরিচিত।

(গ) রাষ্ট্রের বিবর্তনে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করা চলে না। গেটেল বলেন, "রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের প্রাথমিক ও সর্বাপেক্ষা সংকটময় অবস্থায় একমাত্র ধর্মই পাশবিক অরাজকতাকে দমন করিয়া মানুষকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের নীতি শিক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিল।* প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক স্তরে এবং পরবর্তী উন্নততর স্তরেও ধর্ম একই বিশ্বাসের বাঁধনে একই উপাসনার পদ্ধতিতে একই নির্দেশের বন্ধনে বশ্যতা ও নৈকট্যের বন্ধনে সমাজ জীবনকে অধিকতর ঘন সংঘবদ্ধ করিয়াছে। আজ হয়তো সেই ইন্দ্রজালিকের প্রভাব কমিয়াছে কিন্তু উহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

(৩) **আত্মরক্ষার তাগিদ, শক্তির সংগঠন ও ব্যবহার (Need of Self-protection, place of force and its use) ঃ** রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাপারে সমাজ বিবর্তনের গোড়া হইতেই বলপ্রয়োগের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বলপ্রয়োগের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় আদিম যুগে যখন মানুষকে বলপ্রয়োগের সাহায্যে শিকার করিয়া আহার্য সংগ্রহ করিতে হইত। আত্মরক্ষার জন্য আততায়ী পশু ও মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্যও বলপ্রয়োগ করিতে হইত। আবার গোষ্ঠী প্রধানকে মান্য করানোর জন্য মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগেরও প্রয়োজন হইত। সামাজিক নির্দেশ যাহারা মান্য করিতে চাহিত না, তাহাদিগকে মান্য করাইবার জন্য এবং সামাজিক নির্দেশ বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজন হইত বলপ্রয়োগের।

(৪) **অর্থনৈতিক প্রয়োজন (Economic Need) ঃ** (ক) মানুষ বাঁচিতে

---

*" In the earliest and most difficult periods of Political development, religion alone could subordinate barbaric anarchy and teach reverence and obedience."
Gettel

চায়। এই বাঁচিবার জন্য প্রয়োজন আহার্য। আদিম মানুষ আহার্য সংগ্রহ একাকী করিতে পারিত না বলিয়া তাহাকে যূথবদ্ধ হইতে হইত। আবার এই যৌথ জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইত একদল নায়কের। শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এই নায়কের প্রতি বশ্যতা ও তাহার নির্দেশ পালন করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই আহার্য সংগ্রহ করার সামাজিক ব্যবস্থাই হইল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়ার কথা। অতএব দেখা যায় মানুষ প্রথমে যূথবদ্ধ হয় এই অর্থনৈতিক কারণে। তারপর এই যূথবদ্ধ মানুষ অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য রাষ্ট্ররূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

(ঘ) সমাজ বিবর্তনের প্রথমস্তরে মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষ যখন ধনসম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয় করিতে শিখিল তখন এক নূতন অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধনসম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রবিবর্তনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। প্রথমে শিকারের যুগে মানুষেরা যাহা শিকার করিয়া পাইত তাহা সকলে সমানভাবে ভাগ করিযা ভোগ করিত। তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই। তারপর পশুপালন ও পশুচারণ যুগে ধনবৈষম্য দেখা দিল। পশুর মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় পশুব মালিকগণ বিত্তবান্ হইয়া সমাজের অধিকাবী শ্রেণীতে পরিণত হইল। সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গেল। যাহাদের সম্পদ বলিয়া কিছু ছিল না তাহাবা হইল নিঃস্বশ্রেণী আর যাহারা পশুর মালিক তাহারা হইল অধিকারী শ্রেণী। এইভাবে সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হইয়া পড়ায় উত্তরাধিকার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন অপরিহার্য হইয়া পড়িল। আবার সমাজে এই সময়ে দেখা দিল চৌর্যবৃত্তি। ইহার পর কৃষি যুগে ভূমি ও ক্রীতদাসকে ইহাদের মালিকের সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করা হইত। ইহার পর উত্তরোত্তর স্তরে ধনবৈষম্য প্রকট হওয়ায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠিল। এই দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িল আরও আইন, আদালত, আমলা প্রভৃতি যাহার দ্বারা সমাজে শান্তি রক্ষা করা হইত। কৃষিযুগের পর পণ্য বিনিময় প্রথা চালু হইলে বাণিজ্যের প্রসার হইল। ফলে সমাজে বণিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই বণিকশ্রেণীর স্বার্থের জন্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হইল বলপ্রয়োগের। বলপ্রয়োগের দ্বারা একদিকে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং অপর দিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন হইল সৈন্যসামন্ত ও নেতার নির্দেশ। এইরূপে সামরিক প্রয়োজনে মানুষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইল।

(২৯) ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব

(গ) সমাজে ধনসম্পত্তির বৃদ্ধির ফলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে, ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগের ফলে বিভিন্নশ্রেণীর উদ্ভব হয়। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে শ্রেণীসংঘর্ষকে সংযত রাখার জন্য আইন প্রণয়ন ও শাসনযন্ত্রের একান্ত

প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সমাজে অধিকারী শ্রেণী এই শাসনযন্ত্রকে নিজেদের করতলগত করিয়া শাসনযন্ত্রকে তাহাদের নিজেদের ব্যবহারে লাগাইতে শুরু করিল। রাষ্ট্রের সরকার হইল এই শাসন যন্ত্র।

বলা হয় যে, আদিম যুগে যখন মানুষ শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত তখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই, কারণ সমাজ তখন শ্রেণী বিভক্ত হয় নাই। এবং এক শ্রেণী কর্তৃক অপরশ্রেণীকে শোষণ করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং শিকারের যুগে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তখনই যখন সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একশ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণ করিবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন হয়। অতএব অর্থনৈতিক শক্তি যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

(৫) **যুদ্ধবিগ্রহ (War)** : (ক) সমাজ বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ যে স্তরে মানুষের গোষ্ঠীজীবন শুরু হইয়াছে, সেই স্তরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। কারণ গোষ্ঠীর কোন সামরিক সংগঠন ছিল না। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সমাজ বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে, যখন উপজাতি (Tribe) বলিয়া এক সংগঠনের সৃষ্টি হইল। এই উপজাতীয় সংগঠন হইল একটি সামরিক সংগঠন। গোষ্ঠীর সহিত উপজাতির পার্থক্য হইল, গোষ্ঠী অসামরিক আর উপজাতি হইল সামরিক। উপজাতির উদ্ভব হয় তখনই যখন পরিবার বা গোষ্ঠী এত বেশী সম্প্রসারিত হইল যে, একের সহিত অপরের ব্যক্তি সম্বন্ধ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং আঞ্চলিক ও পারিবারিক সম্পর্কের স্থান অধিকার করিল ব্যাপকতর ধর্মের রূপ।

(খ) আবার সমাজে আক্রমণ ও প্রতিরোধ করিবার জন্য আবির্ভূত হইল বল-প্রয়োগকারী শক্তি। এই শক্তিই পরবর্তীকালে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে গৃহীত হইল। সমাজের মানুষ এই শক্তির প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করিত। উপজাতির মধ্যে সার্বভৌম শক্তির অধিনায়ক হইলেন যুদ্ধনায়ক। যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধের নায়কত্ব করিতেন। তাই বলা হয় যুদ্ধের ফলেই রাজার জন্ম হয় (War begot the King)। শুধু যুদ্ধের সময়েই যুদ্ধনায়কের নেতৃত্ব বজায় থাকে না, তিনি শান্তির সময়েও অনেক সময় নেতৃত্ব দিয়া থাকেন।

(গ) রাষ্ট্রের উদ্ভবের গোড়ার দিকে সমাজের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ছিল অল্প। ইহার নেতার সংখ্যাও ছিল কম। পরে যখন রাষ্ট্রের কাজ বাড়িয়া গেল তখন তাহার কাজও জটিল হইয়া পড়িল। সরকারের গঠনেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেল। এই অবস্থায় একদিন যে, রাষ্ট্র যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পরবর্তীকালে আর বুঝা গেল না।

(৬) **রাজনৈতিক প্রয়োজন (Political Need)** : (ক) রাষ্ট্রের বিবর্তনে প্রথমে রক্তের সম্বন্ধ ও ধর্মের বন্ধন, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, পরিবার ও গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অন্ধ আনুগত্যের যুগকে রাষ্ট্রনৈতিক অবচেতনার যুগ বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে

সমাজ জীবন জটিলতর হইয়া উঠিতে থাকে। তারপর উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কিছুলোক ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া উহা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিল। আবার এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইল জটিল আইন ও শাসন ব্যবস্থা। এই সময়েই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

(খ) রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাসে শাসিতের ইচ্ছা (**Consent of the Governed**) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। গোষ্ঠী যখন উপজাতিতে পরিণত হইল তখন বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে মানুষ উপজাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইল। জনসমাজ তাহাদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। এই রাজনৈতিক চেতনা সাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

(গ) ইহা ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনার স্রোতে রাষ্ট্রের রূপ বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। গ্রীক নগর রাষ্ট্র, রোমান সাম্রাজ্য, প্রাচ্যের প্রাচীন সাম্রাজ্য, মধ্যযুগের ফিউডাল রাষ্ট্র এবং ফিউডাল প্রথার অবসানে রাজতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্র—এইরূপ ইতিহাসের বিবর্তনের গতিপথে বহু জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। জনসমাজে জাতীয়তাবোধ (Principle of nationality) যতই শক্তিশালী হইল ততই জাতির দাবি স্বীকৃত হইয়া "এক জাতি এক রাষ্ট্র" ("one Nation one State.") এই আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল।

(ঘ) আবার বর্তমান যুগ হইল আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগ। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে নিত্য নূতন উন্নতির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল নয় বলিয়া এক জাতীয় রাষ্ট্রকে অপর জাতীয় রাষ্ট্রের উপর নানাবিষয়ে নির্ভরশীল হইতে হয়। এই কারণে জাতিতে জাতিতে আত্মঘাতী যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতায় পুষ্ট জাতীয় রাষ্ট্রগুলি তাহাদের উগ্র জাতীয়তাবোধকে প্রশমিত করিয়াছে। এক শতাব্দী পূর্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বর্তমানে পারস্পরিক প্রয়োজনের তাগিদে অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর রাষ্ট্র গোষ্ঠীর এক অংশে পরিণত হইল এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের ভয়ঙ্করী বিষময় ক্রিয়ায় সভ্যতার বিলুপ্তির উপক্রম দেখিয়া পারস্পরিক সম্পর্কে শৃংখলা আনয়নের জন্য এক বিশ্বজনীন সংস্থা গড়িয়া তোলার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন : (১) আলোচ্য মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে জন্মলাভ করে। কিন্তু পরিবারের মতো সহজ সরল সংগঠনের মধ্য দিয়া যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে তাহা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা উন্মেষের সাথে সাথে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে নানাবিধ বিকাশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। অতএব রাষ্ট্রের উৎপত্তির পশ্চাতে বহু উপাদান ও বহু প্রভাব আছে। রাষ্ট্র একদিনে একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। এই দিক হইতে বিবর্তনবাদী যুক্তি অভ্রান্ত।

(২) বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তিত হইয়াছে। দাস প্রথার আমলে

রাষ্ট্রের যে চরিত্র ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে রাষ্ট্রের সে চরিত্র আর নাই।

উপসংহারে বলা যায়, কোন সুদূর অতীতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইতিহাসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় সমাজের ক্রমপরিবর্তনের কোন এক স্তরে রাষ্ট্রের মতো প্রতিষ্ঠানের জন্ম হইয়াছে। বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের চরিত্র যেমন বিভিন্ন রূপ লইয়াছে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণাও বিভিন্ন যুগে পাল্টাইয়াছে। দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র যে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের জন্ম : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে একা তার সকল চাহিদা মিটাইতে পারে না। পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মানুষ সমাজে বাস করে। আর সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য : সমাজ জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করিয়া তোলাই ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা অনেক। ডঃ গার্ণারের সংজ্ঞা হইল সর্বাধুনিক সংজ্ঞা। রাষ্ট্র নিম্নলিখিত ছয়টি উপাদানে গঠিত : (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, (৪) সার্বভৌমিকতা (৫) স্থায়িত্ব এবং (৬) স্বীকৃতি।

সরকার ও রাষ্ট্র : সরকার ও রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নহে। সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র।

রাষ্ট্র ও সমাজ এক ও অভিন্ন নহে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নহে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ প্রধানতঃ চারটি ; যথা (১) ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, (২) বলপ্রয়োগ মতবাদ, (৩) সামাজিক চুক্তি মতবাদ, (৪) ঐতিহাসিক মতবাদ।

(১) ঐতিহাসিক উৎপত্তিবাদ : ইহা প্রাচীনতম মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় রাজার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়ী, প্রজাদিগের উপর তাহার কোন দায়িত্ব নাই।

ইহা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকেই শুধু সমর্থন করে। ইহা অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারিতার সমর্থনকারী।

(২) বলপ্রয়োগ মতবাদ : এই মতবাদ অনুসারে বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তি আসুরিক বল নয়, ইহার ভিত্তি হইল ইচ্ছা ও শক্তি।

(৩) সামাজিক চুক্তি মতবাদ : এই মতবাদ বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হয় হবস, লক্‌ ও রুশোর হাতে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করিত। হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল দুর্বিষহ। এই দুর্বিষহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হাতে আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া আর সমস্ত অধিকার সমর্পণ করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছল শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। কিন্তু এই অবস্থা ছিল অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছল। রুশো প্রাকৃতিক অবস্থাকে মর্তের স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও চিন্তার উন্মেষের ফলে প্রাকৃতিক অবস্থায় যে সুখ-শান্তি ছিল তাহা লুপ্ত হইল। তাই মানুষ পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পত্তন করিল হৃত

সুখ ও শান্তিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য। হবস্ চাহিয়াছিলেন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে, লক্ চাহিয়াছিলেন সীমিত রাজতন্ত্র আর রুশো চাহিয়াছিলেন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিতে।

অনেকে এই মতবাদকে অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক বলিয়াছেন।

(৪) ঐতিহাসিক মতবাদ : এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ বহুদিন ধরিয়া বহিয়া বিবর্তিত হইয়া বর্তমান জটিল রাষ্ট্ররূপ ধারণ করিয়াছে। এই বিবর্তনে যে সকল উপাদান অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা হইল : (১) রক্তের সম্বন্ধ (২) ধর্মের বন্ধন (৩) যুদ্ধবিগ্রহ, (৪) ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং (৫) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা।

প্রশ্নাবলী

১। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ঐশ্বরিক মতবাদটি আলোচনা কর।

(Crit cally discuss the Theory of Divine Origin of the State)

২। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ মতবাদটি সম্যকভাবে আলোচনা কর।

(Critically discu s the Theory of Force regarding the origin of the State.)

৩। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

(Critically discuss the Theory of Social Contract as an explanation of the origin of the State)

৪। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদটি আলোচনা কর।

(Discussthe Historical theory of the origin of the State.)

৫। "শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি" এই বিবৃতির উপর আলোচনা কর।

(Comment on the statement "Will, not force, is the basis of the State.)

৬। রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতিতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বাস্তব গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the pracitical importance of Social Contract Theory in actual Political development)

অতিরিক্ত পাঠ্য

MacIver—The Modern State.

C. D. Burns—Political Ideals.

Sabine—History of Political Theory.

Gettel—Readings in Political Science

৩ | সার্বভৌমিকতা ও ইহার বৈশিষ্ট্য

(Sovereignty and its characteristics)

(Sovereignty and characteristics)

[সার্বভৌমত্ব ও ইহার বৈশিষ্ট্য]

সার্বভৌমিকতার অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Sovereignty) : ল্যাটিন Superanus শব্দ হইতে আসিয়াছে ইংরাজী Sovereignty শব্দটি। Superanus শব্দের অর্থ চরম, চূড়ান্ত ক্ষমতা। ইংরাজী Sovereignty শব্দের বাংলা তর্জমা হইল সার্বভৌমিকতা। ইহার অর্থও চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সার্বভৌমিকতা হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক করিয়াছে। সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের একটি বিশেষ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এবং রাষ্ট্র প্রণীত আইনকে বলবৎ করে। বহু প্রকারের মানুষ লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই সকল মানুষের ইচ্ছা ও স্বার্থের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত লাগিয়াই আছে। অতএব সমাজের স্থায়িত্ব। দৃঢ়তা ও দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য একটি সর্বস্বীকৃত শক্তি বা ক্ষমতা থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। রাষ্ট্র হইল এই শক্তির আধার। রাষ্ট্রের এই শক্তি বা ক্ষমতাকেই বলা হয় সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এবং এই আইনের সাহায্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে। রাষ্ট্রের এই আইন বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রের এই আইনকে অমান্য করিলে রাষ্ট্র শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করে। অতএব সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনগত। রাষ্ট্রও আইন অনুসারে সংগঠিত জনসমাজ। বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "এই আইন অনুসারে সংগঠিত জনসমাজের মধ্যে উদ্ভূত সমগ্র আইনগত দ্বন্দ্বের আইনসঙ্গত মীমাংসার জন্য একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা অবশ্যই থাকিবে।"* রাষ্ট্রেরই একমাত্র এই চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে এবং এই চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই বলা হয় সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্রের এই চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতাকে শক্তির একচেটিয়াত্বও (Monopoly of Power) বলা হয়। এই শক্তি কেন্দ্রীভূত ও অবিভক্ত হয়। রাষ্ট্রে চূড়ান্ত শক্তি যদি বিভক্ত হয় তবে অরাজকতা দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকে, সামাজিক স্থিরতা নষ্ট হয়।

(১) সার্বভৌমিকতার অর্থ

*"There must exist in the State, as a legal association a power of final legal adjustment of all legal issues which arise in its ambit."—Barker.

অবশ্য, শক্তিই সব নয়। শক্তির দ্বারা মানুষের মন জয় করা যায় না। শক্তি প্রয়োগের ভয়ে মানুষ যে রাষ্ট্রের নির্দেশকে পালন করিবে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। স্বেচ্ছায় মানুষ যাহাতে রাষ্ট্রের আদেশকে মানিয়া লয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই রাষ্ট্রের নির্দেশ দীর্ঘস্থায়ী হইবে। তবে শক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন যে উঠিবে না— তাহা নয়, শক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন উঠিবে কিছু সংখ্যক অবাধ্য লোকের জন্য।

মানুষ রাষ্ট্রের নির্দেশকে স্বেচ্ছায় মানিয়া লয় শুধু তখনই যখন দেখে যে, রাষ্ট্রের নির্দেশ ন্যায়সঙ্গত, বিধিসিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা হইল এমন ক্ষমতা, যে ক্ষমতা লোকে আইনসিদ্ধ, বিধিসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্বেচ্ছায় মান্য করে।

আবার সার্বভৌমের আজ্ঞাকেই আইন বলা হয়। সুতরাং আইন সার্বভৌমিকতার ঊর্ধ্বে নহে। কিন্তু সমাজে এমন সব রীতিনীতি, প্রথামূলক আইন আছে যাহাদের সার্বভৌমকে মানিয়া চলিতে হয়। ফলে এইগুলিকে অনেকে সার্বভৌমের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া থাকেন। মানুষ অনেক সময় রাষ্ট্র প্রণীত আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া থাকে। তাই রাষ্ট্র আইন প্রণেতা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আইনসিদ্ধ অভিভাবক।*

আবার কোন দেশকে রাষ্ট্র পদবাচ্য হইতে হইলে তাহাকে স্বাধীন সার্বভৌম হইতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ পাশ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হইতে হইবে। বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ পাশে আবদ্ধ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে; যথা (ক) আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং (খ) রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অর্থ ঃ রাষ্ট্র ইহার অন্তর্গত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আদেশ দিয়া থাকে কিন্তু কাহারও নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করে না।** রাষ্ট্রের এলাকাধীন মানুষ ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র যে কোন সময়ে তাহার আদেশ মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাহার আদেশ মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। ইহাই হইল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (Internal Sovereignty)।

আবার বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ পাশ হইতে মুক্ত অবস্থার অর্থ রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা (External Sovereignty)। ইহার অর্থ হইল বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার ক্ষমতা ; বৈদেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতার অর্থ এই নয় যে, ইহা দ্বারা এক রাষ্ট্রের

*"At any moment the state is more the official guardian than the maker of the Law."—MacIver

**"The State is internally supreme over the area that it controls. It issues orders to all men and associations within that area ; it receives orders from none of them."

সার্বভৌমিকতা অপর রাষ্ট্রে ব্যবহৃত হইবে। কারণ, এক রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অপর রাষ্ট্রে ব্যবহৃত হইলে যে রাষ্ট্রে উহা ব্যবহৃত হইবে সেই রাষ্ট্রের আর সার্বভৌমিকতা থাকে না। বস্তুতঃ "বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে সেই সকল অধিকারের সমষ্টি যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ব্যবহারে নিজের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা প্রকাশিত করে।"* রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা অপর রাষ্ট্রকে জানানোর অর্থই হইল বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা।

(২) আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা

বাংলায় একটি কথা আছে ঃ "গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল"। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা যদি কেহ না মানে তবে তার কোন অর্থই হয় না। অতএব সার্বভৌমিকতা নির্ভর করে স্বীকৃতির উপর। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। দেশের লোক যদি সার্বভৌমকে না মানে তবে সে সার্বভৌমের কোন মূল্য নাই। আর জনগণ যদি এই ক্ষমতাকে স্বীকার করে তবেই এই ক্ষমতার মূল্য আছে।

সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের বিকাশ ঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণা ষোড়শ শতাব্দীর আগে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই। কারণ, মধ্যযুগ পর্যন্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। অবশ্য, প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইত বটে, কিন্তু ন্যায় নীতি এবং প্রথাগত আইনকে রাষ্ট্রের নির্দেশের উপরে স্থান দেওয়া হইত। মধ্যযুগে ছিল সামন্ত প্রথা। এই যুগে সামন্তগণ শুধু রাজার প্রতি আনুগত্য দেখাইত। আর সাধারণ লোকেরা আনুগত্য দেখাইত সামন্তদের প্রতি। এইভাবে আনুগত্য বিভক্ত হইয়া পড়ায় সার্বভৌম ক্ষমতাও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই যুগেই রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে বিরোধিতা শুরু হয়। মধ্যযুগের শেষের দিকে নূতন রাষ্ট্রশক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে। পোপ ও সম্রাটের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং সামন্ত প্রথা, মুক্ত নগরী ও গিল্ডগুলির বিলোপ লক্ষ্য করা যায়। রাজা রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী হন। এই সময়ে সামন্তবর্গের হাত হইতে ভূমি রাজার হাতে চলিয়া যায় এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্বের ভূমিগত প্রাধান্য আরম্ভ হয় অর্থাৎ ভূমিগত সার্বভৌমিকতার সূত্রপাত হয়। ক্রমে পোপের প্রাধান্য খর্ব হয়; রাজার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। রাজা ও পোপের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয় এবং তাহার মধ্য হইতে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। জাতীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা।

১৫৮৬ সালে **বোঁড্যা** তাঁহার '*De Republica*' গ্রন্থে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ প্রথমে ব্যাখ্যা করেন। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রের জনসাধারণের উপর চরম ক্ষমতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন। এই চরম ক্ষমতার নাম দেওয়া হইল সার্বভৌমিকতা। তিনি বলেন, এই ক্ষমতা কোনরূপ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে

*"What is called external sovereignty is in reality the totality of rights by which internal sovereignty manifests itself in its dealings with foreign states."
—Gettel.

("The supreme power of the State over citizens and subjects unrestrained bylaw.")। রাষ্ট্রের এই চরম ক্ষমতাকে অবিভাজ্য, চিরন্তন ও অপ্রতিহত বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। বোডাঁার এই সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচ আন্তর্জাতিক আইনবিদ গ্রোটিয়াস (Grotious) বলেন, সকল রাষ্ট্রই সমমর্যাদা সম্পন্ন এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে রাষ্ট্রকে মুক্ত করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, "সার্বভৌমিক হইল সেই ব্যক্তি যাহার হস্তে চরম রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, যাহার কার্যকলাপ অপর কাহারও আজ্ঞাধীন নহে ; যাহার ইচ্ছা কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।"* গ্রোটিয়াসের সংজ্ঞায় বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

হবস্ তাঁহার লেভায়াথান গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে এক সামাজিক চুক্তির কল্পনা করেন এবং তিনি রাষ্ট্রের এক চরম ক্ষমতাকে স্বীকার করেন। রাজাকেই তিনি সার্বভৌম হিসাবে প্রচার করেন। ব্লাক্‌স্টোন বলেন ঃ "সার্বভৌমিকতা হইল চরম, অপ্রতিরোধ্য, শর্তহীন, সীমাহীন কর্তৃত্ব ("The supreme, irresistible, absolute and uncontrolled authority.")। ইহার পর রুশোর হাতে সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব আরও বিকাশ লাভ করে। রুশো বলিলেন, সার্বভৌমিকতা অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা রাজার নহে, ইহা জনগণের। রুশোর মতে জনগণের সার্বভৌমিকতা চরম এবং অনিয়ন্ত্রিত। রুশোর এই মতবাদ হইতেই জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের উদ্ভব হয়।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রচার করেন ইংরেজ আইনজ্ঞ দার্শনিক **অস্টিন (John Austin)**। ১৮৩২ সালে তাঁহার Lectures on Jurisprudence নামক গ্রন্থে সার্বভৌমিকতার মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, **"যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কোন বিশেষ সমাজের অভ্যস্ত আনুগত্যলাভ করিতে থাকেন, অথচ সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি সমপর্যায়ভুক্ত অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করেন, তবে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি উক্ত সমাজের সার্বভৌম এবং উক্ত সার্বভৌম-সম্বলিত সমাজ একটি স্বাধীন ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ।"****

*"The supreme political Power vested in him whose acts are not subject to any other and whose will cannot be overridden."—Grotious.

** 'If a determinate human superior, not in a habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society and the society including the determinate superior is a society political and independent."—John Austin

অস্টিনের সংজ্ঞা হইতে সার্বভৌমিকতার যে সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহা হইল :

(১) এই সার্বভৌম হইল সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। ইহা হইল কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ। ইহা জনসাধারণের মতো অনির্দিষ্ট বা সাধারণ ইচ্ছার মতো নৈর্ব্যক্তিক নহে।

(২) ইহা প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা ব্যক্তি-সমষ্টির উপর ন্যস্ত থাকে। ফলে এই সার্বভৌম শক্তির নির্দিষ্ট অধিকারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

(৩) ইহার অধিকারকে অস্টিন উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ কাহারও আনুগত্য স্বীকার করে না এবং ইঁহার বা ইঁহাদের ইচ্ছা কোন কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। অতএব সার্বভৌম ক্ষমতাকে চূড়ান্ত, চরম ও অসীমরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

(৪) ইহা নির্ধারিতরূপে সংগঠিত, যথারূপে নির্দিষ্ট ও আইন দ্বারা স্বীকৃত।

(৫) সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য। ইহা চরম অসীম বলিয়া উহা সর্বপরিব্যাপ্ত। রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও বিষয়ের উপর ইহার অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকারকে বিভক্ত করা যায় না। উহাকে বিভক্ত করিলে উহা আর সর্বপরিব্যাপ্ত থাকিবে না।

(৬) জনগণের স্বভাবই ইহার মানদন্ড। ইহার অর্থ সার্বভৌম শক্তির প্রতি জনসাধারণ স্বভাবতঃই আনুগত্য স্বীকার করিবে। এই আনুগত্যের দ্বারাই সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হইবে।

(৭) সার্বভৌমই রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে আইনের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে।

(৮) ইহাকে সর্বপ্রকার অধিকারের উৎস হিসাবে ধরা হয়। রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তি-গণ যে সকল অধিকার ভোগ করে তাহা সার্বভৌমই দেয়।

(৯) ইহার আজ্ঞাকে সকলকেই পালন করিতে হইবে। যাহারা পালন করিবে না তাহারা শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য।

আবার জেলিনেকের ভাষায় সার্বভৌমিকতার রূপটি এইরূপ, "রাষ্ট্রের ইচ্ছা ছাড়া ইহার উপরে কোন প্রকার বন্ধন আরোপ করা যায় না। নিজে ছাড়া অপর কোন শক্তি ইহাকে সীমিত করিতে পারে না।" বার্জেস বলেন, সার্বভৌমিকতা হইল, "প্রজাপুঞ্জ ও তাহাদের সকল সংগঠনের উপর আদি অবিমিশ্র সীমাহীন ক্ষমতা. নির্দেশ দান করিবার ও তাহা মান্য করিতে বাধ্য করিবার স্বতোৎসারিত ও স্বাধীন ক্ষমতা।"*

বর্তমানে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। ইহারা হইল **আন্তর্জাতিক মতবাদ** ও **বহুত্ববাদ**। আন্তর্জাতিক মতবাদে বিশ্বাসিগণ

---

*"Original, absolute, unlimited power over the individual subject and over all associations of subjects, the underived and independent power to comand and compel obedience."—Burgess

রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী নন। তাহাদের মতে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হইলে বলশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালাইবে। ফলে বিশ্বশান্তি ধ্বংস হইবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে রাষ্ট্রের আর বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা থাকে না।

বহুত্ববাদিগণ মনে করেন যে, মানুষ সামাজিক জীব। এই সামাজিক মানুষেব জীবন বহুমুখী। বহুমুখী জীবনের পূর্ণ বিকাশ একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই হইতে পারে না। তাই মানুষ বিভন্ন সংঘ সৃষ্ট করিয়াছে। পরিবার, ধর্মসংস্থা, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি মানুষেরই সৃষ্টি। ইহারা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহাযতা করে। রাষ্ট্রও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তবে রাষ্ট্র একা মানুষের জীবনের সব দিকের চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। মানুষ তাই রাষ্ট্রের প্রতি যেমন আনুগত্য প্রদর্শন করে তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই সামাজিক সংঘগুলি নিজস্ব সত্তার অধিকারী। তাই রাষ্ট্র একাই সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইতে পারে না। এই সামাজিক সংঘগুলিও সার্বভৌমিকতার অধিকারী। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অবাধ ও অসীম নয়।

(৩) বহুত্ববাদ

ল্যাস্কি বলেন সমাজে রাষ্ট্র যদি তার ক্ষেত্রে সার্বভৌম হয় তবে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও তাহাদের ক্ষেত্রে সার্বভৌম হইবে। অতএব সার্বভৌমিকতা অবিভক্ত হইতে পারে না। সমাজ সংঘমূলক আর তাহার কতৃত্বও সংঘমূলক। অতএব সমাজের কতৃত্ব রাষ্ট্রের একচেটিয়া হইতে পারে না। রাষ্ট্রের কোন অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকিতে পারে না, কারণ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আইন দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা যেমন সীমিত হয় সেইরূপ অন্য রাষ্ট্রের অধিকার দ্বারা এই রাষ্ট্রের অধিকার নিযন্ত্রত হয় (State is limited within and without.)

বহুত্ববাদিগণ মনে করেন যে, সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যদি আজ্ঞা দিয়া আইন প্রণয়ন করিয়া তাহা প্রয়োগ করে তবে সমাজ তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে। তাই রাষ্ট্র সামাজিক সংঘগুলির উপর যদৃচ্ছা খবরদারি করিতে পারে না বরং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অধিকার তাহাকে মানিয়া লইতে হয়। রাষ্ট্র দৈহিক শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু পাশবিক বলই একমাত্র বল নহে; সামাজিক, নৈতিক ও মানবিকবলও বল। রাষ্ট্র যদি পাশবিক বল ব্যবহার করিতে পারে তবে সমাজও নৈতিকবল প্রয়োগ করিতে পারিবে। রাষ্ট্র মানুষের আন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। রাষ্ট্র তাহার কার্যাবলির মধ্যেও সীমাবদ্ধ। আবার রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্ভর করে স্বীকৃতির উপর। সমাজ কর্তৃক অস্বীকৃত ক্ষমতা ক্ষমতাই নহে। যেমন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তাহার আচার প্রণালী অনুসারে কাজ করিয়া যায়। রাষ্ট্র তাহাকে বড় একটা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। ফলে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সেখানে সীমিত। অতএব সার্ব-

ভৌম ক্ষমতা সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে। উহা রাষ্ট্রের একার নয়।

মূল্যায়ন : সার্বভৌমিকতার অর্থ হইল চরম ক্ষমতা। এখন প্রশ্ন হইল এই ক্ষমতা কাহার? এই ক্ষমতার অবস্থিতি কোথায়? এই সকল প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে দিয়াছেন। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের ধারণা সম্পূর্ণ আইনগত। এই আইনগত দিক ছাড়াও সমাজের অন্যান্য দিক হইতে সার্বভৌমিকতাকে বিচার করা উচিত। হেনরী মেইন বলেন, কোন এক ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিকে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা ঠিক নয়। সার্বভৌমত্ব যে জনগণের তাহা অস্টিন স্বীকার করেন নাই। আবার সার্বভৌমের আদেশএকমাত্র আইন নহে, কারণ প্রথাগত আইনের সমাজে যথেষ্ট মূল্য আছে। সার্বভৌম তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত হইতে পারে না কারণ রাষ্ট্রের আইন সমাজের প্রথাগত আইন দলীয় নিয়ন্ত্রণ ও সমাজের অন্যান্য প্রভাব দ্বারা সীমিত হয়। সকলেই ইহাকে মান্য করার উপরই ইহার মূল্য। কেউ সার্বভৌমকে সার্বভৌম বলিয়া মান্য না করিলে ইহার কোন মূল্য নাই। সার্বভৌম সর্বদা বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে মান্য করাইয়া লইতে পারে না। গণসম্মতির উপর নির্ভর করে ইহার অস্তিত্ব। ব্লুন্টস্‌লি বলেন, "রাষ্ট্র বাহরের দিক হইতে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিজস্ব চরিত্র ও সাধারণ সদস্যদের অধিকারের দ্বারা সীমিত।" আবার অনেক সময় দুর্বল রাষ্ট্র বলিষ্ঠ রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে আশ্রিত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আশ্রিত রাষ্ট্র ও বলিষ্ঠ রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা খুবই কঠিন, কারণ অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয়। তাই অনেকে যুক্তরাষ্ট্রে যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় তাহাকেই সার্বভৌম বলেন। আবার সমাজ বহু প্রতিষ্ঠানের সমবায় বিশেষ। রাষ্ট্র হইল একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

(৪) মূল্যায়ন

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরযদি সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে তবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠনেরও সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। সমাজে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রই সব না। প্রত্যেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নিজ নিজ এলাকায় সার্বভৌম। সমাজের সার্বভৌমত্ব সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানেরই। অবশ্য, সার্বভৌমত্ব শব্দটি যদি শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় তবে তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিতে হইবে। সমাজে রাষ্ট্রকে যদি কর্তৃত্বের আসনে বসানো হয় তবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইবে। কারণ সংঘগুলি তাহাদের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিবে না। তাই ল্যাস্কি বলেন, সার্বভৌমিকতার সম্পূর্ণ ধারণাটি বিসর্জন দিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ হইবে।* তবে সমাজে স্বার্থের দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য, কেন্দ্রীয় সংযোগ ও তত্ত্বাবধানের জন্য এক আইনগত কর্তৃত্বের প্রয়োজন আছে।

*"It would be of lasting benefit to political science if the whole concept of sovereignty were surrendered."—Laski

৪ | জাতিতত্ত্ব
(Nation and Nationalism)

(জাতীয় জনসমাজ, জাতি এবং জাতীয়তাবাদ, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ)

[Nationality, Nation and Nationalism , Right of self-determination, Nationalism, and Internationalism]

জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতি (People, Nationality and Nation ঃ জাতি শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন, বর্ণ (Caste), কুল (Race) এবং জাতীয় জনসমাজের একটি রাষ্ট্রনৈতিক রূপ, নেশন (Nation)। বর্ণ অর্থে জাতি শব্দের প্রয়োগ হয় ব্রাহ্মণজাতি, বৈদ্যজাতি ও শূদ্রজাতি প্রভৃতি বুঝাইতে। কুল অর্থে জাতি শব্দের প্রয়োগ হয় আর্যজাতি ও দ্রাবিড়জাতি প্রভৃতি বুঝাইতে। ইংরেজী নেশন (Nation) শব্দটি *Natio, Natus*—এই ল্যাটিন শব্দদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জন্ম বা জাতি অর্থে নেশন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নেশন বা জাতির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল "একই পূর্বপুরুষ হইতে জাত জনসমষ্টি"। ইংরেজী ন্যাশন্যালিটি (Nationality) বুঝাইতেও জাতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার নেশন (Nation) বুঝাইতেও জাতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই জাতি শব্দটির অর্থবিভ্রাট ঘটিবার আশংকা এড়াইবার জন্য কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাহার "নেশন কি?" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন ও ন্যাশন্যাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থ দ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।" অবশ্য, বাংলা বইয়েতে নেশনের প্রতিশব্দরূপে জাতিশব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে। আমরাও নেশনের প্রতিশব্দরূপে জাতি শব্দটি ব্যবহার করিব। অতএব রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে ইংরেজী নেশনের অর্থ জাতি বুঝিতে হইবে, ভিন্ন অর্থে নহে। .

(১) জাতি শব্দের বিভিন্ন অর্থ

এই প্রসঙ্গে ইংরেজী আরও কয়েকটি শব্দের প্রতিশব্দ ঠিক করিয়া লওয়া ভালো। কারণ, বর্তমান আলোচনায় বারবারই তাহারা আসিয়া হাজির হইবে। এই শব্দগুলি হইল People, Nationality, Nation এবং Nationalism ও Internationalism। ইহাদের বাংলা প্রতিশব্দ হইল যথাক্রমে জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি এবং জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ।

জাতি কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের জবাব শুধু ইংরেজী Nation শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হইতে পাওয়া যাইবে না। শব্দের কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া তাহার তত্ত্বগত রূপটি উদ্ঘাটন করিতে হইবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জাতি কি

তাহাই বুঝিতে হইবে। আবার জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইলে জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ-এর অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ, জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগিয়া উঠিলেই উহা জাতীয় জনসমাজে রূপান্তরিত হয়। আবার জাতীয় জনসমাজের ক্রমোন্নতির এক বিশেষ স্তরে জাতির উদ্ভব হয়। তাই আগে জনসমাজ ও জাতীয় জনসমাজ কাহাকে বলে তাহাই জানা দরকার।

(ক) জনসমাজ (People) : মানুষ যূথবদ্ধ জীব। সে একাকী বাস করিতে পারে না। তাই সে সমাজে বাস করে এবং সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালোবাসে। সামাজিক বন্ধন ছাড়া তার চলেও না। যদি একই ভূখণ্ডে এমন কিছু সংখ্যক লোক বাস করে যাহাদের ভাষায়; সাহিত্যে, ইতিহাসে, আচার ব্যবহারে, অধিকারবোধে এবং অভিযোগে একটি ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে তাহাকেই জনসমাজ বলা যায়। এই সংজ্ঞা হইতে জনসমাজের যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহা হইল, (ক) জনগণের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য, (খ) ঐতিহাসিক ঐক্য, (গ) অধিকারবোধে ঐক্য, (ঘ) ভৌগোলিক সান্নিধ্য, (ঙ) অভাব অভিযোগবোধে ঐক্য এবং (চ) উদ্ভবগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। এই সকল ঐক্যসূত্র মানুষকে সমাজবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া থাকে। কাজেই দেখা যায় কিছু সংখ্যক লোক এই সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বসবাস করিলেই তাহাকে জনসমাজ বলা হয়। যেমন, স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে লঙ্কার মানুষেরা ছিল একটি জনসমাজ।

(২) জনসমাজ

(খ) জাতীয় জনসমাজ (Nationality) : জাতীয় জনসমাজ হইল জনসমাজের এক উন্নতস্তর বিশেষ। যখন কোন মানবসমাজ পরস্পরের সহিত রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কুলগত ঐক্য থাকে, যখন তাহাদের ধর্ম এক, ভাষা এক, যখন তাহারা একই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে এবং একই ধরণের অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধনে যুক্ত হয়. তখন যে জনসমাজ সৃষ্টি হয় সেই জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলে জাতীয় জনসমাজের উদ্ভব হয়। জাতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাস এক, ইহাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্য এক, ইহারা একই ধরনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ইহাদের ভাব ও ভাবনা একই রকমের, একই ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত; একই প্রকারের মানসিক গঠনে চিহ্নিত। কিছু সংখ্যক মানুষ যদি বিশ্বাস করে যে, তাহাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত এবং তাহাদের আকৃতিতে যদি একই ধরনের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে তবে স্বভাবতই সমগ্র গোষ্ঠীকেই স্বজন বলিয়া মনে করে। এক ঈশ্বরের উপাসনা তাহাদের সমবিশ্বাসের বন্ধনে নিকটে টানিয়া আনে এবং এক উপাসনা পদ্ধতি সে নৈকট্যকে আরও গাঢ়ো করিয়া তোলে। আবার ভাষা হইল ভাবের বাহন। যাহারা এক ভাষায় কথা বলে তাহারা পরস্পরের মনের ভাব সহজে বোঝে ও বুঝাইতে পারে। যাহাদের ভাষা এক তাহাদের প্রকাশ ভঙ্গি এক, রঙ্গ রসিকতা একই ধরনের, ইঙ্গিত, ইসারা ও সংকেত একবর্গীয়। এক ভাষার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গভীর ঐক্যবোধে সকলকে বাঁধিয়া রাখে।

(৩) জাতীয় জনসমাজ

এক ভৌগোলিক সীমানার বাঁধনও বড়ো শক্ত। শৈশব কাল হইতেই মানুষ একই প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়িয়া উঠে, একই দেশের মাটি, জল, হাওয়া হইতে তাহাদের আহার্য ও ঐহিক সম্পদ সংগ্রহ করিতেছে। একই দেশের মাটির সহিত তাহাদের অতীত পিতৃপুরুষের স্মৃতি ও ভবিষ্যদবংশীয়দের আশা আকাংখা জড়িত রহিয়াছে। তাহাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাভাবনা ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া গিয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন, "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।"

আবার মানুষ যখন এক সাথে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অর্থনৈতিক সংগ্রাম করে তখন সহযোদ্ধার ভূমিকায় একটা ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। অর্থনৈতিক সমস্বার্থ বহুসংখ্যক মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এখন বোঝা গেল যে, কুলগত, ধর্মগত, ভাষাগত, ভৌগোলিক সীমানাগত ও অর্থনীতিগত ঐক্য যে জনসমাজে পরিলক্ষিত হয় সে জনসমাজ একাত্মবোধে আপ্লুত থাকিবে। **এই একাত্মবোধই জাতীয়তার অনুভূতি। এই অনুভূতি সম্পন্ন জনসমাজই হইল জাতীয় জনসমাজ।**

ইংরেজী Nationality শব্দটির দ্বারা জাতীয় ঐক্যের চেতনা বা জাতীয় ভাবকেও বুঝানো হয়। জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলে তাহারা একই সরকারের অধীনে বাস করিতে চায়। অতএব জনসমাজ ও জাতীয় জন-সমাজের মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বদ্ধ নয়। আর জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবদ্ধ। এই জাতীয় জনসমাজ যখন স্বাধীন হইয়া নিজ ভাগ্য নিজেই নির্ণীত করে বা তাহা করিবার দাবিতে অগ্রসর হয় তখনই জাতির জন্ম হয়।

(গ) জাতি (Nation): জাতির জন্ম হয় তখনই যখন জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা আরও গভীরতর হয়। জাতির গভীরতর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্রে। **বার্জেস (Burgess)** জাতি সম্বন্ধে একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি বলেন: "পরস্পরের সন্নিহিত কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী এক জনসমাজ যদি একই ভাষা ও সাহিত্য একই ইতিহাস ও ঐতিহ্য, একই আচার-ব্যবহার, একই ধরনের ন্যায় অন্যায় ও সুখ দুঃখের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় তবে তাহাকে জাতি বলা চলিবে।*

লর্ড ব্রাইস্ এই জাতি ও জাতীয় জনসমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বলেন, "জাতীয় জনসমাজ হইল ভাষা সাহিত্য, ধ্যান ধারণা, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য প্রভৃতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এমন একটি জনসমাজ যাহা অনুরূপ ভাবে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করে না।" "জাতি হইল রাষ্ট্রনৈতিকভাবে

---

*"A nation is a people "having a common language and literature, a common tradition and history, common customs and a common consciousness of rights and wrongs inhabitating a territory of geographical unity."—Burgess

সংগঠিত এক জনসমাজ যাহা বহিঃশাসন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে।” জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে ভারতবাসীদের একটি জনসমাজ ধরা যাইতে পারে। একই ইংরেজ শাসনাধীনে সমগ্র ভারতবাসী শাসিত হইবার ফলে এবং একই ধরনের নিপীড়ন ভোগ করার ফলে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র স্থাপিত হয় এই ঐক্য-সূত্রের ভিত্তিতে ইহারা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্নসূত্রে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীকে জাতীয় জনসমাজ বলা যাইতে পারে এবং পরে ভারত যখন স্বাধীন হইয়া একটি রাষ্ট্রে পরিণত হইল তখন ইহা একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকালে ভারতীয় জনসমাজেরই এক অংশ মুসলমানগণ সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিয়াছে। এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনকারী মুসলমানগণকে পৃথক জাতীয় জনসমাজ বলিয়া ধরা হয় নাই। কিন্তু পরে মুসলমানগণ যখন তাহাদের সম্প্রদায়গত ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সমগ্র ভারতবাসী হইতে নিজেদেরকে পৃথক মনে করিয়া পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করিতে লাগিলে তখন তাহাদিগকে একটি পৃথক জাতীয় জনসমাজ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই মুসলমানগণ যখন পাকিস্তান নামে ভারতের এক খণ্ড লইয়া আলাদা রাষ্ট্র গঠন করিল তখন তাহারা একটি জাতিতে পরিণত হইল।

(৪) জাতি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগ দুঃখ স্বীকার এবং পুনর্বার সকলে মিলিয়া ত্যাগ দুঃখ স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তাহাই নেশন।” অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ, একসঙ্গে দুঃখ বহনের বন্ধন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। জাতি গঠন হয় মানুষেরই মতো সুদীর্ঘ অতীতকালের প্রয়াস ও ত্যাগ স্বীকার ও নিষ্ঠার দ্বারা। নেশন হইল একটি সজীব সত্তা। নেশনগঠনে মানুষের মননশক্তি, আত্মশক্তিই বেশী পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। জিমার্ন বলেন, “যে জন-সমাজের মধ্যে জাতীয় জনসমাজের চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাহাই জাতীয় জনসমাজ।”*

(৫) রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা

রেণা বলেন,—“মানুষজাতি ভাষার, ধর্মমতের বা নদী পর্বতের দাস নহে। অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চরিত্র সৃষ্টি করে, তাহাই নেশন। নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুতঃ একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ; আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা।...অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরই ন্যাশান্যাল

* "If a people feels itself to be a nationality, it is a nationality."—Zimern

ভাবের মূলপত্তন। অতীতকালে সকলের এক গৌরব এবং বর্তমান কালে সকলের এক ইচ্ছা; পূর্বে একত্রে বড় কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প, ইহাই জনসম্প্রদায় গঠনের ঐকান্তিক মূল"।* অতীতের স্মৃতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা, অতীতের ধর্ম ও কীর্তি মানুষের মনপ্রকৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করে; ইহাই নেশনগঠনের উপাদান। সেখানে ভাষার বৈচিত্র্য বড় কথা নয়। দেশপ্রেম একসূত্রে যেখানে বাঁধিয়াছে সহস্র জীবন সেখানে দেশপ্রেমই নেশন গঠনের উপাদান।

যোসেফ ষ্ট্যালিন জাতির একটি বাস্তবধর্মী সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলেন "জাতি হইল ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সমঅর্থনৈতিক জীবনের বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত ইতিহাস বিবর্তিত স্থায়ী সমাজ।*

উপসংহারে বলা যায়, অতীতে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা নিজেদেরকে জাতি হিসাবে কল্পনা করিত না। জাতির উদ্ভব হয় ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের পথে মানব সমাজের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া। বহু উপাদান—যথা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, অতীত স্মৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, সামাজিক প্রথা, কুলের সম্বন্ধ, অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন, সমসুখ দুঃখ ভোগের স্মৃতি, ভৌগোলিক সান্নিধ্য প্রভৃতি জাতীয় চেতনার বিকাশে সাহায্য করে। জাতি ও রাষ্ট্র ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। জাতি মানুষকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করে তেমনি আবার অনৈক্য সৃষ্টি করে; যেমন, ইংরেজ বলার সাথে সাথে ইংরেজদের ফরাসীদের হইতে পৃথক করা হইল। আবার একই রাষ্ট্রে একাধিক জাতিও বাস করিতে পারে। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ও সংখ্যালখিষ্ঠ জাতির মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

জাতি গঠনের বিভিন্ন উপাদান (Elements of Nationality): বিভিন্ন উপাদানে জাতি গঠিত হয়। মানব সমাজ যখন একই অর্থনৈতিক স্বার্থ বন্ধনে যুক্ত হয়, একই ভৌগোলিক সান্নিধ্যে আবদ্ধ হয়, একই ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং মানুষ যখন রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ বা কুলগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় তখনই জাতীয় জনসমাজের জন্ম হয়। এই উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া জাতি গঠনের উপাদানগুলি পাওয়া যায়। নিচে ইহাদের আলোচনা করা হইল:

(১) **রক্তের সম্বন্ধ:** রক্তের সম্বন্ধে মানুষ যখন সম্পর্কিত হয় তখন তাহাদের আকৃতিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং অত্যন্ত সাধারণ কারণেই সমগ্র গোষ্ঠীর লোকেরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে আত্মীয় বলিয়া মনে করে।

(২) **ভৌগোলিক সান্নিধ্য:** ভৌগোলিক সান্নিধ্যও গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে

*"What constitutes a nation is not speaking the same tongue or belonging to the same ethnic group, but having accomplished great things in common in the past and the wish to accomplish them in the future."—(Renan) MacIver

** "A nation is a historically evolved, stable community of language, territory, economic life, and psychological make up manifested in a community of culture.—Stalin.

এক বন্ধন আনিয়া দেয়। মানুষ একই ভূখণ্ডে বাস করার ফলে একই ধরনের প্রাকৃতিক সুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করে। একই পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া যে সকল শিশু বাড়িয়া উঠে স্বভাবতঃই তাহাদের মধ্যে একটি গাঢ় ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। আবার ঐ বাসভূমির সহিত জড়াইয়া আছে তাহাদের **পিতৃপুরুষগণের অতীত স্মৃতি**। মানুষের চিন্তা ভাবনা ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা সবই মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। একই দেশের জমি হইতে তাহারা সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের আহার্য। দেশের জলমাটি, আলো-বাতাস তাহাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত তাহাদের আকৃতিও একটি বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ভৌগোলিক সান্নিধ্য মানুষকে এক নিবিড় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

(৩) **কুলগত, দেশগত, ভাষাগত, ধর্মগত ঐক্য এবং অর্থনৈতিক ঐক্য**ঃ দেশের লোকের মধ্যে একটা কুলগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষা এক হওয়ায় এই ঐক্য আরও গাঢ় হয়। একই ধর্মের মানুষেরা একই পদ্ধতিতে উপাসনা করে একই দেবতার পূজা করে। ফলে একটা ঐক্যবোধ জন্মায়। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক সুখ সুবিধা ও অভিযোগের ভিত্তিতেও গোষ্ঠীসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক অসুবিধার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া একই সাথে সংগ্রামকরার জন্য জনসমাজের মধ্যে এক গাঢ় ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়।

(৪) **ভাবগত ঐক্য**ঃ উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রের ঐক্যবোধে যখন জনসমাজ আপ্লুত হয় তখন যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়, সেই একাত্মবোধ হইতে একজাতীয়তার অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আবার এই জাতীয়তার অনুভূতিতে আপ্লুত জাতীয় জনসমাজ যখন নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করিতে চায় এবং তাহা নিজেদের সরকারের মাধ্যমে কার্যকরী করিতে অগ্রসর হয় তখনই জাতির উদ্ভব হয়। এই একাত্মবোধকেই **ভাবগত ঐক্য** বলা হয়।

(৫) **জাতি ও রাষ্ট্র**ঃ রাষ্ট্র ও জাতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বটে, তবে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব হইলেই জাতির জন্ম হয় না আবার জাতির উদ্ভব হইলেই রাষ্ট্রের জন্ম হয় না। প্রথম মহাসমরের আগে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী এক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু তাহারা জাতি ছিল না। কারণ তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন ছাড়া অপর কোন বন্ধন ছিল না। আবার দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর জার্মান ও জাপান সার্বভৌমিকতা হারাইয়া ফেলে তাই বলিয়া তাহাদের জাতি লোপ পায় নাই। অবশ্য, ১৯২০ সাল হইতে জাতি ও রাষ্ট্র সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

মূল্যায়নঃ জাতি গঠনের উপরোক্ত উপাদানগুলিকে অপরিহার্য বলা চলে না। বর্তমানে জাতিগঠনের কোথাও **কুলগত পবিত্রতা** রক্ষিত হয় নাই। বর্তমানে অনেক জাতিই বহুকুলের সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। এশিয়ায় ভারতীয় জনগণের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন

প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী মানুষ একই সঙ্গে মিশিয়া বাস করিতেছে। জাপানে শিণ্টো মতাবলম্বীদের সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান পাশাপাশি বাস করিতেছে। ধর্ম বিশ্বাসে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় ভারতবাসী প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে এক জাতি গঠন করিয়াছে। আবার একই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চীন ও জাপানী দুইটি পৃথক জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ একটি জাতি গঠন করিয়াছে ; যেমন, জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান এবং রোমান্স্ ভাষাভাষী মানুষ সুইজারল্যাণ্ডে সুইস্ জাতি গঠন করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের মানুষ ইংরেজী ভাষায় কথা বলে কিন্তু তাহারা দুইটি জাতি। আবার বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করিয়াও এক জাতি হয়। যেমন, পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। অর্থনৈতিক শুল্ক প্রাচীর তুলিয়া দিলে বা খাড়া করিয়া দিলেও জাতীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয় না।

(৬) কুল, ধর্ম, ভাষা ভৌগোলিক ও অর্থনীতিগত বৈষম্য থাকিলেও একজাতি গঠিত হইতে পারে

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) ঃ জাতীয়তাবাদ বা স্বাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতিব উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়তাবাদকে অনেকে জাতীযতাবোধ বলিয়াও প্রচার করেন। ম্যাকাইভার বলেন, "জাতীয়তাবোধ হইল সেই সামাজিক বোধ যাহা এক বিশেষ সামাজিক যুগের ঐতিহাসিক পরিবেশের ভিতরে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে অথবা রাষ্ট্রের মাধ্যমে আপন অভিব্যক্তির এখনও অনুসন্ধান করিতেছে।" ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সমঅর্থনৈতিক জীবনের বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভাবগত উপলব্ধি প্রভৃতির কারণে যে ঐক্যবোধ জন্মায় সেই ঐক্যবোধে স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয়। এই স্বাজাত্যবোধের জন্য তাহারা নিজেদেরকে অপরাপর মানব সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া দেখে।

জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হইলে জাতীয়তাবাদ যেরূপ ধারণ করে তাহাকে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্খা বলা হয়। স্বাজাত্যবোধ প্রথমে স্বাদেশিকতার রূপ ধারণ করে। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইবার সাথে সাথে মানুষ তার নিজ নিজ জাতির লোকেদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রদর্শন করে। জাতীয়তাবোধ জাতীয় রাষ্ট্র ও দেশ প্রেমের মিশ্রণ হইতে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদ একটা ঐক্যের অনুভূতি ও চেতনা। জাতীযতাবাদের প্রধান লক্ষ্যই হইল জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। এই সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৭) জাতীয়তাবাদ

জাতির অধিকার-সমূহ ঃ বহু জাতিকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হইলে জনসমাজের কতকগুলি মৌলিক অধিকারকে স্বীকার করিতে হয়। (১) বহুজাতিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি জাতীয় জনসমাজের ধর্ম, ভাষা ও সাংস্কৃতির যথাযথ বিকাশের সুযোগ নির্দিষ্ট করিয়া **রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের** ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২) প্রত্যেকটি জাতিকেই **রাষ্ট্র পরিচালনা করার অধিকার** দিতে হইবে। (৩) প্রতিটি জাতিকে **সহ অবস্থানের অধিকার** দিতে হইবে। (৪) প্রত্যেক জাতিকেই **নিজ নিজ ভাষা**

ব্যবহারের অধিকার দিতে হইবে, তাহাতে সংস্কৃতির স্ফুরণ হইবে। (৫) জাতির আঞ্চলিক রীতিনীতি ও প্রচলনগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হইবে। (৬) সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ও আইনগত সাম্যের অধিকার দিতে হইবে। প্রত্যেকেই যাহাতে আইনের দরবারে সমান ব্যবহার পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, এক জাতি এক রাষ্ট্র (Rights of Self-determination of Nations, one Nation one State) ঃ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার। জাতি মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার ভিতর দিয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৭৭৬ সালে উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য সংগ্রাম শুরু করে এবং তাহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশশতাব্দীতে বহু স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু স্বাধীন ও জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়। প্রত্যেক জাতির স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অধিকার ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছে।

জাতীয়তাবোধ তাহার ব্যাপকতাও বাস্তবতায় অনেক সামাজিক চেতনাকেই ছাপাইয়া গিযাছে। সমাজের ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, রাজা-প্রজার মধ্যে পার্থক্য জাতীয় চেতনার কাছে সব ম্লান হইয়া যায়। এই ধারণাটাই প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের গোরার ভাষায়, "আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।" জাতির চেতনা রাষ্ট্ররূপের মধ্যেই ধারণ করে। স্বাধীনতার জন্য যদি অনিবার্য তাগিদের কথা বাদও দিই তাহা হইলেও নিম্নলিখিত যুক্তিতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিতেই হইবে।

সপক্ষে যুক্তি ঃ (১) প্রত্যেকটি জাতিরই **নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য** থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ সম্ভবপর হয় শুধু তখনই যখন ঐ জাতি অপরের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বকীয় চেষ্টায়, স্বকীয় পদ্ধতিতে নিজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকে। অতএব জাতির নিজস্ব গুণের প্রস্ফুটন ও সামগ্রিক বিকাশের জন্য নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজন রহিয়াছে।

(৮) এক জাতি এক রাষ্ট্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ

(২) **বৈচিত্র্যের মধ্যেই সৌন্দর্যের বাস।** স্বতন্ত্র জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের মধ্য দিয়াই এক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। সারা পৃথিবীর মানুষের বৃহদাকার ফ্যাক্টরির ছাপমারা মালের মতো একই প্রকারের হাবভাব, চাল চলন, আচার ব্যবহার পোশাক আশাক, প্রথা ও প্রকাশভঙ্গি দেখিতে কেহই চাহে না। একই ধরনের চালচলন একঘেয়েমি ভাব সৃষ্টি করে। সারা বিশ্বে মানুষ যদি হাজার রকমের চালচলন, রীতি নীতিতে চলে তাহাতে সৌন্দর্যেরই প্রকাশ হইবে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের বিকাশ সমগ্র মানব সভ্যতাকে অধিকতর সম্পদময় করিয়া তোলে।

(৯) বৈচিত্র্যের মধ্যে সৌন্দর্য

(৩) বর্তমান যুগ গণতান্ত্রিকতার যুগ। এই যুগে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়। **ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের** চিন্তাধারা হইতেও জাতীয় স্বাধীনতার দাবি সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা কে বা কাহারা পরিচালনা করিবে সে সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষই গ্রহণ করিবে, তবে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ আত্মবিকাশের দাবিতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া বাঁচিতে চাহিলে সে দাবিকে কি উপেক্ষা করা যায় ?

(১০) ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা

(৪) কেহ কেহ বলেন, জাতি **স্বাধীন** হইলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ বাধাইবে, একথা ঠিক সঙ্গত নয়। কারণ, সমাজে যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, বরং সকলের চাহিদার প্রয়োজনের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইয়াই স্বকীয় দাবি পূরণ করে; তেমনি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হইলে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না বরং সম্মানই করিবে, বৃহৎ মানব সমাজে অন্যান্য জাতির অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ভিত্তিতেই প্রতিটি জাতির স্বকীয় জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। স্বস্ব প্রয়োজনীয়তার জন্য বিরোধ করিবে না বরং সহযোগিতার ভিত্তিতেই পাশাপাশি অবস্থান করিবে। এই প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিলের উক্তিটি উপস্থিত করা অযৌক্তিক হইবে না। তিনি বলেন, "যেখানে জাতীয়তাবোধ কিছুটা পরিমাণে শক্তিশালী, সেখানেই জাতীয় জনসমাজের সকল মানুষকে একটি **স্বতন্ত্র সরকারের** শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রাথমিক যুক্তি রহিয়াছে।"*

(১১) স্বাধীনতা

(৫) রাষ্ট্রপতি উইলসন বলিয়াছেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে উপেক্ষা করিলে রাষ্ট্র নেতাগণ অমঙ্গলকেই আহবান করিবেন। তিনি বহুজাতি সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রে (Poly National State) **সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের** সমস্যার চিরন্তন **সমাধানের** সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহার ধারণা ছিল প্রত্যেক জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি দিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া চিরতরে দূরীভূত হইবে। ১৯১৯ সালের শান্তি সম্মেলনে (Peace Conference) প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিবার দাবিকে সর্বসম্মতিক্রমে মানিয়া লওয়া হয় এবং এই নীতিকে কার্যকর করিবার জন্য ইওরোপকে নূতন করিয়া গঠনের চেষ্টা করা হয়।

(১২) সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা

(৬) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের উদারনৈতিক চিন্তাধারার বাহক প্রখ্যাত

---

*"Where the sentiment of nationality exists in any force there is prima facie case for uniting all the members of the nationality under ths same government, and a government to themselves a part." John Stuart Mill—Representative Government

দার্শনিক **বার্ট্রাণ্ড রাসেল** বলেন ঃ "কোন জনসমাজকে তাহাদের নিজেদের জাতীয় সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের শাসনাধীনে থাকিতে বাধ্য করা, আর একটি নারীকে, যে পুরুষ তাহাকে ঘৃণা করে, তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা একই কথা।"*

(১৩) রাসেলের মত

(৭) যখনই কোন জাতীয় জনসমাজ নিজের সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয় তখনই ইহা নিজের **পৃথক সত্তাকে** একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে।

(১৪) পৃথক সত্তা

বিপক্ষে যুক্তি ঃ (১) জাতির স্বাধীনতার অধিকারের পথে ভূগোলই একটা মস্তবড়ো বাধা। প্রত্যেকটি জাতীয় জনসমাজ যদি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িতে শুরু করে তবে দেখা যাইবে যে, সুদীর্ঘকালের সুপ্রতিষ্ঠিত সুশৃংখল রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে হইতেছে। ধরা যাক, ভারতের কথা। ভারতকে যদি জাতীয় জনসমাজের ভিত্তিতে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করা যায় তবে ২০০ এর বেশী রাষ্ট্র হইবে, ইংল্যাণ্ডে হইবে চারিটি, সুইজারল্যাণ্ডে হইবে ৩টি। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে গেলে এক ইওরোপেই ষাটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। ইহা কি সমর্থনযোগ্য ?

(২) কিন্তু এইভাবে শত শত রাষ্ট্র সৃষ্টি করিলেও সমস্যার সমাধান হইবে না। কারণ, অনেক জায়গায়ই বিভিন্ন জাতির মানুষ এমন ভাবে মিশিয়া বাস করিতেছে যে রাষ্ট্রসীমার প্রাচীর দিয়া তাহাদের ভাগ করা যায় না। কলিকাতার চৌরঙ্গীর মোড়ে একটা বাড়ীতেই ৭ জাতের লোক বাস করে। প্রত্যেক জাতের লোকের জন্য যদি এক একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে হয় তবে একটা বাড়ীতেই সাতটা রাষ্ট্র হইবে, পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইবে, গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইবে। ইহা কি সম্ভব ? এমনি ভাবে ভাগ করিলেও বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আসিয়া হাজির হইবে ; সংখ্যালঘুদের সমস্যা তখনও শেষ হইয়া যাইবে না। বিকল্প উপায় হইল লোকাপসরণ ও স্থানান্তরিতকরণ (Population Transfer)। কিন্তু তাহার মারাত্মক ফল বাংলাদেশের লোকাপসরণ হইতে নিশ্চই শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে। দেশবিভাগের পরবর্তী ভারতে লোকাপসরণ ও লোক স্থানান্তর করণের ভয়াবহ ফল আজও মানুষ ভুলিতে পারে নাই।

(৩) ইহার পর এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে যে পারিবে না তাহা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অবস্থা হইতেই বুঝা যায়। তাই আজ সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য অপর রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইতে হইতেছে।

*"To force people to live under a government not that of their own nation was felt to be like forcing a woman to marry a man whom she hates.'
—Bertrand Russell

(৪) ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অর্থ দুর্বল রাষ্ট্র। বড়ো রাষ্ট্র যে কোন সময়ে ছোট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজস্ব দুর্বলতার জন্য কোন-না-কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাবেদার হইয়াই ছোট রাষ্ট্রকে চলিতে হইবে, পরনির্ভরশীলতা ঘুচিবে না। স্বাধীন হইয়াও সে পরাধীন। স্বাধীনতার নিরাপত্তা থাকিবেই না বরং জটিলতা বাড়িয়াই চলিবে।

(৫) লর্ড এ্যাকটনের ভাষায়, "জাতিতত্ত্ব হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদগামী পদক্ষেপ।"* এই প্রসঙ্গে লর্ড কার্জন বলেন, "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার দুইদিকে ধার। একদিকে ইহা যেমন ঐক্য বন্ধ হইবার প্রেরণা যোগায়, অন্যদিকে আবার তেমনি বিচ্ছিন্ন হইতেও উন্মাদিত করে।"** জাতির আত্মনির্ধারণ নীতি একদিকে যেমন জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি জাতিকে ঐক্যবন্ধ করিয়াছিল। অপর দিকে তেমনি অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক এবং রুশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাঙ্গন ধরাইয়াছিল।

(৬) লর্ড এ্যাকটনকে উল্লেখ করিয়া আবার বলা যায় বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলিও উন্নত হয়। সমাজে যেমন জনসমষ্টি অত্যাবশ্যক, সেই রকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে অনেক জাতির বাস।*** এই সংমিশ্রণের ফলে মানব সমাজের একটি অংশের বীর্য, মহত্ত্ব, জ্ঞান ও ক্ষমতা অপর একটি অংশে সঞ্চারিত হয়।

উপসংহারে বলা যায়, বর্তমান জগতে একজাতি বিশিষ্ট রাষ্ট্র প্রায় নাই বলিলেই চলে। যে কোন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে হয় এক ভাষা প্রচলিত নাই বা একধর্ম প্রচলিত নাই, একই ধরণের স্বার্থের বন্ধন খুব কমই আছে। জাতির সবগুলি উপাদান একসাথে রাষ্ট্রের সকল জনসমষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় না। কোন-না-কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকিবেই। সুতরাং একজাতি এক রাষ্ট্র এর ভিত্তি খুবই দুর্বল। তবে কোন একটা বিশেষ চেতনায় রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই ঐক্যবন্ধ হইতে পারে। এই ঐক্যবন্ধ চেতনার ভিত্তিতে যদি জাতির বিচার করা হয় তবে হয়ত একজাতি এক রাষ্ট্রের নজির পাওয়া যাইতে পারে।

*"The theory of Nationality is a retrograde step in history."—Acton

**"The right of self determination is a double edged sword, it is and has been in the past a unifying force but it may be, and has recently become also a disintegrating force."—Lord Curzon

***"The combination of different nations in one State is as necessary condition of civilised life as the combination of men in society. Inferior races are raised by living political union with races intellectually superior."—Lord Acton.

ভারতের জাতীয় চরিত্র

(Character of Indian Nationality)

ভারতের একটা নিজস্ব জাতীয় চরিত্র আছে। ভৌগোলিক, কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ঐক্য যদি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তবেই একটা জাতীয় চরিত্র গড়িয়া উঠে। জাতির আচার-ব্যবহার ও প্রচলনের মধ্যেও ঐক্য থাকে।

(১) ভারতের জনগণের মধ্যে অনৈক্য ও ঐক্য

পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতে জনগণের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম প্রচলিত আছে। ভাষার দিক হইতে বাংলা, তামিল, তেলেগু, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষাভাষী মানুষ ভারতে বাস করে। আচার-ব্যবহারের দিক হইতেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ মিল নাই। তাই মুসলমানেরা মনে করে যে, তাহারা হিন্দুগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই তাহারা একটি পৃথক জাতি। এইরূপ বহু জাতি ভারতে বাস করে। মুসলমানগণ জাতি হিসাবে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও দাবি করিয়াছিল। বর্তমানের পাকিস্তান এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি ও আন্দোলনের ফল।

পশ্চিমী সমালোচকেরা বিষয়টির **কেন্দ্রগামিতার** (**Centrifugal**) দিকে লক্ষ্য নিবন্ধ না করিয়া **কেন্দ্রবহির্মুখিতার** (**Centripetal**) দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন। অবশ্য, ইহা সত্য যে, ভারতে বহু ভাষার প্রচলন আছে, বহু ধর্ম আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে, বহু কুল তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বিরাট আয়তনের দেশে, এই বিরাট ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বহনকারী দেশে বহুবিধ কথ্য ভাষা, বহুবিধ আচার-ব্যবহার, বহুবিধ বিধিনিয়ম প্রচলিত থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ইহাও স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, ধর্ম এখানে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ইহা শুধু ভারতে কেন বহু দেশেই এই ধর্ম, প্রচলন, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতি বৈপরীত্যের ভাব ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডেও বিভিন্ন কুল, ভাষা, ধর্মাবলম্বী মানুষ একত্রে বাস করে। যদি এই সকল দেশে একজাতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকে তবে ভারতের ক্ষেত্রে কেন দ্বিমত পোষণ করিব?

(২) ভারতেও এক জাতির বাস

'জাতি' অর্থে ভাবগত ঐক্যের উপরই জোর দেওয়া হয়। এই ভাবগত ঐক্য যদি বাস্তব পার্থক্য অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়—তবে ভারতের জাতীয় চরিত্রকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিতে হইবে। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে হাজার রকমের পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ভাবগত ঐক্য বর্তমান আছে। এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল **সাইমন কমিশনও** স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, ভারতে বহু ভাষা, বহু আচার-ব্যবহার এবং বহু ধর্ম থাকা সত্ত্বেও এখানে একটি মৌলিক ভাবগত ঐক্য

আছে যাহা সকলকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে।* হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেরই অবদান রহিয়াছে এই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার পশ্চাতে। হিন্দু ও মুসলমান শত শত বৎসর একই স্থানে বাস করিতেছে। তাহাদের ভাষাগত ঐক্য তাহাদের সাহিত্যের মধ্যে ঐক্য আনিয়া দিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির মধ্যে ইহাদের ঐক্য দেখা যায়। অর্থনৈতিক সমস্বার্থে এই দুই ধর্মাবলম্বী জাতি আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বর্তমানে যে বিবাদ, দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায় তাহা সাম্প্রতিক। এই বিবাদ ও হানাহানির পশ্চাতে রহিয়াছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ, যাহারা জাতীয়তাবাদের নামে নিজেদের স্বার্থকে পূর্ণ করিয়া লইতেছে।

আবার জাতি বলিতে শুধু ধর্ম, ভাষা, কুলের সম্পর্কের কথা ধরিলেই চলিবে না। জাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আদর্শের ঐক্যকে বুঝিতে হইবে। এই ঐতিহাসিক স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তিতে বহু ভাষাভাষী, বহু কুলোদ্ভব মানুষ রুশিয়াতে একই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অধীনে বাস করিতেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইংরেজ রাজত্বকালে সমগ্র ভারতে এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, এক ধরনের আইন, এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে একটা রাজনৈতিক ঐক্যের চেতনা আনিয়াছে। আবার দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের জাতীয় ঐক্যের নিদর্শন। স্বাধীনতালাভের আগে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ সমগ্র ভারতবাসীরা এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবেই পরিগণিত হইয়াছে। আবার স্বাধীনতা অর্জনের পরও আজ সেই ঐক্যবোধ ভারতে একটি জাতীয় রাষ্ট্রের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিভিন্নজাতির ঐক্যের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মিঃ জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব (Two Nations Theory) ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে বর্ণনাতীত দুঃখকষ্ট আনিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তানের মানুষ অনেক রক্তদানের পর এই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। এই দুঃখকষ্টের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভারতবাসী আরও ঐক্যবদ্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ (Nationalism and Internationalism) ঃ জাতীয়তাবাদের অর্থ স্বাজাত্যবোধ। জাতীয়তাবাদ বা স্বাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা একজাতি, আমাদের একদেশ, একপ্রাণ, একমন এই যে অনুভূতি ইহাই জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হইলে

*"It would be a profound error to allow geographical dimensions or statistics of population or complexities of religion, caste and language to be the little significance of what is called the Indian National Movement.—"Simmon Commission

জাতীয়তাবাদ যে রূপ ধারণ করে তাহাকেই জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন সকল ভারতবাসীই স্বাধীনতা লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলে। এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল ভারতবাসীর দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাবোধ। পরে ভারত যখন স্বাধীন হইল তখন জাতির স্বাজাত্যবোধের অনুভূতির সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখা গেল ভারত খণ্ডিত হইয়াছে। এক জাতি এক রাষ্ট্রের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল আর অবশিষ্ট ভারত পৃথক রাষ্ট্র হইল।

(১) জাতীয়তাবাদ

স্বাজাত্যবোধের অনুভূতি মানুষকে তাহাব অধিকারগুলি সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিসাধন করে। এইভাবে নিপীড়িত জাতিগুলি মুক্ত হইয়া বিশ্বে তাহাদের স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া লয়। স্বাজাত্যবোধ প্রথমে **স্বাদেশিকতার (Patriotism)** রূপ ধারণ করে। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইবার সাথে সাথে মানুষ তার নিজ নিজ জাতির লোকদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রদর্শন করে। জাতীয়তাবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, জাতির প্রতিটি মানুষ জাতীয় জীবনের প্রতি নির্বিচারে আনুগত্য স্বীকার করিবে ; কারণ জাতির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থের এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। তাই বলা হয় জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও তার উন্নতিবিধান প্রতিটি মানুষের পবিত্র দায়িত্ব।

(২) জাতীয়তাবাদ একটা মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত

জাতীয়তাবাদের দুইটি দিক আছে ; ইহার একটি হইল **প্রকৃত জাতীয়তাবাদ** আর অপরটি হইল **বিকৃত জাতীয়তাবাদ** বা **উগ্র জাতীয়তাবাদ**। এই উগ্র জাতীয়তাবাদ সভ্যতার সংকট (Nationalism is a menace to civilization)। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন, "স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ"। জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনেক সময় জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বাধে। এই জাতীয়তাবাদের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বজাতীয় সকলকে এক শাসনাধীনে আনয়ন করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাব্যাপী ইহার পরিধি। সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টিকারক হিসাবে জাতীয়তাবাদকে বুঝা যায় ইতিহাসের পটভূমিকায়। জাতীয়তাবাদ ও জাতি গঠন শুরু হয় ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ এবং সমাজতন্ত্রের অবসানের মধ্যে। মধ্যযুগে যখন সামন্তগণ প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন করিত এবং ব্যবসায়ীদিগকে করভারে প্রপীড়িত করিত তখন দেখা দেয় ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং প্রজাবর্গের মধ্যে বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিল ব্যবসায়ী শ্রেণী। সামন্ত যুগের অরাজকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে বর্তমান বুর্জোয়াশ্রেণী সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামের মধ্যেই জতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই জাতীয়তাবাদ প্রথমে সামন্তদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়াদের সহায়তা করে ও পরে ধনতন্ত্রের বিকাশেও বুর্জোয়ারা এই জাতীয়তাবাদকে তাহাদের কাজে ব্যবহার করে। আবার দেখা যায় ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি প্রবল হইয়া

(৩) জাতীয়তাবাদের জন্ম

উঠে। মুনফার লোভে জাতীয় রাষ্ট্রগুলি বিদেশী বাজারের প্রসার, কাঁচামালের সংগ্রহ এবং বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করিয়া মুনাফা অর্জন করার জন্য সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই সকল জাতীয় রাষ্ট্রগুলি শক্তিমদে মত্ত হইয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, ফলে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঔপনিবেশের মালিকানা লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হইয়া যায়। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, যখন কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়।* সাম্রাজ্যবাদই জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করিয়াছে। জাতীয়তাবাদ এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রাস করার প্রেরণা যোগায়। এই প্রেরণা প্রথম রূপ নেয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, তারপর বিস্তৃতি লাভ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। কবির ভাষায় "বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"।

(৪) জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়

প্রথম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার পর শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করে। এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলি হয় সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশ। শুরু হয় সেখানে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা। আর এই ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নূতন নূতন যুক্তির জাল বুনিতে শুরু করে। কিপলিং-এর "শ্বেতাঙ্গের বোঝা" ("**White man's burden**"), "**নর্ডিক কুলের উৎকর্ষ**" ("**Superiority of the Nordic Race**") প্রভৃতি যুক্তি দাঁড় করানো হয়। যেমন, ভারতকে স্বাধীনতা না দিবার কারণস্বরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীবা এই যুক্তি দেখাইয়াছিল যে, ভারত একটি শ্বেতাঙ্গের বোঝা। ভারত অজ্ঞমূর্খের দেশ। তাহাকে মানুষ করার দায়িত্ব লইয়াছে ব্রিটিশ। ব্রিটিশ ভারতকে শাসন করিতেছে। তাই ভারত শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের একটি বোঝা হইয়াছে। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা বলেন, তাঁহারাই একমাত্র আর্য আর সব অনার্য। তাঁহারাই একমাত্র উন্নত। তাই তাঁহাদের নর্ডিক কুলের অধীনই সকলকে থাকিতে হইবে। সকলে হইবে পরাধীন আর একমাত্র তাহারাই হইবে স্বাধীন। এই অজুহাতে জার্মানীর নেতা হিটলার অনেক রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বসমর শুরু হইয়া যায়। জাতীয়তাবাদের এই নগ্নরূপকে লক্ষ্য করিয়া হেজ্ এই উক্তি করেন যে, "আমাদের যুগে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় রাষ্ট্র ও দেশপ্রেমের মিশ্রণ হইতে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছে তাহা মারাত্মক অন্যায় এবং অমঙ্গলের উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ত্রুটি : (১) মানুষ নিজেকে ভালবাসে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে বুঝিতে হইবে ইহা তাহার মানসিক সংকীর্ণতার লক্ষণ। এই সংকীর্ণতা জাতির ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। স্বাজাত্যবোধ বা দেশপ্রেম অন্যায়

* "As power extends, nationalism becomes transformed into imperialism"—Laski.

নয়। তাই বলিয়া দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ মানুষ নিজের দেশকে অপরাপর দেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে কেন? সঙ্কীর্ণমনা জাতি নিজের জাতিকে অপরাপর জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অপর জাতিকে উপেক্ষা করে। আবার ইহাও মনে করে যে, যেহেতু তাহার জাতি শ্রেষ্ঠ সেইহেতু অপরাপর জাতি তাহার জাতির বশ্যতা স্বীকার করিবে।

(২) জাতীয়তাবাদ মানুষকে এই অন্ধ আবেগে উদ্বুদ্ধ করে যে, জাতির সকলকেই একভাবে চলিতে হইবে। একভাবে চলিবার দাবি মানুষের সর্বপ্রকারের বৈশিষ্ট্য ও মতপার্থক্যকে দমন করে।

(৩) জাতীয়তাবাদ মানুষকে অন্ধ করিয়া তোলে। যদি কখনও বলা যায় যে, ইহা জাতীয়তা বিরোধী তখন মানুষ আর কোন যুক্তিতর্কের অপেক্ষা না করিয়াই ইহাকে দমন করিবার উগ্র-উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। জাতীয়তাবাদের এই ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতাকে মানুষ ভয় করে বলিয়া মানুষ তাহাদের সকল পার্থক্য, সকল বৈচিত্র্যকে ঢাকিবার চেষ্টা করে।

(৪) জাতীয়তাবাদের এই আক্রমণমুখী রূপের শেষ পরিণতি হইল যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবিস্তার, গণতন্ত্রের সমাধি রচনা ও ফ্যাসিবাদ বা ন্যাৎসিবাদের অভ্যুত্থান।

গুণ ঃ অবশ্য, জাতীয়তাবাদের সব কিছুই খারাপ এমন কথা বলা ঠিক নয়। জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মানুষ এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা অপরিহার্য হয়, তবে ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, সেই জাতির বিকাশের জন্যও জাতীয় স্বাধীনতা অপরিহার্য। প্রকৃত জাতীয়তাবাদের মূল নীতি হইতেছে, "নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও।" এই আদর্শের ভিত্তিতে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব সৃষ্টি করিতে পারা যায়। বর্তমান জগত হইল পরস্পর নির্ভরশীল জগৎ। বর্তমান জগতে কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য জাতি বা রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। কি রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সকল রাষ্ট্রকেই পরস্পর নির্ভরশীল হইতে হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "বর্তমান জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছে যে, কোন একটি রাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্যরাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে।"* জাতীয়তাবাদের জনক ইতালীর দার্শনিক ম্যাট্‌সিনী এই মত পোষণ করিতেন যে, প্রত্যেক জাতির কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা আছে। * এই কারণে তিনি মানব সমাজকে 'স্বাজাত্যাভি-মানী বিভিন্ন জাতির সমবায়' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির একত্রে বাস এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া যদি জাতি-

(৫) জাতীয়তাবাদের মূল নীতি হইল "নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও।"

*"The world has become so interdependent that an unfettered will of a State may be fatal to the peace of others."—Laski.

**Mazzini thought, "each nation possessed certain talents which taken together formed the wealth of the human race." Lloyd

পুঞ্জ স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্যের প্রশ্নে অগ্রসর হয় তবে মানব সমাজ কল্যাণের পথে ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ, যে জাতীয়তাবোধ কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে না, সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলে সেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র যে কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

আবার ইতিহাস একথা প্রমাণ করিয়াছে যে, জাতীয়তাবাদ বহুদেশে এক নায়কত্বের অবসান করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই প্রকারের জাতীয়তাবাদ বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ ঃ উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প কি? উত্তর হইল বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত হইয়া মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিয়া এক আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করিতে পারিলেই যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া তিরোহিত হইবে। আন্তর্জাতিকতাবাদ নূতন নয়। জাতিগঠনের বহুপূর্ব হইতেই মানুষ বিশ্ব সংগঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শান্তিকামী মানুষ চিরকালই বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস চালাইয়াছে। মানুষ এমন দিনের কল্পনা করিয়াছিল যখন এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না।*

(১) আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্ম

কালক্রমে জাতি গঠিত হইল। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইয়া গেল। আন্তঃরাষ্ট্রিক যানবাহন ব্যবস্থা চালু হইল। আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল আর অপরদিকে আন্তঃরাষ্ট্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতি সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল।

আবার নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের সাথে সাথে সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় মত্ত হইয়া উঠিল। সারা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার মতো আন্তর্জাতিক আদর্শ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। রোমক সাম্রাজ্য ও মধ্যযুগের বিশ্ব ঐক্যের কল্পণা এবং দান্তের বিশ্ব সংগঠনের কল্পনা সাম্রাজ্যবাদের আদর্শকেই রূপ দিয়াছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা হইত।

মধ্যযুগে পিরে দুবুই ইউরোপের রাজন্যবর্গের সংগঠন, আন্তঃরাষ্ট্র বিবাদ-মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক সালিশী ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে সুপারিশ করেন। রেঁনেসাস যুগে ইর্যাসমাস বিশ্বশান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এমেরিক ক্রুচে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ফরাসীরাজ চতুর্থ হেনরী ইউরোপকে ১৫টি শক্তির মধ্যে বন্টন

*"Nations shall not lift up sword against nations, neither shall they learn war any more."—Isaiah ii4.

এবং ইহাদের একটি আইন প্রণেতা সার্বভৌম সভার প্রতিষ্ঠার জন্য এক মহান পরিকল্পনা (a great design) করেন। ১৬৯৩ সালে উইলিয়াম পেন আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধ মীমাংসার জন্য রাজন্যবর্গের একটি সংসদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। আন্তর্জাতিক আইনবিদ গ্রোসিয়াস আন্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মকানুন রচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৯টি রাষ্ট্র লইয়া একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন আবে সেন্ট পিয়েরে। রুশো ও বেন্থাম পিয়েরেকে সমর্থন করেন। কিন্তু এই সকল মতবাদ ছিল হয় রাজার প্রভুত্ব বিস্তারের পরিকল্পনাপুষ্ট অথবা আদর্শবাদীদের কল্পনা প্রসূত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পোন্নতি, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইল। ফলে আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্র প্রসারিত হইল। এই শতাব্দীতেই আন্তর্জাতিক আদর্শের বাস্তব প্রয়োগের সন্ধান পাওয়া যায় ইউরোপের কনসার্টের মতো কূটনৈতিক সংগঠনের মধ্যে এবং রাশিয়া, এশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে পবিত্র চুক্তির (The Holy Alliance) মধ্যে। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের মতো সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও জন্মলাভ করে। আর আন্তর্জাতিক আদর্শের বাস্তব রূপায়নের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় ১৮৯৯ সালে হেগ শহরে অনুষ্ঠিত হেগ সম্মেলনের ঘোষণার মধ্যে। নিরস্ত্রীকরণ এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সভায় স্থায়ী আন্তর্জাতিক সালিসী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ সালেও হেগে আবার শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মেলন, সভা, প্রস্তাব ও সালিশী প্রভৃতির মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক স্বার্থ স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রে মানিয়া লওয়ায় যখনই আন্তর্জাতিক স্বার্থের সহিত জাতীয় স্বার্থের সংঘর্ষ বাধিয়াছে তখনই যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতেই ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়। এই রাষ্ট্রগুলি উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা নানা দেশে ঔপনিবেশ বিস্তার করে।

আধুনিকযুগে আন্তর্জাতিকতাবাদকে এক নূতন দৃষ্টি লইয়া বিচার করা হয়। আধুনিক আন্তর্জাতিকতাবাদ সাম্রাজ্যবাদের দোসর নয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিকতাবোধ একটি মানসিক অনুভূতি। এই মানসিক অনুভূতি বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ববোধে মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, আবার সকল মানুষের বিচিত্র অবদানে সমৃদ্ধ বিশ্বসভ্যতার রসানুভূতিতে সঞ্জীবিত মানুষ আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করে। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির কামনা হইল সুখী জীবন। এই সুখী জীবনকে গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় তখনই, যখন পৃথিবীর প্রতিটি জাতি তাহাদের বিকাশের জন্য সর্ববিধ সুযোগ পাইবে। পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিবে না বরং ভালবাসিবে। কবিগুরুর ভাষায় "দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।" এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে

২) আন্তর্জাতিকতাবাদ

পারিলেই বিশ্ব **সৌভ্রাতৃত্ব** প্রতিষ্ঠিত হইবে। উগ্র জাতীয়তাবাদের আতঙ্কময় পরিবেশকে বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর পরস্পরের স্বাধীনতাকে সম্মান করিয়া, সহযোগিতার ভিত্তিতে যখন বসবাস করিতে পারিবে, তখনই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বিশ্বশান্তিকে রক্ষা করিবার প্রহরী হিসাবে কাজ করিবে আন্তর্জাতিক সংগঠন। আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমেই স্বজাতিপ্রেম ও আন্তর্জাতিক মানবতাবোধ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিবে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদের হাতে মানুষ যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষ একদিকে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, আর অপরদিকে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বহুজাতি প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই মহাসমরের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে **জাতিসংঘ (League of Nations)** প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জাতিসংঘের মাধ্যমে যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার আশা করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই। পুনরায় জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম শুরু হয় ও দ্বিতীয় বিশ্বসমর বাধে। এখন দ্বিতীয় বিশ্বসমর শেষ হইয়াছে। মানুষের উন্নতি করিবার ইচ্ছা, বাঁচিবার ইচ্ছা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা আবার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার দিকে প্রেরণা যোগাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পর পুনরায় মানুষ **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ "United Nations"** প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল সকল জাতির উন্নয়ন করা এবং যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বর্তমানে যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির ফলে জাতিতে জাতিতে বিভেদের প্রাচীর ধসিয়া পড়িতেছে। বিশ্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ভয়ে মানবসভ্যতা আজ এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ভারতের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী **নেহরু** বাঁচার একটা পথের ইংগিত দিয়াছেন। তিনি বলেন: "শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের বিকল্প হইতেছে সম্মিলিত বিনষ্টি"। ("The alternative to peacefull co-existence is co-destruction.") আন্তর্জাতিকতাবাদের মর্মকথাই হইল জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান।

বর্তমানে বিশ্বরাজনীতিতে আবার নূতন ধরনের সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। রাষ্ট্র-নৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টাই বর্তমান আন্তর্জাতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের মূল কারণ।* আবার অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের স্পৃহাও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কারণ।** বর্তমানে ইরাক, ইরাণ ও সৌদি আরবের অনাবিষ্কৃত **তৈলখনি**

* "The pursuit of political or economic power has been the main dynamo of international movements and conflicts."—Friedmann

** "The quest for economic power is the main source of international conflicts."—Friedmann

আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পারস্য উপসাগরের ও ভূমধ্য-সাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের তৈলসম্পদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সোভিয়েত রাশিয়া ইরাণের উপর যেমন চাপ সৃষ্টি করিতেছে তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদের উপরও কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। ফলে আবার তৃতীয় বিশ্বসমরের আশঙ্কা করা যাইতেছে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের ধ্বংসকারী সংঘর্ষের কারণ যেমন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ তেমনি আদর্শবাদের মধ্যে সংঘর্ষও বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বকে ধ্বংস করিতে সক্ষম। ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম, উদার ও জ্ঞানদীপ্ত মানবতা এবং শ্রেণীহীন সমাজবাদ প্রভৃতি আদর্শ সারা-বিশ্বে প্রচারিত হইতেছে। একটি আদর্শকে গ্রহণ করানোর জন্যই হয়ত যুদ্ধ নামিয়া আসিবে।

কার্ল মার্কস শত বৎসর আগে বিশ্বের সকল মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ("Workers of all lands unite.") হইবার আহ্বান জানান। অর্থনৈতিক সমস্বার্থের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানান। সকল দেশেই ধনিকশ্রেণী শোষণের উপর ভিত্তি করিয়া বাঁচিয়া আছে। ফলে সকল দেশেই এক শ্রেণীর মানুষ শোষিত হইতেছে। এই সকল দেশের শোষিত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হইয়া আন্দোলন করিলে জাতীয়তাবাদকে বুর্জোয়াশ্রেণী অপর দেশকে আক্রমণ করার কাজে লাগাইতে পারিবে না। বর্তমানে জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসাবে আঞ্চলিক শক্তিজোট, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, বিশ্বজনীন আইন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতেছে। কিন্তু শক্তিজোট শক্তিজোটের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার সমস্যায় বিব্রত; যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও পরস্পরবিরোধী যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

উপসংহারে বলা যায়, নিজের দেশের সবকিছুই গ্রহণ বা বর্জন এই উভয় মতবাদই অমঙ্গল সূচিত করে। নিজের দেশের যাহা ভাল ও শ্রেষ্ঠ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আবার অপর দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। সকল দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বমানবের বেদীতে নৈবেদ্য হিসাবে দান করা সঙ্গত এবং এই নৈবেদ্যের উপর সকলেরই সমান ভাগ। এইভাবে শ্রেষ্ঠত্বের আদান প্রদানের মধ্য দিয়া নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইবে। এই সভ্যতা জাতীয়তাবাদের আতঙ্ক হইতে মানুষকে রক্ষা করিবে এবং বিশ্বশান্তিকে সুদৃঢ় করিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুরাশি লইয়া যেমন মহাসাগরের সৈকতভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে তেমনি আকাশ যতই ভাঙ্গিয়া পড়ুক না কেন বিশ্বমানব প্রেমিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। এক পৃথিবীর স্বপ্ন সার্থক হইবেই। মানবসমাজে শান্তি, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সারসংক্ষেপ

জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কুল সাহিত্য, ভাষা, আচার-ব্যবহার স্বভাব অভিযোগ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য প্রভৃতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে জনসমাজ বলা হয়। জনসমাজ জাতীয় জনসমাজে রূপান্তরিত হয় তখনই যখন জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়। আবার রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা গভীরতর হইলে জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। অনেক লেখক জাতির সংজ্ঞা দিয়াছেন।

জাতিগঠনের উপাদানগুলি হইল রক্তের সম্বন্ধ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, পিতৃপুরুষগণের অতীত স্মৃতি দেশগত কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ঐক্য, অর্থনৈতিক ঐক্য এবং ভাবগত ঐক্য, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা", এই ভাবগত ঐক্যবোধের ভিত্তিতেই জাতি গড়িয়া উঠে।

প্রত্যেক জনসমাজ নিজেদেরকে এক শাসনাধীনে আনয়ন করিতে চায়। নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ অনুভব করে। ফলে তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয়। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি দাঁড় করানো যায়। জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার হিসাবে অভিহিত করা হয়। স্বাজাত্যবোধ অনেক সময় উগ্র রূপ ধারণ করে। উগ্র জাতীয়তাবাদ সভ্যতার এক সংকট বিশেষ।

বর্তমানে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিকতা-বাদ বর্তমান যুগে এক প্রশংসনীয় মতবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. Define Nationality, Nation and Nationalism.

(জাতীয় জনসমাজ জাতি এবং জাতীয়তাবাদ এর সংজ্ঞা দাও।)

2. What is meant by the doctrine of self determination? Discuss in this connection the value and limitations of this doctrine

(জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের তত্ত্ব বলিতে কি বুঝায়? এই প্রসঙ্গে ইহার মূল্য ও সীমা আলোচনা কর।)

3 What is meant by Nationalism? Is the idea of Nationalism compatible with the existence of an International order? Give reasons for your answer.

(জাতীয়তাবাদ কাহাকে বলে? জাতীয়তাবাদের আদর্শ আন্তর্জাতিকতাবাদের সহিত কি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।)

4 'The future of civilization lies in a synthesis of nationalism and internationalism" Explain fully and give your own views with reasons there of."

('ভবিষ্যৎ সভ্যতা নির্ভর করে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সংমিশ্রণের উপর। এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর এবং যুক্তিসহ তোমার মতামত লিখ।)

5 "One Nation, one State" Discuss the underlying principle of the slogan and the part played by it in the formation of a modern state. Point out its limitations if any.

("এক জাতি, এক রাষ্ট্র"—এই স্লোগানের অন্তর্নিহিত নীতিটি সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে ইহার অংশগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইহার সীমা নির্দেশ কর।)

6. Discuss the value and limitations of Nationalism as a political ideal.
(জাতীয়তাবাদের মূল্য ও সীমা সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

7. Define Nation.
(জাতির সংজ্ঞা দাও।)

অতিরিক্ত পাঠ্য

Delisle Burns,—Political Ideas.

Carlton, J. H. Hayes—Essays on Nationalism

Rabindranath—Nationalism.

Mac Iver.—Modern State.

Laski—Grammar of Politics.

Friedmann—World Politics.

Lloyed—Democracy and its Rivals.

S. Mukherjee—International law Redefined

৫ | সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
(United Nations)

[সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—উদ্দেশ্য, গঠন এবং কার্যাবলী]

(The United Nations—objectives, structure and functions)

আন্তর্জাতিকতাবাদের রূপরেখা (Outline of Internationalism) ঃ আধুনিক জগতে জাতীয়তাবাদ একটা বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই জাতীয়তাবাদের কষ্টিপাথরে বিচার করিয়াই বর্তমান সভ্যতাকে বুঝিতে হইবে। জাতীয়তাবাদ দুইটি রূপ লইয়া হাজির হইয়াছে। ইহার একটি হইল কল্যাণের আর অপরটি অকল্যাণের রুদ্রমূর্তি। অন্যজাতির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া জাতির সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান করার নজীর আজও পাওয়া যায় নাই। ইতিহাস বরং ইহাই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, জাতীয় রাষ্ট্রগুলি আপন আপন সংকীর্ণ স্বার্থের খাতিরে পশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্যজাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রতলে অধীন জাতিগুলি নিষ্পেষিত, লুণ্ঠিত ও শোষিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদ সভ্যতার এক বীভৎস সংকট লইয়া আসিয়াছে যার যাঁতাকলে দুর্বল জাতিগুলি শোষিত হইতেছে। ক্ষমতা বিস্তারের জন্য দানবীয় পশুশক্তি লইয়া শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি বারংবার রক্তাক্ত যুদ্ধ ডাকিয়া আনিয়াছে। একবার ১৯১৪ সালে আর একবার ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ পৃথিবীতে রক্তের নদী বহাইয়া দিয়াছে। এই দুইটি মহাযুদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের সর্ববিধ্বংসী ভয়ংকর রূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। আণবিক বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় মানব সভ্যতা ঘোরতর রূপে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। সভ্যতার আদিমকাল হইতে আজ পর্যন্ত জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ পৃথিবীর বুকে মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও ধ্বংস আনিয়াছে। এই দারুণ বিপর্যয়ের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার উপায়স্বরূপ শান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শ বারংবার মানব সমাজে উত্থাপিত হইয়াছে। ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে বিশ্ব-

(১) জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

সৌভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত হইয়া মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিয়া আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করিতে পারিলেই যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া তিরোহিত হইবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ নূতন নয়। জাতিগঠনের বহু পূর্বেই মানুষ বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শান্তিকামী মানুষ চিরকালই বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস চালাইয়াছে।

(২) মধ্যযুগ

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদ্বয় **পিয়ের দুবু** এবং **দান্তে** আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। দুবু প্রস্তাব করেন ইউরোপের রাজাদের একটি সংঘ গঠন করার এবং আন্তঃরাষ্ট্রিক বিবাদ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক সালিশী ও আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠিত করার। আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলেন। ইতালীর মহাকবি **দান্তে** প্রস্তাব করেন যে, পশ্চিম ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একজন সর্বগুণসম্পন্ন সম্রাট প্রয়োজন। এই সম্রাটের অধীনে বিভিন্ন রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৩) রেনেসাস

রেনেসাস বা নবজীবনায়নের যুগে **ইর‍্যাসমাস** যুদ্ধের বিরোধিতা করেন এবং শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রাজন্যবর্গের-দ্বারাই এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপসে বিবোধ মীমাংসাব জন্য সালিশী প্রথার প্রবর্তনও তিনি সুপারিশ করেন। ১৬২৩ সালে ইতালীর **এমেরিক ক্রুচে** ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির জন্য একটি সংঘ এবং তাহাদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য সালিশী ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ১৬৩৪ সালে ফরাসী চিন্তাবীর **সালী** প্রস্তাব করেন যে, ইউরোপের ১৫টি রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়া একটি পরিষদ গঠন করিবে। এই পরিষদই আন্তর্জাতিক মৈত্রী রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ১৬৯৭ সালে **উইলিয়াম পেন** আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।

(৪) অষ্টাদশ শতাব্দী

১৭১০ সালে **জন বেলার্স** প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে শান্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য একটি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা উচিত। এই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রত্যেক বৎসর একটি করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র কংগ্রেস আহ্বান করা হইবে এবং রাজন্যবর্গও রাষ্ট্রগুলির দাবি দাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা ও মীমাংসার ব্যবস্থা করা হইবে। ১৭১৩ সালে **এ্যাবে দ্য সাঁ পিয়েরে** প্রস্তাব করেন যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির একটি কংগ্রেস থাকিবে। এই কংগ্রেস আন্তর্জাতিক চিরন্তন শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। **রুশো** ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার পরামর্শ দেন। ১৭৯৫ সালে **কান্ট** জাতিসংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় অনেক চিন্তাবীর আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রচার করিয়াছেন, অনেকে **বিশ্ব রাষ্ট্রের** কল্পনাও করিয়াছেন কিন্তু এই আদর্শকে বাস্তবে প্রয়োগ করার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। তবে **ইউরোপের কনসার্ট, পবিত্র চুক্তি, আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন** এবং **হেগ সম্মেলন** প্রভৃতি আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার বাস্তব প্রয়োগের নজির। ইউরোপের কনসার্টের (The Concert of Europe) সার কথা ছিল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও ব্রিটেনের স্ব স্ব স্বার্থ, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। রাশিয়ার রাজা জারের নেতৃত্বে যে পবিত্র চুক্তি (The Holy Alliance) হইয়াছিল তাহার সার কথা হইল চুক্তির স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি ন্যায়, শান্তি ও ধর্ম নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে। আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন ছিল সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়া ১৮৯৯ সালে হেগ শহরে অনুষ্ঠিত হেগ সম্মেলনে ২৪টি রাষ্ট্র যোগদান করে। নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া শ্রমিকদের উন্নতি বিধানকল্পে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে আরও বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

(৫) ইউরোপের কনসার্ট, পবিত্র চুক্তি, হেগ সম্মেলন, আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করে এবং ইহারই ফলে ১৯১৪ সালে সার্বিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হয়।

জাতিসংঘ

(League of Nations)

১৯১৪ সালে বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯১৯ সালে উহা শেষ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীকে যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। জাতিসংঘ বিশ্বসৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করিয়া অতি-জাতীয়তার স্বপ্নকে সার্থক করিবার প্রথম প্রচেষ্টা। জাতিসংঘ ভার্সাই চুক্তির একটি অংশ। ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারী জাতিসংঘ সরকারীভাবে প্রবর্তিত হয়। জাতিসংঘের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি হইল: (১) সভা, (২) পরিষদ এবং (৩) কর্মদপ্তর। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো **উইলসনই** ইহার জনক।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য রাজ-

নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। আবার যুদ্ধকে পরিহার করিবার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করা হয়। জাতিসংঘের সভ্যসংখ্যা ছিল প্রথমে ৪০টি। ১৯৩২ সালে সভ্যসংখ্যা ছিল ৫৫টি। পরে ১৯৩৪ সালে রাশিয়া যোগদান করে। জার্মানীকেও জাতিসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হয়। জাতিসংঘের সভায় ২/৩ অংশ ভোটে নূতন কোন রাষ্ট্রকে সদস্যপদ দেওয়া যাইত। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রেরই সার্বভৌমিকতাকে স্বীকার করা হয়। সদস্যগণের চুক্তির সর্তাদি পালন করা বাধ্যতামূলক ছিল না।

(৬) উদ্দেশ্য

সভা (Assembly) ঃ সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া সভা গঠিত হইত। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের তিনজন করিয়া প্রতিনিধি সভায় থাকিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রস্তাব পাসের জন্য **সর্বসম্মত** ভোটের প্রয়োজন হইত। সভা পরিষদের কার্যের তদারক করিত। সভা শান্তিশৃংখলা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার বিচার বিবেচনাও করিত।

পরিষদ (Council) ঃ প্রথমে পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিল মোট ৯টি। ইহার মধ্যে ৫টি ছিল স্থায়ী সদস্য আর ৪টি ছিল অস্থায়ী সদস্য। ১৯৩৯ সালে স্থায়ী সদস্য ছিল ৩টি আর অস্থায়ী সদস্য ছিল ১১টি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করে নাই। সভার মতো পরিষদও বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের বিচার বিবেচনা করিতে পারিত। প্রত্যেক সদস্যেরই একটি করিয়া ভোটাধিকার ছিল। অধিকাংশ বিষয়েই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইলে সদস্যদের সর্বসম্মত হইতে হইত। পরিষদই আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করিত।

কর্মদপ্তর (Secretariate) ঃ জাতিসংঘের একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছিল। কর্মদপ্তর সভার ও পরিষদের কর্মসূচী প্রণয়ন করিত। সভা কর্মদপ্তরের একজন সম্পাদক নির্বাচন করিত।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত (Permanent Court of International Justice) ঃ ১৯৩০ সালে ১৫ জন বিচারক লইয়া একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়। ইহার কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৯ বৎসর। ইহা বিচারযোগ্য যে কোন মামলার বিচার করিতে পারিত। ইহা ছাড়া শ্রমিকগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একটি **আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organisation : I. L. O.)** গঠন করা হয়। আবার জাতিসংঘের কতকগুলি সাহায্যকারী সংস্থাও ছিল, যেমন, (১) অর্থনৈতিক ও মূলধন বিষয়ক সমিতি, (২) যানবাহন ও চলাচল সংক্রান্ত সমিতি ও (৩) স্বাস্থ্য সংস্থা প্রভৃতি। এই সকল সংস্থাগুলি অনুন্নত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, যানবাহন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উন্নয়নের কাজ করিত। ইহা ছাড়া (১) নিরস্ত্রীকরণ সমিতি, (২) অস্বায়ত্তশাসিত দেশের শাসনভার গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ক সমিতি এবং (৩) সামাজিক ও মানসিক

কর্তব্য সংক্রান্ত সমিতি প্রভৃতি নামে কতিপয় উপদেষ্টা সমিতি জাতিসংঘকে কাজে সাহায্য করিত।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা : উগ্র জাতীয়তাবাদ জাতিসংঘের পতন অনিবার্য করিয়া তুলিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান না করায় জাতিসংঘ দুর্বল হইয়া পড়িল। জাতিসংঘের স্থায়ী কোন সৈন্যদলও ছিল না, সুতরাং বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইলেও জাতিসংঘ বলপ্রয়োগ করিতে পারিত না। আবার সদস্য রাষ্ট্র তাহাদের খেয়াল খুশি মতো শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিত বলিয়া জাতিসংঘের মূল্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এই সকল দুর্বলতার সুযোগ লইয়া জাতিসংঘের বাহিরে বিভিন্ন শক্তিজোট সৃষ্টি হইল। জাপান ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। ইতালি ইথিওপিয়া আক্রমণ করিল (১৯৩৫)। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডকে গ্রাস করিল। ১৯৩৯ সালে আবার দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের হুংকারে ধরণী প্রকম্পিত হইল। এই যুদ্ধে একদিকে ছিল জার্মানী, জাপান ও ইতালী আর অপর দিকে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। জার্মানী, জাপান ও ইতালী পরাজিত হয়। এই ভাবে জাতিসংঘের পতন ঘটে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
(United Nations)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম (Origin of the United Nations) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালে এবং শেষ হয় ১৯৪৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় সাধারণ মানুষ ও যুদ্ধমান জাতিগুলিও যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিতেছিল। জাতিসংঘের প্রতি সাধারণ মানুষ আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আপস মীমাংসার দ্বারা সকল বিবাদের মীমাংসা করিয়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের পরিবর্তে **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ** (United Nations) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ হইতে জন্ম হয় জাতিসংঘের আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ হইতে জন্ম হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়াযই মিত্র পক্ষের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ১৯৪১ সালে ঘোষণা করিলেন যে প্রতিটি জাতীয় সমাজের (Nationality) জাতিপর্যায়ে (Nation) উন্নীত হইবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। অর্থাৎ পরাধীন দেশের স্বাধীন হইবার অধিকার আছে। তিনি তাঁহার ঘোষণার মধ্যে চারিপ্রকার স্বাধীনতার কথা বলেন। ইহারা হইল (১) বাক্য ও মতপ্রকাশের

(৭) জন্ম

স্বাধীনতা, (২) ধর্মের স্বাধীনতা, (৩) দারিদ্র্য হইতে মুক্তি এবং (৪) ভয় হইতে মুক্ত হইবার স্বাধীনতা। ১৯৪১ সালের ১২ই জুন লণ্ডনে মিত্র পক্ষীয় শক্তি সমূহ সমবেত হইয়া ঘোষণা করে যে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশ্বের স্বাধীন মানুষকে একযোগে কাজ করিতে হইবে। এই ঘোষণাকে **লণ্ডন ঘোষণা (London Declaration)** বলা হয়।

১৯৪১ সালের ১৬ই আগষ্ট মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রিন্স অব ওয়েলস্ নামক যুদ্ধজাহাজে মিলিত হইয়া একটি ঘোষণা প্রচার করেন। ইহাই **আটলাণ্টিক চার্টার** নামে খ্যাত। আটলাণ্টিক চার্টারে আটটি মৌলিক নীতি ঘোষিত হয়। এই নীতিগুলি হইল (১) মিত্রপক্ষ কখনও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইবে না, (২) কোন ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমারেখা সেই ভূখণ্ডের জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তিত হইতে পারিবে, (৩) জাতীয় জনসমাজের ইচ্ছামতো সরকারের প্রকৃতি ও গঠন নির্ধারিত হইবে, (৪) মিত্র পক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহ ব্যবসাবাণিজ্য ও কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানির জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের সহিতই সম-ভিত্তিক বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে, (৫) প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ে এক সংহতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে, (৬) জার্মানীর পতনের পর প্রতিটি রাষ্ট্রই নিরাপদে বাস করিতে পারিবে, (৭) শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতিটি জাতির লোকেই বাধাবিপত্তিহীনভাবে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারিবে এবং (৮) বিশ্বের প্রতিটি জাতিই শক্তিপ্রয়োগ নীতি বর্জন করিবে।

(৮) আটলান্টিক সনদ

আটলাণ্টিক চার্টার বা সনদের ৮টি মৌলিক নীতির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রনায়কগণ নূতন পৃথিবী গঠনের আশা প্রকাশ করেন। ইহা মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের চতুর্দশ দফা সর্তাবলীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ইহার পর ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী ২৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ আটলাণ্টিক সনদের নীতির ভিত্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন **(The United Nations Declaration, January, 1942)**। যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে ভাবীকালকে মুক্ত করিবার, স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার এবং ব্যক্তি ও জাতির সমানাধিকার স্বীকারের নীতিই ছিল আটলাণ্টিক সনদের মূলনীতি। তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কথাটি ব্যবহার করেন রুজভেল্ট।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে চার্চিল, রুজভেল্ট এবং ফ্রান্সের প্রতিনিধিগ উত্তর আফ্রিকার ক্যাসারাঙ্কা শহরে সমবেত হন এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিভি রাষ্ট্রের কিরূপ ভূমিকা হইবে তাহা লইয়া আলোচনা করেন। ঐ বৎসর মে মা ভার্জিনিয়ার হটস্প্রিংএ বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ উদ্বাস্তুদের খাদ্যসমস্যা লই আলোচনা করেন। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে ব্রিটিশশক্তিসমূহ মস্কো ঘোষণ মাধ্যমে বিশ্বসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এই প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী [illegible] রাষ্ট্রের সমানাধিকার থাকিবে এবং এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শান্তি ও রক্ষা করিবে।

যুদ্ধকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য বিভিন্ন আলাপ আলোচনা হইয়াছে কিন্তু সক্রিয় কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ১৯৪৪ সালের ৭ই অক্টোবর ডামবারটন ওকস্ কনফারেন্সে (Dumberton Oaks Conference) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের একটি বাস্তব পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় প্রথম বলা হয় যে, ১১ জন সদস্য লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মৌলিক বৈশিষ্ট্যও এই পরিকল্পনায় ছিল।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রিমিয়ার ইয়াল্টায় রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিন মিলিত হন। এই সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদের ভোটদান পদ্ধতি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়। ইয়াল্টাতেই রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিন স্থির করেন যে, ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সানফ্রান্সিসকো শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং এইসভায় পূর্ববর্তী বিভিন্ন সম্মেলনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ গ্রহণ করে। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সংস্থা পূর্বাহ্নেই অর্থাৎ যুদ্ধকালীন সময়েই কাজ আরম্ভ করিয়া দেয় এবং বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য সংগঠিত হয়। সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনেই ঠিক হয় যে, সদস্যরাষ্ট্র তাহাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করিবে না এবং বড়ো পাঁচটি শক্তি ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করিবে। ঠিক হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন এই পাঁচটি বড়ো শক্তি নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন লাভ করিবে। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল জাতিসংঘ আর তার ২৬ বৎসর পর ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদিও কোন রাষ্ট্র নয় তবে অনেকে ইহাকে অভিভাবক রাষ্ট্রের পর্যায়ে ধরিয়া থাকেন। ইহার একটি সনদ (Charter) আছে। এই সনদে ১১১টি ধারা সংকলিত হইয়াছে। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩৮টি।

প্রস্তাবনা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে একটি সনদ প্রণীত হইয়াছে তাহার গোড়ায়ই একটি প্রস্তাবনা যুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবনায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, "আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিটি মানুষ প্রতিজ্ঞা করিতেছি—পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে মানুষের জীবনে যে অপরিসীম দুঃখকষ্ট নামিয়া আসিয়াছে তাহার হাত হইতে ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে যাহাতে রক্ষা করা যায় তাহার জন্য সচেষ্ট হইব এবং আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মৌলিক মানবিক অধিকার, মানুষের মর্যাদা, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সম অধিকার ও ছোট বড়ো প্রতিটি জাতির মধ্যে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইব এবং আমরা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিব যাহাতে ন্যায় ও সম্মানের সহিত মানবিক কল্যাণের জন্য যে কোন চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করা যায়

(১) প্রস্তাবনা

এবং সম্প্রসারিত স্বাধীনতায় সামাজিক অগ্রগতি ও জীবনধারণের মানের উন্নতি সাধনের জন্য নিরলস চেষ্টা করিয়া যাইব এবং এই সকল উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিবার জন্য আমরা পরস্পরকে সাহায্য দান ও সহনশীলতার মাধ্যমে যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবেশীর মতো বসবাস করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিয়া যাইব এবং

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য সম্মিলিত হইব এবং

মানবিকতার এই মহান আদর্শ ও পদ্ধতিগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য একমাত্র সম্মিলিত স্বার্থ ব্যতীত সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করিব না এবং

বিশ্বমানবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিব।"*

এই প্রস্তাবনায় বিশ্বে শান্তিকামী মানুষের নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিবার আশা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রণেতৃবর্গ বিগত যুদ্ধের ফলাফল বুঝিয়াই প্রস্তাবনায় ভাবীকালের মানুষকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে মুক্তি, মানবিক অধিকার স্থাপন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক নীতি ও নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অনুন্নতজীবন ধারণের মানোন্নয়ন, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা প্রভৃতি জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য প্রস্তাবনায় ঘোষিত হইয়াছে।

---

* "We the peoples of the United Nations, determined

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life time has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote Social progress and better standards of life in larger freedom,

And for these ends

to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbour, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institutions of methods that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

have resolved to combine our efforts to accomplish these aims,

Accordingly, our respective governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organisation to be known as the United Nations".—Preamble.

প্রস্তাবনাকে দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম অংশে জাতিপুঞ্জের জনগণ কতকগুলি উদ্দেশ্যকে বিশিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকর করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় অংশে দেখা যায় জনগণের সরকারসমূহ সনদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য (Objectives of the U. N) ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতকগুলি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে মোট ১১১টি ধারা আছে। এই সনদে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দেশ্যগুলি হইল ঃ

(১) যুদ্ধই যে বিশ্বশান্তিকে ব্যাহত করে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে মুক্ত করাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শাস্তিদান এবং শান্তিপূর্ণভাবে সকল বিরোধের মীমাংসা করা সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের উদ্দেশ্য।

(২) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও সমানাধিকারের নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীর সম্পর্ক প্রসার করাও ইহার উদ্দেশ্য।

(৩) যুদ্ধ বাধে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে। যুদ্ধকে বন্ধ করিতে হইলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা, মানব অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মানসূচক মনোভাব সৃষ্টি করা। এই কারণে জাতিপুঞ্জ এইরূপ মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়াছে।

(৪) বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিলে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া উঠিবে।

নীতি (Principles) ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্যরাষ্ট্রদের জন্য কতকগুলি অবশ্য পালনীয় নীতি গৃহীত হইয়াছে। সকল সদস্যরাষ্ট্রকে সনদের সর্তাধীন দায়িত্বগুলিকে বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিতে হইবে। সদস্যরাষ্ট্রকে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিবাদ মীমাংসা করিতে হইবে। তাহারা আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত করিতে পারিবে না। সদস্য রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলপ্রয়োগদ্বারা ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

সনদে বর্ণিত বিষয়গুলি কার্যকর করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সকল সদস্যের সাহায্য লইতে হইবে। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ যদি বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্র ঐ রাষ্ট্রকে সাহায্য করিতে পারিবে না। জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রও যাহাতে এই নীতিগুলি পালন করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জাতিপুঞ্জ

(১০) নীতি

সদস্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না; কিন্তু যদি কোন সদস্যরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ঘটনা বিশ্বশান্তি ভঙ্গের কারণ হয় তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে।

মূল্যায়ন: সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদর্শ মহৎ এবং ইহা নীতি সম্মত। কিন্তু বাস্তব আর নীতি এক জিনিস নয়। আবার নীতিগুলি ঘোষিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা পালনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা খুব কমই আছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে বটে কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের গঠনের ক্ষেত্রে ৫টি রাষ্ট্রকেই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। এই সুবিধা হইল তাহাদের ভিটো দেওয়ার ক্ষমতা। অতএব সমানাধিকারের নীতি কার্যকর হয় নাই। কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিষয় কি তাহার ব্যাখ্যা লইয়া গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য, কোরিয়ার যুদ্ধ, হাঙ্গেরীর গণঅভ্যুত্থান, ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল সংক্রান্ত বিবাদ—উহাদের ঘরোয়া ব্যাপার কিনা তাহা লইয়া জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যোগদানকারী রাষ্ট্রের সরকারই সনদ রচনা করিয়াছে, জনগণ করে নাই। তবে সরকার কর্তৃক সনদ গ্রহণ করা আর জনগণ কর্তৃক সনদ গ্রহণ করা একই কথা। যদিও বলা হয় ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর। এইদিন হইতেই সনদ কার্যকর হয়।

বাস্তব আর কল্পনা এক নয়। কল্পনাকে বাস্তবরূপ না দেওয়া পর্যন্ত উহার কোন কার্যকররূপ থাকে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনায় কতকগুলি কাল্পনিক ছবি আছে কিন্তু বাস্তবে সনদের ধারাগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় ইহাতে প্রস্তাবনার অনেক কিছুই বাদ পড়িয়াছে। যেমন, নারী ও পুরুষের সমানাধিকার, মানুষের মর্যাদা, যোগ্যতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতির আদর্শ সনদে স্বীকৃত হয় নাই; শুধু উহা প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে। প্রস্তাবনার সহিত যদি সনদের মূলধারার অসঙ্গতি দেখা দেয় তবে মূল ধারাই কার্যকর হইবে। প্রস্তাবনার মূল্য থাকিবে না। ইহা স্মরণ রাখিয়া প্রস্তাবনাকে বিচার করিতে হইবে। সনদে উদ্দেশ্য হিসাবে লেখা আছে যে, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা হইবে কিন্তু আজও ইজরায়েল, সৌদি আরবিয়া প্রভৃতি দেশে যুদ্ধ চলিতেছে। কার্যকরীভাবে জাতিপুঞ্জ কিছু করিতে পারিতেছে না। ইহা তাহার দুর্বলতার নজির বহন করিতেছে।

প্রস্তাবনাকে সনদের অংশ হিসাবে ধরা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বক্তব্যের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতার সর্ত আরোপ করা হয় নাই। অবশ্য, ইহা সনদের ব্যাখ্যায় সাহায্য করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন (Structure of the U. N.): দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাষ্ট্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য ছিল। প্রথমে ৫১টি রাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে যে কোন রাষ্ট্র সনদ মানিয়া লইলে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করিতে পারে। বর্তমানে ১৩৮টি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য। জাতিপুঞ্জের সংগঠন ৬টি বিভাগ লইয়া গঠিত। ইহারা হইল: (১) সাধারণ সভা, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) আন্তর্জাতিক বিচারালয়, (৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৫) অছি পরিষদ এবং (৬) কর্মদপ্তর।

(১) সাধারণ সভা (The General Assembly): সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি বিশ্বরাষ্ট্র (World State) বা অতিজাতীয় রাষ্ট্র (Super State) নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের কোন সদস্য রাষ্ট্রই তাহাদের সার্বভৌমিকতা ত্যাগ করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করে নাই। ডি. সি. কয়েল বলেন, জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা একটি বিশ্ব-সরকার নয়। ইহা হইল জগতের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা সভা এবং জগতের শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্র।* জাতিপুঞ্জ সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে না পারিলেও ইহা আন্তর্জাতিক জনমতের নৈতিক শক্তিতে শক্তিমান।

জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যকে লইয়া সাধারণ সভা গঠিত হয়।** প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই ৫ জন করিয়া প্রতিনিধি সাধারণ সভায় পাঠাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই একটি করিয়া ভোট দিতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সাধারণ সভা সকল সদস্য রাষ্ট্রের সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। নিয়মিতভাবে সভার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। তবে নিরাপত্তা পরিষদ অথবা অধিকসংখ্যক সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে সভার বিশেষ অধিবেশন হইতে পারে। সাধারণ সভা প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য একজন সভাপতি ও সাতজন সহ সভাপতি নির্বাচিত করে। তবে এই সভাপতি কোন বড় শক্তির হইবে না। সাধারণ সভা সনদের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে। যে কোন সদস্য যে কোন বিষয় লইয়া নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সাধারণ সভা যখন, (১) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন করে, (২) আইনভঙ্গকারী সদস্যদের জাতিপুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করে, (৩) বাৎসরিক বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী গ্রহণ করে, (৪) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে, (৫) নূতন

(১১) সাধারণ সভার গঠন

*'This is not a world governmont. This is a world meeting to talk over the pressing dangers ot our times and to haunt for the way to prosperity and world peace."—D.C. Koyel

**The General Assembly shall consists of all mombers of the United Natiorn.

কোন সদস্যরাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ করে, (৬) অনুন্নত দেশগুলির তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং (৭) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে তখন উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের ⅔ অংশের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাধারণ সভার প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য ৭টি প্রধান কমিটি গঠিত হয়।

(১) **কার্যাবলী**ঃ সাধারণ সভা "বিশ্বের বিতর্ক সভা"। বিতর্কের মাধ্যমে বিশ্বের জনমত গঠন করাই ইহার কাজ। সাধারণ সভা সনদে বর্ণিত যে কোন বিষয়ের উপর আলোচনা করিতে পারে। ইহা জাতিপুঞ্জের সকল সংগঠনের কার্যাবলীর আলোচনা করিতে পারে। আবার প্রয়োজনবোধে কোন সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। এই সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাবলীর উপর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে—নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান, অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতির ঘোষণা করিতে পারে। সাধারণ সভা ১৯৪৯ সালে শান্তির মূলনীতি সম্পর্কে প্রস্তাব এবং ১৯৫৭ সালে শান্তিপূর্ণ-সহ অবস্থানের উপর প্রস্তাব গ্রহণ করে।

(২) **শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক কার্য**ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্র বা সদস্যরাষ্ট্র নয় এমন সব রাষ্ট্র শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্ন বিচার বিবেচনার জন্য সাধারণ সভার নিকট পেশ করিতে পারে। সাধারণ সভা বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। অবশ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন যদি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন থাকে তবে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি ছাড়া সাধারণ সভা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উপর আলোচনা করিতে পারে না। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদ নিষ্ক্রিয় থাকিলে সাধারণ সভা আলোচনা করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের ৭ জন সদস্য যদি সম্মতিজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে এইরূপ প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদের আওতা হইতে সাধারণ সভায় সরাইয়া লওয়া হয়। কোরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে নিরাপত্তা পরিষদের আওতা হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদের এলাকাধীন। কিন্তু ১৯৫০ সালের শান্তির জন্য সম্মিলিত হইবার প্রস্তাবের (**Uniting for Peace**) মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদের ৭ জন সদস্য সমর্থন জানাইলে বা সাধারণ সভার অধিকাংশ সদস্য দাবি করিলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে সশস্ত্র বাহিনী প্রয়োগের জন্য সাধারণ সভা সুপারিশ করিতে পারে।

(গ) **আইন সংক্রান্ত বিষয়**ঃ সাধারণ সভা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতে পারে। ইহা বিশ্বনাগরিক সভা (Town meeting of the World)। ইহা কূটনৈতিকদের সম্মেলন। কিন্তু ইহাকে আইন প্রণয়নী সভা বলা যায় না। আবার ইহার প্রণীত আইন বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হয় না। সাধারণ সভা ১৯৪৮ সালে একটি আন্তর্জাতিক আইন কমিশন নিয়োগ করিয়াছে। এই কমিশন বিভিন্ন নিয়ম-

কানুনের খসড়া রচনা করিবে ও উহা সাধারণ সভায় পেশ করিবে। এই খসড়ার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন ঘোষণা করা হয়। সাধারণ সভা বিভিন্ন রাষ্ট্রের আচার আচরণ সম্পর্কে নিয়মাবলী ঘোষণা করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রকে উহা পালন করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে। যেমন, সাধারণ সভা জাতীয়তা সংক্রান্ত নিয়মাবলী উদ্বাস্তুদের মর্যাদা সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছে।

(ঘ) **তদারকী কাজ**ঃ সাধারণ সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার কাজের তদারক করে। অভিভাবক পরিষদ, অর্থনৈতিক পরিষদ ও কর্মদপ্তরকে সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়াই কাজ করিতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদ অবশ্য, সাধারণ সভার সুপারিশ অগ্রাহ্য করিতে পারে।

(ঙ) **নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ**ঃ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নে সাধারণ সভা একক ক্ষমতা ভোগ করে না। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদের সদস্যগণকে এবং অভিভাবক পরিষদের সদস্যগণকে সাধারণ সভা এককভাবে নির্বাচন করে। জাতিপুঞ্জে নূতন সদস্য গ্রহণ করিতে হইলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫ জন সদস্য সহ ৯ জন সদস্যের সমর্থিত সুপারিশ থাকা দরকার এবং সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হওয়া দরকার। জাতিপুঞ্জের একজন কর্মসচিবকে (Secretary General) নির্বাচন করার সময় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সুপারিশ করা প্রার্থীকে সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে নিযুক্ত হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদস্যগণকেও নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। সাধারণ সভা জাতীয় আইন সভার মতো ক্ষমতা ভোগ করে না কারণ, ইহার প্রস্তাব মান্য করিবার কোন আইনগত বাধ্য-বাধকতা নাই। এই কারণে, সাধারণ সভাকে **বিশ্বনাগরিকের আলোচনা সভা** (**World Conference**) বলা যাইতে পারে মাত্র। তবে ইহা ঠিক যে, সাধারণ সভা বিশ্বজনমত গঠন করিয়া কোন রাষ্ট্রকে সভার প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাধ্য করিতে পারে।*

(২) **নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)**ঃ নিরাপত্তা পরিষদ হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১ জন। ইহাদের মধ্যে স্থায়ী সদস্য ছিল ৫ জন। আর অস্থায়ী সদস্য ছিল ৬ জন। ১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী অস্থায়ী সদস্য সংখ্যাকে বাড়াইয়া করা হয় ১০ জন। ফলে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ জন। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স ও চীন। আর অস্থায়ী সদস্যগণকে সাধারণ সভা ২ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করে। অস্থায়ী সদস্যগণ ২ বৎসর অতিবাহিত হইবার পরই আবার নির্বাচিত হইতে পারে না। কিছু সময় বাদে তাহারা পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রের একজন করিয়া

(১) নিরাপত্তা পরিষদ

* 'The general assembly wields power primarily as voice of the concience of the world'.—Austin.

প্রতিনিধি থাকে নিরাপত্তা পরিষদে এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকে একটি করিয়া।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের গুরু দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিঘ্নস্বরূপ কোন অবস্থার সৃষ্টি হইলে নিরাপত্তা পরিষদ তাহার অবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে অনুধাবন করিতে পারে। শান্তিপূর্ণভাবে সকল বিরোধের মীমাংসার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলাপ, আলোচনা, সালিশী ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা অথবা বিচার করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ কোন বিবাদের মীমাংসা করিতে পারে এবং কোথাও শান্তিভঙ্গ হইয়াছে কিনা বা শান্তি ভঙ্গের আশংকা আছে কি-না তাহা নির্ধারণ এবং শান্তিরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাহা ঠিক করিবে।

নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। (ক) নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সহিত সকল প্রকার অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার নির্দেশ দিতে পারে। (খ) প্রথম ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হইলে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যে সকল স্থল, জল ও বিমানবাহিনী প্রদান করে তাহা শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিবে। এই সামরিক বাহিনী নিরাপত্তা পরিষদের সামরিক কর্মচারী কমিটি (Military Staff Committee) কর্তৃক পরিচালিত হইবে। প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রই সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী কোন দেশ এককভাবে বা অন্য কোন দেশের সহযোগিতায় যৌথভাবে আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। জাতিপুঞ্জের কোন সদস্যরাষ্ট্রের উপর কোন সশস্ত্র আক্রমণ ঘটিলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির সহজাত অধিকার বা যৌথ আত্মরক্ষার অধিকার সম্বন্ধে সনদের কোন অংশই অন্তরায় হইবে না। অবশ্য, আত্মরক্ষার এই অধিকার নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব ক্ষুন্ন করিতে পারে না।

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ হইল অছি পরিষদের সদস্য। অছি অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নূতন সদস্য গ্রহণ নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতির উপর নির্ভর করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকে সাধারণ সভা নিযুক্ত করে। নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভায় বাৎসরিক কার্য বিবরণী পেশ করে। কোনও সদস্যের সদস্যপদ প্রত্যাহার বা কাহাকেও বহিস্কার বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার নিকট সুপারিশ করিতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের ভোটদান পদ্ধতি ও ভিটো প্রথা : নিরাপত্তা

পরিষদের ভোটাভুটির পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট দিবার অধিকার আছে ("Each member of the Security Council shall have one vote." Art 27(1).] নিরাপত্তা পরিষদের সভায় পদ্ধতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইবার সময়ে ১০ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য থাকা চাই। এই ৫ জন সদস্যের কোন একজন সদস্য যদি অসম্মতিজ্ঞাপক ভোট দেয় তবে প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া যাইবে। স্থায়ী সদস্যের অসম্মতি জ্ঞাপক ভোট দ্বারা প্রস্তাব বাতিল হইবার পদ্ধতিকে ভিটো (Veto) প্রদান ক্ষমতা বলা হয় ; ভিটো ক্ষমতা বলে পাঁচটি বৃহৎশক্তি অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। আন্তর্জাতিক কোন বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে যদি বৃহৎ পঞ্চরাষ্ট্রের মধ্যে মতানৈক্য হয় তবে পঞ্চরাষ্ট্রের যে কোন রাষ্ট্র ভিটো প্রয়োগ করিয়া উহা বাতিল করিয়া দিতে পারে।

(১৩) পার্থক্য

নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার মধ্যে সম্পর্কঃসাধারণ সভা জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য লইয়া গঠিত আর নিরাপত্তা পরিষদ মাত্র ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত। সাধারণ সভা একটি আলোচনা সভা। ওপেনহিমের ভাষায় নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক কর্তব্য হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। সাধারণ সভা শান্তি রক্ষাকল্পে ও বিবাদ মীমাংসার জন্য কতকগুলি সুপারিশ করিতে পারে মাত্র। কিন্তু বিবাদ মীমাংসার অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদকে সাধারণ সভার নিকট আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কর্মপন্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করিতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদের রিপোর্ট গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের দ্বারা সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ধার্য করিতে পারে না। সাধারণ সভা সুপারিশ করিতে পারে কিন্তু বাধ্যতামূলক কোন আইন পাস করিতে পারে না। কোন বিরোধমূলক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ না করিলে সাধারণ সভা কোন সুপারিশ করিবে না। অতএব নিবাপত্তা পরিষদই বেশী ক্ষমতাশালী।

(১৪) যুগ্ম ক্ষমতা

কতকগুলি ক্ষেত্রে উভয়েই যুগ্ম ক্ষমতা ভোগ করে ; যেমন, জাতিপুঞ্জে কোন নূতন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি বা কোন সদস্যের জাতিপুঞ্জ হইতে বহিষ্কারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের উপর সাধারণ সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সুপারিশ মতো কাজ করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকে নিযুক্ত করিবেন। এই ক্ষেত্রে উভয়েরই ক্ষমতা রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণ নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা ভোটাভুটি করিয়া নিযুক্ত করে। উভয় সংস্থায় যে বিচারক বেশী ভোট পাইবে সেই নির্বাচিত হইবে।

১৯৪৫ সালে সনদে রচনাকারিগণ নিরাপত্তা পরিষদকে অধিক শক্তিশালী করিতে

একপক্ষ মামলা রুজু করিলে অপর পক্ষ সমর্থনসূচক অভিমত জানাইতে পারে (বিধির ৩৬ ধারা)।

(২) বাধ্যতামূলক এলাকা বলিতে বুঝায় যে কোন রাষ্ট্রই এই আদালতের আবশ্যিক কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে পারে। নিম্নলিখিত বিরোধের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্র সকল আদালতের এলাকাকে আবশ্যিক বলিয়া স্বীকৃতি দিতে পারে ঃ—যথা, (ক) কোন চুক্তির ব্যাখ্যা, (খ) আন্তর্জাতিক আইনের কোন প্রশ্ন, (গ) আন্তর্জাতিক দায়িত্ব-ভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ, (ঘ) কোন ঘটনার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব গ্রহণ। এই সকল বিষয়ে ঘোষণা নিঃশর্তভাবে করা যাইবে অথবা কতিপয় দেশের পাল্টা ঘোষণার সর্তে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা যাইবে। আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারের স্থায়ী আদালতের ঘোষণাগুলি এবং কার্যকর রহিয়াছে এমন ঘোষণাগুলিকে আন্তর্জাতিক আদালতের আবশ্যিক এলাকা মানিয়া লইবার ঘোষণা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) পরামর্শদান এলাকায় ইহার সদস্যদের পরামর্শ দেয়।

(৪) **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) ঃ** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যধারা দুইদিক হইতে বিচার্য—ইহার একদিকে হইল রাষ্ট্রনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক আর অপরদিকে হইল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক। নিরাপত্তা পরিষদ পৃথিবীর মানুষকে যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে মুক্ত করে আর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানুষকে অভাব হইতে মুক্ত করে (Freedom from want)। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া প্রকৃত শান্তি আসিতে পাবে না। মূলতঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যই সংঘাতের কারণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবীয় সমস্যাগুলি সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করা হইবে। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিবার জন্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

১৮ জন সদস্য লইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই ১৮ জন সদস্যকে নির্বাচিত করে সাধারণ সভা। ১৯৫৭ সালে সনদ সংশোধন করিয়া সদস্য সংখ্যা ১৮ জন হইতে বাড়াইয়া ২৭ জন করা হয়। সাধারণ সভা প্রতি বৎসর ৬টি রাষ্ট্রকে পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচন করে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের পুনর্নির্বাচনের অধিকার আছে। সদস্য রাষ্ট্রের কার্যকাল ৩ বৎসর নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সদস্য নির্বাচনের সময় ধর্ম, ভাষা, রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতির সমবণ্টন ও সমান প্রতিনিধিত্বের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি ঠিক করে সদস্য রাষ্ট্রবৃন্দ। ভোটদানকারী সদস্যের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষদ সভাপতি মনোনয়ন করে। পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের অনুরোধে এবং সভা আহবানের নিয়মকানুন অনুযায়ী ইহা মিলিত হইবে। পরিষদের অধিবেশন এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কে এবং জুলাই মাসে জেনেভায়

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ সদস্যের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সহযোগিতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথ বিস্তৃত করা পরিষদের কাজ। এই সকল বিষয়ে গবেষণা কার্য চালানোও ইহার কাজ। মানুষের মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানো ও তাহা মান্য করিবার জন্য পরিষদ সুপারিশ করিতে পারে। পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করিতে পারে। পরিষদের কাজে সহায়তা করিবার জন্য পরিষদ বিভিন্ন কমিশন নিয়োগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজ এক্তিয়ার ভুক্ত কোন বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারে।

বর্তমানে ৮টি কর্মগত (functional) এবং ৪টি আঞ্চলিক (regional) কমিশনের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। মানবিক অধিকার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশ্ববাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে পরিষদ কমিশন নিয়োগ করে। মানবীয় অধিকার বিষয়ে সার্বজনীন ঘোষণায় চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সদস্যদের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সর্ত বলা হইয়াছে। ৬০টির বেশী রাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত কমিশন আফিং, কোকেন, গাঁজা এবং রাসায়নিক মাদক ঔষধ সম্পর্কে পরিষদকে পরামর্শ দেয়। পরিষদের উল্লেখযোগ্য কমিশন হইল ইউরোপের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Europe . E. C. E), আফ্রিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Africa : E. C. A.), ল্যাটিন আমেরিকার জন্য কমিশন (Economic Commission for Latin America : E.C.L.A), এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের জন্য কমিশন (Economic Commission for Asia and the Far East : E. C. A. F. E.) : এই সবগুলি হইল আঞ্চলিক পরিষদ। ইহারা পরিষদকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে কাজে সাহায্য করে। এইসব কমিশন ছাড়া আরও কতকগুলি সংস্থার মাধ্যমে কমিশন কাজ করে। জাতিপুঞ্জ ভাবীকালকে শুধু যুদ্ধের বিভীষিকা হইতেই ত্রাণ করে না, ইহা মানুষের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ক্ষুধা ও হতাশা দূর করিবার কাজেও নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সহিত যুক্ত ১৩টি সংস্থা মানুষের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ক্ষুধা ও হতাশা দূর করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। পরিষদের সহিত যুক্ত এই সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : (১) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (F. A. O.), (২) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O), (৩) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (I. L. O.), (৪) শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (U. N. E. S. C. O.), (৫) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ভাণ্ডার (I. M. F.), (৬) বিশ্ব ব্যাঙ্ক (I. B. R. D.), (৭) সার্বজনীন ডাক ইউনিয়ন (International Postal Union), (৮) আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (International Trade Orga-

(১৭) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

nisation) এবং (৯) বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Meteorological Organisation (W. M. O.)।

জাতিপুঞ্জের সনদে বলা হইয়াছে যে, জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করিবে ; মানবিক অধিকার ও জাতি, ধর্ম, ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মৌল স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উৎসাহ দিবে। ইহাছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার প্রসারের জন্য সমান অধিকার এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া জাতি সমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য এবং স্থায়িত্ব বিধান ও মঙ্গলজনক অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য জাতিপুঞ্জ জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও প্রসার, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আর জাতি, ধর্ম, ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের উপর শ্রদ্ধা দেখানো হইবে।

(৫) **অছি পরিষদ (The Trusteeship Council)** : অছি পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি অঙ্গ। প্রথম যুদ্ধের পর যখন জাতিসংঘ গঠিত হয় তখন জাতিসংঘের অনুশাসন প্রাপ্ত কতকগুলি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স, জার্মান ও তুরস্কের কতকগুলি অঞ্চলের শাসনভার পায়, প্যালেস্টাইনের দায়িত্ব পায় ইংল্যাণ্ড আর সিরিযার দায়িত্ব পায় ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া। অষ্ট্রেলিয়া নিউগিনির শাসনভার পাইয়াছিল। জাপানও কতকগুলি দ্বীপ শাসনের ভার পাইয়াছিল। জাতিসংঘের অনুশাসন বলেই ইহারা শাসনভার পায়। ইহা ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বহুরাষ্ট্র পরাধীন থাকে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও বহুদেশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন থাকে। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খুব কম দেশই পাইয়াছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতকগুলি রাষ্ট্রের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। এই অছিভুক্ত অঞ্চলের শাসন পরিচালনার জন্য সনদের ৮৬ ধারা অনুসারে (১) অছি অঞ্চলের শাসনভার প্রাপ্ত সদস্য, (২) সনদের ২৩ ধারায় বর্ণিত সদস্যগণ, (৩) সাধারণ সভা কর্তৃক ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া একটি অছি পরিষদ গঠন করা হইবে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র অছি পরিষদে একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র সভায় ১টি করিয়া ভোট দিতে পারে। পরিষদ গঠনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে পরিষদের যতজন সদস্য প্রশাসনিক দায়িত্ব বহনকারী থাকিবে ঠিক ততজন সদস্য থাকিবে এইরূপ কর্তৃত্ব যাহাদের নাই তাহাদের মধ্য হইতে। সনদের ৮৯ (২) ধারা অনুসারে অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্রের ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষদের কাজ পরিচালনার নিয়মাবলী এবং পরিষদের সভাপতি নির্বাচন পরিষদ করিয়া থাকে। সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে অছি পরিষদ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যে

(১৮) অছি পরিষদ

রিপোর্ট পেশ করে তাহা বিবেচনা করে। পরিষদ আবেদন পত্র গ্রহণ ও পরীক্ষা করে। আবার পরিষদ নিজ নিজ অছিভুক্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে এবং অছি চুক্তি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অছি পরিষদ অছি অঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং এই তালিকার ভিত্তিতে অছিভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সাধারণ সভার নিকট বার্ষিক কার্য বিবরণী পেশ করিবে। আর অছি অঞ্চলের শাসনভার প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি। প্রশ্নতালিকার উত্তরগুলি পরিষদকে জানাইবে।

১৯৬২ সালে অধিকাংশ অছি শাসনভুক্ত অঞ্চল স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরি-চালনা আরম্ভ করে। অস্ট্রেলিয়ার অছি শাসনাধীন অঞ্চল নিউগিনিকে পার্শ্ববর্তী পাপুয়ার সহিত যুক্ত করা হয়। ১৯৬৩ সালে ইহাদের পার্লামেণ্ট নির্বাচন ও স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আবার অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বহুদেশ জাতিপুঞ্জের সহযোগিতায় ঔপনিবেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হইয়াছে। ইজরায়েল ও কঙ্গো তাহাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে জাতিপুঞ্জের সাহায্যে রক্ষা করিয়াছে। অছি শাসনাধীনে যতগুলি দেশ আছে সেই সবগুলি দেশ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিলে অছি পরিষদ বিলুপ্ত হইবে।

আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা (International Trusteeship System): আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর। অছি ব্যবস্থার মৌলিক লক্ষ্য হইল: (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা, (২) অছি অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক উন্নতি এমন ভাবে সাধন করা যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া উঠিতে পারে, (৩) জাতি, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগানো, (৪) জাতিপুঞ্জের সকল দেশ ও সকল অধিবাসীদের সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত ও সমদৃষ্টি সম্মত আচরণ করা (৭৬ ধারা)।

অছি চুক্তি অনুসারে যে সকল অঞ্চলে অছি ব্যবস্থা চালু হইবে তাহারা হইল: (১) ম্যানডেটের অধীন অঞ্চল, (২) বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সকল অঞ্চলকে শত্রু অধিকৃত রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, (৩) যে সকল অঞ্চলের শাসনভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় এ অঞ্চলকে অছি ব্যবস্থাধীনে দিতে চাহিবে। নিরাপত্তা পরিষদ অছি পরিষদের সাহায্যে অছি অঞ্চলের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমস্যার সমাধান করিতে পারে। অছি অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষগুলির কর্তব্য হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য অছি অঞ্চলগুলির ভূমিকা নির্ণয় করা।

(৬) **কর্মদপ্তর (The Secretariat):** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যসম্পাদন করিবার একটি সংস্থা আছে। এই সংস্থাটির নাম কর্মদপ্তর। একজন প্রধান কর্ম সচিব এবং কয়েকজন কর্মচারী লইয়া কর্মদপ্তর গঠিত হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের

সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। কর্মদপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীদের প্রধান কর্মসচিব নিয়োগ করেন। কর্মচারীদের নিয়োগের জন্য সাধারণসভা কতকগুলি নিয়ম রচনা করিয়াছে। এই নিয়ম অনুসারেই প্রধান কর্মসচিব কিছু করণিক, দপ্তর পরিচালক, গ্রন্থাগারিক, অনুবাদক, মুদ্রক এবং গবেষণাকারীদের নিয়োগ করেন। প্রায় ৪০০ কর্মচারী লইয়া এই দপ্তর গঠিত হইয়াছে। কর্মদপ্তরের কর্মচারিগণ জাতিপুঞ্জের বহিঃস্থ কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মান্য করিতে বাধ্য নয়। প্রায় ১০০টি দেশের ভাল ও গুণী লোকদের কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কোন কর্মচারীই নিজের দেশের সরকারের নির্দেশ মতো কাজ করে না। তাহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি নির্দিষ্ট পথেই কাজ করেন। কর্মদপ্তর কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া কাজ করে। যেমন, নিরাপত্তা পরিষদ বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ, লোকতথ্য বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতি।

কর্মদপ্তর সাধারণসভা চলাকালে সাধারণ সভার কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি দৈনিক বিবরণী প্রকাশ করে, সদস্য রাষ্ট্রের প্রদেয় অর্থ আদায়ের জন্য চিঠিপত্র দেয়, শিক্ষক সংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, গির্জা ও নিয়োগ কর্তাদের সংস্থাকে কর্মদপ্তর কাজে সাহায্য করে। সাধারণ সভার গৃহীত সুপারিশ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করাও কর্মদপ্তরের কাজ। ইহা একটি তথ্য সংস্থাও পরিচালনা করে।

আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের প্রধান কর্মসচিবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। আজ পর্যন্ত যে কয়জন প্রধান কর্মসচিব হইয়াছেন তাহারা হইলেন পর্যায়ক্রমে নরওয়ের ট্রিগভি লাই, সুইডেনের দাগ হ্যামারশীল্ড, ব্রহ্ম দেশের উথান্ট, অটোয়ার কুট ওয়াল্ডহেইম। প্রধান কর্মসচিব নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার অধিবেশনের কার্যসূচী সহকারীদের সাহায্যে স্থির করেন। অবশ্য ভোটাভুটির মাধ্যমে এই কার্যসূচীর পরিবর্তন করা যায়। সাধারণসভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অছিপরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সকল অধিবেশনে প্রধান কর্মসচিব পদাধিকার বলে যোগদান করিতে পারেন। এই সকল সংস্থার নির্দেশিত কাজও তিনি করিবেন। তিনি সভায় বক্তৃতাও দিতে পারিবেন।

সনদ অনুসারে সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের সকল অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন। সাধারণ সভা, বিভিন্ন পরিষদ ও কমিশনের সভায় তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন। এই সকল সংস্থার নির্দেশ তিনি সম্পাদন করিবেন। সেক্রেটারী জেনারেলের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব ও রাজনৈতিক ভূমিকা আছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাভঙ্গকারী যে কোন বিষয় সম্পর্কে সেক্রেটারী জেনারেল নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। সেক্রেটারী জেনারেল কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা ভোগ করেন। তিনি জাতিপুঞ্জের সার্বিক প্রতিভূ, তিনি জাতিপুঞ্জের সনদের নীতি ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

তিনি কমগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাধারণ সভায় উপস্থিত করেন। প্রতিবৎসর এবং সাধারণ সভার নিকট একটি বিবরণী পেশ করেন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাসে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিভিন্ন সেক্রেটারী জেনারেল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। সেক্রেটারী জেনারেল ট্রিগভি লাই কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। সেক্রেটারী জেনারেল ডাগ হ্যামারশীল্ড বহু আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিবাদ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি জাতিপুঞ্জের সামরিক বাহিনী গঠন করেন এবং জাহাজের সাহায্যে সুয়েজ খাল পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করেন। কঙ্গো সমস্যা সমাধান করিবার জন্য তিনি কঙ্গো যাত্রাকালে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। সেক্রেটারী জেনারেল উ-থান্ট কিউবায় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে কুর্ট ওয়াল্ডহেইম সেক্রেটারী জেনারেল। ইহার আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ভিয়েতনাম সম্পর্কে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর, বন্দী-বিনিময়, মার্কিন সৈন্যের অপসারণ ইত্যাদি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠনের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় ইহার কার্যাবলী অতিশয় ব্যাপক। প্রত্যেকটি বিভাগই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত করে তাহাকে আরও বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কতকগুলি বিশেষ সংস্থা। নিচে এই বিশেষ সংস্থাগুলির বর্ণনা দেওয়া গেল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থা সমূহ (Specialised Agnecies of the United Nations) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য হইল যুদ্ধ বন্ধ করা। অবশ্য যুদ্ধ বন্ধ করা ছাড়াও ইহার আরও কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে। যথা, বিশ্বের জনগণের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও হতাশা দূর করিয়া জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কতকগুলি বিশেষ সংস্থা (Specialised agencies) আছে। বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই এই সংস্থাগুলির সহিত সম্পর্কিত আছে। এই সকল সংস্থাগুলির নিজস্ব সনদ ও নিয়মাবলী রহিয়াছে। কতিপয় সংস্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(ক) আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (International Monetary Fund) : (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই ব্রিটন উড্‌স-এ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনীতি ও রাজস্ব সম্পর্কিত সমস্যা। এই সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা ১৯৪৫ সাল হইতে কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল :—(১) আন্তর্জাতিক আলোচনা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণের জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন

করা এবং এই সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা।

(২) আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং সদস্যরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সুষ্ঠু বিনিময় ব্যবস্থার প্রবর্তন করাও ইহার উদ্দেশ্য।

(৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি করা, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ানো এবং প্রকৃত আয় বাড়ানো ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৪) বিভিন্ন দেশের মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তনীয়তা সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক বিনিময়ের উপর অকাম্য বাধা নিষেধ দূর করা অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য।

(৫) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সদস্য রাষ্ট্রের নিজ নিজ লেনদেন ব্যালেন্সের অসুবিধা দূর করিবে। এইরূপে অর্থভাণ্ডারের সাহায্যে সদস্য রাষ্ট্র আস্থাশীল হইয়া উঠিবে।

গঠন ঃ অর্থভাণ্ডার একটি বোর্ড অফ.গভর্ণর, ডাইরেক্টর-মণ্ডলী, একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং কতিপয় কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সদস্যগণ একজন করিয়া গভর্ণর ও একজন বিকল্প গভর্ণর নির্বাচিত করে। বোর্ড অফ গভর্ণরের হাতেই সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। অর্থভাণ্ডারের কতকগুলি কাজ আছে যাহা বোর্ড অফ গভর্ণর অন্য কাহাকেও হস্তান্তরিত করিতে পারে, আবার নূতন সদস্য গ্রহণ, সদস্য রাষ্ট্রের মুদ্রার সমতা মূল্যের পরিবর্তন, অর্থভাণ্ডারের প্রকৃত আয় বন্টন এবং দেউলিয়া ঘোষণা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড অফ গভর্ণরকেই করিতে হয়। অর্থভাণ্ডারে যে সকল সদস্য রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ সাহায্য করে তাহারা ১২ জন পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে ৫ জনকে নির্বাচিত করে। আর বাকি ৭ জন পরিচালক ২ বৎসর অন্তর সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বর্তমানে আরও ১ জন পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য বাড়িয়া যাওয়ায় মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩ জন। একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নির্বাচিত হয় পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা। তিনি বোর্ড অফ গভর্ণর-এর সদস্য নাও হইতে পারেন। তিনিই পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি। অর্থভাণ্ডারের প্রাত্যহিক কাজ তিনিই করেন। ইহার সদর ওয়াশিংটনে বটে কিন্তু অন্যত্রও ইহার অধিবেশন হইতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটেই পরিচালকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সদস্যগণ প্রথমে ৮ বিলিয়ন অর্থাৎ ৮০০ কোটি ডলার অর্থভাণ্ডারে জমা দিয়াছিল। এই অর্থ দ্বারা অর্থভাণ্ডার প্রত্যেক দেশের সরকারকে মুদ্রা স্থিতিকরণে সাহায্য করিয়াছে। মুদ্রামান স্থিতিশীল হইলে এক দেশের সহিত অপর দেশের জিনিস কেনাবেচার সুবিধা হয়। যেমন ভারতকে ইরাণ হইতে তেল কিনিতে হয়, কিন্তু ভারতের যদি ইরাণীয় মুদ্রা না থাকে অর্থভাণ্ডার ভারতকে দেয় অর্থ ইরাণীয় মুদ্রায় পরিণত করিতে সাহায্য করে। ফলে তেলের সরবরাহ বন্ধ হয় না। এইরূপভাবে অর্থভাণ্ডার বিশ্ব বাণিজ্যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। অর্থভাণ্ডারের অধিবেশন অনেক সময় খুব

ব্যাপক হয়। ১৯৬৪ সালে টোকিওতে যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে ২,০০০ ব্যাঙ্কার ও কর্মচারী যোগদান করিয়াছিল।

(খ) বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank)ঃ ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রিটন উডস্-এ একটি সম্মেলনে ৪৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগদান করে। এই সম্মেলনে একটি বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং একটি চুক্তিপত্র গৃহীত হয়। এই চুক্তিপত্রটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুমোদনেব জন্য পাঠানো হয়। ১৯৪৫ সাল হইতে বিশ্বব্যাঙ্ক কাজ শুরু করে।

উদ্দেশ্যঃ (১) উৎপাদনমূলক কাজে মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ দান করিয়া অনুন্নত সদস্যকে উন্নত করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

(২) কোন সদস্য রাষ্ট্র ঋণ করিলে ঋণ শোধের জন্য দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া অনুন্নত সদস্য রাষ্ট্রকে ঋণ পাইতে সাহায্য করে। আবার ব্যক্তিগত বৈদেশিক উন্নতি সাধনেও সাহায্য করে।

(৩) ব্যক্তিগত মূলধন সংগ্রহ সম্ভব না হইলে বিশ্বব্যাঙ্ক ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিজ মূলধন হইতে উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য কবিয়া থাকে।

(৪) সদস্যরাষ্ট্রগুলির উৎপাদনশীল সম্পর্ক উন্নত করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের আদান প্রদানেব ভাবসাম্য রক্ষা কবা আন্তর্জাতিক বিনিযোগে উৎসাহ দেওয়া, উৎপাদন বাড়ানো, জীবনযাত্রাব মান উন্নযন, শ্রমের জন্য সুন্দর পরিবেশ গঠন করা বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। কোন সদস্যরাষ্ট্র ঋণ পরিশোধের গ্যারাণ্টি দিলে সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রও বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে।

(৫) বিশ্বব্যাঙ্ক যদি উপযুক্ত বলিযা মনে করে তবে যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র অন্য কোন উপায়ে অর্থ যোগাড় করিতে পারিবে না তাহাকে বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারে।

(৬) প্রত্যেক ঋণের ক্ষেত্রে ঋণপ্রার্থী দেশের সরকার তাহার করণীয় সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা করিয়া ব্যাঙ্কের নিকট পেশ করিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি পরিকল্পনাকে যোগ্য মনে করিলে ঋণ দিতে পারে।

(৭) আবার বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইয়া তাহা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যয় কবা হইয়াছে কিনা তাহার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বিশ্বব্যাঙ্কের রহিয়াছে। ব্যাঙ্কের ঋণপত্র সারা বিশ্বের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করা হয়।

বিশ্বব্যাঙ্কের পরিচালনার জন্য বোর্ড অব গভর্ণর বা পরিচালকমণ্ডলী আছেন। এই পরিচালকমণ্ডলীর একজন সভাপতি ও একটি কর্মদপ্তর আছে। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে একজন করিয়া গভর্ণর ও একজন বিকল্প গভর্ণব লইয়া বোর্ড অব গভর্ণর গঠিত হইয়া থাকে। বোর্ড অব গভর্ণরই ব্যাঙ্কেব সকল ক্ষমতা ব্যবহার করেন। নূতন সদস্যগ্রহণ, সঞ্চিত তহবিল বাড়ানো বা কমানো, কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা, চুক্তিপত্রের ধারা সম্পর্কিত আপীলের বিচার-বিবেচনা, ব্যাঙ্কেব আয় বণ্টন ও ব্যাঙ্কের কাজ স্থগিত রাখা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বোর্ড অব গভর্ণর। পরিচালকমণ্ডলীর ১২ জন সদস্যের

(১১) গঠন

মধ্যে ৫ জন সদস্য নির্বাচন করে সর্বাধিক শেয়ারের অধিকারী ৫টি রাষ্ট্র। আর বাকী

৭ জনকে নির্বাচিত করে অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচিত গভর্ণরগণ। সদস্যগণ প্রতি ২ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। বোর্ড অব গভর্ণর যে কাজের ভার পরিচালক মণ্ডলীকে দিয়া থাকেন পরিচালকমণ্ডলী তাহাই করেন। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ ব্যাঙ্কের সভাপতিকে নির্ধারিত করেন। সভাপতি প্রাত্যহিক কাজকর্ম করেন। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ব্যাঙ্ককে পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development : I. B. R. D.) বলা হয়। বর্তমানে ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১000 কোটি ডলার। ইহার সঞ্চিত মূলধন ১ লক্ষ ডলার মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত। কোন সদস্য রাষ্ট্র যদি শেয়ারের অংশ হস্তান্তরিত করিতে চায় তবে তাহাকে উহা ব্যাঙ্কের নিকটেই করিতে হইবে। সদস্যরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, রেলপথ নির্মাণ, জাহাজ ও বিমান ক্রয় প্রভৃতি কাজে বিশ্বব্যাঙ্ক অর্থ সাহায্য দেয়। সদস্যগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ মূলধনের শতকরা ২০ ভাগ ঋণ দেওয়া যায়। গরীব ও অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের জন্যই বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ দিয়া থাকে।

(গ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation : I. L. O.) : ৫৬ বৎসর ধরিয়া আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা কাজ করিতেছে। ১৯১৯ সালে জাতিসংঘের একটি সংস্থা হিসাবে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা জন্মলাভ করে। জাতিসংঘের সদস্যগণ শ্রমসংস্থারও সদস্য ছিলেন। বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘের গুরুত্ব কমিতে থাকে কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গুরুত্ব বাড়িতে থাকে। ইহার পর ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি বিশেষ সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই সংস্থার সাধারণ সম্মেলন ওয়াশিংটন, জেনোয়া প্রভৃতি স্থানে হইলেও ইহার বেশীর ভাগ সম্মেলন হইয়াছে জেনেভাতে।

উদ্দেশ্য : বিশ্বশান্তি নির্ভর করে শ্রমের ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলীর উপর। কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ, দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের সর্বাধিক সীমা নির্ধারণ, বেকারত্ব প্রতিরোধ, শ্রমিক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, যথার্থ মজুরি নির্ধারণ, শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের সুব্যবস্থা, দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার সময়ে শ্রমিকের নিরাপত্তা, বিদেশে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা, সম্মানজনক কাজের জন্য সমান মজুরি, সংগঠনের স্বাধীনতা, কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতিকে স্বীকার করিয়া লইলে শ্রমের ন্যায়সঙ্গত সর্তাবলী কার্যকর হইবে। এই সব শ্রম কল্যাণকর উপায়গুলির মাধ্যমেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফিলাডেলফিয়ায়। এই সম্মেলনে ঘোষিত শ্রমসংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইল : (১) শ্রমিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংগঠনের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন, (২) শ্রমকে পণ্য হিসাবে ধরা হইবে না, (৩) প্রত্যেক জাতিকে অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে এবং (৪) দারিদ্র্য সর্বদাই সমৃদ্ধির প্রতিবন্ধক। আবার এই সম্মেলন শ্রমসংস্থায় মৌলিক সামাজিক লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে। এই সামাজিক লক্ষ্য ও কর্ম

পন্থাগুলি হইল: (১) জীবনযাপনের যোগ্য মজুরি, (২) পূর্ণ কর্মসংস্থান, উপযুক্ত খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা, (৩) সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, (৪) যৌথভাবে মজুরি ও কাজের সর্ত নির্ধারণের অধিকার, (৫) সকলের জন্য সমান সুযোগ, (৬) স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত এই উদ্দেশ্যগুলিকে সাধারণ সম্মেলন, পরিকল্পনা সমিতি ও শ্রমদপ্তরের সাহায্যে কার্যকর করা হয়। প্রত্যেক বৎসরেই সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের ৪টি করিয়া ভোটাধিকার থাকে। এই চারিটি ভোট হইল নিয়োগকর্তাদের ১টি ভোট, সরকারের ২টি ভোট এবং শ্রমিক ইউনিয়নের ১টি ভোট। সম্মেলনে ৢ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩২ জন সদস্য লইয়া পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৬ জন বিভিন্ন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে আর ৮ জন হইল নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধি এবং বাকি ৮ জন শ্রমিক প্রতিনিধি। পরিচালক সমিতি সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল নিয়োগ করে, আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তরের তত্ত্বাবধান করে, বাজেট প্রণয়ন করে, সম্মেলনের আলোচ্য সূচী রচনা করে এবং বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ করে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা সদস্য রাষ্ট্রকে শ্রমিক সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সরবরাহ করে, প্রয়োজনীয় শিক্ষক সরবরাহ করে, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে এবং গবেষণার ব্যবস্থা করে। শ্রমিকদের কাজের উন্নতির জন্য সদস্য রাষ্ট্রকে পরামর্শ দেয় এই সংস্থা।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ত্রি-পক্ষীয় সংগঠন অর্থাৎ সরকার, শ্রমিক ও মালিকের সংগঠন একটি অভিনব সংগঠন। প্রত্যেক মানুষেরই যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার, সমান সুযোগের ও স্বাধীন পরিবেশে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির অনুসন্ধান করিবার অধিকার আছে তাহা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কর্মপন্থা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

(খ) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation : W.H.O.) : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই কারণে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলন আহ্বানের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ১৯৪৬ সালের ২২শে জুলাই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সংবিধান স্বাক্ষরিত হইলেও উহা অনেক রাষ্ট্র অনুমোদন করে নাই। পরে সাধারণ সভা-বিশ্বস্বাস্থ্য সংবিধান অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। ১৯৪৮ সালে সংবিধান সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তিনটি বিভাগ আছে। এই বিভাগ ত্রয় হইল বিশ্বস্বাস্থ্য সভা, পরিচালক সমিতি এবং কর্মদপ্তর। বিশ্বস্বাস্থ্য সভা সকল সদস্যের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। ১৮ জন সদস্য লইয়া পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। ইহারা তিন বৎসরের জন্য স্বাস্থ্য সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। পরিচালক সমিতিই সভার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একজন ডাইরেক্টর জেনারেল

নিযুক্ত হন এবং তিনিই দপ্তর পরিচালনা করেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কতিপয় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। ইহা ছাড়া সংস্থার ৬টি আঞ্চলিক সংগঠন আছে। এই আঞ্চলিক সংগঠন পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আমেরিকা, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় কাজ করিতেছে।

কার্যাবলী ঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যাবলী হইল ঃ (১) আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় পরিচালনা করা এবং আন্তঃরাষ্ট্রিক সমন্বয় সাধন করা ; (২) বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য কৃত্যকগুলিকে শক্তিশালী করা , (৩) বিভিন্ন সরকারকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দান করা ; (৪) রোগ ও মহামারী প্রতিরোধ কার্যে উৎসাহ দেওয়া ; (৫) রোগ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য শাসন বিভাগীয় কৃত্যক স্থাপন করা ; (৬) পুষ্টি, বাসস্থান, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মের পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি করা ; (৭) দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের ক্ষেত্রে বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা ; (৮) আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বিধিনিযম প্রবর্তন ; (৯) স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নত মানের শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা ; (১০) শিশু ও মাতার স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ; (১১) গবেষণাকার্য পরিচালনা করা ; (১২) স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করা, রোগ নির্ধারণ পদ্ধতির মান নির্ণয় করা ইত্যাদি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মূল উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিবার সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইহার কাজ।

এই সংস্থা প্রথম হইতেই বিশ্বের অসংখ্য মানুষের কল্যাণের কাজে ব্রতী হইয়াছে। ১৯৪৫ সালে গুয়াতেমালায় এবং ১৯৪৯ সালে আফগানিস্থানে টাইফাস রোগ নিয়ন্ত্রণ করিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ম্যালেরিয়াব বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই সংস্থা বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

(৬) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ঃ (Food and Agricultural Organisation) ঃ ১৯৪৩ সালে ভার্জিনিয়ার হট্ স্প্রীং-এ জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সম্মেলনে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই ১৬ই অক্টোবর খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সংবিধান গৃহীত হয় এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম সংস্থা যাহা বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণ সম্পর্কে জনগণকে সাহায্য করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পব যখন অগণিত মানুষ খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিল এবং কৃষককুল কঠোর পরিশ্রম করিয়াও জীবিকার সংস্থান করিতে পারিতেছিল না তখনই এই সংস্থাটি জন্মলাভ করে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা পরিচালিত হয় একটি পরিচালক সমিতি, সাধারণ সম্মেলন এবং একজন ডাইরেক্টর জেনারেলের অধীনে নিযুক্ত কর্মদপ্তরের দ্বারা। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র একজন করিয়া প্রতিনিধি সাধারণ সম্মেলনে পাঠায়। প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট দিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সম্মেলন সংস্থার নীতি নির্ধারণ করে এবং বাজেট অনুমোদন করে। সাধারণ সম্মেলন ৯ হইতে

১৫ জন সদস্য পরিচালক সমিতিতে নিয়োগ করে। সাধারণ সম্মেলন সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেলকে নিয়োগ করে। সাধারণ সম্মেলন ও পরিচালক সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষে ডাইরেক্টর জেনারেল সংস্থার সকল দায়িত্ব পালন করেন।

সংস্থার সংবিধানে সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকার জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ও পুষ্টি সাধন, খাদ্য ও কৃষিপণ্যের উৎপাদনে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এই সংস্থা বিশ্ব অর্থনীতির সম্প্রসারণের জন্য গ্রামীণ জীবনযাত্রার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

কার্যাবলী ঃ সংস্থা নিম্নলিখিত কাজগুলি করিবে ঃ—(১) খাদ্য, কৃষি ব্যবস্থা ও পুষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহ করিবে এবং উহা বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রকে সরবরাহ করিবে। (২) খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণামূলক কাজ করিবে। (৩) কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ, কৃষি পণ্যের বণ্টন, বিক্রয় বাজারের উন্নতি সাধন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা, সদস্য সরকারকে কারিগরী ও প্রযুক্তি বিষয়ক সাহায্য দান করা প্রভৃতি খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কাজ। ধান, মাছ চাষের উন্নতি, ভেড়া, গরু, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা, কীট পতঙ্গের হাত হইতে খাদ্য শস্যকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া সদস্য রাষ্ট্রকে সাহায্য করা এই সংস্থার কাজ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে বিভিন্ন দেশের খাদ্য ও কৃষির সমস্যা সমাধান করিয়াছে। "পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে ক্ষুধাই হইল নিষ্ঠুর ও নগ্ন সত্য।" এই সংস্থাব সদর দপ্তর রোম। এই সংস্থার কতিপয় শাখা আছে, ইহা ওয়াশিংটন, চিলি, কায়রো প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন দেশের বিদ্যালয়ে, পশু উৎপাদন, মাছ ও শস্যের বাজার আইনের উন্নতি, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল, পুষ্টিকর খাদ্য সববরাহ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সংস্থা "ক্ষুধার হাত হইতে মুক্তি"র জন্য প্রচার অভিযান শুরু করিয়াছে।

(চ) জাতিপুঞ্জের শিক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (**United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation : U.N.E.S.C.O.**) ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থাব উদ্দেশ্য হইল, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা প্রসার করা, শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মানুষের অজ্ঞতা দূর করা। মানুষের অজ্ঞতা দূর করিতে পারিলে বিশ্বশান্তি স্থাপন সহজতর হয়। মানুষের মধ্যেই যুদ্ধের কারণ রহিয়াছে। অতএব অজ্ঞতা দূর করিলে মানুষ আর যুদ্ধ করিবে না। মানুষের চেতনা ও বোধশক্তি যদি বিকশিত হয় তবে তাহার মানসিক উৎকর্ষ সম্ভব হইবে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধিগত সহযোগিতা প্রসারিত হইবে। তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। ফলে এই পরিবেশ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে

সহায়ক হইবে। ন্যায়, আইনের অনুশাসন, মানবীয় অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিবে ("to farther universal respect for justice, for the rule of law, and for the human rights and fundamental freedoms for all.")। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটি সাধারণ সম্মেলন, একটি পরিচালক পরিষদ এবং একটি কর্মদপ্তর লইয়া ইউনেস্কো গঠিত। প্রতি ২ বৎসর অন্তর ইহার সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিসে ইহার সদর দপ্তর। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ১ জন করিয়া প্রতিনিধি সাধারণ সম্মেলন প্রেরণ করে। ২৪ জন সদস্য লইয়া পরিচালক পরিষদ গঠিত হয়। সাধারণ সম্মেলনে ইহাদের নির্বাচিত করে। একজন ডাইরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হয়। কর্মদপ্তরে কতিপয় আন্তর্জাতিক কর্মচারী আছে। কর্মদপ্তর শিক্ষা, সমাজ বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জনসংযোগের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতেছে। পরিষদ বৎসরে অন্ততঃ ২ বার মিলিত হয়। সব কাজের দায়িত্ব পরিষদের উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। সাধারণত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যই ইহার সদস্য। অবশ্য, পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সম্মেলন ⅔ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরের কোন দেশকে সদস্যপদ প্রদান করিতে পারে। বর্তমানে ১৩৯টি দেশ ইউনেস্কোর সদস্য। ইহা ছাড়া কতিপয় সহযোগী সদস্যও আছে। তাহারা সাধারণ সম্মেলনে ভোট দিতে পারে না। কিন্তু সদস্যদের অন্যান্য ক্ষমতা ভোগ করে।

ইউনেস্কোর কর্মসূচীকে দুইদিক হইতে বিচার করা যায়, যথা—(১) সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত আর (২) বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত। বিভিন্ন ধরনের তথ্যসংগ্রহ করা, বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়ন, বেসরকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্যদান এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহবান করা প্রভৃতি সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত। আর বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিতের অন্তর্ভুক্ত হয় বিশেষ রাষ্ট্রের বিশেষ ধরনের সমস্যার সমাধানমূলক কাজ, যথা—(ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (খ) শিক্ষা, (গ) সমাজ বিজ্ঞান, (ঘ) জনসংখ্যার বিনিময়, (ঙ) সাংস্কৃতিক কার্যাবলী, (চ) পুনর্বাসন, (ছ) জনসংযোগ ও (জ) পেশাসংক্রান্ত সাহায্য দান।

জাতিপুঞ্জের তথ্য হইতে বলা হয় জগতের শতকরা ২৫% নরনারী অশিক্ষিত। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো বৎসরে ৩০ লক্ষ ডলার ব্যয় করিতেছে। বিভিন্ন দেশে বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক তৈরীর কাজে শিক্ষণ কলেজ স্থাপন, পাঠাগার স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদির ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। ইহা ছাড়া জাতিপুঞ্জের আদর্শকে কার্যকর করিবার জন্যও চেষ্টা করিতেছে, বিজ্ঞান ও পেশা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে।

(ছ) আন্তর্জাতিক শিশু ভাণ্ডার (United Nations International Children's Emergency Fund : U. N. I. C. E. F.) : এই সংস্থা যদিও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থা বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই কিন্তু ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। প্রথমে ইহা ছিল জরুরী অবস্থাকালীন সংস্থা কিন্তু বর্তমানে ইহা একটি স্থায়ী সংস্থা। ১৯৪৬ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার সুপারিশক্রমে সেক্রেটারী জেনারেল এইরূপ সংস্থা গঠনের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব সাধারণ সভার নিকট উত্থাপিত করিলে জাতিপুঞ্জের সনদের ৫৫ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সভা এই সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত করিলে আন্তর্জাতিক শিশুভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটি পরিচালক বোর্ড-এর মাধ্যমে এই সংস্থার কাজ শুরু হয়। ইহা ছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল একজন ডাইরেক্টরকে নিয়োগ করেন। ৫৫টি দেশের সরকার ও জনগণের অর্থ সাহায্যে শিশু ভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে। কোন দেশ আক্রান্ত হইলে আক্রমণেব দ্বারা বিধ্বস্ত দেশের শিশু ও কিশোরদের কল্যাণের জন্য এই সংস্থা চেষ্টা করিবে। যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি আন্তর্জাতিক শিশু ভাণ্ডারে অর্থদান করিতে পারে। প্রতি বৎসব ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার এই ভাণ্ডার হইতে ব্যয় করা হয়। ইউনিসেফের শুভেচ্ছা কার্ড বিক্রয় কবিয়া এই ভাণ্ডার প্রতি বৎসর কুড়ি লক্ষ ডলার আয় করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রও এই সংস্থাব খরচ বহন করে।

১৯৫৭ সালে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাটি সাধারণ সভায় পাস হয়। শিশুদের জীবন গঠন করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা পাইবাব অধিকার, শিশু পালনের অবস্থা রক্ষা করিবার অধিকার, সহনশীলতা, শান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আদর্শের নীতির অধিকার এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাইবার অধিকার সকল শিশুরই রহিয়াছে। ভূমিকম্প, বন্যা, যুদ্ধ ও ঝড়ে আক্রান্ত শিশুদের দুধ, কম্বল ও ঔষধ দান করে এই শিশু ভাণ্ডার। শিশু রোগ নিবারণের জন্য ও সঠিক পন্থা শিখাইতে শিশু ভাণ্ডার সাহায্য করে। বিভিন্ন দেশে শিশু বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হয়। শিশুদের জন্য দুগ্ধ বীজাণুমুক্ত করিবার কারখানা স্থাপন করিবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ভাণ্ডার হইতে অর্থ দেওয়া হয়। হাসপাতাল নির্মাণের জন্যও অর্থ দেওয়া হইতেছে। এই সংস্থা রেড ক্রশের সহযোগিতায় ইউরোপের ৫০ লক্ষ শিশুকে যক্ষ্মা প্রতিরোধক টীকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইউরোপের ৭০ লক্ষ শিশু ও প্যালেস্টাইনের ৫০ লক্ষ শিশুকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। বিশ্বের অগণিত আর্ত শিশুর কল্যাণে শিশুভাণ্ডার প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী (Functions of the U. N. O.) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীকে দুইদিক হইতে বিচার করা যায়। (ক) ইহার একদিকে হইল ভাবীকালকে যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে রক্ষা করা, (খ) আর একদিকে হইল মানুষকে দৈন্য ও হতাশার হাত হইতে বাঁচানো। দারিদ্র্য ও রোগ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সাহায্য দান, অনুন্নত দেশকে উন্নত করা, পরাধীন দেশকে

স্বাধীন করা ও উন্নত দেশের সমপর্যায়ে অনুন্নত দেশকে উন্নত করিবার চেষ্টা করা।

এই সকল কাজের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করিতেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থাসকল অনুন্নত দেশে উন্নতিব জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য দিতেছে।

আবার বিশ্বের যেখানেই যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে সেখানেই নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ভারতের সহিত পাকিস্তানের যুদ্ধে এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধে, কোরিয়ার যুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আবার অনেক পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা অর্জন করিতেও সাহায্য করিয়াছে।

যাহাতে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ন্যায় বিচার পায় তার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সদা প্রহরায় রত রহিয়াছে। সাধারণ সভার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) বিশ্বে অর্থের ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে অর্থভাণ্ডার, ও বিশ্বব্যাঙ্ক, (২) শ্রমিকদের উন্নতিবিধান করিতেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, (৩) বিশ্বস্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (৪) খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করিতেছে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, (৫) অজ্ঞতা দূর করিতেছে, বিজ্ঞানের উন্নতি করিতেছে ও সাংস্কৃতিক উন্নতি করিতেছে আন্তর্জাতিক শিক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (৬) শিশুদের যত্ন করিবার ভার লইয়াছে শিশুভাণ্ডার। এইভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সংস্থা বিশ্বের বিভিন্নক্ষেত্রে কাজ করিতেছে।

মানবিক অধিকার ঘোষণা করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানুষের অত্যাবশ্যকীয় অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দিয়াছে। ফলে আজ সকল সদস্যরাষ্ট্রই তাহাদের নিজনিজ দেশের নাগরিকদিগের এই অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

জগতের যেখানেই কোন সমস্যা দেখা দিয়াছে সেখানেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন-না-কোন সংস্থা আসিয়া হাজির হয়। সাধারণ সভা সকল সমস্যা লইয়াই আলোচনায় বসে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ করে। নিরাপত্তা পরিষদ সেই সুপারিশকে কার্যে পরিণত করে। এমনি ভাবে আজ সারা বিশ্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আরও বিস্তৃতভাবে ইহার কার্যাবলী আলোচনা করা হইয়াছে (১৪২ পৃষ্ঠা দেখ)।

মানবিক অধিকার (Human Rights) ঃ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সুবিধাগুলিকে মানবিক অধিকার বলা হয়। মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। জাতিপুঞ্জের সনদে তাহাকেই মানবিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জে প্রতিটি সংস্থাই মানবিক অধিকারের সহিত সম্পর্কযুক্ত। জাতিপুঞ্জ যে মানবের অধিকারগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহারা হইল ঃ জীবনের স্বাধীনতার অধিকার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, যথেচ্ছ গ্রেপ্তার হইতে অব্যাহতি পাইবার অধিকার, ন্যায় বিচার পাইবার অধিকার, দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগের অধিকার গমনাগমনের অধিকার ও জাতীয়তার অধিকার, বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিবেক ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, ভোটের অধিকার, সংগঠনের অধিকার, কর্মের ও উপযুক্ত অবকাশের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, উপযুক্ত জীবনযাত্রা মানের অধিকার এবং দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার প্রভৃতি। ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিসকো শহরে সমবেত বিভিন্নদেশের প্রতিনিধিগণ মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায়ও বলা হইয়াছে যে, জাতিপুঞ্জ মৌলিক মানবিক অধিকার. মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং সকল জাতির স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি আস্থা রাখিবার প্রতিজ্ঞা লইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হইয়াছে যে মানবিক অধিকার, জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোর ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ যৌথভাবে সচেষ্ট হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জাতিসমূহ জাতিপুঞ্জকে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা বলবৎ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করে নাই জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপর মানবিক অধিকার সম্পর্কিত দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল কিন্তু মানবিক অধিকার উন্নয়নের মাধ্যম ছিল মানবিক অধিকার সম্পর্কিত কমিশন। এই কমিশনের উপর দুইটি দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, যথা, (১) সার্বজনীন মৌলিক নীতির ভিত্তিতে একটি মানবিক অধিকারের ঘোষণা রচনা করা এবং (২) এই ঘোষণার অন্তর্গত দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত একটি চুক্তি পত্র রচনা করা। এই কমিশনের চেষ্টায় ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় মানবিক অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা উত্থাপিত করা হয় এবং উহা গৃহীত হয়। মানবিক অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার প্রস্তাবনায় বলা হয় যে, পৃথিবীর সকল মানবের সহজাত মর্যাদা এবং সমান ও অপরিত্যাজ্য অধিকারের স্বীকৃতিই হইল স্বাধীনতা, ন্যায় ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি। এই অধিকারের ঘোষণার মধ্যে পাওয়া যায় আমেরিকার অধিকারের বিলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু। অধিকারের ঘোষণার দুইটি অংশ আছে। প্রথম অংশে বর্ণিত অধিকারগুলি হইল ঃ জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, আটক ও নির্বাসন হইতে অব্যাহতি, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার পাইবার অধিকার, চিন্তা, ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমবেত হইবার অধিকার। আর দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হইয়াছে কর্মের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ

(২০) মৌলিক অধিকার

গ্রহণের অধিকার, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার, দেশের শিল্প সম্পদকে ভোগ করিবার অধিকার, এই ঘোষণাটির কোন আইনগত বাধ্য বাধকতা নাই, ইহা শুধু মৌলিক নীতি সম্পর্কিত ঘোষণা। সার্বজনীন অধিকারের ঘোষণার আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও বিগত ২৭ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বহু দেশের আদালত ইহাকে নজির হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, সাধারণ সভায় বহু প্রস্তাবের উপর সার্বজনীন মানবিক অধিকার ঘোষণার অনেক বিষয়বস্তু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নৈতিক দিক হইতে ইহার ক্ষমতা প্রচণ্ড।

উপসংহারে বলা যায, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

(ক) **এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Asia and Far East : E. C. A. F. E.)** ঃ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চেষ্টায় ৪টি কমিশন গঠিত হইয়াছে। এই কমিশন-সমূহের মধ্যে এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন অন্যতম। জাতিপুঞ্জের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার সাহায্যে একটি বিশেষ সংস্থা গঠিত হয়। এই বিশেষজ্ঞ সংস্থা ১৯৪৭ সালে লেক সাক্‌সেস্‌এ এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মিলিত হয়। এই সংস্থা এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের সমস্যাগুলিকে দুই দিক হইতে বিচার করে। ইহার একদিকে হইল যুদ্ধে কি পরিমাণ ধ্বংস সাধিত হইয়াছে আর অপরদিকে হইল ইহার পুনর্গঠনের জন্য কি প্রয়োজন হইবে। বিশেষজ্ঞ দল সমস্যার পর্যালোচনা করিয়া জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের রিপোর্ট পেশ করে। এই সুপারিশের দ্বারাই ১৯৪৭ সালে এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন গঠিত হয়।

জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে এবং জাতিপুঞ্জের মৌলিক উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাজ করিবে। যে দেশ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কমিশনকে সেই দেশের সরকারের অনুমোদন লইতে হইবে। এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মান উন্নয়ন এবং এই দেশগুলির সহিত অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংরক্ষণ এবং সুদৃঢ় করা কমিশনের কাজ। ইহা ছাড়া কমিশন এই সকল অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংক্রান্ত সমস্যার অনুসন্ধান করিয়া সুপারিশ করিতে পারে।

এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ব্রহ্মদেশ, সিংহল, চীন, ভারত, উত্তর বোর্ণিও, সারওয়াক, ইন্দোচীন, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, শ্যাম ও বাংলাদেশ। পশ্চিম প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া পাকিস্তান হইতে জাপান পর্যন্ত সকল এলাকাকেই এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের মধ্যে ধরা হয়। প্রথমে আমেরিকা, নেদারল্যান্ড, ফিলিপাইন ও শ্যাম কমিশনের সদস্যপদ লাভ করে। অবশ্য ,ঠিক হইয়াছে যে, এ অঞ্চলের নূতন কোন রাষ্ট্র যদি জাতিপুঞ্জের সদস্য হয় তবে সেও

এই কমিশনের সদস্য হইতে পারিবে। ৪ জন সহযোগী সদস্য ও ২৫ জন সদস্য লইয়া কমিশন গঠিত হইয়াছে। কার্যাবলী সম্পর্কিত নিয়ম কানুন এবং সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা কমিশনই করে। সেক্রেটারী জেনারেল কমিশনের স্থায়ী কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। এই অঞ্চলের ইস্পাত শিল্প, বৈদ্যুতিক শক্তি, খনিজ সম্পদ, বাসস্থান ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্বন্ধে কমিশন তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইহাদের উন্নতিকল্পে সুপারিশ করে। এই কমিশনের সদর দপ্তর ব্যাংকক।

(খ) ইউরোপীয়-অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Europe : E. C. E.) ঃ ১৯৪৭ সালের ২৮শে মার্চ জাতিপুঞ্জের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করে। ইহাকে একটি আঞ্চলিক কমিশন হিসাবে ধরা হয়। ইউরোপের ২৭টি দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কমিশনের সদস্য। কমিশন নিজেই তাহার কার্যাবলীর নিয়মকানুন ও সভাপতি নির্বাচন করে। সেক্রেটারী জেনারেল কমিশনের কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। কমিশনের সদর দপ্তর জেনেভায়। ইহার কার্যনির্বাহী সম্পাদক আছেন। সুইডেনের প্রখ্যাত অধ্যাপক গুণার মারডাল কমিশনের সম্পাদক। জেনেভায় ইহার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে এবং জাতিপুঞ্জের মূল নীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই কমিশন কার্য-সম্পাদন করে। এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য হইল ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে যৌথ প্রচেষ্টামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা। ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মান উন্নয়ন করা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ইহাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। কমিশনের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই কমিশন ইউরোপের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছে, আন্তঃইউরোপীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাইয়াছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রসারিত করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দূর করিবার জন্য তিনটি আন্তঃরাজ্য সংস্থা, যথা, (১) ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় আন্তর্দেশীয় পরিবহণ সংস্থা (E. C. I. T. O.), (২) ইউরোপীয় কয়লা সংস্থা (E. C. O.) ও (৩) ইউরোপের জরুরী অর্থনৈতিক কমিটি (E. E. C.)। ইহা ছাড়া ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সংস্থার সহিত সহযোগিতা করিয়া একযোগে কাজ করিতেছে।

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের কতকগুলি কমিটি আছে। এই কমিটি-গুলির মধ্যে কৃষিসমস্যা, শিল্প ও শিল্পদ্রব্য, বাণিজ্য, কয়লা, বিদ্যুৎশক্তি, ইস্পাত, কাষ্ঠ, আন্তর্দেশীয় পরিবহণ এবং জনসম্পদ বিষয়ক কমিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কমিটিগুলির মাধ্যমে কমিশন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা, ইস্পাত, খনিজ পদার্থ, মোটরগাড়ী, কাষ্ঠ ও বক্সাইট প্রভৃতির উন্নততর বন্টন ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছে। ১৯৫৩ সালের পর হইতে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপীয়

দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার উন্নতি হওয়ায় অনেক সমস্যার সমাধান হইয়াছে।

স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চল (Non Self Governing Territory) : অছি ব্যবস্থাধীন অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসনহীন অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব জাতিপুঞ্জের কতিপয় সদস্য রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। যে সকল জাতি এখনও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করে নাই তাহারাই হইল স্বায়ত্তশাসনহীন জাতি। এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ানোই জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য। জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলি স্বায়ত্তশাসনহীন জাতিগুলির সংস্কৃতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা বজায় রাখিবে, তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি, তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবে।

ইহা ছাড়া সদস্যরাষ্ট্রগুলি স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চলগুলির স্বায়ত্তশাসন বিকাশের জন্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য এসকল অঞ্চলের বিশেষ পরিস্থিতি এবং অধিবাসীদের শিক্ষার পর্যায় অনুসারে তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশে সাহায্য করিবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে, গঠনমূলক উন্নয়ন কাজের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, গবেষণায় উৎসাহ দান করিবে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কাজ করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সংগঠনের সহিত সহযোগিতার সূত্র রচনা করিবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রশাসনিক ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক পরিসংখ্যান ও পেশাগত খবরাখবর সেক্রেটারী জেনারেলকে জানাইতে হইবে। ইহা ছাড়া তথ্য কমিটি স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চল সম্পর্কে সাধারণ সভায় বিভিন্ন সুপারিশ পেশ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। বিশেষ কমিটি স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চলের শাসনভারপ্রাপ্ত সদস্য রাষ্ট্রের নিকট হইতে তথ্যসংগ্রহ করিয়া তাহার ভিত্তিতে সাধারণ সভার নিকট সুপারিশ করে। স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চলের ঘোষণা সম্বন্ধে অনেক মত পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ ঘোষণার কার্যকারিতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা (Achievements and failures of the U. N.) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টির পর ৩২ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। জাতিপুঞ্জ এই ৩২ বৎসরের মধ্যে বহু কাজ করিয়াছে। বিশ্বে তৃতীয় মহাযুদ্ধের পদক্ষেপকে বন্ধ করাই জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ৩২ বৎসরের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বাধে নাই। ইহাই জাতিপুঞ্জের সাফল্যের প্রমাণ। জাতিপুঞ্জের সাফল্যকে দুই দিক হইতে বিচার করিতে হইবে। ইহার একদিক হইল রাষ্ট্রনৈতিক আর অপর দিক হইল অর্থনৈতিক ও সামাজিক।

(২১) সাফল্য

(১) রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে জাতিপুঞ্জ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বহু আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করিয়াছে। সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষ ব্যক্তি ও জাতীয়

স্বার্থের উপরে উঠিয়া এক কল্যাণময় আদর্শ পৃথিবী গড়ার কাজে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবদান কম নহে।

কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত, পাকিস্তান, আরব-ইজরায়েল প্রভৃতি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার সৃষ্টি হইলেও জাতিপুঞ্জের চেষ্টায় এই সকল সংঘর্ষ ছড়াইয়া পড়ে নাই। কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয় নাই। জাতিপুঞ্জ নয়াচীনকে বাহিরে রাখা নিরাপদ মনে না করিয়া চীনকে সদস্য পদ দিয়া আন্তর্জাতিক আইনের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। চীনের জাগরণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব কমিয়াছে। এই ত্রিশক্তির মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে তৃতীয় মহাসমর সহসা শুরু করিবার সাহস কেহ পাইতেছে না। আজ প্রায় সকলকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী হইতে হইয়াছে। আবার জাপান ও পশ্চিম জার্মানী নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আজ শিল্পোন্নত দেশ। ইহাদের জাগরণে তিনটি বৃহৎ শক্তির প্রভাব হ্রাস পাইবে। এইভাবে সংঘাত ও শক্তি প্রসারের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সফলতার পথে অগ্রসর হইবে। ১৯৫৩ সালে ইরাণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিবাদের মীমাংসায় জাতিপুঞ্জ সফল হইয়াছে। সিরিয়া, লেবানন, গ্রীস, আলবেনিয়া এবং বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় জাতিপুঞ্জ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। জাতিপুঞ্জই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটায়।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও জাতিপুঞ্জ সাফল্যলাভ করিয়াছে, যেমন, (১) ১৯৪৮ সালে সাধারণ সভায় মানবিক অধিকার ঘোষিত হয়। এই ঘোষণায় জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল নরনারীর মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। (২) জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। (৩) অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের জন্য, মানবের অভাব, দারিদ্র্য মোচনের দ্বারা বিশ্বকল্যাণের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। বিভিন্ন অনুন্নত দেশকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দিয়াছে। ফলে অনেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হইয়াছে। (৪) ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া মানুষকে রক্ষা করিয়াছে। (৫) মূল্যবান গবেষণা কার্যের দ্বারা-জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে বাড়াইয়াছে।

(২২) ব্যর্থতা

সমালোচকগণ বলেন, জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় উহার ব্যর্থতার পরিমাণ উহার সাফল্যকে অনেক পরিমাণে অতিক্রম করিয়াছে। জাতিপুঞ্জ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, জাতিতে জাতিতে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা করিবার যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কার্যকর করিতে পারে নাই। যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে ভাবীকালকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য এখনও সার্থক হয় নাই। স্থায়ী শান্তি, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এখনও সম্ভব হয় নাই। জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব পৃথিবীর

আবহাওয়াকে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতিপয় ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিলেও তাহার ব্যর্থতার মাত্রাই বেশী।

ব্যর্থতার কারণ ঃ (১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন। সুতরাং সদস্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া ইহার কোন ক্ষমতা নাই ("Since it is an organisation of sovereign states, it can only do what its members are willing to support.—*Goodrich*)।

(২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধকে ধিক্কার দিয়াছে (renounce) বটে, কিন্তু অস্বীকার (denounce) করে নাই। নিরাপত্তা পরিষদের ভোট পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কোন যুদ্ধমান রাষ্ট্র যদি শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ৫টি রাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করে তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে না। কারণ যুদ্ধমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেই এই ৫টি রাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্র ভিটো ক্ষমতা দ্বারা জাতিপুঞ্জের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিবে। ইহাই জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণ।

(৩) শান্তিভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাতিপুঞ্জের নিজস্ব শক্তি নাই। জাতিপুঞ্জের হাতে প্রভূত সামরিক বল থাকিলে পৃথিবীর যেখানেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আশঙ্কা থাকিত সেখানেই বল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ শান্তিভঙ্গকারীকে দমন করিতে পারিত।

(৪) জাতীয় সার্বভৌমিকতার উপর জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। উহার সদস্যপদও স্বেচ্ছায় ছিন্ন করা যাইত। জাতিপুঞ্জের সদস্যপদও স্বেচ্ছায় ছিন্ন করা যায়। এখন যদি অনেক রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জ হইতে বাহিরে চলিয়া যায় তবে তাহাদের লইয়া একটি নূতন জাতিসংঘ তৈরী হইবে। সদস্যপদ ছিন্ন করিবার সুযোগ জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

(৫) আবার জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোন আয় নাই। সদস্যগণের অর্থ-সাহায্যের এবং সামরিক সাহায্যের উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। ইহা অতিশয় দুর্বল প্রতিষ্ঠান।

(৬) সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে জাতিপুঞ্জের স্বীকার করিতে হয় ফলে জাতিপুঞ্জের কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিতে সদস্য রাষ্ট্র বাধ্য নহে।

(৭) পৃথিবী দুইটি শিবিরে বিভক্ত। একদিকে রাশিয়া অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দুই শিবিরের মধ্যে আদর্শ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব জাতিপুঞ্জকে আশ্রয় করিয়া তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। নয়া চীনের সদস্যপদ গ্রহণের পর আশা করা গিয়াছিল যে, নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইবে কিন্তু পূর্বের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমানে বড় যুদ্ধ না হইলেও যুদ্ধের যে আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে স্নায়ু যুদ্ধ (Cold war) বলা যায়। এই স্নায়ু যুদ্ধ পৃথিবীর আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

(৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতিপয় রাষ্ট্রের স্বার্থ সিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ফলে ইহা তাহার মহৎ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

(৯) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সমরোপকরণ প্রস্তুতি বন্ধ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর নিরপরাধ মানুষ আজ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রের দয়ার উপর নির্ভরশীল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করিতে পারে নাই। এই সকল দুর্বলতাগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে কূটনৈতিক রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বার বার ভিটো প্রয়োগের ফলে বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পরিক অভিযোগ নিরাপত্তা পরিষদকে দুর্বল করিয়াছে। ১৯৫৬ সালে যখন সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ গণঅভ্যুত্থানকে দমন করে তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে পারে নাই। সোভিয়েত ইউনিয়ন হাঙ্গেরীর বিষয়কে আভ্যন্তরীণ সমস্যা বলিয়া ঘোষণা করে। জাতিপুঞ্জের সনদের ২ (২) ধারা অনুসারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই একই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের সমস্যা সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভারতের কাশ্মীরের কিছু অঞ্চল পাকিস্তান আজও দখল করিয়া আছে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার সংঘর্ষ রোধ করিতে জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হইয়াছে। বার্লিন ও জার্মান সমস্যার সমাধান আজও হয় নাই। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ চালাইয়াছে, লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে কিন্তু জাতিপুঞ্জ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কাম্বোডিয়া ও লাওসে যুদ্ধের অবস্থা শান্ত করিতে জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হইয়াছে। ইজরায়েল ও আরবের মধ্যে যুদ্ধের সময় জাতিপুঞ্জ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। জাতিপুঞ্জের কোন যুদ্ধমান রাষ্ট্রই জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব গ্রহণ করে না।

জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ (Future of the U. N.)ঃ পূর্বে জাতিপুঞ্জ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নীতির উদ্দেশ্য সাধন করিবার হাতিয়ার। কিন্তু বর্তমানে বহু আফ্রিকার ও এশিয়ার দেশ জাতিপুঞ্জের সমস্যপদ লাভ করায় ইহা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতের যন্ত্র হিসাবে কাজ করিতে পারে না। বর্তমানে চীনকে সদস্য স্বীকার করা হইয়াছে। ইহার ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে থাকিয়া চীন বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহা আর সে করিতে পারিবে না। চীনের জাগরণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। আবার জাপান ও পশ্চিম জার্মানি নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের জাগরণের ফলে তিনটি বৃহৎ শক্তির প্রভাব হ্রাস পাইবে। এইভাবে সংঘাত ও শক্তি প্রসারের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জ সফলতার পথে অগ্রসর হইবে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত এজেন্সি ও কার্যক্রমসমূহ ব্যাপকতর হইতেছে। ইহা সফলতার পথ প্রশস্ত করিবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে সকল রাষ্ট্র অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে। অভিযোগ জানানোর এবং জোট বাঁধার ইহাই উপযুক্ত মাধ্যম। ইহার উপযোগিতা আজ সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। চীন সদস্যপদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া সদস্যপদ ছাড়িয়া পুনরায় গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীকে যুদ্ধের আতংক হইতে মুক্তি করিয়াছে যুদ্ধ। বন্ধ করিতে না পারিলেও তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ঘটিতে দেয় নাই। ভবিষ্যতে জাতিপুঞ্জ এক পৃথিবীর স্বপ্নকে সার্থক করিতে না পারিলেও মানব সভ্যতাকে রক্ষা করিতে পারিবে ("It has proved itself to be an indispensable institution."—*Lippmann*)।

সারসংক্ষেপ

আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ নূতন নয়। সুদূর অতীত কাল হইতেই মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গঠিত নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কালক্রমে আন্তর্জাতিক আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গেল। একদিকে গঠিত হইল পবিত্র মৈত্রীরমতো কূটনৈতিক সংগঠন আর অপর দিকে গঠিত হইল আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়নের মতো প্রতিষ্ঠান। গ্রোসিয়াস, পেন, বেন্থাম, রুশো প্রমুখ আন্তর্জাতিকতার মতবাদের প্রচারক।

জাতিসংঘ অতিজাতীয়তার স্বপ্নকে বাস্তব করিবার প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু জাতিসংঘের বিভিন্ন দোষের জন্য ইহার পতন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ আবার অতিজাতীয়তার স্বপ্নকে বাস্তব করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনেকগুলি বিভাগ আছে। যেমন (১) সাধারণ সভা, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৫) অভিভাবক পরিষদ। জাতিপুঞ্জ যদিও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ইহার বিভিন্ন দোষ-ত্রুটির জন্য ইহা সফলকাম হইতে পারিতেছে না।

প্রশ্নাবলী

(১) আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তি ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the basis and ideal of Internationalism.)

(২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য, গঠন এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the objects, composition and functions of the United Nations.)

(৩) জাতিপুঞ্জের কার্যকারিতা সম্বন্ধে মন্তব্য কর এবং ইহার কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা নির্দেশ কর।

(Comment on the working of the United Nations pointing out its achievements and failures.)

(৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the compositions and functions of the General Assembly and the Security Council of the United Nations.)

(৫) সম্মিলিতজাতিপুঞ্জের বিশেষীকৃত সংস্থাগুলির উপর টীকা লিখ।

(Write notes on the specialised agencies of the United Nations.)

(৬) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান দুর্বলতা ও ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the present weakness of the United Nations and its future)

অতিরিক্ত পাঠ্য

Friedman—World Politics.

Lloyd—Democracy and its Rivals.

S, Mukherjee—International Law Redefined.

Charter of the United Nations.

৬ | আইন ও স্বাধীনতা
(Law and Liberty)

[আইন , আইনের সংজ্ঞা ; আইনের উৎস—স্বাধীনতা , স্বাধীনতার রক্ষাকবচ—আইন ও স্বাধীনতা]
(Law , Definition of Law : Sources of Law—Concept of Liberty ; Safeguards of Liberty—Law and Liberty.)

আইনের প্রকৃতি (Nature of Law) : আমরা রোজই সকালে উঠিয়া দেখি সূর্য পূর্বদিকে উঠে আর বিকালে দেখি সূর্য পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। বিশ্বব্যবস্থা এমনি একটা নিয়মাধীন। মনুষ্য সমাজও বিধিনিয়মের নিগড়ে বাধা। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম দেশকালাতীত, অব্যয় ও অপরিবর্তনশীল কিন্তু মনুষ্যসমাজের নিয়মাবলী এর উল্টা অর্থাৎ নিত্য তার বদল হয়। ইহার কারণ সমাজ নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আগাইয়া চলে। তাই তার নিয়মও পাল্টায়।

(১) আইনের প্রকৃতি

সবকালেই মানুষের জীবন একরকম থাকে না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি—সব কয়টি যুগেই কি মানুষ একই প্রকৃতির ছিল বা আছে ? বিভিন্নযুগে মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। তাই বিভিন্নযুগের সামাজিক বিধি বিধানগুলিও ছিল বিচিত্র। জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলার পথে বিধিনিয়মগুলিও নানা আকার ধারণ করে। দেশকালভেদেও নবনবরূপে রূপায়িত হয়। সদা পরিবর্তনশীল মানব জীবনের সহিত তাল রক্ষা করিয়া এই নিয়ম কানুনগুলিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, মানবজীবন একটা কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। প্রায় প্রতিপদে, প্রতিক্ষেত্রে মানুষকে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। শারিরীক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি উদ্দেশ্য লাভের জন্য মানুষকে কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়া চলিতে হয়।

আইনের অর্থ নিয়মকানুন। নিয়মকানুন শব্দটি আবার অনেকগুলি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ জীবনে মানুষের বাহ্যিক আচরণ (external behaviour) নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে কতকগুলি রীতিনীতি (customs), চিরাচরিত প্রথা ও বিধিনিষেধ আছে তাহাকে বলে **সামাজিক আইন (social law)।** সমাজের চাপেই মানুষ সামাজিক আইন মানিয়া চলে।

আবার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস দুইটি মিশাইলে জল তৈরী হয়। এইরূপে প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে কার্যকারণে যে সম্বন্ধ দেখা যায় তাহাকে বলে **বৈজ্ঞানিক বিধি (Scientific laws)।** রসায়ন ও পদার্থ-শাস্ত্রেও কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝাইতে আইন শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

সংঘবদ্ধ জীবনের তাগিদে মানুষকে ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্নের সহিত জড়িত যে নৈতিক বিধিগুলি মানিয়া চলিতে হয় তাহাকে নৈতিক বিধি (Moral Law) বলে।

সমাজের শাখা অনেক। ইহার এক একটি শাখা মানুষের জীবনের এক একটি দিকের আশাআকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করে। মানুষের জীবনের যে অংশটুকু রাষ্ট্রের আওতায় আসিয়াছে সেইটুকু সম্পর্কে রাষ্ট্রের যে বিধি বিধান তাহাই **রাষ্ট্রীয় আইন**। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সহিত মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটাই আইনের বিষয়বস্তু। মানুষের আত্মিক জীবন, ভাব ও ভাবনা, চিন্তা ও অনুভূতির সহিত আইনের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহাদের বাহ্যিক প্রকাশের সহিত আইনের একটা যোগ আছে।

আইনের প্রকৃতিই হইল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা। সামাজিক আইন সমাজজীবনের উপর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজজীবনের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে। নৈতিক আইনের পক্ষেও এই একই কথা খাটে। মানুষের ভালমন্দ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া মানুষের বিবেক যাহাতে মানুষকে সুপথে চালিত করিতে পারে তাহার জন্যই নৈতিক বিধি। বিশ্বব্যবস্থাও এইরূপ নিয়মাধীন।

আইনকে বলা হইয়াছে রাষ্ট্রিক জীবনের ধারক। আইন রাষ্ট্রান্তর্গত একজন মানুষের সহিত অন্য একজন মানুষের যোগসূত্র স্থাপন করে; আবার রাষ্ট্রের বাহ্যিক ঐক্য আইনই রক্ষা করে। আইন না থাকিলে রাষ্ট্র এক অরাজকতার রাজ্যে পরিণত হইত। আইন মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষা করে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করে। আইন ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদিগের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া, তাহাদের জীবনকে সুপথে পরিচালিত করা এবং তাহাদের উদ্দেশ্যলাভের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রভৃতি কাজ আইনই করিয়া থাকে।

(২) আইন ছাড়া রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না

কেহ কেহ বলেন আইনের সহিত মানুষের সুখদুঃখের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ মানুষের সুখদুঃখ আত্মগত। কিন্তু আইনের সহিত মানুষের সুখদুঃখের পরোক্ষ সম্পর্ক আছে। কারণ রাষ্ট্র আইনদ্বারা মানুষের সুখলাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই অনুকূল পরিবেশের জন্যই মানুষ সুখী হয়।

আবার আইন রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমাজের জড় উপাদান অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি এবং বস্তুনিরপেক্ষ অর্থাৎ ধর্ম ও নীতি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। আইন সমাজের সকল উপাদানেই প্রতিফলিত হয়। সুতরাং আইন সমাজ জীবনের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। রাষ্ট্রিক কাঠামোই আইনের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ধনতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক দেশে আইন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে।

আইনের আর একটি দিকও লক্ষ্যণীয়। গণতান্ত্রিক দেশে আইনের পশ্চাতে জনসমর্থন থাকে; স্বৈরাচারীরাষ্ট্রে তাহা থাকে না। অবশ্য, আইন কার্যকর করিতে হইলে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। আইন ভঙ্গ হইলে রাষ্ট্রশক্তি সক্রিয় হইয়া উঠে। রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা আইনের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আইনের সংজ্ঞা ঃ (**Definition of Law**) বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে যে আইনের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহারা হইল ঃ (১) আইন সার্বভৌমের আজ্ঞা, (২) আইন ইতিহাসের ফল, (৩) আইন সমাজ বিবর্তনের ফল, (৪) আইন সর্বোচ্চ নীতির প্রকাশ, (৫) আইন শ্রেণী স্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উড্রো উইলসন্ আইনের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে উপরোক্ত বিভিন্ন মতগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। তিনি বলেন ঃ "আইন হইল মানুষের স্থায়ী চিন্তা ও আচার ব্যবহারের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র বিধিবদ্ধ করে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের **সমর্থন থাকে**।"* এই সংজ্ঞায় সার্বভৌমত্ব, ইতিহাস, সমাজদেহ, সামাজিক চিন্তাধারা, রীতিনীতি, কার্যাবলী ও জনমতের স্থান করিয়া দিয়াছেন। এই সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা। তবে তাত্ত্বিকদিক হইতে আইনের আরও কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হইল ঃ

(৩) আইনের সংজ্ঞা

(১) **বিশ্লেষণমূলক ধারণা ঃ** এই মতবাদ অনুসারে "আইন হইল নিম্নতনের প্রতি সার্বভৌমের আদেশ" ("Law is the Command of the Sovereign.")। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় আইনের ভিত্তি হইল কতকগুলি বিষয় সম্পাদন করা এবং কতকগুলি বিষয় সম্পাদন হইতে বিরত থাকার জন্য সার্বভৌমের আদেশ। সার্বভৌমই আইনের উৎস, ধারক ও বাহক। আইন এক নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হয়। আইনকে বলবৎ করিবার জন্য প্রয়োজন হয় এক সার্বভৌম শক্তি। **অস্টিন** প্রমুখ এই মতবাদের প্রচারক।

(২) **বিশ্লেষণী বনাম ঐতিহাসিক ধারণা ঃ** অস্টিনের মতবাদের সমালোচনা করিয়া ঐতিহাসিক **হেনরী মেইন** বলেন যে, আইনকে সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সার্বভৌম রচিত আইন ছাড়াও দেশে প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আইন বলা হয়। অতএব সার্বভৌমের নির্দেশই শুধু আইনের উৎস নয়। আবার আইন কোন স্থিতিশীল শক্তি নহে, ইহা নানাবিধ সামাজিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং আইন ঐতিহাসিক বিবর্তনের সহিত যুক্ত। আইন কোন প্রণেতার দ্বারা একদিনে প্রণীত হয় নাই। ইহা অতীতের প্রথা, আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি ও জনসাধারণের

*"Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of Government."—Wilson

সম্মতি প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ধীরে ধীরে সৃষ্টি হইয়াছে। এক কথায় ইহা **ইতিহাসের ফল**। এই মতবাদের সমর্থক হইলেন হেনরী মেইন ও স্যাভিগনী।

সমালোচকগণ বলেন, প্রথা আপনা হইতেই আইনে পরিণত হয় না। আইনে পরিণত হইবার জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। অবশ্য, বহুদিনপর্যন্ত প্রথাগত আইনই একমাত্র আইন ছিল। আবার সার্বভৌমও তাহার খেয়াল-খুশী মতো আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। তাঁহাকেও জনসাধারণের চাপ ও নৈতিক বিধি-সমূহের কথা চিন্তা করিতে হয়। জনমত বিরোধী কোন আইনই কার্যকর হয় না। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন প্রথা রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দ্বারা অনুমোদিত হয় ও প্রযুক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রথা রাষ্ট্রীয় আইন বলিয়া গৃহীত হয় না। কিন্তু জনমত দ্বারা সমর্থিত প্রথাগুলিকে রাষ্ট্র আইনে পরিণত করে। এই সমালোচনার ভিত্তিতে অস্টিনের সংজ্ঞাটি কিছুটা রদবদল হইয়া এইরূপ হইয়াছেঃ "সমাজে মানুষের প্রচলিত চিন্তাধারা ও অভ্যাসের যে অংশ নির্দিষ্ট নিয়মের আকারে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যে বিধিগুলি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী শক্তি ও প্রভাব দ্বারা বলবৎ করা হয় তাহাই আইন।"

হল্যাণ্ড বলেনঃ "সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বদ্বারা প্রযুক্ত মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই হইল **আইন**।"*

আইন জনসাধারণের সম্মতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌমশক্তি জনসাধারণের সম্মতি ছাড়া আইনকে বলবৎ করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় আইন ব্যক্তি নির্বিচারে প্রযোজ্য হয়। রাষ্ট্রান্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তিই আইন মানিতে বাধ্য। আইন মানুষের চিন্তাধারার দর্পনস্বরূপ। মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সাথে-সাথে আইনও পরিবর্তিত হয়। তাই উইলসন বলেন, "আইন হইল মানুষের স্থায়ী আচার ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।"

আইনের সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদঃ আইনের সমাজবিজ্ঞানমূলক ধারণানুসারে আইন সমাজদেহ হইতে উদ্ভূত। ইহা **সমাজ বিবর্তনের ফল**। সমাজ গতিশীল, তাই আইনকেও গতিশীল হইয়া সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইতে হইতেছে। এই মতবাদ এক **সমাজমনের** অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই সমাজমনের প্রকাশকেই আইন বলা হয়। সমাজমনের যে ন্যায্য চাহিদা সার্বভৌম কর্তৃত্ব দ্বারা স্বীকৃত হয় তাহাকেই আইন বলা হয়। অবশ্য, সমাজমনের কল্পনা-বিতর্কমূলক। কেহ কেহ এই মতবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন।

আইনের দার্শনিক মতবাদঃ দার্শনিকদিগের মতানুসারে আইন হইল **আদর্শের প্রকাশ**। আইনের স্বরূপ বস্তুনিরপেক্ষ। গ্রীকদার্শনিক **এ্যারিস্টটল** আইনকে সামাজিক প্রজ্ঞা বা যুক্তিনির্ভর বুদ্ধির প্রকাশ (Reason) হিসাবে

---

* 'A law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority.' —Holland

বর্ণনা করিয়াছেন। স্টোইক সম্প্রদায় প্রাকৃতিক বিধানকেই আইন বলিয়াছেন। কেহ কেহ আইনকে সর্বোচ্চ নীতির অভিব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। রুশো আইনকে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রুশোর মতে রাষ্ট্র সাধারণের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। সমষ্টিগত ইচ্ছা হইল সকলের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। আইনের মধ্যেই এই প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। এখানে কল্যাণকর ইচ্ছার প্রকাশকে রুশো আইন হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

সমালোচকগণ বলেন, আদর্শবাদের ভিত্তিতে আইনকে সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা যায়; কিন্তু বাস্তবে আইনকে স্বার্বভৌম স্বাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা যায় না। অবশ্য, সমষ্টিগত ইচ্ছার অর্থ যদি জনমত হয় তাহা হইলে জনমতের বিরোধী কোন আইনকে বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া যায় না।

মার্কসীয় মতবাদ ঃ মার্কস বলেন, আইন শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ। ল্যাস্কি বলেন, যাহারা অর্থনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী, রাষ্ট্র তাহাদের অভাবকে প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে যে শ্রেণী বসে সেই শ্রেণীই তাহার স্বার্থানুকূল্যে আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং আইন তাহাদেরই স্বার্থের প্রকাশ বই কিছু নয়।

আইনের প্রকারভেদ (Different kinds of Law) ঃ আইনের বিষয়বস্তু অনুসারে আইনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।
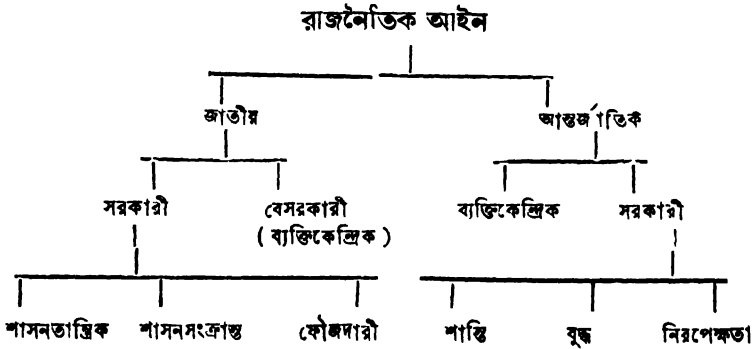
হল্যাণ্ডে কাজের প্রকৃতি ও ধরণ অনুসারে আইনকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, (১) জাতীয় আইন এবং (২) আন্তর্জাতিক আইন। জাতীয় আইনকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা (১) সরকারী আইন, (২) বেসরকারী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইন। জাতীয় আইন হইল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম কর্তৃক প্রবর্তিত আইন। আর সরকারী আইন রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করে। হল্যাণ্ড শাসনতান্ত্রিক আইন, শাসন সংক্রান্ত আইন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন প্রভৃতিকে সরকারী আইনের পর্যায়ে ধরিয়াছেন। ম্যাকাইভার আইনকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন; যথা (১) জাতীয় আইন এবং (২) আন্তর্জাতিক

আইন। আন্তর্জাতিক আইনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, (১) শান্তি, (২) যুদ্ধ এবং (৩) নিরপেক্ষতা। আবার জাতীয় আইনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) শাসনতান্ত্রিক এবং (২) সাধারণ আইন। এই সাধারণ আইনকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, ব্যক্তিগত ও সরকারী।

শাসনতান্ত্রিক আইন হইল রাষ্ট্রের মৌলিকগঠন ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধীয় আইন। এই আইন রাষ্ট্র ও সরকারের সহিত নাগরিকের সম্পর্কের নির্দেশ দেয়। ইহা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অবস্থান নির্ণয় করে এবং আইনের উৎসও নির্ণয় করে।

শাসনসংক্রান্ত আইনঃ শাসন সংক্রান্ত আইন হইল রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্য বহু খুঁটি-নাটি আইন। পুলিশ বিভাগ ও আয়কর বিভাগের আইন ইহার উদাহরণ।

ফৌজদারী আইনঃ ফৌজদারী আইন অপরাধের সংজ্ঞা ও বিচারপদ্ধতির নির্দেশ দেয়। এই আইন বলে আইনশৃংখলা ও নাগরিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইনঃ ইহা ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠীর সম্পর্কে প্রণীত হয়। রাষ্ট্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এই আইনকে কার্যকর করে। এই আইন ব্যক্তির অধিকার ও কার্যের নির্দেশ দেয়।

আন্তর্জাতিক আইনঃ পরস্পর নির্ভরশীল জগতে ব্যক্তির মতোই—অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্কে আসিতে হয়। ফলে সভ্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কতকগুলি নিয়মকানুন গড়িয়া উঠে; এই নিয়মকানুনগুলিকেই বলে আন্তর্জাতিক আইন। আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা (১) ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন ও (২) সরকারী আন্তর্জাতিক আইন। সরকারী আন্তর্জাতিক আইনকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা, (১) শান্তি, (২) যুদ্ধ ও নিরপেক্ষতা। আন্তর্জাতিক আইন ধীরে ধীরে আইনের মর্যাদা লাভ করিতেছে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোন ব্যক্তির অধিকার লইয়া দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে তাহার বিচার হইয়া থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদ, অবৈধসন্তানের অধিকার সম্পর্কিত আইন, ডোমিসিল প্রভৃতি আইন ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

সরকারী আন্তর্জাতিক আইন আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের নির্দেশক। ইহা ত্রিবিধ; যথা, (১) **শান্তিকালীন আইন** আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তির সময়ে দূতবিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কিত। (২) **যুদ্ধ আইন** যুদ্ধের সময় যে সকল নিয়মকানুন পালন করা হয় তাহার নির্দেশ দেয়; যথা যুদ্ধের সময় নিরস্ত্র শহরের উপর বোমা নিক্ষেপ নিষিদ্ধকরণ আইন, দমদম বুলেট নিষিদ্ধকরণ আইন ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। (৩) **নিরপেক্ষতা আইন** হইল যুদ্ধমান জাতিগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নীতি সম্পর্কিত বিধি।

আন্তর্জাতিক আইন আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ও প্রথার ভিত্তিতেই গঠিত হয় বটে কিন্তু এমন কোন সার্বভৌম শক্তি নাই যে উহাকে বলবৎ করিতে পারে। তবে বর্তমানের রাষ্ট্রসকল নিজেদের প্রয়োজনেই ওই আইনকে পালন করে বলিয়া কোন সার্বভৌমশক্তি ছাড়াই ওই আইন বলবৎ হয়।

স্বাভাবিক আইন ঃ জীবজন্তুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অর্থাৎ স্নেহ প্রভৃতি এবং ধর্মীয় অনুশাসনকে স্বাভাবিক আইন বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাভাবিক আইন বলিতে বুঝায় সামাজিক প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ন্যায়ের মৌলিক নীতিকে। ইহা সার্বভৌমের আজ্ঞা নয় বরং ইহা ঐশ্বরিক অনুজ্ঞা। অতএব ইহা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বে। এ্যারিস্টটল বিশ্বজনীন আইনকে স্বাভাবিক আইন বলিয়াছেন। তাহার মতে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ন্যায় অন্যায় বোধ রহিয়াছে এই আইন তাহারই প্রকাশ। গ্রীসের স্টোইক দার্শনিকদের ধারণায় সাম্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিধানে যে কতকগুলি শাশ্বত নীতি রহিয়াছে তাহাদিগকে মানুষ প্রজ্ঞার সাহায্যে উপলব্ধি করে। এই শাশ্বত নীতিগুলিই প্রাকৃতিক আইন। সিসেরো ও সেনেকো স্বাভাবিক আইনকে সহজাত, চিরন্তন, অপৌরুষেয় ও অবাধ বলিয়া মনে করিতেন। রোমকগণ স্বাভাবিক আইনের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক আইন রচনা করে।

স্বাভাবিক আইন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট নয়। আবার ইহাকে বলবৎ করারও কোন উপায় নাই।

আইন ও নীতি ঃ রাষ্ট্রিক আইন মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সমাজে মানুষের বিবেক ও নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যে নিয়মকানুন তাহাই নৈতিক আইন। মানুষের চিন্তাশুদ্ধি নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রনৈতিক আইন মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। আর নৈতিক আইন মানুষের সমগ্র জীবনকে, তাহার চিন্তা, অনুভূতি কার্যকলাপের উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রিক আইনের সহিত নৈতিক আইনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিবেকের ঊর্ধ্বে যাইয়া কোন সার্বভৌমই পাকাপাকি কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। সুতরাং বিবেকদংশনই বড়ো জিনিস। নীতিশাস্ত্রের নীতি ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন তাহা করে না।

সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত কার্যাবলী, চিন্তা ও অভ্যাস রাষ্ট্রে স্বীকৃতি লাভ করে এবং প্রচলিত রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহাকে আইন বলা হয়। কিন্তু সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত এই সকল নিয়ম-গুলি ছাড়াও অন্যান্য আরও কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা মানুষের বিবেক ও নীতি-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শেষোক্ত নিয়মাবলীকে **নৈতিক আইন** বলা হয়। রাষ্ট্রের ইচ্ছা আইনের মধ্যেই প্রকাশিত হয় এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আইনের মাধ্যমেই কার্যকরী হয়। আইন সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনের সহিত নৈতিক আইনের সম্পর্ক অতিশয় গভীর। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা ইহাদের মধ্যে কোন

পার্থক্য নির্দেশ করিতেন না। ষোড়শ শতাব্দীতে ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাষ্ট্র-নীতিকে নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করিলেন। তার পরে হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশো প্রভৃতি দার্শনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করেন। নীচে রাষ্ট্রনৈতিক আইন ও নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হইল ঃ

প্রথমতঃ রাষ্ট্রনৈতিক আইন শুধু মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। আর নৈতিক আইন মানুষের সমগ্র জীবনকে—তাহার চিন্তা, অনুভূতি, কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ও বাস্তব কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। নৈতিক বিধি মানুষের বাহ্যিক ও মনের চিন্তা উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। রাষ্ট্রনৈতিক আইন বল-প্রয়োগে বলবৎ করা হয়; কিন্তু নৈতিক আইন বিবেক দংশনে ও লোকনিন্দার ভয়ে কার্যকরী হয়। নৈতিক অপরাধ রাষ্ট্রকর্তৃক দণ্ডনীয় নয়, তেমনি আবার নৈতিক অপরাধকে নীতিশাস্ত্র কখনই সমর্থন করে না। কিন্তু নৈতিক অপরাধ দ্বারা যতক্ষণ কাহারও না ক্ষতি হয় ততক্ষণ ইহা আইনের এক্তিয়ার-বহির্ভূত।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইনগুলি সুস্পষ্ট এবং ব্যক্তি-নির্বিচারে সকল সময়ে প্রজোয্য। কিন্তু নৈতিক নিয়মগুলি সুস্পষ্ট নয় এবং সকল সময়ে প্রযোজ্যও নয়। এক সময়ে ভাবতবর্ষে বাল্য-বিবাহকে সুনীতি বলিয়া গণ্য করা হইত, কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশের ধারণাই ইহার বিপরীত।

তৃতীয়তঃ, নীতিশাস্ত্রের নীতি ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করে এবং ইহা ন্যায় অন্যায়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ হয় না; ইহা রাষ্ট্রের স্বর্থের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয়ের ক্ষেত্রও বিভিন্ন। অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি নৈতিক অপরাধগুলি রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা দণ্ডনীয় নয়। আবার রাত্রি-কালে বাতি না জ্বালিয়া মোটর-গাড়ী চালনা করা নৈতিক অপরাধ নয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা দণ্ডনীয়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, জনস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে রাষ্ট্র অনেক সময় নীতিবিগর্হিত আইনও প্রণয়ন করে। **রাষ্ট্রের অস্তিত্ব-রক্ষাকল্পে প্রণীত যে আইন তাহাই হইল প্রথম আইন এবং নীতির ঊর্ধ্বে থাকিয়াও তাহাকে কার্যকরী করিতে হইবে ("The safety of the State is its first law and to realise this end it must be above morality.")।** কিন্তু এই মতবাদকে সকলে স্বীকার করেন না। ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রেরও স্বাধীনতা, অধিকার ও অস্তিত্ব আছে বটে, রাষ্ট্রকে কিন্তু অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র সাময়িকভাবে নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন প্রবর্তন করিতে পারে এই যুক্তিতে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক হইল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতাও বিপন্ন হইবে। এই কারণে বৈদেশিকদের দ্বারা রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে বা অন্তর্বিপ্লব দেখা দিলে অনেক সময় নীতিজ্ঞান বিরোধী আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কলেজকে আস্তাবলে পরিণত করিবার মতো নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনের মতো আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিতে

দিবার অর্থ স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ন্যায়নীতিকে বলি দেওয়া। কিন্তু আইন ও নৈতিক বিধানের মধ্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। আবার বিবাহ বিচ্ছেদ, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ধীরে ধীরে জনমতকে পরিবর্তন করিয়া মানুষের নৈতিক জ্ঞানের সংস্কার সাধন করিয়াছে। রাষ্ট্রের আইননীতি ভিত্তিক না হইলে উহা কেহ মানে না।

আইনকে মান্য করা হয় কেন ? কোন কিছুকে মানুষ সহজভাবে মানিয়া লয় না। যখন মানুষ কোন কিছুকে মান্য করে তখন বুঝিতে হইবে তাহার পশ্চাতে শক্তির অনুমোদন আছে। মানুষ আইন মান্য করে বিনা দ্বিধায়। ইহার কারণ আইনের পশ্চাতে শক্তির অনুমোদন আছে। সার্বভৌম শক্তির ভয়ে লোকে আইন মান্য করে। আইনের পশ্চাতে জনমতের অনুমোদন রহিয়াছে। ইহা স্বীকৃত যে, জনমতকে উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বজায় রাখা অথবা আইনকে বলবৎ করা যায় না। লোকে আইন মান্য করে কারণ জনমত আইনকে মান্য করিবার জন্য দাবি করে। সমাজবদ্ধ মানুষ দন্ডের ভয়ে এবং উপযোগিতার উপলব্ধি করিয়াও আইন মান্য করে।

জনগণ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামায় না তাই আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা না করিয়াই উহাকে মান্য করে। জনগণের আইন সম্বন্ধে নির্লিপ্ততাই ইহাকে মান্য করিবার কারণ। জনগণ রাষ্ট্রনেতাগণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বশতঃ রাষ্ট্র-নেতাগণ প্রণীত আইন মান্য করে। আবার অধিকাংশই যে আইনকে মান্য করে তাহাকে সহানুভূতি বশতঃ সকলেই উহাকেই মান্য করে। মানুষ অনুকরণ প্রিয় তাই একজন যখন দেখে অপরকে আইন মান্য করিতে তখন সেও আইন মান্য করে। আবার সমাজমঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়াও লোকে আইন মান্য করে। জনগণের সম্মতিই আইনের ভিত্তি ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। জনগণের সম্মতি আছে বলিয়াই আইন মান্য করা হয়।

আইনের উৎস (Sources of Law) ঃ অনেকেই এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আইনের পশ্চাতে যে শক্তি ও স্বীকৃতি প্রয়োজন তাহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিই দিয়া থাকেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম মঞ্জুর না করিলে কোন বিধিবিধানই আইনের মর্যাদা পায় না। কিন্তু শুধু সার্বভৌমের আদেশের মধ্যেই আইনের চৌহদ্দি বাধা থাকে না। সার্বভৌমের আদেশের সীমা ছাড়াইয়া গিয়া গোটা সমাজ দেহেই আইনের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। হল্যান্ড আইনের উৎসের যে সকল সন্ধান দিয়াছেন নিচে তাহাদের আলোচনা করা হইল ঃ

(১) প্রথা (Customs) ঃ প্রথা হইল সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারা দীর্ঘকাল পালিত আচার ব্যবহার। এই আচার ব্যবহার (ক) প্রথমে পরিবারে বা গোষ্ঠীর মধ্যেই জন্মাইতে দেখা যায়। এই আচার ব্যবহারগুলির মধ্যে যেগুলি (খ) সমসাময়িক ধর্ম ও নীতির সহিত সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে এবং

গ) সমাজের অনেকেরই স্বীকৃতি পায় সেইগুলিই আইন। আর বাকি সব আইন নয়। আইনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে এমন আচার ব্যবহার-গুলি মানুষের ধর্মের ভয়ে, শাস্তির ভয়ে, উপযোগিতার জন্য এবং অনুকরণ করিবার জন্য মানিয়া চলে। প্রথাই আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস। প্রাচীনকালে আইন ছিল প্রথামূলক। সমাজ ও রাষ্ট্র প্রথার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত।

(৪) প্রথা

প্রথার উদ্ভব কখন হইয়াছিল তাহা বলা না গেলেও একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে, ভারত ও চীনের প্রাচীন ইতিহাসে প্রথা সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য লেখা আছে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান আইন এবং ব্রিটেনের প্রথাগত আইন (Common law) প্রমাণ করে যে প্রথাগুলি আইনের মর্যাদা পাইতেছে। ম্যাকআইভার বলেন, "বিপুলাকাব আইনেব পুস্তকে বাষ্ট্র এখানে-ওখানে দুই একটা আচর কাটিতে পারে, কিন্তু মানুষ যেমন তাহার শরীরকে নূতন করিয়া গঠন করিতে পারে না, রাষ্ট্রও তেমনি বর্তমান আইনকে কখনও নূতন কবিয়া সৃষ্টি কবিতে পারে না।" প্রচলিত প্রথাকে ভিত্তি করিযাই রাষ্ট্র তাহার রাষ্ট্রিক আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। প্রথা আপনা হইতেই গড়িযা উঠে। এমন কি বাষ্ট্রের উৎপত্তির অনেক পূর্বে হইতেই এই প্রথাগুলি চলিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর বাষ্ট্র তাহাদিগকে শুধু মাত্র স্বীকৃতি দেয়।

(২) ধর্ম (**Religion**): প্রথার মতো ধর্মীয় অনুশাসনগুলিও আইন সৃষ্টিতে সহাযতা করিয়াছে। আদিম ও প্রাচীন সমাজের বিধিনিষেধ ধর্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীনকালের এই সামাজিক বিধিনিষেধগুলি ছিল নেতিবাচক (Negative Commands) অর্থাৎ ইহা করিও না, উহা করিও না, তাহা হইলে দেবতা অসন্তুষ্ট হইবে। ধর্ম তাইছিল নিয়মেব উৎস। হিন্দু ও মুসলমান আইন ধর্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। মিশরের আইনের ওপর ধর্মের প্রভাব প্রবল ছিল। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইউরোপের নানাদেশের আইনের উপর খ্রীষ্টানধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। প্রাচীন ইহুদিদের রাষ্ট্র ছিল ধর্মরাষ্ট্র।

(৫) ধর্ম

বিশৃংখল সমাজজীবনকে সুসংবদ্ধ করিয়াছে ধর্মীয় অনুশাসন। ধর্মীয় অনুশাসন সমষ্টিগত জীবনে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীনকালে প্রথা ছিল আইন। আর আইন ছিল ধর্ম। অর্থাৎ আইন ও ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছে প্রত্যক্ষভাবে ইহা রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করিয়া তাহার নির্দেশকেই আইনরূপে মান্য করিতে শিক্ষা দিয়াছে। আর পরোক্ষ ভাবে এই প্রথাকে সমর্থন করিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব দিয়াছে। রাষ্ট্রপতি উইলসন বলেন যে প্রথম যুগের রোমক আইন কতকগুলি ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া কিছু নয়।

(৩) **বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Judicial decision) :** সমাজ জীবনে দ্বন্দ্ব

মীমাংসার ব্যবস্থা আদিমকালে প্রথা ও ধর্মের অনুশাসনের দ্বারাই হইত। কিন্তু কালান্তরে সমাজ জীবন হইয়া পড়িল জটিল। তখন প্রথা ও ধর্মের অনুশাসনের সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। প্রথমে রাজাই ছিলেন বিচারের ভারপ্রাপ্ত, ব্যক্তি কিন্তু যখন প্রথা ও ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে বিচার্যসমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইতেন না তখন তিনি নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতেন। রাজার বিচার মীমাংসা আইনের মর্যাদা লাভ করে।

সর্বোচ্চ আদালতের বিচার মীমাংসা বা রায় অনেক সময়ে আইনের উৎস হিসাবে কার্য করিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল বিচার মীমাংসাকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় কেন ? উত্তরে বলা যায়, (ক) আইন হইল স্থিতিশীল আর সমাজ হইল গতিশীল। গতিশীল সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হইলে স্থিতিশীল আইনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ স্থিতিশীল আইনকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিবর্তন করিয়া বিচার মীমাংসা দিয়া থাকেন। পরে এই বিচারমীমাংসাই এক স্বতন্ত্র আইনে পরিণত হয়। (খ) দ্বিতীয় কারণ হইল সকল অবস্থা পূর্ব হইতেই কল্পনা করিয়া কোন লিখিত আইনই ভবিষ্যতের সকল মোকদ্দমার ঘটনাবলী সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারে না। নিত্য নূতন ঘটনা ও পরিস্থিতি যখন আদালতের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় তখন বিচারপতিগণ ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আইনের সহিত সঙ্গতি সম্পন্ন ন্যায্য ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া নূতন নীতির প্রবর্তন করেন। এই বিচারের রায়গুলিই আইনের উৎস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি মার্শাল. ভারতবর্ষের বার্ণস্, পীকক্ ও দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি বিচারপতিগণ বিচারমীমাংসার মাধ্যমে বহু আইন সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৬) গতিশীল সমাজের সঙ্গে চলিতে হইলে। আইনের সংশোধন প্রয়োজন।

(৪) **বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা (Scientific discussion)** : আইনবিদগণ তাঁহাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক সময় নূতন আইন সৃষ্টিতে এবং প্রচলিত আইনের সংশোধন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করেন। এই আইনবিদদিগের ব্যাখ্যা ও প্রস্তাব অনেক দেশেই গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন, ভারতবর্ষের রাসবিহারী ঘোষের বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত পুস্তক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীধন সম্পর্কিত পুস্তক বিচার মীমাংসার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতে এই দুইখানি পুস্তক আইনের উৎস হিসাবে যথেষ্ট স্বীকৃতি পাইয়াছে।

(৭) বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা ও গ্রন্থ

(৫) **ন্যায়নীতি (Equity)** : আইন স্থিতিশীল আর সমাজ গতিশীল। গতিশীল সমাজ জীবনের সহিত তাল রাখিয়া স্থিতিশীল আইন চলিতে অসমর্থ, তাই আইনকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। আইনের এই অসম্পূর্ণতার জন্য বিচারপতি-গণ অনেক সময় নিজেদের ন্যায় ও বিবেকবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করেন। বিচারকার্য যাহাতে ন্যায়ধর্ম অনুসারে পরিচালিত হয় সেইজন্য

বিচারকগণ ন্যায়নীতি অনুসরণ করেন। এই ন্যায়নীতি শুধু প্রজ্ঞা বা যুক্তিসঙ্গত নহে, শাশ্বতও বটে। সুতরাং ইহাকে রাষ্ট্রের সমসাময়িক আইনের ঊর্ধ্বে বলা যাইতে পারে। ব্রিটেনেও এই শাশ্বতনীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই ন্যায়নীতিকে আইনের একটি উৎস বলা যাইতে পারে।

(৬) **আইন প্রণয়ন (Legislation)**ঃ আধুনিক কালে আইন পরিষদকেই আইনের প্রধান উৎস হিসাবে ধরা হয়। ওপেনহিম জনমতকেই আইনের প্রধান উৎস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আইন পরিষদের নির্বাচিত সভ্যগণ যে আইন প্রণয়ন করেন তাহা জনমতেরই অভিব্যক্তি।

উপসংহারে উড্রো উইলসনের মন্তব্যটি উল্লেখ করা গেল ঃ তিনি বলেন যে, প্রথা আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস হইলেও ধর্ম প্রথাগুলির সহিত অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিশিয়া আইন প্রস্তুত করিতে সহায়তা করিয়াছে। অতএব প্রথা ও ধর্মের অবদানের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য নাই। তারপর সমাজ বিবর্তনেব এক বিশেষ স্তরে যখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল তখন আইন সভার দ্বারা আইনের সংশোধন ও আনুষ্ঠানিক ভাবে আইন প্রণয়ন করা হইলেও আইনেব মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়। বিচারপতিগণের বিচার নিষ্পত্তির দ্বারা এই ফাঁক বন্ধ করা যায়। আবার ইহারই সহিত ন্যায়নীতির সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রথা ও ধর্মের পববর্তী উৎস হইল বিচারকের মীমাংসা এবং ন্যায় বিচার। আইন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাও আইন প্রণয়নে অনেক সহায়তা করিয়াছে।

স্বাধীনতার ধারণা
(Concept of Liberty)

স্বাধীনতা বলিতে সাধারণতঃ বুঝায়, প্রতিটি মানুষের নিজের ইচ্ছামতো চলা, বলা ও করা। ইহাতে অসুবিধা এই প্রত্যেকেই যদি তার খুশীমতো চলে তবে একে অপরের পথরোধ করিবে, ফলে মারামারি হইবার উপক্রম হইবে। তাই মারামারি এড়াইয়া চলিতে গেলে প্রত্যেককেই কিছুটা নিয়ন্ত্রণ মানিতে গিয়া যদি দেখা যায় কেউ কাহারও কোন কিছুতেই বাধা দিতেছে না তবেই সকলে সমাজে শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া অপরের অধিকারে হাত না দেয় আবার অপরেও যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন ব্যক্তির অধিকারে হাত না দেয় তবে উভয়েই উভয়ের নিয়ন্ত্রিত অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। এই **নিয়ন্ত্রিত অধিকারই স্বাধীনতা**।

(১) স্বাধীনতার অর্থ

অধিকারের অর্থ স্বত্ব বা দাবী। তাহা হইলে যে বিষয়ে আমার অধিকার বা দাবী আছে অপরের নিকট তাহা ভিক্ষার বস্তু নহে; অপরের করুণার দানও নহে। আমি যখন আমার স্বত্বের ব্যবহার করিব তখন আমার উপভোগে কেহ

হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না ; বরং অন্যান্যদের সচেতন থাকিতে হইবে যাহাতে আমার সেই উপভোগে কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। আবার আমারও সচেষ্ট থাকিতে হইবে যাহাতে আমি অপরের স্বত্বভোগে কোন বাধার সৃষ্টি না করি। সুতরাং অধিকার একটা সামাজিক ধারণা। সমাজ ছাড়া অধিকারের চিন্তা করা যায় না। কেবলমাত্র সমাজের মধ্যেই অধিকারের প্রশ্ন উঠিতে পারে। জনশূন্য দ্বীপবাসী রবিনসন্ ক্রুশোর কোন অধিকার ছিল না। কারণ, প্রথমে সেখানে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না যাহার কাছে সে দাবী জানাইবে। সে ছিল সব কিছুর মালিক, নিজে বিদ্যা-বুদ্ধি প্রয়োগ করিত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য। সে পরে কিছু সুখেরও ব্যবস্থা করিয়াছিল। অতএব সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষেই অধিকাব ভোগ করা সম্ভব। সামাজিক জীবন হইতেই অধিকাব জন্মায়। মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য হইতে কোন অধিকার জন্মায় না।

(২) সমাজবদ্ধ মানুষের অধিকার আছে

আবার একের অধিকার স্বীকার করার অর্থ অপরের সেই নির্দিষ্ট ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার অস্বীকার। একজনের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারেব অর্থ অপরের তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার নাই। একজনের পথে চলার অধিকারের অর্থ অপরের তাহাকে রাস্তায় ধাক্কা মারিবার অধিকার নাই। এইভাবে যখনই কোন অধিকার স্বীকৃত হইল তখনই ঠিক হইয়া গেল যে, সেই অধিকারের সীমার মধ্যে সমাজের প্রত্যেক মানুষের হস্তক্ষেপের সুযোগ নির্ধারিত হইয়া যাওয়া। আর যাহাতে কাহারও অধিকার লংঘিত না হয় তার জন্য সমাজকেও দায়িত্ব লইতে হইবে।

স্বাধীনতা ও অধিকার প্রায় সমার্থবোধক। স্বাধীনতার অর্থ হইল অপরের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্তি। আর অধিকার বলিতে বোঝায় অপরের হস্তক্ষেপ নিরোধ। তাই স্বাধীনতা ও অধিকার প্রায় সমার্থ-বোধক। বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় সামাজিক কতকগুলি অধিকার সৃষ্টির মারফতই কোন স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারা যায়। অধিকার হইল কতকগুলি বাস্তব সুযোগ সুবিধা। কতকগলি সুযোগ সুবিধা মিলিয়া যে সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহাই স্বাধীনতা।

(৩) স্বাধীনতা ও অধিকার

মানুষ দুইটি সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রবৃত্তি দুইটির মধ্যে একটি হইল সামাজিক প্রবৃত্তি আর অপর প্রবৃত্তটি হইল মানুষের অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণের স্পৃহা। মানুষের এই প্রবৃত্তি দুইটি একে অপরের বিপরীত। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি মানুষকে সমাজে বাস করিতে বাধ্য করে। আর অবাধ স্বাধীনতার স্পৃহা মানুষকে সমাজচ্যুত করিবে। কারণ সমাজে বাস করিতে হইলে মানুষকে একে অপরের জন্য কিছু অবাধ স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইবে। অন্যথায় তাহাকে বনে যাইয়া বাস করিতে হইবে। মানুষের এই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার প্রশ্নের আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাধীনতার আলোচনা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ বিহীনতার অর্থে ব্যবহার

করা হয় না; অর্থাৎ অবাধ স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। কারণ, একজনের অবাধ স্বাধীনতার অর্থ অন্য সকলের স্বাধীনতায় তাহার হস্তক্ষেপের স্বীকৃতি। তাই নিয়ন্ত্রণবিহীন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিবার স্পৃহা সমাজ-বিরোধী। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কি বলেন: "মানুষের সহজাত বৃত্তির নিশ্চিত পরিণতি-রূপে নিয়ন্ত্রণগুলি আবশ্যক।" সকলেরই সব বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। কারণ, সকলেরই সব বিষয়ে কিছু করিবার স্বাধীনতার অর্থ হইল প্রত্যেকেই অপরের যে কোন স্বাধীনতা ভঙ্গ করিতে পারিবে।

প্রাচীন গ্রীসে স্বাধীনতার অর্থে সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত এই উভয় স্বাধীনতাকেই বুঝাইত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অর্থ করা হইত স্বশাসন ও অভাব অভিযোগ হইতে মুক্তি। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অর্থ কালক্রমে বিবর্তিত হইয়া দাঁড়ায় ব্যক্তির জীবনকে সুখী করিবার জন্য ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু শীঘ্রই রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সহিত ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, স্বাধীনতার অর্থ মানুষের বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রণবিহীনতা নয়। স্বাধীনতার অর্থ হইল মানুষের মৌলিক ও সামাজিক শক্তির এক শক্তিশালী ও অব্যাহত অভিব্যক্তি।

(৪) বার্কারের মত

বার্কারের মতে রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতা বা আইনসঙ্গত স্বাধীনতা কখনও প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা হইতে পারে না, ইহা সর্বদাই সকলের জন্য সর্তসাপেক্ষ স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীন হওয়া উচিত। কিন্তু কোন ব্যক্তিই চূড়ান্তভাবে স্বাধীন হইতে পারে না।

সমাজজীবনকে সার্থক করিবার জন্যই রাষ্ট্র আইন কানুনের মাধ্যমে মানুষের অবাধ স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ জারি করিয়া স্বাধীনতাকে প্রকৃত করিয়া তোলে। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতার প্রকৃতির মধ্যেই আছে বাধা নিষেধ, কারণ আমি যে স্বতন্ত্র স্বাধীনতা ভোগ করি তাহা আমার সহবাসীদের স্বাধীনতা খর্ব করিবার স্বাধীনতা নয়।"*

অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি কতকগুলি পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ, যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।"** এখানে যে পরিবেশের কথা বলা হইয়াছে সেই পরিবেশের সৃষ্টি হয় তখনই যখন মানুষের অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। অধিকারই স্বাধীনতার উৎপত্তিস্থল ("Liberty is the product of rights.")। সুতরাং এই অধিকারের সংরক্ষণে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাহাই ব্যক্তির স্বাধীনতা।

(৫) ল্যাস্কির সংজ্ঞা

* "Liberty thus involves in its nature restraints, because the separate freedoms I use are not freedoms to destroy the freedoms of those with whom I live".—Laski.

** "By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves."—Laski.

আবার সাম্যের উপরই নির্ভর করে স্বাধীনতার পরিবেশের সৃষ্টি। অসাম্যের সমাজে স্বাধীনতা নিরর্থক। রাষ্ট্র যদি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমাজের একশ্রেণীকে বিশেষ অধিকার প্রদান করিয়া অপর শ্রেণীর লোকদিগকে বিশেষ সুবিধা-ভোগকারী শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল করে তবে যে বৈষম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হইবে তাহাতে সকলে আত্মোপলব্ধির সমান সুযোগ পাইবে না। ফলে স্বাধীনতার পরিবেশ গড়িয়া উঠিবে না।

স্বাধীনতাকে একদিক হইতে নিয়ন্ত্রণবিহীনতাও বলা যায়, অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে জনগণের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে সেই সকল বিষয়ের উপর ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা রহিযাছে। "স্বাধীনতা হইল সুখীজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত সামাজিক অবস্থা।" এই সামাজিক অবস্থাই মানুষের অধিকার।

এখানে স্বাধীনতার দুইটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি হইল উহার নেতি-বাচক দিক (Negative aspect) আর অপরটি হইল অস্তিবাচক দিক (Positive aspect)। নেতিবাচক দিক দ্বারা বুঝানো হয মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য নিয়ন্ত্রণবিহীনতাব প্রযোজন। আব অস্তিবাচক দিক দ্বাবা বুঝানো হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে যাহা প্রয়োজন। যেমন, জীবনধারণের মান উন্নয়নমূলক সুযোগ সুবিধা, প্রকৃত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ ইত্যাদি।

(৬) নেতিবাচক ও অস্তিবাচক

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতা মানুষের লক্ষ্য নহে, স্বাধীনতা একটি পন্থা মাত্র। মানুষের সত্তার উপলব্ধিই ইহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে স্বাধীনতাকে প্রকৃতভাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Kinds of Liberty) ঃ স্বাধীনতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা যাইতেছে।

(ক) ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা (Individual and National Liberty) ঃ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সুযোগ সুবিধাকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলা হয় আর সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা বলিতে বর্তমানে বোঝায় জাতীয় স্বাধীনতাকে। বার্ণস জাতীয় স্বাধীনতাকে জাতির সর্বপ্রকার স্বাভাবিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেন। পরাধীন দেশের মানুষের আত্মোপলব্ধির আইনসঙ্গত সুযোগ সুবিধা থাকে না। এইজন্য জাতীয় স্বাধীনতা বা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

(খ) স্বাভাবিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) ঃ প্রাক্-রাষ্ট্রিক যুগে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যে যথেচ্ছাচরণের ক্ষমতাভোগ করিত তাহাকে বলা হইত স্বাভাবিক স্বাধীনতা। রুশোর ভাষায় বলা যায়, "মানুষ স্বাধীন হইযাই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু চারিদিক হইতে সে আজ শৃঙ্খলাপাশে আবদ্ধ", (Man is born free, but every where he is in chains.—Rousseau)। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আইনের অসংখ্য শৃঙ্খলে মানুষ আজ আবদ্ধ বলিয়া সে তাহার সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ

করিতে পারে না। কিন্তু প্রাক্-রাষ্ট্রিক যুগে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ বিহীন স্বাভাবিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অবাধ স্বাধীনতার কল্পনা করা যায় না। ল্যাস্কি বলেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ পরস্পর বিরোধী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য পরস্পর বিরোধী আচরণ করিবে, ততদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক স্বাধীনতার কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রিক অনুশাসনের বেড়াজালের মধ্যেই স্বাধীনতা প্রকৃতরূপ গ্রহণ করে। এই নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা যদি সমাজ-কল্যাণকর হয়, তবে তাহাই স্বাভাবিক স্বাধীনতা।

(গ) **আইনসঙ্গত স্বাধীনতা** : এই স্বাধীনতা হইল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা স্বীকৃত, সংরক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। ইহাকে নির্দিষ্ট ও পরস্পরের আপেক্ষিক হইতে হইবে। এক ব্যক্তির স্বাধীনতার দ্বারা অপর ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইবার পর মানুষ যে যথেচ্ছাচারিতা ভোগ করে তাহাই আইনসঙ্গত স্বাধীনতা। আইনসঙ্গত স্বাধীনতা ত্রিবিধ; যথা, (১) ব্যক্তি স্বাধীনতা, (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এবং (৩) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

(১) ব্যক্তি স্বাধীনতা (Civil Liberty) : ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এবং দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলি অধিকারকে বলা হয় **পৌর স্বাধীনতা** বা **ব্যক্তি স্বাধীনতা** বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ব্ল্যাকস্টোন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গতিবিধির স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির স্বাধীনতাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। বর্তমানে চিন্তা, বিশ্বাস, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা এবং চুক্তির স্বাধীনতা প্রভৃতিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার পর্যায়ে ধরা হয়।

(২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসন পরিচালনা ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার অধিকার সমূহকে রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধীনতা বলা হয়। **ব্ল্যাকস্টোন** বলেন, "রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইল প্রধানতঃ সরকারকে দমন করার ক্ষমতা। যেমন, জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য আবেদনের অধিকার, বিচারালয়ে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা প্রভৃতির অধিকার। বর্তমানে রাজনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় সরকারের গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা। ল্যাস্কি বলেন, "রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইল রাষ্ট্র কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ক্ষমতা" ("Political liberty means the power to be active in affiars of State". —Laski)। এই স্বাধীনতার উদাহরণ হইল প্রাপ্তবয়স্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা এবং সরকারের কার্যাবলী সমালোচনা করিবার অধিকার প্রভৃতি। এই স্বাধীনতা মানুষকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে। ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।

(৩) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) : অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় প্রত্যেক মানুষের নিজের শিক্ষা ও সামর্থ্যানুযায়ী কার্য করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার। অনশনের

ভয় মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। তাই প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। ইহা মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলে। এই স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য একটা স্থিরীকৃত জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই স্বাধীনতার উদাহরণ হইল জীবিকা অর্জনের অধিকার, বেকার ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতি।

উপসংহারে বলা যায়, স্বাধীনতার এইরূপ অনেকক্ষেত্রে একে অপরের বিরোধীতা করে; যেমন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধাটা অস্বাভাবিক নয়। তাই বার্কার বলেন, "বস্তুতঃ স্বাধীনতা একটি জটিল ধারণা ইহা একদিকে মানুষকে স্বাধীনতার প্রতি আনুগত্যে ঐক্যবন্ধ করে, আবার অপরদিকে ইহার বিভিন্ন রূপের প্রতি আনুগত্যের জন্য পরস্পরকে পৃথক করে।"

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty)ঃ যে স্বাধীনতার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার উপায় লইয়া অনেকেই চিন্তান্বিত। কারণ বোধ হয় এই যে, ক্ষমতায় যাহারা বসেন তাহারা নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থকে কায়েম করিতে চান। ইহাতে অপর শ্রেণীর আর কোন স্বাধীনতা থাকে না। আবার দেখা গিয়াছে ক্ষমতায় যাহারা বসেন তাহারা আদর্শ ভ্রষ্ট হন।* সমাজে কেহ কেহ বিশেষ সুযোগ পায়, রাষ্ট্রের কাজও পক্ষপাতমূলক হইতে পারে; ফলে একজনের স্বাধীনতা অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ স্বাধীনতার কয়েকটি রক্ষাকবচ নির্দেশ করিয়াছেন। নিচে কয়েকটি রক্ষাকবচের উল্লেখ করা হইলঃ

(১) **আইনের সাহায্যঃ** আইন যদি স্বাধীনতা ও অধিকারকে একবার স্বীকার করিয়া লয় তবে বিচার বিভাগের সাহায্যে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায়। বিচারকের রায়ের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে মানিয়া লইতে সরকারকেও বাধ্য করানো যাইবে। আইন স্বীকৃত স্বাধীনতা ব্যক্তিবিশেষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা যেহেতু আইন স্বীকার করে না সেইহেতু স্বাধীনতা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সরকার যদি স্বৈরাচারী হয় এবং স্বৈরাচারমূলক আইন প্রণয়ন করে তখন কি হইবে? এই প্রশ্নের জবাব হইল স্বৈরাচারী শাসকও লিখিতভাবে স্বৈরাচারকে বহাল করিবে না; কারণ, তাহাতে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং তাহারা আইন মান্য করিবে।

(১) আইন

(২) **লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারঃ** ঐ একই যুক্তিতে অধিকারগুলির শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি অপরিহার্য। শাসনতন্ত্রে অধিকারগুলি স্থান পাইলে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারগুলি কার্যকর হয় এবং সংখ্যালঘুরাও বুঝিতে পারে তাহাদের কি অধিকার শাসনতন্ত্র মানিয়া লইয়াছে। আবার বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনকে কার্যকর করিবার

(২) মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণ

* "Power corrupts and absolute power corrupts absolutely."—Lord Acton

জন্য সরকারকেও বাধ্য করানো যায়। মৌলিক অধিকারগুলিকে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি দিতে হয়। যেমন, ভারতের শাসনতন্ত্রে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, সাম্যের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার, সবিশেষ স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সরকার যদি এই অধিকারগুলি অমান্য করে তবে আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায়।

(৩) **ক্ষমতা পৃথকীকরণ ঃ** লক্, মতেসকিউয়ে, ম্যাডিসন প্রমুখ ক্ষমতা পৃথকীকরণকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ এলাকায় কাজ করিবে। কেহ কাহারও বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করে তবে স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। একই ব্যক্তির হাতে যদি শাসন পরিচালনা ও বিচারের ভার থাকে তাহা হইলে ন্যায় বিচার পাওয়া দুঃসাধ্য। শাসকের অন্যায়ের প্রতিকার হইবে না। স্বৈরাচারিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ধ্বংস হইবে।

(৩) ক্ষমতাপৃথকীকরণ

(৪) **বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ঃ** আইনের যথার্থ ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত বিচার ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী ও ন্যায্য বিচার পদ্ধতি। বিচারকদিগকে শাসন ব্যবস্থার অন্যান্য বিভাগ হইতে আলাদা করিয়া রাখা প্রয়োজন। কারণ তাহা না হইলে বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি শাসকের মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইবে। শুধু ক্ষমতা ভাগভাগি করিলেই চলিবে না বিচারকদিগের নিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করিতে হইবে। এইজন্য সর্বাগ্রে দরকার (ক) বিচারকদিগের চাকুরির নিরাপত্তা, (খ) তাহাদের বেতন ও পদোন্নতির নিশ্চয়তা। কারণ, বিচারক যদি তাঁহার চাকুরির স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত না থাকেন, তাহাকে যদি তাঁহার চাকুরির জন্য আইনসভা, শাসকমণ্ডলী ও জনমতের ক্রোধ উপেক্ষা করিবার মতো অবস্থায় না রাখা যায় তবে তাঁহার নিকট নির্ভীক ন্যায় বিচার আশা করা যায় না। তাই অনেকেই বলেন, বিচারকগণ চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর তাহাদের যেন আর কোন লাভজনক কাজে নিয়োগ না করা হয়। শাসনবিভাগই বিচারকদের নিয়োগ করে সতরাং শাসনবিভাগকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিচারকগণ সরকারের শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে কখনও মামলার রায় দিবে না। তাই বিচার বিভাগের নিয়োগ, পদোন্নতি বিচার বিভাগের হাতেই রাখা ভালো। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগ শাসনতন্ত্রের বাহিরে যে সব আইন পাস করে এবং শাসন বিভাগ কর্তৃক যে আইন প্রণীত হয় তাহা যদি ব্যক্তি স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হয় তাহা হইলে যাহাতে আদালতের নিকট আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার বিচার ব্যবস্থা যাহাতে মৌলিক অধিকার বলবৎ করিবার জন্য বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus) এবং পরমাদেশ (Mandamus) প্রভৃতি জারি করিতে পারে উচ্চতর আদালতগুলিকে সে

(৪) বিচারকের স্বাধীনতা

অধিকার দিতে হইবে। তাহার জন্য ভারতের সংবিধান বিচারবিভাগকে এই অধিকার দিয়াছে।

(৫) **আইনের অনুশাসন** : স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইল আইনের অনুশাসন (Rule of Law) বজায় রাখা। আইনের অনুশাসনের অর্থ, (ক) আইনের পূর্ণ প্রাধান্য এবং (খ) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যায়, আইনের অনুশাসন বলিতে বুঝায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলকেই আইন ব্যবস্থার অধীন থাকিতে হইবে। আইনের অনুশাসন স্বীকৃত হইলে সরকার পূর্বে ঘোষিত আইনানুসারে সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে। ফলে আইনানুমোদিত নয় এমন কোন ক্ষমতার ব্যবহার সরকার করিতে পারিবে না। আর আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অর্থ প্রত্যেকের জন্য এক আইন অর্থাৎ অধিকারে সাম্য রক্ষিত হইবার আইনগত স্বীকৃতি।

কিন্তু প্রশ্ন হইল আইন কি ? আইন হইল শ্রেণী স্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ। যে শ্রেণী যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিবে আইন তাদের কথাই বলিবে। আর সব সেই আইনের বিচারে নিপীড়িত হইবে, এবং তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে না। সুতরাং আইনের অনুশাসনে স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে শুধু তাহাদের যাহারা আইনটি প্রণয়ন করিবে, কারণ তাহারা আইন প্রণয়ন করিবে তাহাদের প্রয়োজন মতোই। অন্য কাহারও স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে না।

(৬) **দায়িত্বশীল শাসন**-ব্যবস্থা : আইভর জেনিংস বলেন, "কমন্স সভার দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে সমালোচনাকে স্পষ্ট ও কার্যকর করা যায় ফলে ইহাই হইল শাসন বিভাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ।" এই কারণে ইংল্যাণ্ডে বিরোধী দলকে স্বাধীনতার রক্ষা কবচ হিসাবে ধরা হয়। সরকার যদি দায়িত্বশীল হয়, জনদরদী হয়, কাজের জন্য আইন সভার নিকট জবাবদিহী থাকে তবে তাহার পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব নয়, এবং জনগণের স্বাধীনতাও রক্ষা পায়।

(৮) **জনগণের সচেতনতা** : জনগণের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ও সাহসিকতাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে বর্ণনা করেন। জনগণ যদি সদাজাগ্রত হয় তবে শাসকবর্গ সচেতন জনসমুদ্রকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না। অবশ্য এইজন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার। গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিসও চিরন্তন সতর্কতা ও সাহসিকতাকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৯) **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ** : ল্যাস্কি বলেন, যে রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে বেশীমাত্রায় ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয় সেই রাষ্ট্রে কোন প্রকার স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। "ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে। তাই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইল ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা। সারাদেশে যদি ক্ষমতা ছড়াইয়া থাকে তবে কোন কর্তৃপক্ষই ক্ষমতাকে এককভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না এবং একছত্র ক্ষমতা কাহারও হাতে না থাকায় জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে।

(১০) **গণভোট গণউদ্যোগ ও পদচ্যুতি :** স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক রাষ্ট্র জনগণকে 'গণভোট', 'গণউদ্যোগ' এবং 'পদচ্যুতি' প্রভৃতি অধিকার দিয়া থাকে। গণভোটের মাধ্যমে জনগণ আইন প্রণয়নের সময় নিজেদের মতামত ভোট দানের মাধ্যমে ব্যক্ত করিতে পারে। জনগণ ভোট দ্বারা সম্মতি না দিলে আইন পাস হয় না। গণউদ্যোগের দ্বারা বোঝায় জনগণের উদ্যোগেই আইন প্রণীত হয়। পদচ্যুতির অর্থ হইল যখন কোন জনপ্রতিনিধি জনগণের স্বার্থে কাজ না করে তখন জনগণ তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। এই অধিকারগুলির দ্বারা জনগণ তাহাদেব স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক জনতাকে যদি এইরূপ অধিকার দেওয়া হয় তবে আইন প্রণয়নে বিলম্ব হইবে এবং ঘনঘন গণভোট গ্রহণ করাও সম্ভব হইবে না। ছোট রাষ্ট্রের পক্ষেই স্বাধীনতার রক্ষা কবচ হিসাবে এই অধিকারগুলি ব্যবহৃত হইতে পারে।

আইন ও স্বাধীনতা

(Law and Liberty)

সাধারণতঃ স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজের ইচ্ছামতো কাজ করিবার অবাধ ক্ষমতা। কিন্তু মানুষকে যদি এইভাবে অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে দেওয়া হয় তবে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেয়। সমাজে বল যার বেশী সে দুর্বলের স্বাধীনতা হরণ করিবে। অর্থবলে বলীয়ান মিলমালিক শ্রমিককে তাহার ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে। স্বাধীনতার অর্থকে এইভাবে ধরিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়।

বস্তুতঃ, স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিবিশেষেব একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়। সমাজের প্রত্যেকেই ইহার সমান অংশীদার। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের চরম সুযোগ পায় সেইজন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র প্রত্যেক্যের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং উহাকে রক্ষা করে। একজনের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা নষ্ট না হয় সেইজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাকে কতকগুলি বিধি-নিষেধের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে। **এই বিধিনিষেধের অর্থ আইন।** রাষ্ট্র যদি এইরূপ আইন করে যে, কেহ কাহাকেও হত্যা করিতে পারিবে না, তবেই প্রত্যেকের জীবনের অধিকার কার্যকর হইবে। সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষভাবে যে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব আইনকে বলবৎ করে তাহার উপর নির্ভরশীল। একজনের যা খুশী তাই সে করিতে পারার অর্থ স্বাধীনতা নয়। অপরের অধিকারকে

(১) বিধিনিষেধের অর্থ আইন

স্বীকার করিয়া যে যতটা অধিকার ভোগ করিতে পারিবে ততটাই তার স্বাধীনতা। আইন একজনকে যা খুশী তাই করিতে দেয় না। আইন একজনকে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না। একজনের যাহাতে অধিকার অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা এরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজের কোন লোকের স্বাধীনতা কোনরূপে ব্যহত না হয়। বার্কারের ভাষায়, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ।"*

রাষ্ট্র রাষ্ট্রে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে, পারস্পরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ইহা করিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার বা চরম ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। সার্বভৌমশক্তির দ্বারাই রাষ্ট্র সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে, একজন যাহাতে অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করে। প্রত্যেকেই যাহাতে নিজের স্বাধীনতাটি ভোগ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করে। তাই বলা হয় সার্বভৌমিকতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নহে।**

এই সার্বভৌমের আজ্ঞাই আইন। আইন হইল রাষ্ট্রের হস্তে প্রধান হাতিয়ার, যাহার দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন একটি পরিবেশ গড়িয়া তোলে, যে পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে সক্ষম হয়। এই আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র (১) ব্যক্তি স্বাধীনতাব সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। আবার (২) আইনের মাধ্যমে শাসকবর্গের কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করিযা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং (৩) আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিব ব্যক্তিত্ব বিকাশেব সহাযক পরিবেশ সৃষ্টি করে। যেমন একব্যক্তি যাহাতে অপরের সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ না করিতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। এই আইন অমান্য করিলে দৈহিক শাস্তি পাইতে হয়। এই শাস্তির ভয়ে লোকে আইন মান্য করে, ফলে মানুষের সম্পত্তির অধিকার রক্ষা পায়। সম্পত্তির সাহায্যে মানুষ তাহার আত্মার বিকাশ সম্ভব করিতে পারে, ফলে স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারে। এমনি ভাবে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই বরং আইন স্বাধীনতার সহায়ক, আইন ছাড়া স্বাধীনতা অবাস্তব। তাই আইনকে বলা হয় **স্বাধীনতার রক্ষক** (**"Law is the condition of Liberty"**)। এই কারণে স্বাধীনতাকে **আইন সঙ্গত স্বাধীনতা** (**Legal Liberty**) বলিয়াও অনেকে মনে করেন।

(২) আইন স্বাধীনতার পরিপূরক

সমাজে প্রত্যেকেরই যদি কল্যাণ করিতে হয় তবে প্রত্যেকেই যাহাতে প্রত্যেকের অধিকারকে স্বীকার করে অর্থাৎ কাহারও অবাধ অধিকার থাকিবে না, একের

* 'The need of liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty for all".—Barker

** "Sovereignty and Liberty are not contradictory terms".

অধিকার অপরের অধিকারের দ্বারা সীমিত হইবে অর্থাৎ একজনের ততটুকু অধিকারই থাকিবে যাহাতে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। এইজন্য প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নির্দিষ্ট করা হয়, সীমিত করা হয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে তাহা শুধু বলবানের স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। ইহা হইল "জোর যার মুল্লুক তার" নীতির প্রয়োগ মাত্র। সভ্য সমাজে একজনের স্বাধীন আচরণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে অপরের স্বাধীন আচরণ ব্যাহত না হয়। আমার রাস্তায় চলিবার স্বাধীনতা আছে, অতএব অপরের আমাকে ধাক্কা মারার অধিকার নাই, তাহার ধাক্কা মারার অধিকার সীমিত হইল। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "স্বাধীনতার প্রকৃতিতেই রহিয়াছে নিয়ন্ত্রণ।" আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যায় যে, রাষ্ট্র কর্তৃত্ব আইনের মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যাহাতে একজনের আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা যেন অপরের আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

সমালোচনা : অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, আইনসঙ্গত স্বাধীনতাই একমাত্র স্বাধীনতা নয় এবং আইনসঙ্গত স্বাধীনতার ক্ষেত্র ছাড়া, অন্যান্য স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আইনের কর্তৃত্ব বজায় থাকে না। যেমন, **সামাজিক স্বাধীনতার** (**Social Freedom**) ক্ষেত্রে আইনের কর্তৃত্ব বজায় থাকে না। রাষ্ট্রের বাহিরে আছে বৃহত্তর মানব সমাজ। এই মানব সমাজজীবনে সামাজিক বিধির দ্বারা সৃষ্ট এবং সামাজিক বিধির দ্বারা সংরক্ষিত সামাজিক স্বাধীনতা বলিয়া এক প্রকারের স্বাধীনতার অস্তিত্ব রহিয়াছে। আবার সামাজিক স্বাধীনতার পিছনে বিবেক দংশন ছাড়া এমন কোন কর্তৃত্ব নাই যাহা ইহাকে কার্যকর করিতে পারে। এই কারণে রাষ্ট্র অনেক সময় ইহাকে আইন দ্বারা স্বীকার করিয়া লইয়া ইহাকে আইনানুমোদিত করে। এইভাবে আইনসঙ্গত হইয়া অনেক সামাজিক স্বাধীনতা আইনসঙ্গত স্বাধীনতার পর্যায়ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় **ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা**। পূর্বে যাহা সামাজিক স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য হইত বর্তমানে তাহাকে অনেক রাষ্ট্র আইনানুমোদিত করায় ইহা প্রকৃত স্বাধীনতার পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যবস্থার মতো মনুষ্যসমাজও নিয়মাধীন। বৈজ্ঞানিক, সামাজিক আইন, নৈতিক আইন ও রাষ্ট্রিক আইন হইল বিভিন্ন রকম আইন। আইন মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের নির্দেশ দিয়া রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের অভীষ্টলাভের সুযোগ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রশক্তি আইনকে বলবৎ করে।

আইনের সংজ্ঞা : (১) বিশ্লেষণপন্থীরা বলেন, আইন সার্বভৌমের আদেশ। (২) ঐতিহাসিকগণ বলেন, আইন ইতিহাসের ফল। (৩) সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, আইন সমাজদেহ হইতে উদ্ভূত ও সমাজ বিবর্তনের ফল। (৪) দার্শনিকগণ বলেন, আইন আদর্শের প্রকাশ। (৫) মার্কসীয় ধারণায় আইন শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ। (৬) হেগেলের মতে আইন সর্বোচ্চনীতির প্রতীক।

আইনের উৎস : (১) প্রথা, (২), ধর্ম, (৩) বিচার মীমাংসা, (৪) বৈজ্ঞানিক আলোচনা, (৫) ন্যায়-নীতি ও (৬) আইন প্রণয়ন।

আইনের প্রকারভেদ : স্বাভাবিক আইন, রাষ্ট্রনৈতিক আইন ও আন্তর্জাতিক আইন।

লোকে আইন মান্য করে—নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধাভক্তি, সহানুভূতি, দণ্ডভয়, উপযোগিতার উপলব্ধিহেতু।

স্বাধীনতার ধারণা : অবাধ স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় স্বেচ্ছাচারিতা। একের স্বাধীনতা দ্বারা অপরের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। আইন ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়, বরং পরিপূরক। ব্যক্তির ব্যক্তি-সত্তাকে প্রকাশ করিবার পক্ষে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে রাষ্ট্র। এই পরিবেশকেই যদি স্বাধীনতা বলা হয় তবে রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে স্বাধীনতার রক্ষক বলা যাইতে পারে।

স্বাধীনতার প্রকারভেদ : স্বাভাবিক স্বাধীনতা, আইনসঙ্গত স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

আইন ও স্বাধীনতা : আইন স্বাধীনতার সর্ত।

প্রশ্নাবলী

১। আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Define Law and discuss the nature of Law.)

২। আইনের উৎস কি কি ?

(What are the sources of Law.)

৩। স্বাধীনতার অর্থ কি ? ইহার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।

(What is meant by the Concept of Liberty ? Explain its different forms.)

৪। আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কি কি ?

(What are the safeguards of liberty in a modern state ?)

৫। "আইন স্বাধীনতার সর্ত"—ব্যাখ্যা কর।

("Law is the Condition of Liberty." Explain.)

৬। আইন কাহাকে বলে ? স্বাধীনতার সহিত ইহার সম্পর্ক আলোচনা কর।

(Define law and discuss its relation with Liberty.)

অতিরিক্ত পাঠ্য

MacIver—The Modern State, Ch. VIII

Sidgwick. H—Elements of Political Science. Ch. XIII.

Diecy—Law and Public Opinion.

৭ । নাগরিকত্ব, অধিকার ও কর্তব্য
(Citizenship, Rights and Duties)

(নাগরিকত্ব,—নাগরিকের সংজ্ঞা—নাগরিকত্ব অর্জন ও বর্জন, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য—পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ।)

[Citizenship—Definition a of citizen—Acquisition and loss of citizenship ; Rights and Duties of a citizen—Civil and Political Rights]

নাগরিকত্ব (Citizenship) ঃ নাগরিকত্বের ধারণা নূতন নয়। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থে ও প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থে নাগরিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আছে। জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু সব জনসমষ্টিকেই নাগরিক বলা হয় না। তবে নাগরিক কাহাদের বলা হয়? এই প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে দেওয়া হয়। সাধারণ অর্থে নাগরিক বলিতে বুঝায় **নগরবাসীকে**। যেমন কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি নগরে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে এইসব নগরের নাগরিক বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাগরিক শব্দের একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে। নাগরিক শব্দের অর্থ ইহল **"রাষ্ট্র সংস্থার সদস্য"**। নাগরিক শব্দটির ব্যবহার গ্রীকদের নগর রাষ্ট্রের আলোচনায় পাওয়া যায়। তবে গ্রীকগণ রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীকেই নাগরিকেব মর্যাদা দিত না। আজও কোন রাষ্ট্রই রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীকেই নাগরিকের মর্যাদা দেয় না। অর্থাৎ নাগরিক হইল রাষ্ট্রের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি। প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে যাহাদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা ও বিশ্রামের জন্য প্রচুর সময় আছে তাহাদিগকেই নাগরিক বলিয়া অভিহিত করা হইত। সমাজের অবশিষ্টাংশ মানুষ ও ক্রীতদাস প্রভৃতিকে নাগরিক বলা হইত না। কারণ, এই সকল পরনির্ভরশীল অধিবাসীদের সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত না।

(১) নাগরিকের সংজ্ঞা

বর্তমানে নাগরিক সম্বন্ধে ধারণা অনেক পাল্টাইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন আর পূর্বের মতো ক্ষুদ্র নাই। ইহার আয়তন বিশাল, লোকসংখ্যাও প্রভূত। এই বিশাল রাষ্ট্রেরই শুধু শহরে-নহে, গ্রামেও যাহারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করে তাহারা যদি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখায় তবে তাহাদের সকলকেই নাগরিক পদবাচ্য করা হয়। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে কতকগুলি সুযোগ সুবিধা পায়। আবার রাষ্ট্র নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিয়ভাবে কোন কর্তব্য পালনের দাবি করে না বটে, কিন্তু নাগরিকদিগকে রাষ্ট্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ধরা হয় এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতিতে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকিতে হয়। সকল নাগরিকেরই কিছু-না-কিছু প্রতিভা ও জ্ঞানবুদ্ধি আছে। নাগরিককে তাহার এই প্রতিভা

(২) নাগরিক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ

জনগণের কল্যাণে নিয়োগ করিতে হইবে। সমাজের সামগ্রিক উন্নতির মাধ্যমে নাগরিকের নিজের জীবনকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করা বিধেয় বলিয়া মনে করা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকতার একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলেন : "নাগরিকতা হইল জনগণের হিতার্থে ব্যক্তির দ্বারা মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ।"*

নাগরিকতার অর্থ হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণের সমাবেশ। আবার শুধু এই গুণের সমাবেশ হইলেই চলিবে না, সেই গুণীব্যক্তিকে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য তাহাব গুণাবলীকে প্রয়োগ করিতে হইবে।

বর্তমান রাষ্ট্রেও দেখা যায় রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীকেই নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয় না। বাষ্ট্রের অধিবাসীকে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ; যথা, (১) নাগরিক, (২) সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ নাগরিক এবং (৩) বিদেশী।

নাগরিক (Citizen) : নাগরিক কাহাদের বলা হয় তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে একটা অংশ নাগরিক। নাগরিক সভ্য মানুষ হিসাবে বাঁচিবার অধিকার, নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার. নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকাব এবং নির্বাচনমূলক পদ অধিকার করার সুযোগের অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্রেব অন্যান্য অধিবাসীরা তাহা করে না। নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জানায় এবং নির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব পালন করে।

(২) সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ নাগরিক (Citizen and National) : রাষ্ট্রে নাগরিক ছাড়াও আরও এক প্রকারের লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যাহারা নাগরিকের মতোই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রের আইনকানুন মানিয়া চলে, তথাপিও তাহারা নাগরিত্ব পায় না। যেমন একুশ বৎসর বয়স্ক না হইলে ভারতের কোন স্ত্রী-পুরুষই পূর্ণ নাগরিকত্ব পায় না। কিন্তু ইহারা সকলেই রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তি। কেহ নাগরিকত্ব পাইল কি, পাইল না তাহা একটি সর্তের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা হইল ভোটদানের রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা ভোটাধিকার পায় তাহারা পূর্ণ নাগরিক আর যাহারা ভোটাধিকার পায় না তাহারা **অসম্পূর্ণ নাগরিক (National)**। অসম্পূর্ণ নাগরিকের বদলে কেহ কেহ **প্রজা (Subject)** শব্দটিও ব্যবহার করেন। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে ও ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশগুলিতে মহান নৃপতির প্রজা (Her Majesty's Subject) শব্দটি ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রের কাঠামোও নাগরিকত্ব স্থির করে। যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব দুই রকমের হইতে পারে। অর্থাৎ নাগরিকত্ব বিভক্ত হইতে পারে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **দ্বিব-নাগরিকত্ব (Dual Citizenship)** স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ একই নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাইতে পারে

---

* "Citizenship is the contribution of one's instructed judgment to public good." —Laski.

আবার যে অঙ্গ রাজ্যে সে বাস করে সেই অঙ্গরাজ্যের নাগরিকত্ব পাইতে পারে। ভারত যদিও যুক্তরাষ্ট্র তবু এখানে দ্বি-নাগরিকত্বের নীতি স্বীকৃত হয় নাই।

(৩) **বিদেশী (Alien) ঃ** রাষ্ট্রে নাগরিক ও অসম্পূর্ণ নাগরিক ছাড়াও আরও এক প্রকার লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যাহারা বিদেশী বলিয়া পরিচিত। অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিক যখন সাময়িক ভাবে কোন রাষ্ট্রে বাস করে তখন তাহাকে বিদেশী বলিয়া গণ্য করা হয়। বিদেশীরা তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। বিদেশী ও অসম্পূর্ণ নাগরিক উভয়েই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। তথাপি বিদেশী ও অসম্পূর্ণ নাগরিক এক নয়। বিদেশীরা ভিন্নদেশের লোক আর অসম্পূর্ণ নাগরিক স্বদেশের লোক।

নাগরিকত্ব অর্জন ও বর্জনের পদ্ধতি Modes of Acquisition and loss of Citizenship) ঃ নাগরিকত্ব কথাটি বলার সাথে সাথেই কতকগুলি সর্তের কথা মনে পড়ে। রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মধ্যে যাহারা সেই শর্তগুলি পূরণ করিতে পারিবে তাহারাই নাগরিকত্ব পাইবে। আর যাহারা সেই সর্ত পূরণ করিতে পারিবেনা তাহারা নাগরিকত্ব পাইবে না। সব রাষ্ট্র একই ধরণের শর্ত আরোপ করে না। ভারতে যে ভাবে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় রাশিয়ায় সে ভাবে নাগরিকত্ব লাভ করা যায় না। যেমন, একুশ বৎসর বয়স্ক না হইলে ভারতে কোন স্ত্রী-পুরুষই নাগরিক হইতে পারে না, ভোটাধিকার পায় না, কিন্তু রাশিয়ায় কুড়ি বৎসর বয়স্ক লোকই নাগরিকত্ব পায়। আবার যাহারা দেউলিয়া, উন্মাদ এবং আইনভঙ্গকারী, দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী তাহাদের অনেক সময় ভোটাধিকার দেওয়া হয় না, তাহাদের সকল প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়। আবার অনেক দেশে কুল (Race), গায়ের রং, ধর্ম, শিক্ষার মানদণ্ড, সম্পত্তির মালিকানা এবং স্ত্রী-পুরুষভেদে নাগরিকত্ব স্থির করা হয়। কিন্তু ইহারা সকলেই রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তি। ইহাদের মধ্যে কাহারও ভোটাধিকার আছে, আবার কাহারও তাহা নাই। এই ভোটদানের ক্ষমতা অনুসারে নাগরিক-কি-নাগরিক নয় তাহা স্থির করা হয়।

(১) সর্ত

নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি ঃ নাগরিকত্ব অর্জন ও বর্জন সম্বন্দে বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে অনুসরণ করা হয়। সাধারণতঃ নাগরিকত্ব অর্জনের দুইটি পদ্ধতি আছে ; যথা, (১) জন্মসূত্র এবং (২) অনুমোদন। আবার জন্মসূত্র অনুসারে নাগরিকত্ব অর্জনের দুইটি পদ্ধতি আছে ; যথা (ক) জন্মনীতি (**Jus sanguinis**) এবং (খ) জন্মস্থান নীতি (**Jus soli or loci**)।

(১) **জন্মসূত্র ঃ** (ক) **জন্মনীতি** অনুসারে শিশু যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে তাহার পিতার নাগরিকত্ব পাইবে আর (খ) **জন্মস্থাননীতি** অনুসারে শিশু যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিবে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাইবে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে পিতা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয় আর তাহার সন্তান যদি ভারতে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে উক্ত সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব

পাইবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পিতা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয় আর তাহার সন্তান যদি ইংল্যাণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে উক্ত সন্তান ইংল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব পাইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহরে জন্মনীতি অনুসারে উক্ত সন্তানকে নাগরিকত্ব দিবে আর ইংল্যাণ্ডে তার জন্মস্থান নীতি অনুসারে উক্ত সন্তানকে নাগরিকত্ব দিবে। কিন্তু সন্তানটি একই সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না—ফলে সে ভয়ানক বিপদে পড়িয়া যাইবে। যেমন ভ্রাম্যমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের যদি তিনটি সন্তান তিনটি রাষ্ট্রে ভূমিষ্ঠ হয় তবে জন্মনীতি অনুসারে তিনটি সন্তানই হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক আর জন্ম-স্থাননীতি অনুসারে ৩টি সন্তানই ৩টি রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে। এইরূপ দ্বিজাতি-তত্ত্বের ফলে সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নাগরিকত্ব স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে। কোন উড়োজাহাজ বা জাহাজের মালিক যদি ইংল্যাণ্ডীয় হয় এবং সেই উড়ো জাহাজ বা জাহাজে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিকের একটি সন্তান জন্মায় তবে সে সেই উড়ো জাহাজ বা জাহাজের মালিকের দেশের অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব পাইবে।

(২) জন্মনীতি ও জন্মস্থাননীতি

(২) **অনুমোদন** ঃ অনুমোদন শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা, (ক) ব্যাপক অর্থে এবং (খ) সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে অনুমোদন বলিতে বোঝায় **বৈধতা** **(Legitimation)**। বিবাহ, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান, স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করা, সরকারী চাকুরি গ্রহণ প্রভৃতি উপায়ে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা। আর সংকীর্ণ অর্থে ইহার দ্বারা বোঝায় রাষ্ট্রনির্দিষ্ট সর্তসাপেক্ষে কাহাকেও আনুষ্ঠানিক ভাবে যে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ভারতে এই **অনুমোদন** কথাব অর্থে বোঝায় রাষ্ট্রের সর্ত সাপেক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব প্রদান। ভারতে কোন বৈদেশিককে নাগরিকত্ব পাইতে হইলে আবেদন করিতে হয়। ব্যাপক অর্থে অমুমোদন দিবার জন্য আবেদন করিতে হয় না।

(৩) অনুমোদন

অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে সকল সর্তে নাগরিকত্ব প্রদান করে তাহারা হইল ঃ (১) স্থায়ী বাসিন্দার সর্ত (Lex domicili), অর্থাৎ যে নাগরিকত্ব পাইতে চায় তাহাকে নির্দিষ্ট সময় রাষ্ট্রে বসবাস করিতে হইবে ; (২) তাহাকে চিরকাল বসবাস করিবার অঙ্গীকার ও কার্যের মাধ্যমে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হইবে ; (৩) ভারতের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সচ্চরিত্র হইতে হইবে ; (৪) ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানের উল্লিখিত ১৫টি ভাষার মধ্যে যে কোন একটিতে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। অনুমোদনের দ্বারা নাগরিকত্ব অর্জন পূর্ণ (perfect) বা অসম্পূর্ণ (imperfect) দুইই হইতে পারে। পূর্ণ নাগরিক কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে আর অসম্পূর্ণ নাগরিক তাহা করে না। ইহা ছাড়া ভারতে সমষ্টিগত অনুমোদনের (group naturalisation) ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ কোন দেশের অধিবাসীদের একযোগে নাগরিকত্ব প্রদান করার নীতি। আবার যাহারা অনুমোদনের মাধ্যমে

নাগরিকত্ব পায় তাহারা অনেক রাষ্ট্রে সকল প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদন প্রাপ্ত নাগরিক রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতিপদে আসীন হইতে পারে না।

আজকাল নাগরিকত্ব প্রাপ্তির উপর অনেক দেশই অনেক নিয়ন্ত্রণ ধার্য করে ফলে একটা জাতিবিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক বিরোধ দেখা দিতেছে।

ভারতের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি ঃ ভারতের সংবিধানে নাগরিকত্ব সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা নাই শুধু ১১ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে নাগরিকত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া নাগরিকত্ব সম্পর্কে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। **প্রথমতঃ**, (ক) সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে নাগরিকত্ব অর্জন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, জন্মস্থান ও স্থাযী বসবাসের সূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন কবা যাইবে। ইহার অর্থ বর্তমান সংবিধান প্রবর্তিভ হইবার সময় অর্থাৎ ১৯৫০ সালেব ২৬ শে জানুয়ারী তারিখে অথবা তাহার পরবর্তী সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণকারী সকল ব্যক্তি এবং ভারতে স্থায়ী বসবাসকাবী সকল ব্যক্তিই নাগরিকত্ব অর্জন করিবে।*

(খ) আবার স্থায়ী বসবাসকারীদের মধ্যে যাহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহাদের পিতা বা মাতা যদি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে সংবিধান প্রবর্তিত হইবার সময় তাহারা নাগরিকত্ব অর্জন করিবে।

(গ) আর যাহারা সংবিধান প্রবর্তিত হইবার ৫ বৎসর পূর্ব হইতে ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে তাহারা যদি ভারতে স্থায়ী বাসিন্দা হয় তবে তাহারাও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, তাহা হইল ভারত ভূমিতে জন্ম বা পিতা বা মাতার ভারত ভূমিতে জন্ম অথবা সংবিধান চালু হইবার ৫ বৎসর পূর্ব হইতে ভারতে বসবাস করিলেই ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করা যাইবে না। ইহার সহিত আর একটি সর্ত পূরণ করিতে হইবে, তাহা হইল স্থায়ী বসবাসের সর্ত। এখানে বুঝিতে হইবে স্থায়ী বসবাস আর বসবাস এক নয়। বাসিন্দার অভিপ্রায়ের দ্বারা বাসিন্দার স্থায়ী বসতি কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। বাসিন্দার এই অভিপ্রায় জানিতে পারা যায় বাসিন্দার গতিবিধি, জমিজমা ক্রয়, ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা, নিজ বাসগৃহ নির্মাণ প্রভৃতির মধ্য হইতে। অতএব যাহারা ভারতের নাগরিকত্ব পাইতে চায় তাহারা এই অভিপ্রায়গুলিকে কাজে পরিণত করিবে। তবেই নাগরিকত্ব পাইবে।

* "At the Commencement of the constitution, every person who has his domicile in the territory of India and (a) who was born in the territory of India; or (b) either of whose parents was born in the territory of India; or (c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding such commencement, shall be a citizen of India." Art 5, Constitution of India.

দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্তান হইতে আগতদিগের নাগরিকত্ব ঃ স্বাধীনতা অর্জন করিবার সময় ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগের নাম হয় **ভারত** আর অপর ভাগের নাম হয় **পাকিস্তান**। স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর পাকিস্তানে বাস করাটা যাঁহারা নিরাপদ মনে করে নাই তাহারা পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিবর্গকে নাগরিকত্ব প্রদান সম্পর্কে সংবিধান অনুসারে ঠিক হয় যে, যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের আগে ভারতে আসিয়াছে তাহারা নিজে বা তাহাদের পিতা বা পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহীর মধ্যে কেহ যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহারা যদি ভারতে আসিবার পর সাধারণভাবে ভারতে বাস করিয়া থাকে তবে তাহারা ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের নাগরিক অধিকার অর্জন করিবে।

ইহা ছাড়া ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই বা তাহার পরে যাহারা পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে তাহাদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হয় যে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যদি সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ভারত ডোমিনিয়নের সরকারের নিকট আবেদন করিয়া ভারতের সংবিধান প্রবর্তনের তারিখে ভারতের নাগরিত্ব অর্জন করিবে। অবশ্য, সরকারের নিকট আবেদন করিবার একটি সর্ত ছিল. তাহা হইল নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করিবার অব্যবহিত পূর্বে আবেদনকারীকে ৬ মাস ভারতে বসবাস করিতে হইবে। ইহার অর্থ ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারীর ৬ মাস পূর্বে পাকিস্তান ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু ইহার পরও অনেক লোক পাকিস্তান ছাড়িয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের জন্য ১৯৫৫ সালে আবার একটি নাগরিকতার আইন পার্লামেণ্টে পাস হয়।

তৃতীয়তঃ, বিদেশে ভারতীয় বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব ঃ সংবিধানের ধারায় বিদেশে ভারতীয় বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সকল ব্যক্তি নিজে অথবা যাহাদের পিতা বা মাতা বা পিতামহ বা মাতামহ পিতামহী বা মাতামহীর মধ্যে কেহ যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং যাহারা ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্য কোন দেশে বসবাস করিতে থাকে এবং তাহারা যদি সংশ্লিষ্ট দেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধির নিকট নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করে এবং ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধি তাহাদিগকে ভারতের নাগরিক বলিয়া তালিকাভুক্ত করেন তাহা হইলে এই সকল বিদেশে অবস্থানকারী ভারতীয়গণ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারিবে।

ভারতের ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন অনুসারে (১) জন্ম সূত্রে (by birth), (২) রক্তের সম্পর্কিত সূত্রে, (by descent), (৩) দেশীয়করণের মাধ্যমে (by naturalisation), (৪) রেজিষ্ট্রিকরণের মাধ্যমে (by registration) (৫) **রাষ্ট্রভুক্তির** (by incorporation of territory) মাধ্যমে **নাগরিকত্ব** অর্জন করা যায়।

(১) **জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন :** এই আইনে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে অথবা তাহার পরবর্তী সময়ে ভারতে যাহাদের জন্ম হইয়াছে তাহারা জন্মগত সূত্রে ভারতের নাগরিকতা অর্জন করিবে। অবশ্য, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার পিতা তাহার জন্মের সময় ভারতের নাগরিক ছিলেন।

(২) **রক্তের সম্পর্কগত সূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন :** বর্তমান আইনের ৪ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের পরে ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পিতা যদি ভারতীয় নাগরিক হয় তাহা হইলে রক্তের সম্পর্ক সূত্রে তাহারা ভারতের নাগরিকতা অর্জন করিবে।

(৩) **দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন :** আলোচ্য আইনের ৬নং ধারা অনুসারে বিদেশীয়েরা দেশীয়করণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক বিদেশী নির্দিষ্ট পন্থায় দেশীযকরণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়া এবং দেশীয়করণের নির্দিষ্ট কতকগুলি সর্ত পূরণ করিয়া দেশীয়করণের প্রমাণপত্র পাইতে পারে এবং ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে। অবশ্য এই পদ্ধতি কমনওয়েলথের রাষ্ট্রগুলির নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(৪) **রেজিস্ট্রিকরণের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন :** আলোচ্য আইনের ৫নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, রেজিস্ট্রিকরণের দ্বারাও ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়। যে সকল ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করে কতকগুলি সর্তাধীনে সরকার তাহাদিগকে রেজিস্ট্রিভুক্ত করিতে পারেন। অবিভক্ত ভারতের বাহিরের বসবাসকারী ভারতীয়গণ, ভারতে সাধারণভাবে বসবাসকারী এমন ভারতীয়গণ, যাহারা রেজিস্ট্রিভুক্ত হইবার আবেদন করিবার অব্যবহিত পূর্বে ৬ মাস ধরিয়া সাধারণভাবে ভারতে বসবাস করিয়াছে, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক নাগরিকগণ, ভারতীয় নাগরিকদিগকে বিবাহ করিয়াছে এমন স্ত্রীলোকগণ এবং ভারতীয় নাগরিকদিগের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান সন্ততিগণ রেজিস্ট্রিকরণের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব পাইতে পারে। অবশ্য, তাহাদিগকে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেখাইতে হইবে।

(৫) **রাষ্ট্রভুক্তিতে নাগরিকত্ব অর্জন :** কোন অঞ্চল, যাহা পূর্বে ভারতের ছিল না, তাহা যদি পরে কোন এক সময়ে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতের নাগরিকত্ব পাইবে। যেমন, গোয়া, দমন, দিউ এবং সিকিম প্রভৃতি অঞ্চল ভারতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, পরে এই সকল অঞ্চল ভারতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ফলে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা আজ ভারতের নাগরিক হইয়াছে।

(৬) **কমনওয়েলথ নাগরিক ঃ** কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলি ভারতের নিকট বিদেশী নয়। কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক ভারতে কমনওয়েলথ নাগরিকের মর্যাদা ভোগ করিবে। ভারত সরকার ভারতীয় নাগরিকদিগের প্রদত্ত অধিকারগুলি কমনওয়েলথ নাগরিকদিগকে প্রদান করিতে পারিবেন। অবশ্য, ভারতীয় নাগরিকগণ অন্যান্য কমনওয়েথলরাষ্ট্রে কি ধরণের অধিকার পায় তাহার উপর নির্ভর করিবে কি ধরণের অধিকার ভারত কমলওয়েলথ নাগরিকদিগকে দিবে।

উপরোক্ত পদ্ধতি দ্বারা ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়।

নাগরিকত্ব বর্জনের পদ্ধতি ঃ সর্ব দেশে একই পদ্ধতিতে নাগরিকত্ব বর্জিত হয় না। তবে সাধারণতঃ যে সকল কারণে এবং পদ্ধতিতে নাগরিকত্ব বর্জিত হয় তাহা হইল ঃ (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না। সে যদি অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তবে তাহাকে স্বরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিতে হইবে।

(২) বিদেশীর সহিত বিবাহিত স্ত্রীলোকের স্বরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব চলিয়া যায়।

(৩) আবার অনেক সময় অপর রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ্য না করিলেও নাগরিকত্ব চলিয়া যায়; যেমন, সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিলে, বিদেশীরাষ্ট্র প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিলে, স্বরাষ্ট্র হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিলে নাগরিকত্ব লোপ পায়।

পূর্বে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ছিল অপরিবর্তনীয়, তাই নাগরিকত্বের পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। বর্তমানে এই আনুগত্য পরিবর্তনীয় বলিয়া নাগরিকত্বও পরিবর্তনীয় হইয়াছে।

ভারতের নাগরিকত্ব বর্জন পদ্ধতি ঃ (১) ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইনে বলা হইয়াছে যে, কোন ভারতীয় নাগরিক যদি দেশীয়করণ, রেজিস্ট্রিকরণ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে স্বেচ্ছায় অপর কোনও দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তাহা হইলে সে ভারতের নাগরিকত্ব হারাইবে। অবশ্য, ভারতের নাগরিক যদি কমনওয়েলথভুক্ত কোনও দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তবে সে ভারতের নাগরিকত্ব হারাইবে না। আর যুদ্ধের সময় ছাড়া একটি ঘোষণার দ্বারা যে কোন নাগরিক তাহার নাগরিকত্ব পরিহার করিতে পারে।

(২) আলোচ্য আইনের ৮নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি একই সময়ে ভারত ও অন্য আর কোন দেশের নাগরিক হয়, তবে সে ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিকত্ব বর্জন করিতে পারে।

(৩) আলোচ্য আইনের ১০ নং ধারা অনুসারে দেশীয়কবণ ও রেজিস্ট্রিকরণ পদ্ধতিতে যাহারা ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছে এবং সংবিধান চালু হইবার ৫ বৎসর পূর্বে হইতে ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে এবং ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের স্থায়ী বসবাসকারী হিসাবে নাগ রকত্ব

অর্জন করিয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে ভারত সরকার আদেশ প্রদান করিয়া নাগরিকত্বের বিলোপ ঘটাইতে পারেন।

(ক) যে সকল নাগরিক ভারতীয় সংবিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে এবং সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের অভাব প্রদর্শন করিবে বা যাহাদের আনুগত্যের অভাব অনুভূত হইবে তাহাদের নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটানো যাইবে।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি অসদুপায়ে নাগরিকত্ব লাভ করে তাহা হইলে তাহার নাগরিকত্বের অবসান ঘটানো যাইবে।

(গ) দেশীয়করণ অথবা রেজিস্ট্রিকরণ পদ্ধতিতে যাহারা নাগরিকত্ব অর্জন করিবে তাহারা যদি দুই বা ততোধিক বৎসরের জন্য কোন দেশে কারাভোগ করে তাহা হইলে তাহাদের নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটানো যাইবে।

(ঘ) যুদ্ধের সময় দেশের শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গে ব্যবসায় লিপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট নাগরিকের নাগরিকত্ব লোপ পাইবে।

(ঙ) ভারতের কোন নাগরিক যদি উপর্যুপরি ৭ বৎসর ভারতের বাহিরে সাধারণভাবে বাস করে অথচ সে ভারতের বাহিরে কোন দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্র নয় বা ভারতীয় বৈদেশিক প্রতিনিধিকে ভারতীয় নাগরিকতা রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রতি বৎসর না জানায় বা ভারত যে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য তাহার কোন একটিতে চাকুরী না করে তাহা হইলে সরকার তাহার নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটাইতে পারেন।

ইহা ছাড়া সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিয়াছে এমন নাগরিকের নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে, আর কোন ভারতীয় নারী যদি কোন বিদেশীকে বিবাহ করে তাহা হইলেও তাহার নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট মহিলা যদি নাগরিকত্ব রক্ষা করিবার নিয়মাবলী মান্য করিয়া চলে এবং ভারতের নাগরিকত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হয় তবে সে নাগরিকত্ব রক্ষা করিতে পারিবে।

সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক ঃ বর্তমানযুগ গণতান্ত্রিকতার যুগ। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নির্ভর করে নাগরিকদিগের কতকগুলি বিশেষ গুণের উপর। যাহাদের এই গুণগুলি থাকে তাহারাই **সুনাগরিক**। **লর্ড ব্রাইস** এইরূপে তিনটি গুণের কথা বলিয়াছেন ; যথা (১) **বিচারবুদ্ধি** ; (২) **সংযম** এবং (৩) **বিবেকবুদ্ধি**। **বার্ণস** ইহার সহিত আরও দুইটি গুণ যুক্ত করিয়াছেন। তাহা হইল ঃ (৪) **সমাজপ্রেমিকতা** এবং (৫) **স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি**। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মতে প্রত্যেক নাগরিককে ন্যায়, অন্যায় ও সত্যাসত্য উপলব্ধি করিবার মতো যোগ্যবিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হইতে হইবে।

বর্তমান সমস্যা-সংকুল সমাজে নাগরিককে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া চলিতে হইবে। আত্মসংযমী হইয়া তাহাকে নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া সমষ্টিগত কল্যাণে ব্রতী হইতে হইবে। বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সহিষ্ণুতার সহিত নিজ কর্তব্য পালন করিতে হইবে। নাগরিককে যেমন নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন

হইতে হইবে, তেমনি আবার তাহাকে কর্তব্যের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। এইভাবে স্বাধীনচেতা ও স্বদেশপ্রেমিক নাগরিক তাহার কর্তব্য পালন করিলে দেশ ও জাতির কল্যাণ হইবে। কিন্তু সুনাগরিকতার পথে অনেক বাধা আছে। এই বাধাগুলিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে নাগরিক তাহার কর্তব্য পালন করিতে পারিবে না। এই বাধাগুলি হইল ঃ—

(১) **নির্লিপ্ততা ঃ** নির্লিপ্ততার অর্থ উদাসীনতা ও উৎসাহহীনতা। সর্বসাধারণের কাজ কাহারও নিজস্ব কাজ নয়—এই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইলে সকলের কল্যাণই ব্যহত হইবে। সে যদি ভুলিয়া যায় যে, সকলের মধ্যে সেও একজন, সকলের মঙ্গল হইলে তাহারও মঙ্গল হইবে, অন্যথায় নিজেরও অকল্যাণ হইবে। নির্লিপ্ততার জন্য অনেকে নিজের বক্তব্যটুকু সজোরে প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না। সমাজের ভিত্তিই হইল সহযোগিতা। নির্লিপ্ততা মানুষকে স্বার্থপর করিয়া তোলে। কতকগুলি কারণে মানুষকে নির্লিপ্ত থাকিতে হয়। এই কারণগুলি হইল, (ক) বৃহদায়তন রাষ্ট্র, (খ) বিভিন্ন দিকে আকর্ষণের সৃষ্টি, (গ) জীবনসংগ্রামের তীব্রতা।

(২) **ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ঃ** এই প্রসঙ্গে কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম হইল সমাজধর্ম; লোভরিপু তাহার প্রধান হন্তারক।" ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ মানুষকে সমাজবিরোধী কাজে প্ররোচিত করে। নাগরিকের উচিত অপরের ক্ষতি না করিয়া নিজের উন্নতি করা।

(৩) **দলীয় মনোবৃত্তি ঃ** গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হইল দলীয় প্রথা। দল প্রথার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা প্রসারলাভ করে, জনমত গঠিত হয়, দলভুক্ত নাগরিক স্বাধীনভাবে তাহার প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে এবং স্বৈরাচারিতার পথ রোধ করে। কিন্তু এই দলপ্রথার জন্যই দলভুক্ত নাগরিক দলেরই মঙ্গল কামনা করে, সমাজের নহে।

(৪) **অজ্ঞতা এবং সংবাদপত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এবং নির্বাচন পদ্ধতি** নাগরিককে বিপথে পরিচালিত করে। অজ্ঞ মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনে।

এইগুলি সুনাগরিকতার পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকগুলি দূর করিতে হইলে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে নাগরিকের নির্লিপ্ততা দূর করা যায়। যেমন, বাধ্যতামূলক ভোটদানের আইন পাস করিলে ভোটদাতাগণ ভোটদানের সময় নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না। আবার নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কার্যে উৎসাহিত করার জন্য জনগণকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইবে।

মূল্যায়ন ঃ সবদেশের নাগরিকত্বের সর্ত একই রকমের নহে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের নাগরিক অধিকার অর্জন করা অতিশয় অসুবিধাজনক। ইউরোপের অনেকদেশে বহুদিন পর্যন্ত নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই। এইদিক হইতে ভারতীয় নাগরিকত্ব বিশ্বজনীন নীতির ভিত্তিতে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের নাগরিকত্বের ব্যবস্থা কোন ধর্মীয় বা জাতিগত নীতির ভিত্তিতে রচিত হয় নাই।

অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties) ঃ (ক) অধিকার ঃ অধিকার বলিতে বোঝায় কোন কিছুর উপর স্বত্ব বা দাবি। এই স্বত্ব বা দাবিগুলি যদি সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নাগরিক স্বীকার করে তবেই স্বত্বগুলি অধিকারে পরিণত হয়। অধিকারের ধারণা সমাজগত। মানুষ সমাজে বাস করে তাই তাহার অধিকারের প্রশ্ন উঠে। জনশূন্য দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশোর কোন অধিকার ছিল না, কারণ সে সমাজে বাস করিত না। রাষ্ট্র সমাজের পক্ষে আইনের মাধ্যমে অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অতএব অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত দাবি ছাড়া আর কিছু নয়। আর ইহার জন্ম হয় সমাজে। সমাজে একের যাহার উপর অধিকার অপরে তাহার উপর যদি হস্তক্ষেপ না করে, তবেই অধিকার জন্মায়। একজনের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারের অর্থ হইল অপরের তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার নাই। এইভাবে একের অধিকার অপরের অধিকারকে সীমিত করে। **ল্যাস্কি** বলেন যে, রাষ্ট্র কোন অধিকার সৃষ্টি করে না। অধিকার প্রত্যেক মানুষের পূর্ব হইতেই আছে, রাষ্ট্র শুধু ইহাকে স্বীকার করে। রাষ্ট্র যে সকল অধিকারকে স্বীকার করে তাহার দ্বারা রাষ্ট্রের চরিত্র বুঝা যায়। যেমন, ভারতের লোকের দাবি আছে **বেকার ভাতার,** কিন্তু ভারতের সংবিধান এই দাবিকে স্বীকার করে নাই। তাই বলিয়া এই দাবি বা অধিকারের অস্তিত্ব নাই তাহা বলা চলে না। অধিকার ঠিকই আছে তবে রাষ্ট্র এই অধিকারকে স্বীকার করে নাই। রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক—না—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী তাহা রাষ্ট্রের অধিকার স্বীকৃতিরদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কারণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এক ধরণের অধিকার স্বীকার করে আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র আর এক ধরণের অধিকার স্বীকার করে।

(১) অধিকার কাহাকে বলে

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। সে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়, কিন্তু ইহা করিতে হইলে কতকগুলি সামাজিক অবস্থার দরকার। এই **সামাজিক অবস্থা** গুলিকেই অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক **ল্যাস্কি** বলেন, অধিকার **হইল** এমন কতকগুলি সমাজজীবনের অবস্থা যাহাদের ছাড়া সাধারণভাবে মানুষ তাহার সম্পূর্ণ উন্নতি বিধান করিতে পারে না।* রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে তখনই যখন মানুষের আত্মোপলব্ধিতে রাষ্ট্র সাহায্য করিবে। তাই রাষ্ট্রকে কতকগুলি অধিকারে স্বীকৃতি দিয়া এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যে পরিবেশের সহায়তায় মানুষ আত্মোপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। অধিকার হইল আত্মোপলব্ধির অনুকূল পরিবেশ।

ল্যাস্কির সংজ্ঞা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই অধিকারকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দিতে হইবে। সমাজে কোন একজনের আত্মোপলব্ধির জন্য অধিকার

---

* "Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best."—Laski

অপর একজনের আত্মোপলব্ধির অধিকারের যেন বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হইবে। ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য বাঁচিবার অধিকারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একজনের বাঁচিবার অধিকারের অর্থ অপরকে হত্যা করার ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকার নহে। একজনের সম্পত্তি রক্ষার অধিকার তাহাকে ব্যক্তিত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করিবে। অবশ্য, ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার দিবার পূর্বে দেখিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি সমাজকে কিছু দেয় কিনা। অর্থাৎ সমাজকে কিছু দিবার পুরস্কার হইল সম্পত্তি। অন্যথায় প্রুধোর ভাষায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুণ্ঠনবৃত্তি ছাড়া কিছু নহে। ল্যাস্কি বলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি আত্মোপলব্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে তবে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। আবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের অর্থ এই নহে যে, একজন অপর একজনকে যাহা খুশি তাহাই বলিয়া অপরের সুনাম নষ্ট করিবে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অর্থ এই নহে যে, অপরের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ভোগ করা যাইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজজীবনকে সত্য ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য কতকগুলি সুযোগ, যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় তাহাকেই অধিকার বলা হয়।

(৩) অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ

টি. এইচ. গ্রীণের ভাষায় বলা যায় "সমষ্টিগত নৈতিক শুভচেতনা ব্যতীত অধিকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।* সামাজিক জীব হিসাবে কোন ব্যক্তি যদি শুধু তাহার নিজের সুখ সুবিধার কথা স্বার্থপরের ন্যায় চিন্তা করে তবে সে সমাজজীবনযাপন করিতে পারিবে না তাহাকে অপরের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। অপরের সুযোগ সুবিধার কথা ভাবিতে হইবে। পরস্পর পরস্পরের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন হইলেই সমাজে অধিকারের অস্তিত্ব সম্ভব হয়। অন্যথায় প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজেব আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাইবার জন্য ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা হইলে সেই ক্ষমতা হইবে পাশবিক ক্ষমতার সমতুল্য। এই ক্ষমতা যে সমাজে বলবৎ থাকে সে সমাজে অধিকারের অস্তিত্ব সম্ভব নহে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, অধিকারকে পূর্ণ করিতে হইলে দুইটি সর্ত পূর্ণ করিতে হইবে। (ক) প্রথমটি হইল প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থাৎ সমষ্টির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে আর (খ) দ্বিতীয়টি হইল অধিকারকে আইনানুমোদিত হইতে হইবে। বার্কার আবার আধা অধিকারের কথা বলিয়াছেন। যে সকল অধিকার এই দুইটি সর্ত পুরাপুরি পূর্ণ করে না তাহা হইল আধা অধিকার।

আবার অধিকার শুধু আইনানুমোদিত হইবে না, কারণ ক্রীতদাস পোষণের অধিকার যদি আইনানুমোদিতও হয় তথাপিও উহা অধিকারের পর্যায়ভুক্ত হইবে

* "Without a society conscious of common moral interests, there can be no rights—T. H" Green.

না, কারণ ইহা সমষ্টিগত কল্যাণের পরিপন্থী। সুতরাং অধিকারকে আইনানুমোদিত হইলেই চলিবে না, ইহাকে সমষ্টিগত কল্যাণকামী হইতে হইবে। প্রকৃত ও পূর্ণ অধিকার সবল ও দুর্বল সকলেই ভোগ করিতে পারিবে। রাষ্ট্র যদি দুর্বল ও সবল নির্বিশেষে সকলের অধিকার ভোগ করিবার সমান সুযোগ সৃষ্টি করিয়া সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের সমাধান করে তবেই অধিকার সার্থক হয়।

আদর্শরাষ্ট্র সকলের জন্য অধিকারের স্বীকৃতি দিবে। এবং তাহা সংরক্ষণ করিবে। আদর্শ রাষ্ট্র আদর্শ অধিকারকে স্বীকৃতি দিবে।

১৯৪৭ সালে মানব অধিকার সম্পর্কে ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞগণ এই সংজ্ঞা প্রদান করেন যে, মানুষের অধিকাব হইল জীবন যাপনেব এই সর্ত যাহা ছাড়া মানুষ সমাজের যে কোন ঐতিহাসিক স্তবে মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইযা সমাজের সক্রিয় সভ্য হিসাবে সমাজের উন্নতিতে সাহায্য কবিতে পারে না ("A right is a condition of living, without which in any given historical stage of society, men cannot, give the best of themselves, as active members of the community, because they are deprived of the means to fulfil themselves as human beings")

বৈশিষ্ট্যঃ অধিকারের বিভিন্ন সংজ্ঞা হইতে যে সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহারা হইল ঃ

(১) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কতকগুলি সুযোগের দাবি হইল অধিকার।
(২) এই সুযোগগুলি সমষ্টিগত কল্যাণকামী হইবে।
(৩) এই সুযোগগুলি আইনানুমোদিত হইবে।
(৪) ইহা মানুষের জীবনযাপনের সর্ত।

অধিকারের প্রকারভেদঃ অধিকারকে কতিপয শ্রেণীতে ভাগ করিয়াও দেখানো হয ; যথা, (১) স্বাভাবিক অধিকার, (২) নৈতিক অধিকার, (৩) আইন সঙ্গত অধিকার, (৪) সামাজিক অধিকার, (৫) রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার এবং (৬) অর্থনৈতিক অধিকার।

(১) স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights)ঃ মানুষ কতকগুলি অধিকারকে সঙ্গে লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই অধিকারগুলি ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। চামড়া যেমন মানুষের দেহের অংশ এবং এঞ্জিন যেমন চলার শক্তি তেমনি এই অধিকারগুলিও তাহার স্বভাবের অংশ। ইহা অপরিত্যাজ্য, সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ। এই অধিকারগুলিকেই বলে স্বাভাবিক অধিকার। চুক্তিবাদীদের ধারণায় প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকার ছিল তাহাই প্রাকৃতিক অধিকার। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার অবাধ ক্ষমতাকে হবস্ প্রাকৃতিক অধিকার বলিয়াছেন। ইহা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় ও ফ্রান্সের স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাভাবিক অধিকারের উল্লেখ আছে। আমেরিকার অধিকারের ঘোষণায় বলা

(১) সংজ্ঞা

হইয়াছে যে, মানুষ কতিপয় অপরিত্যাজ্য অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ফ্রান্সের স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সকল মানুষই স্বাধীন ও সমানাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে সংরক্ষণ করা। এই অধিকার গুলির মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার অধিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীণ বলেন, মানুষের নৈতিক-প্রকৃতি উপলব্ধি করিবার জন্য যে সকল অধিকার প্রয়োজন সেই অধিকারগুলিকে স্বাভাবিক অধিকার বলা হয়। বর্তমান ধারণায় স্বাভাবিক অধিকারকে আর চিরন্তন, অবাধ অপরিত্যাজ্য বলিয়া কল্পনা করা হয় না। গিডিংস বলেন, স্বাভাবিক অধিকার হইল "সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্রদ্বারা নির্বাচিত সমাজের প্রয়োজনীয় অধিকার।"*

সমালোচকগণ বলেন অধিকার সমাজদেহ হইতেই উদ্ভূত। সমাজ গতিশীল হইতে বাধ্য। সুতরাং সহজাত, চিরন্তন, অবাধ অধিকার বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। বেন্থাম প্রমুখ বলেন সমাজ নিরপেক্ষ কোন অধিকার থাকিতে পারে না। অধিকার সমাজস্বীকৃত দাবি। যে অধিকারের দ্বারা বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সামগ্রিক কল্যাণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যক্তির কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হয় তাহাই স্বাভাবিক অধিকার। সর্বাধিক মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধনকেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা হয়; সমাজ স্বীকৃত অধিকারগুলির মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা যায়।

(২) **নৈতিক** অধিকার (**Moral Rights**)ঃ নৈতিক অধিকার হইল সমাজের ন্যায়বোধ ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবি। ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া অনেকে ইহাকে স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেন। নৈতিক অধিকারের উদাহরণ হইল পুত্রের নিকট হইতে পিতার সদ্ব্যবহার পাইবার দাবি। রাষ্ট্রের আইন পিতার উপর পুত্রের অত্যাচারেব বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিতে পারে; কিন্তু জোর করিয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সদ্ব্যবহার আদায় করিতে পারে না। একমাত্র বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই পুত্র পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। এই কারণে নৈতিক অধিকারকে ঠিক অধিকার বলা যায় না। তবে আদর্শরাষ্ট্র নৈতিক অধিকার কার্যকরী করিবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া উহাকে প্রকৃত অধিকারের মর্যাদাদান করিবে। রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন দাবিই অধিকারের মর্যাদা লাভ করে না, কিন্তু নৈতিক দাবির পশ্চাতে কোন রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন না থাকিলেও ইহাকে অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। নৈতিক অধিকার সমাজকল্যাণের অনুপন্থী।

(৩) **আইনসঙ্গত অধিকার** (**Legal Rights**)ঃ রাষ্ট্রের আইন যে সকল অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় তাহাই আইনসঙ্গত অধিকার। তবে আইনসঙ্গত অধিকারকে

* "Natural rights are socially necessary forms of right, enforced by natural selection in the sphere of social relations."—Giddings

সমাজ কল্যাণের অনুপন্থী হইতে হইবে। শ্রেণী স্বার্থের তাগিদে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া যদি সমাজ অকল্যাণকর কোন অধিকারকে স্বীকার করে তবে তাহাকে পূর্ণ অধিকার বলা যাইবে না। কারণ পূর্ণ অধিকার সমাজ কল্যাণকর হইবে। সুতরাং আইনসঙ্গত অধিকারকে নৈতিক অধিকারের অঙ্গীভূত হইতে হইবে।

(৪) **সামাজিক অধিকার—১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।**

(৫) **রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।**

(৬) **অর্থনৈতিক অধিকার—১৯১ পৃষ্ঠা দেখ।**

(খ) **কর্তব্য (Duties) ঃ** কর্তব্য বলিতে বুঝায় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব কোন কিছু করাও হইতে পারে আবার কোন কিছু করা হইতে বিরত থাকাও হইতে পারে ; যেমন রাষ্ট্রের আইন মান্য করা একটি কর্তব্য, আবার রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য না করাও একটি কর্তব্য। কর্তব্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা, (১) **আইনসঙ্গত** কর্তব্য এবং (২) **নৈতিক কর্তব্য**। যে কর্তব্য পালন না করিলে রাষ্ট্র আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি দিতে পারে তাহাকে আইনসঙ্গত কর্তব্য বলা যাইতে পারে আর যে কর্তব্য মানুষ বিবেকের তাড়নায় পালন করে তাহাকে নৈতিক কর্তব্য বলা যাইতে পারে, গরীবকে সাহায্য করা নৈতিক কর্তব্যের উদাহরণ ; এই কর্তব্য পালন না করিলে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে না। ইহা বিবেকের দংশনেই লোকে পালন করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের আইন মান্য করাই হইল আইনসঙ্গত কর্তব্য। যদি কেহ রাষ্ট্রীয় আইন মান্য না করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিতে পারে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত করা হয় ভোটদান করা প্রভৃতিকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো কোন কোন দেশে ভোট-দানকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এইক্ষেত্রে ভোটদানকে আইনসঙ্গত কর্তব্যও বলা হয়। কর্তব্য বলিতে কতকগুলি দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারকেও বোঝায়। ইহা সমাজবোধ হইতেই জন্মায়। সমাজে একের অধিকারকে যখন অপরে স্বীকার করে তখন বুঝিতে হইবে একের দায়িত্ব বা কর্তব্য হইল অপরের অধিকারকে মানিয়া চলা। রাস্তায় একজনের চলার অধিকার আছে, অপরের কর্তব্য হইল তাহাকে চলিতে দেওয়া। এইভাবে অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তব্যকে বুঝিতে হইবে।

(১) কর্তব্যের সংজ্ঞা

নাগরিকের মূল কর্তব্যগুলি (Principal Duties) ঃ

(ক) **আইনকে মান্য করা (Obedience to Law) ঃ** আইনের মাধ্যমেই অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকেরই উচিত আইনকে মান্য করা। রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের জন্যই নাগরিকের আইন মান্য করিয়া চলা উচিত। আইন যদি অন্যায় হয় তবে জনমত গঠন করিয়া তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে তাহাকে অমান্য না করিয়া।

(খ) **রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য (Allegiance) ঃ** ইহা নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। আনুগত্যের অর্থ হইল রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া সর্বতোভাবে রাষ্ট্রকে

সাহায্য করা ; রাষ্ট্র এই আনুগত্যের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে। (১) রাষ্ট্রের তথা স্বাধীনতার অস্তিত্বকে বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করা ;

(২) প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সৎভাবে ভোটদান করা ;

(৩) রাষ্ট্রকার্যে সরকারী কর্মীদের সহায়তা করা নাগরিকের বিশেষ কর্তব্য। এইজন্য সর্বদেশে জুরীর প্রবর্তন হইয়াছে।

(৪) অপরাধীদের গ্রেপ্তার কার্যে, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে, রাষ্ট্র রক্ষার কার্যে প্রত্যেক নাগরিকেরই দায়িত্ব রহিয়াছে।

(গ) করপ্রদান (Payment of taxes) ঃ রাষ্ট্রযন্ত্রকে চালু রাখিবার জন্য, জনহিতকর কার্য করিবার জন্য, ব্যয় নির্বাহার্থ নাগরিককে কর প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) সামাজিক কাজ ঃ উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য নাগরিকগণকে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে সরকারকে সমালোচনা করা এবং ভোটদান ব্যাপারে সচেতন হওয়া কর্তব্য।

পরিশেষে বলা যায়, অধিকাংশ শাসনতন্ত্রেই নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের কর্তব্যগুলি লিপিবন্ধ হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে অধিকার ও কর্তব্য পাশাপাশি লিপিবন্ধ হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু নাগরিকের কর্তব্যের সোজাসুজি উল্লেখ করা নাই। কেহ কেহ বলেন অধিকারের সাথে কর্তব্যগুলি লিপিবন্ধ হওয়া উচিত। আবার কেহ কেহ বলেন অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকে সুতরাং উহা সংবিধানে লিপিবন্ধ না করিলেও চলে। ভারতের সংবিধান আবার সংশোধিত হইতে চলিয়াছে এই সংশোধনে নাগরিকের কর্তব্য উল্লিখিত হইবে।

(গ) অধিকার ও কর্তব্য ঃ অধিকার যেমন সমাজবোধ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কর্তব্যও তেমনি সমাজবোধ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সমাজে এক জনের দাবি যদি আর একজন মানিয়া লয় এবং স্বীকার করে তবেই অধিকার জন্মায়। দাবিগুলি স্বীকারের অর্থ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার। সমাজে একজনের অধিকার অপরের কর্তব্য পালনের উপর নির্ভরশীল। কোন সম্পত্তির উপর আমার **অধিকার** বজায় থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না অপর কেহ আমার সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ না করিবার কর্তব্য পালন করিবে। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে হবহাউস বলেন ঃ "আমার যদি ধাক্কা না খাইয়া পথে চলিবার অধিকার স্বীকৃত হয় তবে অপরের কর্তব্য হইবে আমাকে দরকার মতো পথ ছাড়িয়া দেওয়া।"[1] এই দিক হইতে বিচার করিলে অধিকারের অর্থ কর্তব্য পালন করা ("Rights imply duties."—*Laski*)। অতএব অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

অধিকার বলিতে বুঝায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু

*** "If I have a right to walk along the street without being pushed off the pavement...your duty is to give me reasonable room.—Hobhouse.**

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির অকল্যাণ করিয়া এই সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না।

সামাজিক কল্যাণের সহিত ব্যক্তিগত অধিকারের সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। নাগরিক সম্পত্তির অধিকার পাইলে তাহার কর্তব্য ঐ সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহার করা যাহাতে সমাজের কোন অকল্যাণ না হয়। অধিকার বলিতে বুঝায় আইনসঙ্গত অধিকার ও কর্তব্য।

(২) রাষ্ট্র বনাম কর্তব্য

রাষ্ট্রই অধিকারকে স্বীকার করে। সুতরাং সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখানো, তাহাকে কর দিয়া ব্যয় নির্বাহ করিতে সাহায্য করা, অপর দেশ কর্তৃক রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য যুদ্ধে যোগদান করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। কারণ, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই যদি বজায় না থাকে তবে নাগরিকের অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবে কে? অতএব রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য নাগরিকের।

(৩) ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্রোহের অধিকারও একটি কর্তব্য

আবার অধিকার বলিতে বোঝায় নাগরিকের ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করার সুযোগ সুবিধা। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই সকল সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। রাষ্ট্র যদি তাহার এই কর্তব্য পালন না করে তবে রাষ্ট্রের এই কর্তব্য সম্পাদনকারী যন্ত্র সরকারের পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নাগরিকের কর্তব্য হইল আইনসঙ্গতভাবে বিদ্রোহের দ্বারা এই সরকারকে পরিবর্তন করা। এই কারণে বিদ্রোহের অধিকারকে কর্তব্যের অন্তর্গত করা হয়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Civil and Political Rights) ঃ (ক) সামাজিক অধিকার বা নাগরিক অধিকার (Civil Rights) ঃ সমাজ জীবনে মানুষের এমন কতকগুলি অধিকারের প্রয়োজন যেগুলি ছাড়া মানুষের সামাজিক জীবন ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই অধিকারগুলির সাহায্যে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া সমাজের কল্যাণব্রতী কাজকে সক্রিয় করিয়া তোলে। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দিয়া এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে অনুকূল যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহাকেই বলে **ব্যক্তি স্বাধীনতা (Civil Liberty)**।

(১) সামাজিক অধিকার

গেটেলের মতে "রাষ্ট্র নাগরিকদিগের জন্য যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে এবং রক্ষা করে তাহাদিগকে পৌর অধিকার বা ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে।"* নিচে কতকগুলি মৌলিক সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল ঃ

(১) জীবনের অধিকার (Right to life) ঃ জীবনের অধিকার হইল মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার। অর্থাৎ একজন অপর একজনকে যদৃচ্ছা হত্যা করিতে

---

* "Civil liberty consists of the rights and privileges which the state creates and protects for its subjects."—Gettel

না পারার অধিকার। এই প্রসঙ্গে হবস্ বলিয়াছেন, জীবনরক্ষার জন্যই আদিম মানুষ চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, ব্যক্তির জীবনকে বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার হাত হইতে রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রধানতম কর্তব্য। জীবনরক্ষার অধিকার সমাজের পক্ষে যেমন মঙ্গলকর তেমনি আত্মহত্যার দ্বারা কোন জীবরের বিনষ্টি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই ব্যক্তির আত্মহত্যার অধিকার নাই, কারণ আত্মহত্যা করিলে ব্যক্তি সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না।

(২) **স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty) :** স্বাধীনতার অধিকার বলিতে বুঝায় গতিবিধির স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন প্রভৃতির অধিকার। জীবনকে সুন্দর ও কাম্য করিতে হইলে এই অধিকারগুলি অপরিহার্য। অবশ্য, এই অধিকার অব্যাহত নহে, কারণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইলে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলিকে খর্ব করিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে। ভারতের সংবিধানে এই অধিকারকে স্বীকার করা হইয়াছে।

(৩) **মত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of opinions) :** মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের অধিকার। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, (ক) বাক্ **স্বাধীনতা ও (খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা**। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। এই যুগের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় জনমতের উপর। আবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকিলে কখনই জনমত গঠিত হইতে পারে না। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলেন যে, জনগণের সতর্ক দৃষ্টি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নিরর্থক। জনমতের দ্বারা সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনৈতিক জীবনই আদর্শ জীবন।

কিন্তু এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা অনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, অনিয়ন্ত্রিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা এমন দুর্নীতিমূলক ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক প্রচারকার্যে রত থাকিতে পারে যাহা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। আবার মানহানি, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রদোহিতার অজুহাতে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করাও অবাঞ্ছনীয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে মত প্রকাশ করা হয় তাহা সংবাদপত্রের মালিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী মত, প্রকৃত জনমত নয়। অতএব মত প্রকাশের মাধ্যমগুলিরও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে উহার স্বার্থকতা। সুতরাং মত প্রকাশের স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়, উহাকে বলবৎ করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ভারতের সংবিধানে এই অধিকারকে স্বীকার করা হইয়াছে।

(৪) **পরিবার গঠনের অধিকার (Right to family) :** সমাজ জীবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত পারিবারিক জীবনই সমাজের কেন্দ্রস্থল হিসাবে কার্য করিতেছে। এই পরিবার ধ্বংস হইলে সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংস হইবে। এই কারণে কোন রাষ্ট্রই

পরিবার গঠনের অধিকারকে অস্বীকার করে না। গ্রীকদার্শনিক অ্যারিস্টটল্ও বলিয়াছেন পরিবারই সমাজগঠনের মূলসূত্র। প্রত্যেকেরই পরিবার গঠনের অধিকার থাকা উচিত।

(৫) **সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)ঃ** সম্পত্তির অধিকারকে অ্যারিস্টটল সমাজবন্ধনের মূল গ্রন্থী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সম্পত্তির অধিকার বলিতে বুঝায় সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের ও দানের অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের ও ব্যবহারের অধিকার। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকারকে স্বীকার করা হয় না এই যুক্তিতে যে, সম্পত্তির অধিকার শোষণ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্যই এই অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। ভারতের সংবিধানে এই অধিকারকে স্বীকার করা হইয়াছে।

(৬) **সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (Right to Association)ঃ** মানুষ সংঘপ্রিয়। সংঘপ্রিয়তা তাহার প্রকৃতিগত। মানুষের এই সংঘপ্রিযতার জন্যই রাষ্ট্রনৈতিক সংঘের উদ্ভব হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। মানুষ তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার জন্য, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনকে বিকশিত করিবার জন্য বিভিন্নধরণের সংঘ গড়িয়া তুলিয়াছে। অতএব মানুষের সংঘগঠনের অধিকার অতিশয় প্রয়োজনীয় অধিকার। ভারতের সংবিধানের এই অধিকারকে স্বীকার করা হইয়াছে।

(৭) **চুক্তির অধিকার (Right to Contract)ঃ** সমাজে যতদিন পর্যন্ত সম্পত্তির অধিকার ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের অধিকার স্বীকৃত হইবে ততদিন পর্যন্ত চুক্তির অধিকারও স্বীকৃত হইবে। কারণ, সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমেই হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক চুক্তির দ্বারাই স্বীকৃত হয়। অবশ্য, এই অধিকার কখনও অনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না ; কারণ, দুর্নীতিমূলক চুক্তিকে কোন আদর্শ রাষ্ট্রই স্বীকার করিবে না।

(৮) **স্বাধীন বিবেক ও ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Freedom of Conscience and Religion)ঃ** পূর্বে অনেক রাষ্ট্র ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মীয় রাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্রধর্ম থাকিত। রাষ্ট্র-ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অপরাপর ধর্মকে বিনাশ করা হইত। যেমন পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। বর্তমানে বিশ্বে দুই-একটি ছাড়া ধর্মরাষ্ট্র নাই বলিলেই চলে। কিন্তু ধর্মরাষ্ট্র না থাকিলেও প্রায় সকল রাষ্ট্রই বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য, এই বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার সহিত যদি রাষ্ট্রের আইনের সংঘর্ষ বাধে, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। ভারতের সংবিধানে বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হইয়াছে।

(৯) **আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার (Right to equality before Law)ঃ** অধিকার বলিতে বুঝায় মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের পক্ষে সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু সমাজান্তগত অধিকার যদি অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়

তবে অধিক সুবিধাভোগকারীর অধিকার অপরের অধিকার ভোগকারীর পথে বাধা সৃষ্টি করিবে। আইনের মাধ্যমেই একমাত্র সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আইনের দৃষ্টিতে যদি সমানাধিকার স্বীকৃত হয় তবে প্রত্যেকের অধিকার সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কারণ আইন নিজেই অধিকারী শ্রেণীর স্বার্থবাহী। ভারতের সংবিধানে এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

(১০) **ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্ররক্ষার অধিকার (Right to Education and preserve distinct language and culture)**ঃ এই তিনটি অধিকার ছাড়া ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইতে পারে না। অশিক্ষিত ও অজ্ঞদের সমাজে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আবার স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার ছাড়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ লাভও সম্ভব নয়। ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার অধিকার সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করে। শিক্ষার অধিকার বলিতে বোঝায় রাষ্ট্রান্তর্গত প্রতিটি মানুষের একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত শিক্ষিত হইবার সমানাধিকার। অবশ্য, মেধাবী ছাত্রকে সকল রাষ্ট্রই বিশেষ অধিকার দিয়া থাকে। ভারতের সংবিধানে এই অধিকারগুলি স্বীকার করা হইয়াছে।

(খ) **রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Rights)**ঃ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা। এই অধিকার রাষ্ট্রের নাগরিক ছাড়া অন্য কেহ ভোগ করিতে পারে নাঃ পূর্বে এই অধিকার দ্বারা বোঝাইত সরকারকে দমন করিবার ক্ষমতা। বর্তমানে ইহার দ্বারা সরকারকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার সুযোগ সুবিধাকে বোঝানো হয়। নিচে কতিপয় রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের আলোচনা করা হইলঃ

(১) **বসবাস করিবার অধিকার (Right of Residence)**ঃ এই অধিকারের অর্থ রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অধিকার। এই অধিকার নাগরিকেরাই ভোগ করে। বিদেশীরা শুধু রাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত নাগরিক স্থায়িভাবে রাষ্ট্রে বাস করিতে পারে না বলিয়া তাহার নাগরিকত্ব লোপ পায়।

(২) **বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তার অধিকার (Right to Protection while staying Abroad)**ঃ এই অধিকারের অর্থ রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যখন বিদেশে সাময়িকভাবে বাস করে তখন বৈদেশিক রাষ্ট্র যদি তাহার উপর কোন দুর্ব্যবহার করে তবে তাহার নিজের রাষ্ট্র উহার প্রতিকার করিবে। নাগরিকের এই অধিকারকে বলবৎ করিবার জন্য রাষ্ট্র যুদ্ধ পর্যন্ত করিতে পারে।

(৩) **ভোটাধিকার (Rights to Vote)**ঃ ভোটাধিকার একটি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। এই অধিকার হইল নির্বাচনের সময় ভোট দিবার অধিকার। শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ সুবিধাই প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। পূর্বে নাগরিকেরা সরাসরি ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসনকার্যে অংশ

গ্রহণ করিত। এই অধিকার জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে দেওয়া উচিত। ভারতের সংবিধানে এইরূপ অধিকার ভারতের নাগরিককে দেওয়া হইয়াছে।

(৪) **নির্বাচিত হইবার অধিকার (Right to Contest in the Election) :** ভোটদানের অধিকার হইতেই নির্বাচিত হইবার অধিকার জন্মায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যোগ্যতা থাকিলেই ভোটদানের অধিকার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার স্বীকার করা হয়।

(৫) **সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের অধিকার (Right to hold Public Office) :** সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের অধিকারের মাধ্যমে নাগরিক রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য যোগ্যতা অনুসারে এই অধিকার প্রদান করা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৬) **রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against the State) :** রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকারকে সমর্থন করিয়াছেন। আবার অনেকেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকারকে সমর্থন করেন নাই। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকারের অর্থ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার। সরকার যদি নাগরিকের আত্মোপলব্ধির সুযোগ সুবিধা না সৃষ্টি করে তবে নিশ্চয়ই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার নাগরিকদের থাকা উচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

কিন্তু সকল অধিকারই সমাজ সঞ্জাত। রাষ্ট্র ইহাদের স্বীকৃতি দেয় ও বলবৎ করে মাত্র। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে অধিকার রাষ্ট্র তাহার স্বীকৃতি দিবে কি ভাবে? তাই এই অধিকার অলীক।

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Right) : অর্থনৈতিক অধিকার সমাজজীবনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া অনেকে এই অধিকারকে মৌলিক সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। বর্তমানে অর্থ ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় এই অধিকারকে বিশেষ পর্যায়-ভুক্ত করা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় অর্থনৈতিক অধিকার হইল, "দৈনন্দিন অন্নসংস্থান ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া পাইবার সুযোগ" ("The opportunity to find reasonable significance in the earning of one's daily bread.")। নিচে এই জাতীয় কতিপয় অধিকারের উদাহরণ দেওয়া হইল :

(১) **কর্মের অধিকার (Right to Work) :** কর্মের দ্বারাই মানুষ তাহার জীবিকার্জন করে; অতএব মানুষের কর্মসংস্থান করিয়া দিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাজের। জীবিকার্জনের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ সুবিধার পথ উন্মুক্ত না থাকিলে মানুষের জীবনের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। কর্মের অধিকার বলিতে যে কোন কর্মের অধিকার বুঝায় না, ইহার দ্বারা বুঝায় যথাযোগ্য কর্মের অধিকার।

(২) **পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের অধিকার (Right to Adequate wages) :** ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, "কতিপয় লোকের প্রাচুর্যের রসদ যোগাইবার পূর্বে দেখিতে হইবে, প্রত্যেকের যেন অভাবমোচন হয়।" সমাজে ধনী ও নির্ধনের জীবনযাত্রার মান এক নহে। জীবনযাত্রা মানের সাম্য বিধানের জন্য নাগরিককে শুধু কর্মের অধিকার দিলেই চলিবে না, তাহাকে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের অধিকার দিতে হইবে।

(৩) **অবকাশের অধিকার (Right to Leisure) :** অ্যারিস্টট্‌ল বলেন, "সুখী হইবার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইল বিশ্রাম।" মানুষের সত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয় যদি মানুষকে সারা দিনরাত অন্নসংস্থানের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। মানুষের কর্মশক্তির একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিলে মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়। সুতরাং তাহাকে বিশ্রামের অধিকার দিতে হইবে।

উপসংহারে বলা যায়, উপরে যে তিন শ্রেণীর অধিকারের আলোচনা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ খুব অস্পষ্ট। কারণ প্রায় প্রত্যেকটি অধিকারই পরস্পর নির্ভরশীল। যেমন, **মত প্রকাশের অধিকার**; ইহা সামাজিক অধিকার; কিন্তু ইহা আবার ভোটদানের অধিকার অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সহিত সম্পর্কিত। আবার সব রাষ্ট্রে একই ধরনের অধিকার দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রিক কাঠামোর উপরই অধিকারের চরিত্র নির্ভর করে।* ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয় কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয় না।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মধ্যে যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, রাষ্ট্রকর্তৃক সভ্যহিসাবে স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয়। আর রাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশ জনগণকে অসম্পূর্ণ নাগরিক ও বিদেশী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

নাগরিকত্ব অর্জনের উপায় (১) জন্মসূত্র, (২) অনুমোদন। বর্জনের পদ্ধতি : (১) অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ, (২) বিবাহ, (৩) রাষ্ট্রীয় শাস্তির মাধ্যমে, নাগরিকত্ব লোপ পায়।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক সুযোগের দাবিকে বলে অধিকার। কর্তব্য বলিতে বোঝায় দায়িত্ব। অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অধিকারকে কতিপয় ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—সামাজিক অধিকার, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। আবার কর্তব্যেরও কতকগুলি প্রকারভেদ আছে। রাষ্ট্র নাগরিকদের শুধু অধিকারগুলির স্বীকৃতি দিবে আর নাগরিকেরা কোন কর্তব্য পালন করিবে না—ইহা অসম্ভব। কর্তব্য পালনের উপরই অধিকার স্বীকৃতি নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

* "A state is known by the rights it maintains."—Laski.

প্রশ্নাবলী

১। নাগরিকত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

(Define "citizenship")

২। নাগরিকত্ব অর্জন ও বর্জনের উপায়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the different methods of acquiring and loss of citizenship.)

৩। ভারতের নাগরিকত্ব অর্জনের উপায় কি এবং উহা কেন লুপ্ত হয়?

(How Indian citizenship is acquired and lost ?)

৪। সুনাগরিকের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সুনাগরিকতার পথে অন্তরায় কি কি? ইহা দূরীকরণের উপায় কি?

(Define good citizen. Describe the factors that hinder it. Show how they can be removed ?)

৫। তুমি কিভাবে নাগরিকের সহিত বিদেশীদের পার্থক্য করিবে?

(How do you distinguish between citizens and aliens ?)

৬। অধিকার কাহাকে বলে? রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

(What are Rights ? Distinguish between Civil and Political rights.)

৭। "অধিকার ও স্বাধীনতা একই জিনিসের দুইটি দিক।" ব্যাখ্যা কর।

("Rights and duties are two aspects of the same thing" Elucidate.)

৮। আধুনিকরাষ্ট্রে নাগরিকের কি কি অধিকার ও কর্তব্য? অধিকারের সহিত কর্তব্যের সম্পর্ক কি?

(Explain the rights and duties of citizens in a modern state. What is the relationship between rights and duties ?

অতিরিক্ত পাঠ্য

Laski—Grammar of Politics

MacIver—The Modern State

C.D. Burns—Democracy : Its Defects and Advantages

৮ । মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি
(Fundamental Rights and Directive Principles)

(ভারতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার—অর্থনৈতিক ও সমাজিক অধিকার , ভারতের সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতি)

[Fundamental Rights of an Indian Citizen—Economic and Civil Rights , Directive Principle in the Indian Constitution]

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) ঃ নাগরিকদের অধিকারগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। এই অপরিহার্য অধিকারগুলিই মৌলিক অধিকার। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার হইল এই ধরণের অধিকার। অধিকাংশ দেশেই এই অধিকারগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য হইল ঃ

(১) ইহা রাষ্ট্র কর্তৃক মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত ও ঘোষিত হয়।

(২) এই অধিকারগুলিকে লিখিত বা অলিখিত শাসনতন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়।

(৩) আবার বিশেষ সনদস্বারাও এই অধিকারগুলি গৃহীত হইতে পারে। Charter of Rights or Bill of Rights এই ধরণের সনদের উদাহরণ।

সংবিধানে মৌলিক অধিকার ঘোষিত হইবার প্রয়োজনীয়তা হইল ঃ (১) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সার্থক করিতে হইলে সংবিধান কর্তৃক নাগরিকের অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। একবার সংবিধানে অধিকার লিপিবদ্ধ হইলে তাহাকে অস্বীকার করা সরকারের পক্ষে যত কষ্টকর, অধিকারগুলি যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহাকে অস্বীকার করা তত কষ্টকর নহে।

(২) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের। আইনসভার প্রাধান্যের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধান্য। অধিকারকে লিপিবদ্ধ আকারে ঘোষণা করিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সরকার ও আইন সভার হস্তক্ষেপ হইতে অধিকারগুলিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

(৩) সংবিধানে অধিকার লিপিবদ্ধ হইলে অধিকারগুলি কি তাহা পরিষ্কারভাবে জনগণ জানিতে পারে এবং জনগণ অধিকারগুলি সম্পর্কে সচেতন হইতে পারে।

(৪) সংবিধানে অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হইলে অধিকারগুলি সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি যদি ভঙ্গ করে তবে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন

করা যত সহজ হয় অধিকারগুলি লিপিবন্ধ না হইলে তত সহজে অভিযোগ আনয়ন করা যায় না।

ব্রিটেনে অলিখিতভাবে শাসনতন্ত্রের দ্বারাও কতিপয় মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার লিখিতভাবে ঘোষিত হইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ঘোষিত হইয়াছে। ভারতেও শাসনতন্ত্রে নাগরিকদিগের মৌলিক অধিকার লিপিবন্ধ হইয়াছে।

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার : ভারতীয় সংবিধান লিখিত। তাই লিখিতভাবেই মৌলিক অধিকারগুলিকে ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে **১২ হইতে ৩৫ অনুচ্ছেদে** মৌলিক অধিকার লিপিবন্ধ হইয়াছে। এবং ২২৬ অনুচ্ছেদ, ৩৫৮ এবং ৩৫৯ অনুচ্ছেদও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত। ইহা ছাড়া সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিও অধিকারের সমষ্টি বিশেষ। আত্ম-উপলব্ধির জন্য অধিকার অত্যাবশ্যক এবং অধিকার রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আইরিশ ও জার্মান সংবিধানে লিপিবন্ধ ও স্বীকৃত এবং ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন সনদে ঘোষিত অধিকার, জেফারসন কর্তৃক প্রদত্ত মানব অধিকারের ঘোষণা, রুশোর ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, জাতিপুঞ্জের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় সংবিধানে লিপিবন্ধ মৌলিক অধিকারগুলির সন্নিবেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে লিপিবন্ধ মৌলিক অধিকারসমূহ হইল :

(১) **ভারতীয় সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকারসমূহ**

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার : (১) সাম্যের অধিকার (Right to Equality), (২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty), (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation), (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion), (৫) সংস্কৃতি এবং শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতা Cultural and Educational Right), (৬) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property), (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)। এই অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হইল :

(২) **বৈশিষ্ট্য**

বৈশিষ্ট্য : (১) সংবিধানে লিপিবন্ধ অধিকারগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর অধিকারগুলিকে বলা হয় মৌলিক অধিকার আর দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারগুলিকে রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য আর রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ মৌলিক অধিকারগুলিকে মানিয়া চলিতে বাধ্য কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়।

(২) ভারতীয় সংবিধানে লিপিবন্ধ মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে কতিপয়

অধিকার ভারতীয় নাগরিক ছাড়া আর কেহ ভোগ করিতে পারে না আর অন্যান্য অধিকারগুলি ভারতীয় নাগরিক ও অনাগরিক, বৈদেশিক সকলেই সমানভাবে ভোগ করিতে পারে।

(৩) মৌলিক অধিকারগুলির কোনটিই সর্তশূন্য নয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি অধিকারের উপরই কিছু-না-কিছু সর্ত আরোপ করা হইয়াছে। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাক্ স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করিবার স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, নিরস্ত্র হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হইবার অধিকার, ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস করিবার অধিকার, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও নিজ মালিকানায় রাখার অধিকার, বৃত্তিগ্রহণ করিবার অধিকার-সমূহ যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ (Reasonable restrictions) দ্বারা সীমিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার নিবর্তনমূলক আটক আইন দ্বারা সীমিত হইয়াছে। নিবর্তনমূলক আটক আইনবলে শুধু সন্দেহের বশবর্তী হইয়াই যে কোন ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করিয়া রাখা যাইতে পারে।

(৪) মৌলিক অধিকারগুলিকে দুই দিক হইতে বিচার করা যায়। (ক) কতকগুলি অধিকার ভারতের আইনসভা, শাসন কর্তৃপক্ষ এবং কতিপয় ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের কার্যের বাধাস্বরূপ কাজ করে। অর্থাৎ কতকগুলি অধিকার রাষ্ট্রের উপর শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ধার্য করে। যেমন, রাষ্ট্র প্রত্যেককে সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ দিতে বাধ্য। রাষ্ট্রের কোন পৃথক ব্যবহার করিবার অধিকার নাই।

(খ) আর কতকগুলি অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদিগকে প্রদত্ত অধিকার। যেমন, বাক্ স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি। মৌলিক অধিকারের সহিত আইনসভার সংঘর্ষ হইলে মৌলিক অধিকারই কার্যকর হইবে।

(৫) ভারতীয় সংবিধানে শুধু মৌলিক অধিকারের সন্ধানই পাওয়া যায়, কিন্তু নাগরিকগণের কর্তব্যের কথা সংবিধানে পরিষ্কারভাবে লেখা হয় নাই। আবার সংবিধানে মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করিবার উপায় স্থিরীকৃত হয় নাই। বর্তমানে স্মরণ সিং কমিটির সুপারিশ অনুসারে কতিপয় মৌলিক কর্তব্য সংবিধানে যুক্ত হইতে যাইতেছে।

(৬) অবশ্য আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হইলে সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকিবে এবং রাষ্ট্র এক আদেশ দ্বারা মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে পারে।

(৭) পার্লামেণ্ট সংবিধান সংশোধন করিয়া মৌলিক অধিকারকে পরিবর্তন করিতে পারে। সুতরাং, মৌলিক অধিকার ভারতে অপরিবর্তনীয় একটা কিছু নয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অসদাচরণ, অশ্লীলতা, জরুরী অবস্থা, জনশৃংখলা প্রভৃতি কারণ দেখাইয়া শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। জাতীয় স্বার্থে, জনস্বার্থের জন্য রাষ্ট্র সম্পত্তির অধিকারেও হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে।

(৮) আবার আদালতের প্রাধাণ্যও এখানে স্বীকৃত হয় নাই। ন্যায়-পরায়ণতার ভিত্তিতে আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা আদালতগুলিকে প্রদান করা হয় নাই।

৯) অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সামরিক বা শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণের পরিচয় পত্র বা খেতাব ছাড়া অন্য কোন খেতাব দেওয়া যাইবে না বলিয়া যে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা তাহা ঠিক মৌলিক অধিকার নয়।

১০) সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, আইন বিহিত পদ্ধতি ছাড়া কোন ব্যক্তির প্রাণ হরণ করা যাইবে না বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না, কিন্তু আইন বিহিত পদ্ধতি অনুসারে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে আদালতের কিছু করিবার নাই। অর্থাৎ আদালত আইনের ন্যায্যতার বিচার করিতে পারিবে না। অন্যায্য আইনকেও আদালতকে মানিয়া লইতে হইবে। আইন বলিতে অবশ্য বোঝায় বৈধভাবে প্রণীত আইন। অবশ্য, আইনসভা এমন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না যাহার দ্বারা নাগরিকগণকে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব ছাড়া অন্য কোন খেতাব দেওয়া যায় এবং নাগরিকগণকে ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ এবং জন্মস্থানের জন্য বৈষম্য করা যায়। নিচে মৌলিক অধিকারগুলি আলোচিত হইল ঃ

(১) **সাম্যের অধিকার (Right to Equality)** ঃ সাম্যের সাধারণ অর্থ হইল সকল মানুষই সমান। সাম্য নীতিকে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে এই অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ভোগ করিবার সমানাধিকার আছে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। রুশোর ভাষায় স্বাধীন হইয়াই মানুষ জন্মায়। ("Man is born free")। ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, "মানুষ জন্ম হইতেই স্বাধীনতা ও সমানাধিকারসম্পন্ন" ("Men are from birth free and equal in rights.")। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবিক অধিকারের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে স্বাধীনতা, শান্তি ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিমূল হইল বিশ্ব-মানবের সকল পরিবারের স্বভাবজাত মর্যাদা রক্ষার এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি।

বাস্তব জীবনে দেখা যায় শারীরিক ও মানবিক গঠনে দুইটি মানুষ সমান নয়। মানুষ অসমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আবার বয়োবৃদ্ধির পরও তাহারা অসমানই থাকিয়া যায়। অতএব সাম্য বলিতে সব বিষয়ে সমান বোঝায় না। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইল **প্রত্যেকের সমান সুযোগ পাইবার অধিকার।** রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিককেই রাষ্ট্র তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ দিবে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা সম্প্রদায়কে পার্থকামূলক সুযোগ দান করিতে পারিবে না। ল্যাস্কি বলেন, জনগণের কোন স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না যদি বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা থাকে ("Freedom for the mass of men can never, firstly exist in the presence of special privilege."—Laski)। সমাজে যদি একশ্রেণীর

(৩) **সাম্যের অর্থ**

লোক থাকে যাহারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবে, তবে অপর শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে। বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে।

ভারতের সংবিধানের ১৪ **অনুচ্ছেদে** বলা হইয়াছে যে, "**আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের**" (**Equality before the eye of law**) **অথবা আইনসমূহের** দ্বারা **সমানভাবে সংরক্ষিত হইবার অধিকার** (**Equal Protection of the laws**) **কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অস্বীকার করিতে পারিবে না**"।*

আইনের দৃষ্টিতে সমতা বা আইনসমূহের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হইবার অধিকার বলিতে কি বোঝায়? ডাইসি বলেন, আইনের দৃষ্টিতে সমতার অর্থ হইল, কোন ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান। রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া অতি সাধারণ একজন নাগরিক পর্যন্ত সকল ব্যক্তিই রাষ্ট্রীয় আইনের অধীন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল অবশ্য কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। তাহাদের ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি প্রযুক্ত নয়। সুতরাং একমাত্র **সমপর্যায়ভুক্ত** ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। আইনের দৃষ্টিতে সাম্যনীতিকে কার্যকর করিতে হইলে প্রত্যেককে বিচার ব্যবস্থার সমান সুযোগ দিতে হইবে।

ভারতীয় সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম, শ্রেণী বা জন্মসূত্রে নির্বিচারে প্রত্যেককেই সমান সুযোগ দেওয়া হইবে। সাধারণের জন্য ব্যবহার্য রাষ্ট্রের কোন স্নানাগার, পুষ্করিণী, হোটেল বা রেস্তোরাঁয় প্রবেশের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, পেশা, জন্মসূত্র, স্ত্রী, পুরুষভেদে কোন প্রভেদ করা হইবে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, স্ত্রী, শিশু ও অনুন্নত জাতির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

সংবিধানের ১৬ **অনুচ্ছেদে** বলা হইয়াছে যে, চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিককে সমান সুযোগ দেওয়া হইবে। অবশ্য, অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য পদ সংরক্ষিত করা যাইবে। সংবিধান অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করিয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে সমানভাবে গ্রহণ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। রাষ্ট্র কাহাকেও খেতাব বা পদবী দিয়া বিশেষ পদমর্যাদায় বসাইতে পারিবে না। বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতেও কেহ খেতাব গ্রহণ করিতে পারিবে না। রাজা, মহারাজা, নবাব ইত্যাদি হইল খেতাবের উদাহরণ।

উপসংহারে বলা যায়, সরকার যুক্তিসংগতভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক আইন ব্যবহার করিতে পারে। সাম্যের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি আইনই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযুক্ত

* "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." Article 14 of the constitution of India.

হইবে। আবার কোন একটি লোক অপর একটি লোকের সহিত যেহেতু সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না, অতএব বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য বিভিন্ন আইনও প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) **স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) ঃ** ভারতীয় সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে সকল ভারতীয় নাগরিককে (ক) বাক্য ও মতামত প্রকাশ করা, (খ) শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার, (গ) সংঘ, সমিতি গঠন করিবার, (ঘ) সমগ্র ভারতে চলাফেরার, (ঙ) ভারতের যে কোন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিবার, (চ) সম্পত্তি দখল, অর্জন ও হস্তান্তর করিবার এবং (ছ) যে কোন বৃত্তি বা উপজীবিকা বা ব্যবসা বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।*

উপরোক্ত অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই অধিকারগুলির উপর অবশ্য অনেক নিয়ন্ত্রণ ধার্য করা হইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণগুলি যুক্তি সঙ্গত হওয়া চাই।

(৪) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও তাহার নিয়ন্ত্রণ

(ক) **বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ঃ** ভারতীয় নাগরিকদের বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ একজনের বিশ্বাসের ও ধারণার স্বাধীনতা। আবার ইহা মৌখিকভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে, লিখিতভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে, ছবির মাধ্যমেও ব্যক্ত হইতে পারে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পত্রিকা ছাপা হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমেও মতামত ও বিশ্বাস ব্যক্ত হয়। সুতরাং মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। বাক্ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইলেই বিতর্কের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হইবে। কারণ বাক্যের দ্বারাই বিতর্ক হয়, আলাপ আলোচনা হয়। এই অধিকারকে যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধের দ্বারা সীমিত করা যাইতে পারে। (১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (২) বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন, (৩) জনশৃংখলা ভঙ্গ, (৪) বিচারালয়ের অবমাননা, (৫) মানহানি, (৬) অপরাধ অনুষ্ঠান এবং (৭) অশ্লীলতা ও অসদাচরণের উপর যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। সুতরাং বর্তমানে এইসকল কারণে বাক্ স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রাষ্ট্র যদৃচ্ছা খর্ব করিতে পারে।

* All citizens shall have the right :—

(a) to freedom of speech and expression,

(b) to assemble peaceably and without arms,

(c) to form associations or unions,

(d) to move freely throughout the territory of India,

(e) to reside and settle in any part of the territory of India,

(f) to acquire, hold and dispose of property ; and

(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business——Article 19 (1) of the Constitution of India.

(খ) **শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার অধিকার ঃ** ভারতের নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি সর্ত এই অধিকারের উপর আরোপ করা হইয়াছে ঃ যেমন (১) জমায়েত শান্তিপূর্ণ হইবে, (২) ইহা নিরস্ত্র হইবে এবং (৩) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জনস্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর যে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে। অতএব শুধুমাত্র আইনানুমোদিত সভায়ই জমায়েত হইতে পারিবে। আবার শোভাযাত্রা করিবার অধিকারের উপর এবং সমবেত হইয়া সভা করিবার অধিকারের উপরও নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। যক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই অধিকারকে খর্ব করা যায়। অবশ্য, অধিকার যুক্তিসঙ্গতভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার ভার বিচার বিভাগের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। আবার কোন জমায়েত আইনসঙ্গত না বেআইনী তাহাও বিচার বিভাগই ঠিক করিবে। কিন্তু কোন বৈধ আইনসভা যদি বৈধভাবে কোন অন্যায্য আইনও প্রণয়ন করে তাহা শত অযৌক্তিক হইলেও বিচার বিভাগ তাহাকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না।

(গ) **সমিতি গঠনের অধিকার ঃ** ভারতীয় নাগরিকগণকে সংগঠনের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। **কোলের** ভাষায় সংঘ হইল প্রায় সমমতাবলম্বী ব্যক্তিসমষ্টি যখন কোন বৈধ উদ্দেশ্য লইয়া সং উদ্দেশ্যে একাধিক কার্য করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হয় তখনই সংঘের গঠন হয়। অংশীদারী কারবার, ট্রেড ইউনিয়ন, কোম্পানী, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি সংঘের উদাহরণ। ভারতীয় সংবিধানে সংঘ বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নাগরিকগণকে প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু সংঘগঠনের অধিকারের যাহাতে অপপ্রয়োগ না হয় সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করা হইয়াছে ; কোন জঘন্য ঘৃণ্য অপরাধজনক কার্য সাধনের জন্য সংঘ গঠন করা যাইবে না। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার উদ্দেশ্যেও কোন সংঘগঠন করা যাইবে না। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিবার অধিকার শ্রমিকদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদিগের মঙ্গলসাধন বা উন্নতি করিবার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিবার অধিকার স্বীকৃত হইবে না। শ্রমিকগণ রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে অচল করিবার উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করিলে তাহা বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইবে। বিশৃংখলা, নীতি বিগর্হিত উদ্দেশ্যে গঠিত সংঘ বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী সংঘের উপর যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিবার ক্ষমতা সরকারের আছে।

(৫) সংঘ গঠনের অধিকার ও উহার নিয়ন্ত্রণ

(ঘ) **গমনাগমনের ও (ঙ) বাসস্থানের অধিকার ঃ** ভারতীয় নাগরিকগণ দেশের মধ্যে যে কোন স্থানে বসবাস করিবার অধিকার পাইয়াছে। ভারতের নাগরিকগণ ভারতের যে কোন স্থানে গমনাগমনের অধিকার পাইয়াছে। এই সম্পর্কে অঙ্গরাজ্য-গুলির সীমানার দ্বারা কোন বাধার সৃষ্টি করা হয় নাই। ভারতের অখণ্ড

নাগরিকত্ব গ্রহণ ও সেই অখণ্ড নাগরিকত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্যই নাগরিকগণকে সকল অঙ্গরাজ্যে বসবাস করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে এবং সকল নাগরিককেই সর্বত্র গমনাগমনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) গমনাগমন ও বাসস্থানের অধিকার

সমাজের সকলের স্বার্থের জন্য কতিপয় লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করা যাইতে পারে। জনস্বার্থে অথবা সংরক্ষিত উপজাতির মঙ্গলার্থে আলোচ্য অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাইতে পারে। রোগাক্রান্ত না হইবার জন্য সুস্থ ব্যক্তিকে প্লেগ আক্রান্ত অঞ্চলে না আসিতে দেওয়া যাইতে পারে। আবার যদি কোন লোকের কোন স্থানে অবস্থানের জন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হয় তাহা হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করা যাইতে পারে। গুণ্ডা, বদমায়েস, সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকেও বহিষ্কার করা যায়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে মাত্র দুইটি কারণে এই অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাইতে পারে। একটি হইল সামগ্রিক জনস্বার্থে আর অপরটি হইল তফসিলী উপজাতির স্বার্থে। সামগ্রিক জনস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ঃ (১) জনশৃংখলা, (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং (৩) নৈতিক উন্নতি। আলোচ্য অধিকারের উপর যে নিয়ন্ত্রণ ধার্য করা হইবে তাহা যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই।

(চ) **সম্পত্তির অধিকারঃ** ভারতীয় নাগরিকদিগকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ নাগরিকদিগকে সম্পত্তি অর্জন করিবার, উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাইবার, ভোগ করিবার, ক্রয় করিবার এবং বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পত্তির সাহায্যে নীতি বিগর্হিত কোন কার্য করা যাইবে না। সম্পত্তি আত্মার উপলব্ধিতে সহায়তা করে বলিয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের আদর্শানুযায়ী এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই অধিকারের উপর রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে। স্বাধীনভাবে সকলেই এই অধিকার ব্যবহার করিতে পারিবে।

(ছ) **বৃত্তির অধিকারঃ** প্রত্যেক নাগরিকই তাহাদের পছন্দমতো বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারিবে। এই বিষয়ে সরকার যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণাধিকার বলবৎ করিতে পারিবে। রাষ্ট্র জনস্বার্থে এই অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারে এবং বৃত্তি অনুসারে কর্মীর যোগ্যতাও গুণাবলীর সর্ত আরোপ করিতে পারে। বিশেষতঃ কারিগরী বৃত্তিগ্রহণে রাষ্ট্র যোগ্যতা ও গুণাবলী নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে। রাষ্ট্র উপজীবিকার ক্ষেত্রেও নিয়মাবলী গঠন করিতে পারে। রাষ্ট্র নিজেই ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবে অথবা কর্পোরেশন গঠন করিয়া তাহার হাতে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যকে তুলিয়া দিতে পারিবে। কর্পোরেশনের মাধ্যমেও রাষ্ট্র ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া ব্যবসা করিতে পারিবে অথবা

ব্যক্তিগত মালিকানাকে তুলিয়া দিয়া সেইক্ষেত্রে নিজে একচেটিয়া ব্যবসা করিতে পারিবে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিকে কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্র নিজেই যদি কারবার করিতে চায় তাহা হইলে এইরূপ কার্যকে সহজেই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

সর্বশেষে বলা যায়, বৃত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যাহার খুশিমতো ব্যবসা করিতে পারিবে। জনস্বার্থের বিরোধী কোন ব্যবসায়ই কেহ করিতে পারিবে না। উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা, বা গুণাবলী থাকা চাই। রাষ্ট্র এই দক্ষতা ও গুণাবলীর মাপকাঠি ঠিক করিয়া দিতে পারে।

স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ঃ

প্রথমতঃ, একই অপরাধের জন্য একই ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত বা দণ্ড-দান করা যায় না। স্বাধীনতার অধিকার কেবলমাত্র আদালত বা বিচারসংক্রান্ত কোন ট্রাইব্যুন্যালের নিকট বিচারের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইবে। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করানো যাইবে না। যে সময়ে অপরাধ করা হইবে সেই সময়ের আইনভঙ্গের জন্যই তাহা নির্দিষ্ট হইবে এবং সেই সময়কার আইন অনুসারেই শাস্তি পাইবে। অন্য সময়ে প্রণীত বা সংশোধিত আইন বলে শাস্তি দেওয়া যাইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার বিচার করিবার সময় আদালতকে ঘটনার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ও ফলাফল, উদ্দেশ্য এবং সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, কোন ব্যক্তি যদি অপরের এই স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে সাধারণ আইনের দ্বারা তাহা সংরক্ষিত হইবে।

জীবনের অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার (Right to personal liberty) ঃ ভারতীয় সংবিধানের ২১ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কাহারও জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিনষ্ট করা যাইবে না।* ভারতীয় নাগরিককে প্রচলিত আইন ভঙ্গ না করিলে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না। অপরাধের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুপাতে অপরাধীকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একজাতীয় একবারে অনুষ্ঠিত একটি অপরাধের জন্য একাধিকবার কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হইবে না। অপরাধীকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য বাধ্য করানো যাইবে না। একমাত্র বৈধ আইন দ্বারা এই অধিকারকে সংকুচিত করা যায়। আইনসভা শুধু ফৌজদারী মামলার

* 'No persons shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.''—Article 21 of the Constitution of India.

পদ্ধতিকে পরিবর্তন করিতে পারে। অবশ্য, আইনের পদ্ধতির পরিবর্তন দ্বারা কাহারও মৌলিক অধিকার খর্ব করা যাইবে না। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা খুবই কম। আদালত এই ক্ষেত্রে শুধু দেখিবে আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জীবন অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে কিনা। আদালত এইক্ষেত্রে আইনটি যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহার বিচাব করিবে না। এখানে ন্যায়নীতি বিরোধী আইনও যদি বৈধ আইন সভা বৈধ উপায়ে পাস করে তাহা হইলেও সেই নীতি বিগর্হিত আইনকে আদালত অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে না। **আইনের যৌক্তিকতা** বিচার করিবার অধিকার সুপ্রীমকোর্টের নাই। অবশ্য সংবিধানে প্রত্যক্ষীকরণ পদ্ধতি (Writ of Habeas Corpus) প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পদ্ধতির দ্বারা জীবনধারণেব উপর নিয়ন্ত্রণকাবী আইনেব বৈধতা বিচার আদালত করিতে পারে এবং অবৈধ হইলে সত্বর মুক্তিদানের জন্য সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

(৭) জীবনের অধিকার

সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, কাহাকেও সত্বর কারণ না দর্শাইয়া গ্রেপ্তার করিযা আটক রাখা যাইবে না ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাহাব পছন্দ মতো আইন ব্যবসায়ীর সহিত পরামর্শ করিবার এবং আইন ব্যবসায়ীব দ্বাবা পক্ষ সমর্থনের অধিকার দেওয়া হইবে। কোন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় ধৃত ব্যক্তিকে আটকাইয়া রাখা যাইবে না। ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করাইতে হইবে। অবশ্য, নিবর্তনমূলক আটক আইনে ধৃত ব্যক্তি বা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীর ক্ষেত্রে ইহা কার্যকব হইবে না।

(৮) জীবনের অধিকার, নিবর্তনমূলক আটক আইন

ভারতে **নিবর্তনমূলক আটক আইন** নামে, একটি আইন প্রণীত হইযাছে। নিবর্তনমূলক আটকেব দ্বারা বুঝায় শুধু সন্দেহের বশবর্তী হইয়া অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন অপরাধ করিতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যখন কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার কবা হয় এবং আটক রাখা হয়, তখনই বলা হয় নিবর্তনমূলক আইনে আটক করা হইয়াছে। আদালতে এই আইন বলে ধৃত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না। (১) দেশরক্ষা, (২) বৈদেশিক সম্পর্ক এবং (৩) ভারতের নিরাপত্তার জন্য আইন সভা নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করিতে পারে। (১) অঙ্গরাজ্যের নিরাপত্তা, (২) জনস্বার্থ রক্ষার্থ, সংরক্ষণ এবং সেবামূলক কাজের সংরক্ষণ ও শৃংখলা রক্ষার জন্যও অঙ্গরাজ্যের আইন সভা নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করিতে পাবে। ১৯৫০ সালে ভারতের পার্লামেন্ট নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act (IV), 1950) প্রণয়ন করে। ইহার পর আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষার জন্য মিসা আইন (MISA : Maintenance of Internal Security Act) পাস করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, কতকগুলি সর্তসাপেক্ষে নিবর্তনমূলক

আটক আইনে ধৃত ব্যক্তিকে একসাথে তিনমাসের অধিককাল আটকাইয়া রাখা যাইবে না। যদি এই আইন বলে কাহাকেও তিনমাসের বেশী আটক রাখিতে হয় তবে একটি উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত লইতে হইবে। অবশ্য, পার্লামেন্ট যদি এমন আইন পাস করে যে বোর্ডের মতামত ছাড়াই তিনমাসের বেশী আটকাইয়া রাখা যাইবে তবে আর বোর্ডের মতামত লইতে হইবে না। যে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করিবে তাহাকে যথা সম্ভব আটকের কারণ জানাইতে হইবে। ধৃত ব্যক্তিকে আটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। আর বর্তমান মিসার ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আটক আইনকে আরও শিথিল করা হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের স্বার্থে আটকের কারণ না জানাইয়াও যতদিন খুশি আটক করিয়া রাখিতে পারিবে।

(৩) **শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)**ঃ ভারতীয় সংবিধানের ২৩ **অনুচ্ছেদে** বলা হইয়াছে যে, বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের মাধ্যমে মানুষের দ্বারা কায়িক পরিশ্রম করানো বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। মানুষকে ক্রয় বিক্রয় ও বেগার খাটানো দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।* ১৪ **বৎসরের** কম বয়স্ক শিশুদিগকে ফ্যাক্টরীর কাজে বা খনিতে বা কোন বিপজ্জনক কঠিন কাজে নিযুক্ত করা আইন বিরুদ্ধ। এই অধিকারটি নাগরিক এবং বৈদেশিক উভয়েই ভোগ করিতে পারিবে। দাসপ্রথা, স্ত্রীলোককে দিয়া নীতি বিগর্হিত কাজ করানো, তাহার দেহ বিক্রয় প্রভৃতিকে অবৈধ করা হইয়াছে।

(৯) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

মানুষকে লইয়া কারবার নিষিদ্ধ হইয়াছে—ইহার অর্থ স্ত্রীলোকের দেহের ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে, দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বেগার খাটানো নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ বিনা বেতনে শ্রমিকগণকে দিয়া তাহাদের অনিচ্ছায় কোন কাজ করানো যাইবে না। পূর্বে গরীব প্রজাগণ বিনা পয়সায় জমিদারের কাজ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিত। এই আইনের দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইল।

অবশ্য, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে জনস্বার্থের জন্য নাগরিকদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে খাটাইয়া লইতে পারে। জনস্বার্থের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদানকে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক করিতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নেও শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এখানে শোষণের অর্থ ধরা হইয়াছে অর্থনৈতিক শোষণ অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়গুলি যে দেশে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন সেই দেশে শ্রমিককে তাহার **ন্যায্য পাওনা** হইতে বঞ্চনা করিয়া **উদ্‌বৃত্ত মূল্যকে** উৎপাদনের উপায়-গুলির মালিকেরা ভোগ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার

* 'Traffic in human beings and begar and other similar froms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. Article 23 (1) of the Indian Constitution.

স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক কোন ব্যক্তি নয়, উহা রাষ্ট্রের। অতএব কেহ শ্রমিককে খাটাইয়া তাহাকে ন্যায্য মজুরি হইতে বঞ্চিত করিয়া, কম মজুরি দিয়া শোষণ করিতে পারে না। ভারতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, ফলে উৎপাদনের উপায় অর্থাৎ, জমি, পুঁজি প্রভৃতি ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে থাকিতে পারে। তাহাতে মজুর খাটাইয়া যে লাভ হয় এবং মজুরকে মজুরি কম দিয়া যে লাভ হয় তাহা অর্থনৈতিক শোষণের পর্যায়-ভুক্ত কিন্তু ইহা আইনসিদ্ধ শোষণব্যবস্থা, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার আইনসিদ্ধ। মিল মালিক এই আইন বলেই মিলে শ্রমিক নিয়োগ করিয়া শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি না দিয়া শোষণ করিয়া মুনাফা করিতে পারিবে।

এইদিক হইতে ভারতে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। তবে ধীরে ধীরে ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। একদিন দেখা যাইবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অস্বীকৃত হইয়াছে। তখন কেহই আর অর্থনৈতিক দিক হইতে শোষিত হইবে না। রাষ্ট্র ব্যবসা করিয়া, মজুর খাটাইয়া যাহা লাভ করিবে তাহার অংশীদার সকলেই হইবে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির হইবে না।

(৪) ধর্মের অধিকার (Right to freedom of Religion) : ভারত স্বাধীনতা অর্জনের সময় ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা জিন্না মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথক জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিবার জন্য আন্দোলন করিতে থাকে এবং মুসলিম লীগ নামক একটি সংগঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নিকট ভারতকে বিভক্ত করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রস্তাব পেশ করে। ধর্মের দিক হইতে ভারতে প্রধানতঃ দুইটি ধর্মাবলম্বী লোকই বাস করে, একটি হইল হিন্দু আর অপরটি হইল মুসলমান সম্প্রদায়। ব্রিটিশ সরকারও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গার সুযোগ গ্রহণ করিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সকল অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চলগুলি লইয়া পাকিস্তান গঠিত হয়। বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দুইটিকে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। এই দুই প্রদেশের এক অংশ ভারতে থাকিয়া যায় আর অপর অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা ছাড়া সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া পাকিস্তান গঠিত হয়। নবীন ভারত সৃষ্টির গোড়ার ইতিহাস হইল ধর্মের ভিত্তিতে ভারত গঠিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভারতীয় সংবিধান ভারতকে একটি **ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র** বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সংবিধানের ২৫ হইতে ২৮ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ধর্মের অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে বোঝায় এমন রাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া কিছু থাকিবে না। আর যে রাষ্ট্রের একটি ঘোষিত ধর্ম থাকে তাহাকে বলা হয় ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic State); যেমন, পাকিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘোষিত রাষ্ট্রধর্ম হইল মুসলিম ধর্ম (ইসলাম)। আর ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

(১০) ধর্মের অধিকার

ধর্মীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা নূতন নয়। মধ্যযুগে বহু ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্রের কাজ ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, চার্চ প্রভৃতিকে রক্ষা করা।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান, যেমন—পোপ-এর মতো ধর্মগুরুর নির্দেশেই রাজা কাজ করিতেন। রাষ্ট্রের মালিকানা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হাতেই ছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত রাজার অনেক যুদ্ধের পর রাষ্ট্রের মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব রাজার হাতে চলিয়া আসে। পরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজা নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে পরিগণিত হন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা গণতান্ত্রিক সরকারই ব্যবহার করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চার্চকে রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়।

ভারতের সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, জনশৃংখলা, নীতি ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন সাপেক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমভাবে বিবেকের, ধর্ম অবলম্বনের ও প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে।* ভারতে এইভাবে সংবিধান কর্তৃক ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। সংবিধান অনুসারে ভারত এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে বোঝায় রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিককে স্ব স্ব ধর্ম পালন করিবার গ্যারাণ্টি দিবে, কিন্তু রাষ্ট্রের কোন নিজস্ব ধর্ম থাকিবে না বা রাষ্ট্র কোন ধর্মাবলম্বী মানুষকে বিশেষ সুবিধা দেয় না এবং রাষ্ট্র কোন নির্দিষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে না।** রাষ্ট্র অনুমোদিত অথবা সমর্থিত কোন ধর্ম ভারতে থাকিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম পালনের সমান অধিকার থাকিবে। আবার কোন ধর্ম প্রচারের জন্য রাষ্ট্র নাগরিকদিগের নিকট হইতে কোন করও আদায় করিবে না। রাষ্ট্রের সাহায্যে পরিচালিত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে না। কোন বিদ্যালয়েই কোন ছাত্র-ছাত্রীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা তাহার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া ধর্ম শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করা যাইবে না। ভারতে প্রত্যেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মঠ, মন্দির, গির্জা ও মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করিতে পারিবে। ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অর্পণ করিতে পারিবে। ধর্ম পালনের সহিত জড়িত যে কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যাইবে না। ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা প্রত্যেককেই প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

(১১) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

---

* "Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion." Article 25 (1) Constitution of India.

** "The secular state is a State which guarantees individual and corporate freedom of religion deals with the individual as a citizen irrespective of his religion is not constitutionally connected to a particular religion nor does it seek either to promote or interfere with religion."—D. E. Smith

ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র নিম্নলিখিত কতিপয় ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে ঃ

(১) রাষ্ট্র কোন অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা ধর্মীয় নিরপেক্ষতা সম্বন্ধীয় কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। যেমন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একবারের বেশী বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া আইন পাস করা হইয়াছে। রাষ্ট্র চার্চ বা মঠের জমি হইতে আয় নিয়ন্ত্রণী আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

(২) রাষ্ট্র সামাজিক মঙ্গলার্থ এবং সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠানকে সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বী শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যেমন এই আইনবলে বর্তমানে হরিজনেরাও মঠে প্রবেশ করিতে পারে।

(৩) জনস্বার্থে, জনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য, স্বাস্থ্য রক্ষার্থে রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধ করিলে ধর্মীয় কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৪) সংবিধানে যে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইবে। হিন্দু অর্থে জৈন ধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং শিখদিগকে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অবশ্য, শিখ ধর্মাবলম্বীদের কৃপাণ বহন করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যায়, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভেঙ্কটরমন বলেন, "রাষ্ট্র কোন্ ধর্মের পরিপোষক নয়, আবার কোন ধর্মের বিরোধীও নয়। ইহা ধার্মীকতার আশ্রয় স্থলও নয়। রাষ্ট্র সকল ধর্মীয় গোড়ামী ও কার্যকলাপের সহিত সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিবে" ("The State is neither religious, nor irreligious, nor anti religious but is wholly detached from religious dogmas and activities, and thus neutral in religious matters.")। সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকারগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকটি অধিকারই ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জন্মসূত্র নির্বিশেষে ভোগ করিতে পারিবে। ইহা দ্বারাই বোঝা যায় যে, সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে সমানভাবে অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের হাতে ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে ধর্মের নামে ব্যবসা ও ব্যাভিচার না করিতে পারে এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে রাষ্ট্রের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইয়া জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সমালোচনা ঃ ভারতে জনসংখ্যার আধিক্যহেতু জীবনধারণের মান নিম্নস্তরে যাইতেছে। সুতরাং হিন্দুদিগের বহু বিবাহ বন্ধ করিয়া রাষ্ট্র সমাজ সংস্কারমূলক কাজই করিয়াছে। কিন্তু জনসংখ্যার কথা চিন্তা করিয়া যদি হিন্দুদিগের বহু বিবাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয় তবে মুসলমানদিগের বহু বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য আইন কেন প্রণীত হইতেছে না, তাহা দুর্বোধ্য। ধর্ম সম্পর্কে

রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করিবার জন্য সংবিধান কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন ; যেমন, (১) জোর করিয়া কাহাকেও ধর্মান্তরিত করা যাইবে না, (২) কোন বিশেষ ধর্মপ্রসারের জন্য কাহাকেও কর দিতে বাধ্য করানো যাইবে না, (৩) কোন সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে না, (৪) শিক্ষালয়ে কোন দাতার ইচ্ছানুসারে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাইবে, কিন্তু ধর্মশিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে না এবং (৫) অন্যান্য শিক্ষালয়ে অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই সকল দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন একদিকে যেমন ধর্মের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়াছে আবার অন্য দিকে কোন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করিবার স্বাধীনতাকেও স্বীকার করিয়াছে।*

(৫) **সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights) :** সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, ভারতের নাগরিকদিগের সকল সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও লিপি ব্যবহার করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। আবার রাষ্ট্র পরিচালনাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, জন্মসূত্র এবং শ্রেণী নির্বিশেষে প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের পছন্দমতো নিজ নিজ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। অর্থদানের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য করা হইবে না। ভারত অনুন্নত দেশ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অনুন্নতিই তাহার দারিদ্র্যের কারণ ; আবার বহুদিন পরাধীন থাকিবার ফলে ভারতের দিক হইতে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সমগ্র ভারতের প্রত্যেকটি অঞ্চল সমানভাবে উন্নত নয়। ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা জগতে অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রের তুলনায় খুবই বেশী। আবার ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দরিদ্র দেশে মূর্খ, নিরক্ষর নাগরিকদিগকে লইয়া যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তাহা কখনো সাফল্য লাভ করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার প্রথম সর্ত হইল শিক্ষিত নাগরিক থাকা। কারণ অশিক্ষিত নাগরিক কখনো নির্বাচনে যথার্থ ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। আবার জীবনধারণের মান এত নিম্নস্তরের যে, অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষালাভ করাও অধিকাংশ ভারতবাসীর পক্ষে সাধ্যাতীত।

(১২) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

ইহা ছাড়া সামাজিক কুসংস্কার ভারতের সমাজের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে ঢুকিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতকে নিজেদের স্বার্থেই উন্নত করে নাই, শিক্ষিত করে নাই, ভারতের সমাজ সংস্কার করে নাই। শতাব্দীর সামাজিক আবর্জনাকে পরিষ্কার

* "Freedom of religious worship and freedom of anti religious propaganda is recognised for all citizens"—Art 24 of Soviet Constitution.

করিবার কথা চিন্তা করিয়া ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতৃবর্গ নাগরিকগণকে সংস্কৃতি শিক্ষাবিষয়ক অধিকার প্রদান করিয়াছেন। আবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশেষতঃ অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য, চাকুরীর ক্ষেত্রে অপরাপর শ্রেণীর সমকক্ষ করিবার জন্য, অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। আইন সভায় সংখ্যালঘু অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চাকরির ক্ষেত্রে যাহাতে অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগকে প্রতিযোগিতা করিতে না হয় তাহার জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবার অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হইয়াছে।

এই অধিকারের প্রধান লক্ষ্য হইল অনুন্নত, অশিক্ষিত, সাংস্কৃতিক দিক হইতে নিম্নস্তরের, ধর্মের দিক হইতে সংখ্যালঘু এবং ভাষার দিক হইতে ও সংখ্যালঘু এইরূপ অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদিগের স্বার্থরক্ষা করা। ইহা সাম্যের অধিকারের পরিপূরক।

(৬) **সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)** ঃ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সম্পত্তির অধিকার প্রয়োজন বলিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ বিশ্বাস করেন। এই কারণে ব্যক্তির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, ব্যক্তির নিজের চেষ্টায় অর্জিত সম্পত্তি অথবা অন্য কোন আইনগতভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তিকে বেআইনীভাবে কাড়িয়া লওয়া হইবে না বলিয়া অনেক সংবিধানই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, আইনগত উপায় ছাড়া কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের অধিকারের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, কাহারও সম্পত্তি জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া হইবে না ("No one shall be arbitrarily deprived of his property.")।

(১৩) সম্পত্তির অধিকার

ভারতীয় সংবিধান অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ৩১ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তিকে আইনের নির্দেশ ব্যতীত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।* রাষ্ট্র কাহারও সম্পত্তি সর্ব-সাধারণের উদ্দেশ্যে দখল করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকার সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না এমন কোন কথা নাই, তবে সরকারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে (১) আইনের নির্দেশ থাকা প্রয়োজন, (২) জনসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে এবং (৩) সম্পত্তি দখল করিলে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাষ্ট্র **সর্বোপরি ক্ষমতার নীতি** অনুসারে জনস্বার্থে

* "No person shall be deprived of his property save by authority of law."— Article 31 (1) Constitution of India.

সম্পত্তির মালিকের অনুমতি ছাড়াই সম্পত্তি দখল করিতে পারে। আবার পুলিসী ক্ষমতা বলে অর্থাৎ সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সরকারের আইনগত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করিতে পারে। যে সম্পত্তি জনস্বাস্থ্য বিনাশকারী সেই সম্পত্তিকে দখল করিলে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। আবার কর ধার্যের ক্ষমতার মাধ্যমেও রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মতো সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রাষ্ট্রকে প্রদান করা হইয়াছে। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল বা গ্রহণ করিবার জন্য রাজ্যবিধান মণ্ডলী যদি কোন আইন প্রণয়ন করে তবে তাহা রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত কার্যকর হইবে না। আবার সম্পত্তির অধিকার নাগরিক ও অনাগরিক উভয়েই ভোগ করিতে পারিবে।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সর্বোপরি ক্ষমতা অনুসারে সম্পত্তি দখল করিলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে কিন্তু রাষ্ট্র করধার্যের জন্য বা অর্থদণ্ডের জন্য বা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে অথবা জীবন ও সম্পত্তির সংকট নিবারণের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ধ্বংস করিলে বা রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করধার্য ও পুলিসী ক্ষমতার সমতুল্য। আবার বৈদেশিক কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিকে কার্যকর করিবার জন্য কোন সম্পত্তি দখল করিলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না। ইহা ছাড়া অন্যান্য কোন কারণে আইনগতভাবে জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ক্ষতিপূরণের সারমর্ম হইল সম্পত্তির রূপান্তরকরণ। সরকার একজনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিয়া যখন উহার মালিককে ক্ষতিপূরণ দেয় তখন যাহার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইল সে তখন ঐ অর্থ দিয়া অন্যত্র আবার সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে। ফলে ক্ষতিপূরণের দ্বারা যে সম্পত্তি দখল করা হয় তাহাকে ক্ষতিপূরণের দ্বারা সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের অধিগ্রহণ না বলিয়া সম্পত্তির ক্রয় বলাই যুক্তিসঙ্গত। ভারতে (ক) রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, বা জনস্বার্থে সম্পত্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে; (খ) সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; (গ) সম্পত্তির হরণ সম্পর্কিত বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকা চাই, রাজ্যপালের এই বিলে সম্মতি প্রদানের একচ্ছত্র ক্ষমতা নাই।

(১৪) সম্পত্তির দখল

ভারতে ভূমিসংস্কারের জন্য, পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমস্যা সমাধানের জন্য, জনকল্যাণকর কাজকে প্রসারিত করিবার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে অধিক পরিমাণে সংকোচিত করা হইয়াছে। এইজন্য সংবিধানকে সংশোধন করিয়া বর্তমানে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া বা জরিমানা আদায় করিবার নামে, জনস্বার্থ রক্ষার্থে, সম্পত্তিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য করধার্যের মাধ্যমে অর্থাৎ দানকর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতির মাধ্যমে অথবা বাস্তুত্যাগীদিগের সম্পত্তির ব্যবস্থার

জন্য বিনা ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্র সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে। সরকার জনকল্যাণকর কাজের সুবিধার জন্য সংবিধানকে সংশোধন করিয়া লইয়া নানাপ্রকার সমাজকল্যাণকর বিধি প্রবর্তন করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। রাষ্ট্র কৃষিজমির সীমানা নির্ধারণ, দুই বা ততোধিক কোম্পানীর একত্রীকরণ, কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট, কোম্পানীর অংশীদারদিগের স্বত্ব, ডিরেক্টরদিগের ক্ষমতা পরিবর্তন বা বিলোপ করিতে পারিবে; খনি বা খনিজ তৈল বিষয়ে পূর্বকৃত কোন চুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া ঐসব খনিজ তৈল জাতীয়-করণ করিতে পারিবে; ঋণ প্রভৃতির লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিতে পারিবে। রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য সরকার যে প্রচেষ্টা চালাইতেছে সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবই তাহার প্রমাণ। বর্তমানে শহর সম্পত্তির মালিকানাও সীমিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক সম্পত্তির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। জমিদারী প্রথাকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে।

(১৫) বর্তমান অবস্থা

উপসংহারে বলা যায় অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করিবার জন্য, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে কার্যকর করিবার জন্য, অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করিবার জন্য এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য সম্পত্তির অধিকারে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করিবার আরও ক্ষমতা দেওয়া উচিত। অন্যথায় অর্থনৈতিক শোষণ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা যাইবে না।

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional remedies): মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিপিবন্ধ হইতে পারে কিন্তু মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করিবার ক্ষমতাধিকারী কোন সংস্থা ছাড়া মৌলিক অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে। ভারতীয় সংবিধানের ৩২(১) ধারায় শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার লিপিবন্ধ হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, নাগরিকগণকে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট অথবা প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আবেদন করিবার অধিকার দেওয়া হইবে।* ভারতীয় সংবিধানের ৩২(২) ধারা অনুসারে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট নাগরিকগণের অধিকারসমূহকে বলবৎ করিবার জন্য বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (*Habeas Corpus*), পরমাদেশ (*Mandamus*), প্রতিষেধক (*Prohibition*), অধিকারপৃচ্ছা (*Quo warranto*) এবং উৎপ্রেষণ (*Certiorari*) অথবা এই প্রকার কোন নির্দেশ জারী করিতে পারে।

(১৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার

(ক) **বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ** বলিতে বুঝায় একটি বিশেষ ধরণের আদেশ। কোন ব্যক্তিকে কি কারণে আটক করা হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য আদালত এই

* "The right to move the Supreme Court by appropriate Proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed.—Article 32 (1)

ধরণের আদেশ জারি করিতে পারে। এই আদেশের দ্বারা ধৃত ব্যক্তিকে সশরীরে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। এই লেখ বা আদেশ বলে বেআইনীভাবে আটক করা বন্দিগণ মুক্তি পায় অথবা অনতিবিলম্বে বন্দীদিগের বিচারের ব্যবস্থা হয়। বন্দী প্রত্যক্ষীকরণের মাধ্যমে কাহাকেও সত্বর কারণ না দর্শাইয়া গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা যাইবে না বলিয়া যে মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহা বলবৎ করা হয়।

(খ) **পরমাদেশ** জারি করে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট। নিম্নতন কোন আদালত বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টই পরমাদেশ নির্দেশ জারি করিতে পারে। এই আদেশ শুধুমাত্র জনস্বার্থ বিষয়ক কার্যের জন্য এবং আইনসঙ্গত অধিকারের জন্য জারি করা যাইতে পারে। পরমাদেশের জন্য প্রার্থনার পূর্বে প্রার্থীকে ন্যায় বিচারের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। এই ন্যায়বিচার যদি অস্বীকৃত হয় তবেই আদালত পরমাদেশ জারি করিতে পারে।

(গ) **উৎপ্রেষণ** হইল এক প্রকার লেখ বা আদেশ। নিম্নতন বিচারালয় অথবা বিচারকার্যের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি আইনানুগ ক্ষমতার সীমা লংঘন করে তাহা হইলে উৎপ্রেষণের মাধ্যমে উক্ত আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া আইনসঙ্গত বিচারের জন্য উর্ধ্বতন আদালতে বিচারের আদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) **প্রতিষেধক** নির্দেশের দ্বারা উর্ধ্বতন আদালত নিম্নতন আদালতকে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে অথবা সীমার মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিতে পারে। যদি কোন আদালত তাহার নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে তবে প্রতিষেধক নির্দেশ দ্বারা সেই সীমা অতিক্রম করিয়া যাওয়া রদ করিতে পারে।

(ঙ) **অধিকার পৃচ্ছা** নির্দেশের সাহায্যে কোন ব্যক্তি কোন পদে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে যোগ্যতা বিবেচনার জন্য বিচার পাইতে পারে।

সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্ট এই সকল নির্দেশগুলি মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য জারি করিতে পারে। তুলনীয়ভাবে বলা যায় ইংল্যাণ্ডে **লেখ** (**Writ**) এর মাধ্যমে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণের অধিকারের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করা যায়।

ভারতে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার অবাধ নয়। সংবিধানের ৩৫৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে সরকার নাগরিকদিগকে অধিকার বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে আদালতে আবেদন করিবার অধিকারকে অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারকে স্থগিত রাখিতে পারে। রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া মৌলিক অধিকার বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের ব্যবস্থাকে স্থগিত রাখিতে পারেন।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৩ ধারা অনুসারে সামরিক বাহিনী ও শৃংখলা রক্ষায় নিযুক্ত শক্তিসমূহের কর্মিগণ যতদূর পর্যন্ত মৌলিক অধিকার ভোগ করিবে পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া তাহা স্থির করিয়া দিতে পারে।

রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতি

The Directive Principles of State Policy

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও তার কার্যাবলীর পরিধি সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সকলে এক মত পোষণ করেন না। তবে সবাই একমত যে, জনগণের কল্যাণ সাধন করা রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিবার জন্য যে সকল কাজ করা প্রয়োজন রাষ্ট্র তাহাই করিবে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের পথ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ নীতির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধন করা যাইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সমষ্টিবাদ নীতির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধন করা যাইবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সার কথা হইল রাষ্ট্রের কাজ শুধু ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। বৈদেশিকদের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা, দেশের জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা ইত্যাদি রাষ্ট্রের কাজ হইবে। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই উৎপাদন, বণ্টন ও অন্যান্য সামাজিক কাজ করা হইবে। আর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হইবে। কিন্তু এই মতবাদ অনুসারে সমাজে মুষ্টিমেয় লোক আর্থিক লাভবান হইবে। অবাধ প্রতিযোগিতায় যাহারা ধনী তাহারাই বেশী লাভবান হইবে, টিকিয়া থাকিবে, ইহাতে সমাজের বৃহত্তর জনগণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। এই মতবাদের প্রতিবাদ হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমষ্টিবাদের উদ্ভব হয়। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কাজ শুধু ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে কার্যকর করাও রাষ্ট্রের কাজ। সমাজের স্বার্থে রাষ্ট্র-অবাধ প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে এবং রাষ্ট্রাধীনেও উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজ হইতে পারিবে। অর্থনৈতিক বিষয়কে এককভাবে ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না।

(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমষ্টিবাদ

বর্তমানে রাষ্ট্র আর পূর্বের মতো ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থকেই কার্যকর করে না; সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকেই রক্ষা করে। রাষ্ট্র আজ আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নয়, রাষ্ট্র আজ কল্যাণকর রাষ্ট্র। ভারতের সংবিধানের প্রণেতৃবর্গ রাষ্ট্রের কাজের পরিধিকে বাড়াইয়াছেন এবং রাষ্ট্র যাহাতে জনকল্যাণকর কাজ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারত আজ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত হইয়াছে। ইহার সার কথা হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা হয় নাই, অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা হইয়াছে তবে জনস্বার্থে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের জনহিতকর কাজের পরিমাণ বাড়ানো হইয়াছে। অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থ ও ব্যক্তির স্বার্থ উভয়কেই রক্ষা করিবার জন্য এই দুই স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ নির্দেশাত্মক নীতি: ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছিবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কি হইবে তাহা

সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৬ হইতে ৫১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানেও অনুরূপ নির্দেশাত্মক নীতি সংযোজিত হইয়াছে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি জন-কল্যাণকর সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হইয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে অর্থাৎ সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিবার মতো কোন অধিকার লিপিবদ্ধ হয় নাই। বরং সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করিয়া সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সংবিধানের প্রণেতৃবর্গ অবস্থার চাপে পড়িয়া সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। ফলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা পড়িয়া যায়। তাই অর্থনৈতিক সাম্যকে কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যকে বর্ণনা করা হইয়াছে। নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে এমন কতকগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার নির্দেশ পাওয়া যায়, যাহা কার্যকর হইলে ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে কোন বাধা থাকিবে না। সংবিধানের প্রণেতৃবর্গ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ—এই দুইটি মতবাদের কোনটাই পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। উভয়েরই ত্রুটিগুলিকে বাদ দিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। নির্দেশাত্মক নীতি হইল রাষ্ট্রের পরিচালনার বিষয়ে কতকগুলি পথনির্দেশ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট রাখিয়া রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হইবে তাহারই পথনির্দেশ পাওয়া যায় নির্দেশাত্মক নীতিতে।

বৈশিষ্ট্য ঃ ভারতের সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ (১) সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, এই নীতিগুলি দেশের শাসন পরিচালনার মৌলিক অঙ্গ (Fundamental of the Governance of the Country)। কিন্তু এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুকরণে আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত রাখা হইয়াছে। ইহা আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। ইহা সরকারের প্রতি সাধারণ নীতি। ইহা পালন করা বাধ্যতামূলক নয়। (২) নির্দেশাত্মক নীতিকে প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে আইন প্রণয়ন করিয়া লইতে হইবে। নির্দেশাত্মক নীতির নামে কোন আইনকেই লঙ্ঘন করা যাইবে না। যেমন, সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে কার্যের অধিকার, বেকার, বার্ধক্য ও পীড়িত অবস্থায় সরকারী সাহায্য পাইবার

*" The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court. But the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws".—Article 37

অধিকারকে রাষ্ট্র কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করিবে।* কিন্তু কোন বেকার যদি চাকুরী না পাওয়ার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে, তবে মামলায় তাহার পরাজয় হইবে, কারণ সরকার আইনগতভাবে বেকারকে চাকুরী দিতে বাধ্য নয়। নির্দেশাত্মক নীতিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আদালতে বলবৎযোগ্য নয়।

(৩) আবার নির্দেশাত্মক নীতির বলে সরকার কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। কারণ, আইন প্রণয়নের জন্য সংবিধান তিনটি তালিকা রচনা করিয়া আইন প্রণয়নের সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। এই সীমার বাইরে যে আইন প্রণীত হইবে তাহা বাতিলযোগ্য হইবে। অবশ্য, এই সীমার মধ্যে থাকিয়াই সবকার নির্দেশাত্মক নীতিকে কার্যকর করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

(৪) কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিকে লংঘন করিয়া যদি কোন আইন প্রণয়ন করা হয় তবে সেই আইন বাতিলযোগ্য হইবে না। কারণ, নির্দেশাত্মক নীতি পালন বাধ্যতামূলক নয়।

মৌলিক অধিকার বনাম রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিঃ নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক অধিকার উভয়ের মধ্যে আকৃতিতে মিল থাকিলেও প্রকৃতি, বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যেব মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। নিচে নির্দেশাত্মক নীতি ও মৌলিক অধিকাবের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইলঃ

(১) সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ হইতে ৩৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি বর্ণিত হইয়াছে। আর সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদ হইতে ৫১ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি বর্ণিত হইয়াছে।

(২) নির্দেশাত্মক নীতিগুলি রাষ্ট্র যে সকল কার্য করিতে প্রয়াস পাইবে তাহারই উল্লেখ করে আর মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্র যে সকল কার্য হইতে বিরত থাকিবে তাহার উল্লেখ করে। অতএব নির্দেশাত্মক নীতিগুলি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ের নির্দেশ বিশেষ, আর মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার পথে বাধা স্বরূপ; কারণ রাষ্ট্রকে নাগরিকের এই অধিকারগুলিকে মান্য করিয়া কাজ করিতে হয়।

(৩) সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃকবলবৎ যোগ্য নয়। অপরপক্ষে সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে মৌলিক অধিকারগুলিকে আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায়। সুতরাং নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মর্যাদাহীন।

(৪) নির্দেশাত্মক নীতিকে এককভাবে কার্যকর করা যায় না। মৌলিক অধিকারগুলিকে এককভাবে কার্যকর করা যায়। নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকর করিতে হইলে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিতে হয়।

---

* "The State shall within the limits of its economic capacity and development. make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved work".—Art 41

(৫) রাষ্ট্রপ্রণীত কোন আইনকে নির্দেশাত্মক নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয় নাই বলিয়া সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করিতে পারে না। নির্দেশাত্মক নীতিকে কার্যকর করার জন্য সরকারকে বাধ্য করানো যায় না। কিন্তু মৌলিক অধিকার-গুলিকে বলবৎ করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করানো যায়।

(৬) নির্দেশাত্মক নীতির প্রকৃতি মূলতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক, আর মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি রাষ্ট্রনৈতিক।

(৭) মৌলিক অধিকারের সহিত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে আদালতসমূহ মৌলিক অধিকারকেই অগ্রাধিকার দিবে; কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতির সহিত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে নির্দেশাত্মক নীতিকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(৮) মৌলিক অধিকারের প্রধান উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের কার্যের সীমা নির্দেশ করা, আর নির্দেশাত্মক নীতি রাষ্ট্রীয় কার্যের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।*

(৯) নির্দেশাত্মক নীতি সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়, আর মৌলিক অধিকার উদারনৈতিক ভাবধারার ইঙ্গিত দেয় মাত্র। নির্দেশাত্মক নীতি-গুলিকে মৌলিক অধিকারের তুলনায—কম মর্যাদা প্রদান করা হয়। সংবিধানের ১৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না। রাষ্ট্র যদি মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া আইন প্রণয়ন করে তবে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। তাই বলা হয় যে, নির্দেশাত্মকনীতি মৌলিক অধিকারের অধীন। মৌলিক অধিকার দ্বারা নির্দেশাত্মক নীতি সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উক্তিটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশাত্মক নীতি উভয়ই অধিকার, মৌলিক অধিকার স্থিতিশীল, কারণ ইহার মাধ্যমে ইতিমধ্যে যে সকল অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহাকে রক্ষা করা হয়, আর নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কোন উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর গতিশীল পদক্ষেপ বিশেষ।"**

(২) মৌলিক অধিকার নির্দেশাত্মক নীতিকে সীমিত করে

* 'The chapter on Fundamental Rights is socrosanct and not liable to be abridged by Legislative or Executive Act, or order, except to the extent provided in appropriate Articles in Part III. The Directive principles of State Policy have to conform and to run as subsidiary to the chapter on Fundamental Rights".—State of Madras vs Champakam Dorairajan (1951)

** The Directive principles of the State Policy represent a dynamic move towards a certain objective. The fundamental rights represent something static, to preserve certain rights which exist. Both again are rights".—Nehru

নির্দেশাত্মক নীতি ঃ * ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। যেমন,—

(ক) **অর্থনৈতিক আদর্শ ঃ** (১) সংবিধানের ৩৯ **অনুচ্ছেদে** বর্ণিত হইয়াছে যে, রাষ্ট্র সমাজ বৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট হইবে ; (২) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা জনকল্যাণ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বণ্টিত হইবে ; (৩) বেকারী, বার্ধক্য ও পীড়িত অবস্থায় রাষ্ট্র জনগণকে সাহায্য করিবে (৪১ **অনুচ্ছেদ**), (৪) জনগণ যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য পাইতে পারে রাষ্ট্র তাহার ব্যবস্থা করিবে (৪৭ **অনুচ্ছেদ**), (৫) জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে (৪৭ **অনুচ্ছেদ**), (৬) গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্পের প্রসার সাধনে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে (৪৩ **অনুচ্ছেদ**), (৭) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিকগণ পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের অধিকার ভোগ করিবে।

(খ) **সামাজিক আদর্শ ঃ** (১) সংবিধানের ৩৮ **অনুচ্ছেদে** বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে যাহার দ্বারা সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন সম্ভব হয়। (২) সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র পুরুষ ও নারী যাহাতে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে ("that there is equal pay for equal work for both men and women.")। (৩) রাষ্ট্র পুরুষ ও নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তির যাহাতে অপব্যবহার না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে (৩৯ অনুচ্ছেদ)। (৪) রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে (৪৬ অনুচ্ছেদ)। (৫) সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সংবিধান চালু হইবার পর, ১০ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকাদিগের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। (৬) সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্র শোষণের হাত হইতে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (৭) রাষ্ট্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে (৪৬ অনুচ্ছেদ)। (৮) রাষ্ট্র মাদক ও পানীয়ের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া সমাজে একটি সুস্থ ও পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে। (৯) কার্যের সর্তাদি যাহাতে মানবোচিত হয় এবং প্রসূতিদের সাহায্য করিবার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে (৪২ অনুচ্ছেদ)।

* Article 38. The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.

Article 39 The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men, women equally, have the right to an adequate means of livelihood ;

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good ;

(c) that the operation of the economic system does not rest it in the concentration of wealth and means of production to the common detriment ;

(d) that there is equal pay for equal work for both men and women ;

(e) that the health and strength of workers, men and women and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength ;

(f) that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

Article 40. The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.

Article 41. The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

Article 42. The State shall make provision for securing just and human conditions of work and for maternity relief

Article 43. The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and in particular the State shall endeavour to promote cottage industries or on an individual co-operative basis in rural areas.

Article 44. The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Article 45. The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of the Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

Article 46. The State shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people, and in particuar of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and shall protect from social injustice and all forms of exploitation.

Article 47. The State shall regard the rising of the level of nutrition and the standard of living its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

Article 48. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific line and shall, in particular. take stepts for

(গ) **আইন ও শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারমূলক আদর্শ ঃ** (১) সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল সামাজিক বিধি যাহাতে সকল নাগরিকের উপর সমান ভাবে প্রযোজ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। (২) সংবিধানের ৫০ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে যতদূর সম্ভব বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়া, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাকে পরিচালনা করা হইবে। (৩) সংবিধানের ৪০ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে জনসাধারণকে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের সুযোগ দিবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমাজের নিম্নস্তরে গণতন্ত্রের ভিত্তি সূচনা করিতে হইবে। (৪) পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান ও বস্তুসমূহ রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ঘ) **বৈদেশিক নীতির আদর্শ ঃ** সংবিধানের ৫১ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে জাতিতে জাতিতে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে, আন্তর্জাতিক মৈত্রী যাহাতে স্থাপিত হয় এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের উপর যাহাতে সকলের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় এবং সালিশীর মাধ্যমে যাহাতে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা হয়, রাষ্ট্র তাহার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

নীতিসমূহের রূপায়ণ, ইহার তাৎপর্য ও মূল্যায়ন (Implementation, Significance and Evaluation of the Directive Principles of State Policy) ঃ রূপায়ণ ঃ রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির বিরুদ্ধে অনেক সমালোচক সমালোচনা করিয়াছেন কিন্তু ভারত সরকার নির্দেশাত্মক নীতিকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (১) সংবিধানের ৩৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র

---

preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.

Article 49. It shall be the obligation of the state to protec every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation disfigurement, destruction, removal, disposal, or export, as the case may be.

Article 50. The State shall take steps to seperate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Article 51. The State shall enveavour to—

(a) promote international peace and security, (b) maintain just and honourable relations between nations; (c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised people, with one another, and (d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

—Constitution of India.

এমন ভাবে তাহার নীতি পরিচালিত করিবে যাহাতে জনসাধারণের কল্যাণে দেশের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা বণ্টিত হয় এবং সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা কতিপয় লোকের হস্তগত হইয়া জনগণের স্বার্থের হানি না ঘটায়। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ করা হইয়াছে এবং কৃষকদিগের সহিত সরকারের সম্পর্কস্থাপনের জন্য ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যায় ভারতের প্রায় সর্বত্রই মালিকানাধীন জমির পরিমাণের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি শহরাঞ্চলেও সম্পত্তির মালিকানার পরিমাণের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট করিবার জন্য আইন পাস করা হইতেছে। ব্যাংক প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পকে জাতীয়করণ করিয়া শিল্পক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাকে প্রসারিত করা হইতেছে। রাষ্ট্র মালিকানায় বহু শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে। আরও ১৪টি ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হইয়াছে।

(৩) নীতিসমূহের রূপায়ন

(২) রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে বেকার সমস্যার সমাধান, বার্ধক্য ও পীড়িত অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে না পারিলেও সরকার কর্মচারীদের জন্য সরকারী বীমা **পরিকল্পনা** (Employee's State Insurance Scheme) এবং কর্মচারি-গণের জন্য **প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড** পরিকল্পনা (Employee's Provident Fund Scheme) চালু করিয়াছেন। ইহা ছাড়া **নারী ও শিশু শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বেতন** প্রবর্তন করা হইয়াছে; বেতনের ক্ষেত্রে বিবাদ মীমাংসার জন্য **মজুরি বোর্ড** (Wage Board) স্থাপন করা হইয়াছে।

(৩) নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে কুটিরশিল্প প্রসারের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিবার জন্য সর্বভারতীয় হস্তশিল্পবোর্ড (All India Handicraft's Board,) সর্বভারতীয় হস্তচালিত তাঁতবোর্ড (All India Handloom Board), সর্বভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্পবোর্ড (All India Khadi and Village Industries Board) স্থাপন করা হইয়াছে। নির্দেশাত্মক নীতিতে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার সংস্কার, **কৃষি ও পশুপালনের উন্নয়ন** প্রভৃতির উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য **সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা** (Community Development Programme) গৃহীত হইয়াছে। তফসিলভুক্ত বর্ণ, তফসিলী উপজাতি এবং অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগকে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দিবার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের জন্য এবং খাদ্যপুষ্টির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হইবার ফলে অকালমৃত্যুর হার কমিয়াছে এবং প্রত্যেকের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্বাস্থ্য ব্যুরো (Health Bureaus) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক রাজ্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

(৪) শাসন-ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে **ক্ষমতা পৃথকীকরণ** প্রায় সকল রাজ্যেই করা হইয়াছে। বর্তমানে ম্যাজিস্ট্রেটদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; একটি বিচার সম্পর্কিত (Judicial) অপরটি বিচার সম্পর্কহীন (Nonjudicial)।

(৫) কোন কোন রাজ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হইয়াছে। কোন কোন রাজ্যে **৮ম মান** পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। আবার প্রায় সকল রাজ্যেই **পঞ্চায়েত** ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৬) ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর হইতেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও **নিরাপত্তা** প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

(৭) পূর্বে ভারতে বিভিন্ন প্রকারের দেওয়ানী আইন প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সারা ভারতে **এক প্রকারের দেওয়ানী আইন** প্রচলনের ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন (Hindu Marriage Act, 1955), ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার (Hindu Succession Act, 1956) পাস করা হইয়াছে।

সমালোচনা ঃ (১) সমালোচকগণ বলেন যে, সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়, সুতরাং এই নীতিগুলি লিখিত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার কোন অর্থই হয় না। কেহ কেহ ইহাদিগকে সংবিধানের প্রণেতৃবর্গের সদিচ্ছা বলিয়া মনে করে। আবার কেহ কেহ ইহাকে অজ্ঞ সরল ভারতবাসীদের বাক্যের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবার কৌশল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি নৈতিক প্রতিশ্রুতি (Moral Promises) ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পালনের কোন আইনসম্মত বাধ্যবাধকতা নাই। সুতরাং ইহার কোন মূল্য নাই। আইভর জেনিংস-এর মতানুসারে লিখিত সংবিধানে এই ধরণের নির্দেশাবলী লেখার কোন অর্থই হয় না।

(৪) বিপক্ষে যুক্তি

(২) আবার, এখানে আর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়, তাহা হইল—এই নির্দেশ কে দিতেছে এবং কাহাকে দিতেছে। যদি বলা যায়, ভারতের শাসন ক্ষমতার উৎস যে জনগণ, সেই জনগণই এই নির্দেশ দিতেছে—তাহা হইলে আর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়, তাহা হইল—কাহাকে এই নির্দেশ দিতেছে। বলা হয় জনগণ তাহাদের নিজেদেরকে এই নির্দেশ দিতেছে। তাহা হইলে এই কথাই বলা যায় যে, জনগণ তাহাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে এই নীতিগুলি প্রচার করিতে পারে না। সুতরাং ইহা সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কারণ এই ধরণের নির্দেশ একমাত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই নিম্নতন কর্তৃপক্ষকে দিতে পারে। স্বাধীন দেশের জনপ্রতিনিধিমূলক শাসকগোষ্ঠীকে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া যায় না। কারণ তাহারা জনগণের ইচ্ছাকেই (General will) কার্যকর করে।

এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, যে সরকার নির্দেশাত্মক নীতিসমূহকে কার্যকর

করিবে না, জনগণের নিকট তাহাকে জবাবদিহি হইতে হইবে। ডঃ আম্বেদকরের ভাষায়—যদি কোন সরকার এই নীতিগুলিকে উপেক্ষা করে তবে সেই সরকারকে নির্বাচনের সময়ে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট জবাবদিহী হইতে হইবে। সুতরাং ইহা আদালতে গ্রাহ্য না হইলেও **গণআদালতের** নিকট নির্বাচনের সময় ইহা গ্রাহ্য হইবে। সরকার গণআদালতের বিচারের ভয়ে এই নির্দেশাত্মক নীতিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করিবেই। আবার আদালতও বিভিন্ন মামলার রায়ে যেমন, কেরল শিক্ষা বিল (১৯৫৮), **কুয়ারেশী বনাম বিহার রাজ্য** (১৯৫৮) এবং **মারবা মাংঘানী বনাম সংগ্রাম সম্পত** (১৯৬০) রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিকে স্বীকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া এমনকি ভূমিসংস্কার ও অর্থনৈতিক নির্দেশাত্মক নীতিকে কার্যকর করার জন্য সংবিধানের ৩১ **অনুচ্ছেদকে** দুইবার সংশোধন ও করা হইয়াছে।

(৪) সমালোচকগণ বলেন যে, নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক শিক্ষা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত দেওয়া হইবে। বেকারদের চাকুরী দেওয়া হইবে, বার্ধক্য ও পীড়িত অবস্থায় লোকদিগকে সাহায্য দেওয়া হইবে, জীবনধারণের মান উন্নত করা হইবে ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর ২৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সকল প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর করা হয় নাই। এখনও লক্ষ লক্ষ বেকার কোন চাকুরী পাইতেছে না—বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বত্র চালু হয় নাই। জীবনধারণের মান ক্রমাগতই নিম্নগামী হইতেছে। পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়েও দেশীয় পুঁজি একচেটিয়া শিল্পপতিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যক্তিবিশেষের মালিকানায় পরিচালিত হইতেছে। ধনের বন্টন ব্যবস্থায় সাম্য আনয়ন করা সম্ভব হয় নাই। Monopoly Commission-এর রিপোর্ট হইতেই এই সকল অবস্থা পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে, সরকার বিভিন্ন ভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে কার্যকর করার দিকে সরকার নিরলসভাবেই চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। তবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সরকারকে আরও সময় লইতে হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমালোচনা যতই তীব্র হউক, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপ, বিভিন্ন শিল্পের জাতীয়করণ, সরকারী উদ্যোগে শিল্পগঠন, বিভিন্ন ব্যবসায় আরম্ভ, ৮ম মান পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, সংবিধানে লিপিবদ্ধ নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সরকারের কার্যাবলীকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করিতে সাহায্য করে।

---

* "... a harmonious interpretation to be placed upon the constitution and so interpreted it means that the state should certainly implement the Directive Principles..." Supreme Court on M. M Quareshi VS State of Bihar (1958)

তাৎপর্য (Significance) : নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রস্তাবনায় যে সকল আদর্শের কথা বলা হইয়াছে নির্দেশাত্মক নীতির নামে সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

(১) নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নহে বটে, কিন্তু এই নীতিগুলি আদালতের নিকট সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন নহে। এই নীতিগুলির ভিত্তিতে অনেক মামলার মীমাংসা হইয়াছে। আবার ৩৯ **অনুচ্ছেদে** উল্লিখিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য এমনকি মৌলিক অধিকারের বাধাকে অপসারিত করিয়া সংবিধান সংশোধন করা হইয়াছে। সংবিধানের ১৯ **অনুচ্ছেদে** স্বাধীনতার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রকে এই অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ জারি করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। এই বাধা নিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত কিনা সুপ্রীমকোর্ট তাহা নির্দেশাত্মক নীতির ভিত্তিতে বিচার করিয়া থাকেন।

(৫) তাৎপর্য

(২) ভারতের সংবিধানে নাগরিকগণের জন্য অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে এই অর্থনৈতিক অধিকারের উল্লেখ আছে। ধনী ও নির্ধনকে সমান দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হইয়াছে নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে।

(৩) নির্বাচনকালে ভোটদাতাগণ এই নীতিগুলিকে অবহেলা করিবার জন্য সরকারী দলকে ভোট নাও দিতে পারে, অন্ততঃ এই ভয়ে সরকার যতদূর সম্ভব এই নীতিকে কার্যকর করিবার প্রয়াস পায়।

(৪) শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়নের জন্য, দেশের উন্নতিকল্পে নির্দেশাত্মক নীতির মতো এক নৈতিক নিশানার বিশেষ প্রয়োজন। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইল এই নৈতিক নিশানা।

(৫) এই নীতিগুলি মান্য করা না হইলেও উহারা শাসকদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে, তাহারা নূতন সমাজ গঠন করিবার প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়াছে।

(৬) অধ্যাপক হোয়ারের মতে প্রস্তাবনাতে যেমন স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই সকল আদর্শ প্রাচীন হইলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরে বাঁধা হইলেও ইহাদের পুনরুল্লেখ প্রয়োজন আছে।

(৭) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হইবে তাহার ইঙ্গিত নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যেই আছে।

(৮) নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানে লিপিবদ্ধ হওয়াতে জনগণের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। জনগণকে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে। সংবিধানের ৪১ **অনুচ্ছেদে** বর্ণিত কাজের অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভাল হইত, কিন্তু কাজের অধিকারও যে একটি অধিকার হইতে পারে তাহার ধারণা নির্দেশাত্মক নীতির ঘোষণায় পরিষ্কার হইয়াছে। নির্দেশাত্মক নীতি শাসকবর্গকে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করিবার সংকল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

উপসংহারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা হইল : মৌলিক অধিকার হইতে নির্দেশাত্মক নীতির গুরুত্ব বেশী। যদি এই নীতিগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ না হইত তবে সংবিধানের গুরুত্ব কমিয়া যাইত। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবেই এই নীতিগুলিকে গণ্য করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুলাই পার্লামেণ্টে আলোচনা হইয়াছে যে, সরকারের ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্ম-সূচীকে কার্যকর করিবার জন্য সংবিধান সংশোধন করা হইবে। রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিকে কার্যকর করিবার জন্যই এই ২০ দফা কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

সারসংক্ষেপ

মানুষের সুন্দর জীবন গঠনের সহায়ক সুযোগ-সুবিধা বা অবস্থাগুলিকে অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধিকার কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয় ; যথা, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক।

অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন, (ক) আইনের অনুশাসন, (খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং (গ) সংবিধানের অধিকার ঘোষণা।

ভারতীয় সংবিধানের অধিকারসমূহের বৈশিষ্ট্য হইল : ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ অধিকার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা, (১) মৌলিক অধিকার, (২) নির্দেশাত্মকনীতি। ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার সমূহ হইল : (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, (৬) সম্পত্তির অধিকার এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। প্রত্যেকটি অধিকারই সর্ত সাপেক্ষ। অধিকার আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।

রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতি বলিতে বোঝায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশ। ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সংবিধানে ১৩টি নির্দেশাত্মক নীতি ঘোষিত হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের সহিত ইহার পার্থক্য হইল মৌলিক অধিকার আদালতে বলবৎযোগ্য আর নির্দেশাত্মক নীতি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়।

প্রশ্নাবলী

(১) ভারতীয় সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকার কি কি? ইহাদের মৌলিক বলা হয় কেন? কখন ইহারা অকার্যকর হয়?

(What are the Fundamental Rights contained in the Indian Constitution? Why are they called fundamental? When do they become inoperative?)

(২) ভারতীয় সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত সম্পত্তির অধিকার, ধর্মীয় অধিকার স্বাধীনতার অধিকার, সাম্যের অধিকার, জীবনের অধিকার এবং শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার পরীক্ষা কর।

(Examine fully the Right to property, Right to freedom of Religion, Right to Equality, Right to life and Right to constitutional Remedies).

(৩) রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের সারসংক্ষেপ লিখ। উহাদের প্রকৃতি ও গুরুত্ব নির্দেশ কর।

(Summarise the Directive Principles of State Policy and indicate their nature and importance)

(৪) মৌলিক অধিকারের সহিত রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতির পার্থক্য নির্দেশ কর।

(Distinguish between Fundamental Rights and Directiye Principles of State Policy.)

অতিরিক্ত পাঠ্য

Constitution of India—Gavernment of India

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পত্র

৯ শাসনতন্ত্র ও ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

(Constitution and Salient features of Indian Constitution)

(শাসনতন্ত্র—প্রকারভেদ—ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি—ভারতের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য।)

(Constitution—Classification—Nature of Indian Constitution—Salient features of the Indian Constitution)

শাসনতন্ত্র (Constitution) ঃ প্রত্যেক সংগঠনেরই একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংগঠনের সদস্যদের আচরণকে কতকগুলি নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন, একটি সমিতি গঠিত হইল, তাহার নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য থাকিবে। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সমিতির সদস্যদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কতকগুলি নিয়মাবলী ঠিক করা হয়। তেমনি রাষ্ট্রও একটি বিশিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রেরও একটি লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। রাষ্ট্রের যাহারা সদস্য তাহাদের আচার-আচরণকে কতকগুলি নিয়মকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়মকানুনের অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী ও প্রকৃতি, রাষ্ট্রের সদস্য অর্থাৎ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, শাসনের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের প্রণালী প্রভৃতি। রাষ্ট্রের এই নিয়মকানুনগুলিকেই বলে শাসনতন্ত্র।

(১) রাষ্ট্রের সাংগঠনিক নিয়মাবলী

রাষ্ট্রের সাংগঠনিক নিয়মাবলী যাহাকে বর্তমানে শাসনতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহার নজীর বহুদেশের প্রাচীনকালের ইতিহাসে পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল-এর রাষ্ট্রনীতি (Politics) নামক গ্রন্থে অনেক শাসনতন্ত্রের উল্লেখ আছে। তিনি প্রায় শতাধিক শাসনতন্ত্রের আলোচনা করিয়া একটি আদর্শ শাসনতন্ত্র রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রচলিত সরকারগুলিকে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, বণিকতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জনতাতন্ত্র—এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মধ্যযুগে নগর ও কর্পোরেশনের অধিকারসমূহকে লিপিবদ্ধ করিবার নীতি লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতেও শাসনতন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্টুয়ার্ট রাজাদের সহিত পার্লামেণ্টের বিবাদের মধ্যেও

(২) শাসনতন্ত্রের ইতিহাস

শাসনতন্ত্রের ধারণা পরিস্ফুট হয়। আমেরিকার সনদ, সামাজিক চুক্তিবাদীদের ধারণা, আমেরিকা ও ফরাসীবিপ্লবের ঘোষণাবলী প্রভৃতি হইতেও শাসনতন্ত্রের ধারণা পাওয়া যায়। ১৮০০ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে ইউরোপে প্রায় তিন শতাধিক শাসনতন্ত্র সংবন্ধ হইতে দেখা যায়। এই সকল শাসনতন্ত্র ও দলিল আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রতিযুগেব শাসনতন্ত্রই যুগধর্মকে প্রকাশ করিয়াছে এবং রাষ্ট্র যখন যে শ্রেণীর করায়ত্ত হইয়াছে সেই শ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শাসনতন্ত্র প্রণীত হইয়াছে। অবশ্য, উদীযমান শ্রেণীর দাবীব কথাও শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র যে গতিশীল সমাজের চাপে বারংবার পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করা যায়। জনগণের অধিকার স্বীকাব কবিতে গিয়া ইংল্যাণ্ডের সংবিধান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও রাশিয়ার সংবিধান পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাই শাসনতন্ত্রের ধর্ম।

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা ঃ অ্যারিস্টটল শাসনতন্ত্র বিশ্লেষণের সময় বলিয়াছিলেন যে, শাসনতন্ত্র হইল রাষ্ট্রাভ্যন্তবস্থ ক্ষমতার অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাব শৃংখলাবন্ধ-করণ। শাসনতন্ত্র হইল শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি বিশেষ। লুইয়ার শাসনতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "যে উদ্দেশ্য ও যে সকল বিভাগ দ্বাবা ক্ষমতা পরিচালিত হয তাহাদিগের নিয়ন্ত্রণ করার নিয়মাবলীকে শাসনতন্ত্র বলা হয়।"* ডাইসিব মতানুসারে শাসনতন্ত্র হইল এমন কতকগুলি নিয়মকানুন যাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহাবের এবং বণ্টনের ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। ডঃ ফাইনারের ভাষায় বলা যায়, মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত সংবন্ধরূপই হইল শাসনতন্ত্র।** তিনি শাসনতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ ক্ষমতা সম্পর্কের আত্মজীবনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ("A Constitution is an autobiography of a power relationship.")। শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা নির্ধারণ করে। সরকারের পারস্পরিক ক্ষমতা নির্ধারণ করে। ব্রাইসির মতে আইনের প্রাধান্য ও আইনের অনুশাসনই শাসনতন্ত্রের মূল নীতি। তিনি বলেন, সমাজকে সুসংবন্ধ করিবার জন্য, শাসন করিবার জন্য যে সকল আইন জটিল নীতি ও নিয়মকানুনকে রূপদান করে তাহাকেই শাসনতন্ত্র বলা হয়।***

(৩) শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা

---

* "The body of rules which regulates the ends for which and the organs through which Governmental power is exercised"—Luier

** "The system of fundamental Political institutions is the Constitution". —Dr. Finer

*** "The Constitution is the complex totality of laws embodying the principles and rules whereby the community is organised, governed, and held together.—Bryce

আইনবিদদিগের মধ্যে কেহ কেহ শাসনতন্ত্র শব্দটিকে দুইটি অর্থে ব্যবহার করেন; ইহার একটি হইল শাসন-ব্যবস্থা (Government) আর অপরটি হইল সংবিধান (Constitution)। শাসন-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যবস্থা। লিখিত আইন, প্রথা, রীতিনীতি এবং বিচার বিভাগীয় আইন প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রশক্তি তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি এই আইন, প্রথা রীতিনীতির দ্বারাই পরিচালিত হয়। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থা বলিতে এই সকল লিখিত ও অলিখিত আইন, প্রথা, রীতিনীতি ও বিচার বিভাগীয় মীমাংসা প্রভৃতিকে বুঝানো হয়। আইনবিদদিগের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় অর্থে শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি মৌলিক আইন। এই আইন দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এই অর্থে শাসনতন্ত্র হইল রাষ্ট্রের সংবিধান। ভারতের উদাহরণ হইতে বিষয়টিকে বুঝানো যায়। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত যে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইল ভারতের সংবিধান। আর স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর যে সকল প্রথা ও রীতিনীতির উদ্ভব হইয়াছে এবং যে লিখিত সংবিধানের সাহায্যে ভারতের শাসন পরিচালিত হইতেছে তাহাকে বলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা।

(৪) দুইটি অর্থ

শাসনতন্ত্রকে রাষ্ট্রের একটি নিখুঁত ছবি বলিয়াও অভিহিত করা যায়। এই ছবিতে প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্রের আদর্শ ও চরিত্র। রাষ্ট্র রাজতান্ত্রিক-কি-গণতান্ত্রিক তাহা তাহার শাসনতন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

আবার বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের উপর তৎকালীন যুগধর্ম আপন প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিযুগের মানুষের ধ্যান-ধারণা, ভাব-ভাবনা, চিন্তা ও আদর্শ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে। রাষ্ট্র সমকালীন সমাজের পটভূমিতেই তাহার শাসনতন্ত্র রচনা করে। তাই শাসনতন্ত্র সমকালীন সমাজের ভাবধারার প্রতীক। গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়াই শাসনতন্ত্রকে চলিতে হয় বলিয়া মাঝে মাঝে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

(৫) শাসনতন্ত্র সমকালীন সমাজের ভাবধারার প্রতীক

বিভিন্ন যুগে বিভিন্নশ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। শাসনতন্ত্র হইল অধিকারী শ্রেণীর স্বার্থবাহী নিয়মকানুন। যখন ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তখন তাহাদের স্বার্থেই শাসনতন্ত্র রচিত হয়। আর গরীব শ্রেণী যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তখন তাহাদের স্বার্থেই শাসনতন্ত্র রচিত হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, যাহারা অর্থনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী রাষ্ট্র তাহাদের অভাবকে প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের আইন হইল একটি মুখোশ যাহার আবরণের পশ্চাতে থাকিয়া ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের সুবিধা ভোগ করে। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনশীল, কারণ সমাজ পরিবর্তনশীল। প্রথা ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, আদালতের ব্যাখ্যা ও আনুষ্ঠানিক উপায়ে

(৬) ল্যাস্কির মত

শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হইয়া থাকে বা শাসনতন্ত্রকে প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয়। অবশ্য, বর্তমান পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায়, বিভিন্ন অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় দেশের মুষ্টি-মেয় অধিকারী শ্রেণীর দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালিত হইতে পারে না।

আবার কেহ কেহ শাসনতন্ত্রকে **জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক** বলিয়াও অভিহিত করেন। স্বাধীনতাপ্রিয় ভারতবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য হইতে যে শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা জনকল্যাণকর নীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যে আদর্শ শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা জাতীয় ঐতিহ্যের প্রকাশ।

শাসনতন্ত্রের উপাদান (Contents of the Constitution) ঃ শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু কি হইবে? এই প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও রাষ্ট্রের চরিত্রের উপর। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের আলোচ্য বিষয় আর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের আলোচ্য বিষয় এক নয়, কারণ ইহাদের চরিত্র ভিন্ন প্রকৃতির। কেহ কেহ ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবেও শাসনতন্ত্রকে অভিহিত করেন আবার কেহ কেহ সরকারের ক্ষমতার উৎস হিসাবেও শাসনতন্ত্রকে মনে করেন। কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করাই শাসনতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিচে শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হইল ঃ

(১) শাসনতন্ত্রের প্রথমেই একটি প্রস্তাবনা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইবে। শাসনতন্ত্রের যে সকল ধারা স্পষ্ট নয় সে সকল ধারার ব্যাখ্যা করিবার সময় মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহার ব্যাখ্যা করা যাইবে।

(২) শাসনতন্ত্রকে বলা হয় ব্যক্তি স্বাধীনতার উৎস। তাই সমাজজীবনে নাগরিকগণ অপর নাগরিকের ও সরকারের সম্পর্কে কতটা অধিকার ভোগ করিবে শাসনতন্ত্র তাহাই স্থির করিয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করিবে। শাসনতন্ত্র শুধু অধিকারই নির্ধারণ করিবে না। নাগরিকের কর্তব্যও স্থির করিবে।

(৩) সুষ্ঠু শাসনকার্যের জন্য শাসকমণ্ডলীর নির্বাচন পদ্ধতি, শাসন-ক্ষমতা এবং সরকারের কি কি বিষয়ে ক্ষমতা নাই তাহাও শাসনতন্ত্রে পরিস্কার-ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তাহা না হইলে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হইতে পারে।

(৪) রাষ্ট্রের আইন বিভাগ হইল শাসনতন্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতাও শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইবে। আইন, শাসন

ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরিস্কারভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকিবে।

(৫) শাসনতন্ত্রে নাগরিকদিগের অধিকার সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকিবে, নচেৎ শাসকবর্গ নাগরিকদের অধিকারকে তাহাদের প্রয়োজনমত অস্বীকার করিতে পারে।

(৬) সরকারী কার্যে লোক নিয়োগ সম্পর্কিত কতকগুলি মৌলিক আইন শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। আইন অনুসারে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়। সরকারী হিসাব পরীক্ষা, নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধও শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়।

(৭) বর্তমানে অনেক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনকে রাষ্ট্রের আইনরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক পরিবাবেব সভ্য হিসাবে গণ্য হয়। কোন রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিতে পারে না। এই কারণে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের নীতি শাসনতন্ত্রের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের নীতি সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন প্রভৃতি শাসন-তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

(৯) আদর্শ শাসনতন্ত্র শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ করে।

সুশাসনতন্ত্রের লক্ষণ ঃ আদর্শ শাসনতন্ত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকে তাহারা হইল ঃ আদর্শ শাসনতন্ত্রকে সুস্পষ্ট হইতে হইবে যাহাতে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে কোন মতবিরোধ না ঘটে। আদর্শ শাসনতন্ত্র লিখিত হয়। আবার ইহাকে সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে। আদর্শ শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। ইহা অতিরিক্ত মাত্রায় সুপরিবর্তনীয়ও হইবে না আবার অতিরিক্ত মাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয়ও হইবে না। আদর্শ শাসনতন্ত্র মধ্যপন্থাই অবলম্বন করিবে।

শাসনতন্ত্র প্রয়োজন হয় কেন ? **প্রথমতঃ,** শাসক ও শাসিতের আইনগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রেব শাসন-ব্যবস্থা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কই রাষ্ট্র চরিত্র নির্ধারণ করে। পূর্বে এই সম্পর্ক নির্ধারণ করিত শাসকশ্রেণী। বর্তমানে শাসিত শ্রেণীই রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। শাসিতের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল যে শাসন-ব্যবস্থা তাহাকেই বলা হয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ককে সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য শাসিতের মৌলিক অধিকারগুলিকে বিধিবদ্ধ করিয়া স্বৈরাচারিতার পথরোধ করা হয়। শাসনতন্ত্র শাসক ও শাসিতের সম্পর্ককে বিধিবদ্ধ করিয়া এবং মৌলিক বিধিনিষেধগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে রাষ্ট্রে অরাজকতা দেখা দিবে এবং রাষ্ট্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

শাসনতন্ত্র প্রয়োজন কেন

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের চরিত্রের নিদর্শন। একটি দেশের শাসনতন্ত্র দেখিলেই সেইদেশের স্বরূপ বোঝা যায়।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের ভিতরকার ক্ষমতা সম্পর্ক ব্যক্ত করে বলিয়াও ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রীয় জীবন বিকাশের জন্য শাসনতন্ত্র অপরিহার্য। শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার মানের চাবিকাঠি। শাসন-ব্যবস্থা একদিন কি ছিল—আজ সে কি রূপ ধারণ করিয়াছে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হইতে তাহা জানা যায়। এই সকল কারণের জন্য শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে কেহই অস্বীকার করে না।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitution): সাধারণতঃ শাসনতন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(ক) লিখিত ও অলিখিত, (খ) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়।

(ক) **লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র: (Written and Unwritten Constitution):** শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলি যদি এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে তাহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়।* আর কোন আইন প্রণেতৃমণ্ডলী যদি কখনও একটিমাত্র বিধিবদ্ধ ঘোষণার দ্বারা শাসন-ব্যবস্থার রূপটি প্রকাশ না করে এবং কতকগুলি প্রথা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের সাহায্যে শাসন-ব্যবস্থা চলে তবে তাহাকে অলিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝানো যায়। যেমন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত। কারণ, নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ দলিলের মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলি ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘোষিত হইয়াছে। আর অলিখিত শাসনতন্ত্রের উদাহরণ হইল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে অলিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়, কারণ, ব্রিটেনে কোন আইন প্রণেতৃমণ্ডলী কখনও একটিমাত্র বিধিবদ্ধ ঘোষণার দ্বারা ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার রূপটি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। এই কারণে টকভিল প্রমুখ বলেন যে, ব্রিটেনে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু টকভিলের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র যদিও একটি ঘোষণার মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু (১) বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত নানা আইনের মধ্যে, (২) বিভিন্ন রীতিনীতি, প্রথা, আচার-ব্যবহারের মধ্যে এবং (৩) বহু বিচারপতির বিচার মীমাংসার মধ্যে সমগ্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রটি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

(৭) লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা

লিখিত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য: (১) লিখিত শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তুগুলি লিখিত থাকিবে, (২) আইন প্রণেতৃমণ্ডলী তাহাকে শাসনতান্ত্রিক আইন বলিয়া কোন এক সময়ে ঘোষণা করিবে এবং প্রবর্তন করিবে।

---

* "A written constitution is one in which most of the fund amental principles of Governmental organisation are contained in a formal written instrument or instruments deliberately created."—R. G. Gettel.

অলিখিত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) অলিখিত শাসনতন্ত্রের বিষয়গুলি এমন হইতে হইবে যাহা লিখিত শাসনতন্ত্রে স্থান পাইতে পারিত, কিন্তু স্থান পায় নাই ; (২) অনান্য দেশে এই বিষয়গুলি যে শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে তাহার নজির ; (৩) আর ইহাকে শাসনতন্ত্র বলিয়া কোন আইন প্রণেতৃমণ্ডলী কোন দিন ঘোষণা করে নাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলেই শাসনতন্ত্রকে অলিখিত বলা হয়।

কিন্তু লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। লর্ড ব্রাইস বলেন, লিখিত শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা ও রীতিনীতির দ্বারা সম্প্রসারিত হইয়া থাকে, ফলে কিছুদিন পরে লিখিত নিয়মকানুন হইতে উহাব স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ ঃ (১) লিখিত শাসনতন্ত্রকে বলা হয় স্থায়ী ও নির্দিষ্ট আর অলিখিত শাসনতন্ত্র অস্থায়ী ও অনির্দিষ্ট। অবশ্য, শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেই উহা স্থাযী হয় না, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ভাবতের শাসনতন্ত্র লিখিত বটে, কিন্তু বহুবার উহারা সংশোধিত হইয়াছে। আবার শাসনতন্ত্র অলিখিত হইলেও উহা অস্থাযী হয় না, যেমন ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত বটে, কিন্তু ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র ক্রমবিবর্তনের ফলে, দীর্ঘকাল ব্যাপী সংঘর্ষ ও আপোষ মীমাংসার মধ্য দিয়া তাহার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার ফলে ইহা সুপরিচিত ও সুনির্দিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাকে বড় একটা সংশোধন করা হয না—ইহাকে স্থায়ীও বলা চলে। ব্রিটেনের প্রথাগত রীতিনীতি সমাজদেহেব মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে।

(২) আবার লিখিত শাসনতন্ত্রকে যে নির্দিষ্ট বলা হয তাহাও ঠিক নহে, কারণ শাসনতন্ত্র যে ভাষায় লিখিত হয তাহার একাধিক ব্যাখ্যার ফলে লিখিত শাসনতন্ত্র আর নির্দিষ্ট থাকে না। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত শাসনতন্ত্র বিচারপতিদের ব্যাখ্যার ফলে আর এখন নির্দিষ্ট নাই বরং ইংল্যাণ্ডের সমাজদেহে বদ্ধমূল প্রথাগুলি নির্দিষ্ট আছে।

(৩) তবে পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলে যখন শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় তখন ক্ষমতা সম্পর্কে নূতন অবস্থা ঘোষণা করিবার জন্য লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যেমন, ভারত স্বাধীন হইবার পর ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ছিল। শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়া লিখিতভাবে এই ঘোষণা প্রদান করা হয়।

(৪) পুরাতন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অক্ষমতাকে ও সংঘর্ষকে এড়াইবার জন্য, নূতন ভারসাম্যকে নির্দিষ্ট করিবার জন্য এবং রাষ্ট্রান্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকারকে সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে কেহই অস্বীকার করে না।

(খ) সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible and

Rigid Constitution) ঃ লর্ড ব্রাইস শাসনতন্ত্রকে সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয়—এই দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। যে শাসনতন্ত্রকে অতি সহজে পরিবর্তন করা যায় তাহাকে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র বলে। আর দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র হইল এমন শাসনতন্ত্র যাহাকে সহজে কোন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় না। সুপরিবর্তনীয় শাসন তন্ত্রের ক্ষেত্রে **সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক** আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না—অর্থাৎ উভয় প্রকার আইন একই পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায়। আর দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় না। দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র এক বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উদাহরণ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি খুবই জটিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের শাসনতন্ত্রের সংশোধনও জটিল। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া উচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

(৮) সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র

লাওয়েলের মতে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য মূলগত নয়। এই পার্থক্য পরিমাণগত। যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি জটিল বলিয়া ইহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয় কিন্তু বিচারকের ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই শাসনতন্ত্র সর্বদাই সংশোধিত হইতেছে। সুতরাং ইহাকে বরং সুপরিবর্তনীয় বলা যাইতে পারে। সংশোধন পদ্ধতি জটিল হইলেই শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হয় না। আবার ইংল্যাণ্ডের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়, কিন্তু বাস্তবে ইংল্যাণ্ডের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ আলোচনা প্রয়োজন। রক্ষণশীল ইংরেজ জাতির বদ্ধমূল ধারণাকে পরিবর্তন করা এবং জনমত ও গণচেতনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নাই। তাই বাস্তবে ইংল্যাণ্ডের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ ঃ (১) সুপরিবর্তনীয় শাসতন্ত্র গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। লর্ড ব্রাইস বলেন যে, "সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সময়োপযোগী, প্রয়োজনানুসারে এবং সংকটকালে শাসনতন্ত্রের মৌলিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বাড়ানো বা কমানো যায়।"

(২) বিপক্ষে আবার এই ধরণের যুক্তি দাঁড় করানো হয় যে, সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট নয় এবং ইহার পরিবর্তন অতি সহজসাধ্য বলিয়া সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া এবং রাষ্ট্র নেতাগণের খেয়াল খুশিমতো কারণে অকারণে যদৃচ্ছা ইহা পরিবর্তিত হইতে পারে। এই সহজসাধ্য পরিবর্তনের ফলে শাসনতন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে শাসনতন্ত্রের উপর শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে

হ্রাস পায়। আবার মৌলিক আইন হিসাবে সাধারণ আইন হইতে এইরূপ শাসনতন্ত্রের পৃথক কোন মর্যাদা না থাকায় এবং জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা পার্লামেন্টের খামখেয়ালীর উপর নির্ভরশীল বলিয়া সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তবে সমাজ গতিশীল, গতিশীল সমাজের সহিত তালরক্ষা করিয়া যদি শাসনতন্ত্রকে চালাইতে হয় তবে উহাকে সুপরিবর্তনীয়ই হইতে হইবে।

(৩) দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা যায় না। ইহা নির্দিষ্ট, স্থিতিশীল ও সুস্পষ্ট। পার্লামেন্টের খেয়াল খুশীমতো কারণে অকারণে ইহার পরিবর্তন হয় না। এই কারণে ইহা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(৪) কিন্তু এই ধরণের শাসনতন্ত্রও দোষমুক্ত নয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সহিত ইহা তাল রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। ম্যাকলে বলিয়াছিলেন যে, বিপ্লবের একটি মস্তবড়ো কারণ হইল জাতি যখন অগ্রসর হয় সংবিধান তখন স্থিতিশীল থাকে ("The Great cause of revolutions lies in this that while nations move onward, constitution stands still.")।

উপসংহারে অধ্যাপক ল্যাস্কির মন্তব্য দিয়া বলা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মতো অতিশয় সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রও যেমন কাম্য নয়, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুষ্পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্রও অবাঞ্ছনীয়। শাসনতন্ত্র আইনসভার . অংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষ হওয়া উচিত। শাসনতন্ত্রের সংশোধনের সরলতা ও কঠিনতার উপরই নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ।

ভারতের সংবিধানের জন্ম ও উহার প্রকৃতি (Birth and Nature of Indian Constitution) ঃ ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে ভারতের সংবিধানের একটু ইতিহাস জানা দরকার। তাই ভারতের স্বাধীন সংবিধান কিভাবে জন্মগ্রহণ করিল এবং কি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিল এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে।

সংবিধানের জন্ম ঃ ভারতের ইতিহাসের বেশ বড় একটা অংশ পরাধীনতার কাহিনীতে ভরা। শক, হূন, পাঠান, মোগল এদেশে আসিয়াছে, এদেশ জয় করিয়াছে এবং এদেশের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। ইংরেজ, ফরাসী, পোর্তুগীজ এবং ওলন্দাজ এদেশ জয় করিয়াছে, কিন্তু তাহারা এদেশের সাথে মিশিয়া যায় নাই। ১৬০০ সালে রাণী এলিজাবেথের সনদবলে ইংরেজ বণিকগণ ভারতে আসে এবং ভারতের মোগল রাজের অনুমতিতে ভারতে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তন করে। পরে সারা ভারত জয় করিয়া ভারতে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এদেশে শাসন ও শোষণ চাবাইয়া যায়। ১৮৫৭ সালে এই বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। ইংরেজ

(১) শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস

সরকার ইহাতে ভয় পায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। ইহার কারণ, ভারত ছিল ব্রিটিশের একটি মস্তবড়ো বাজার। যাহাতে ভারত হাতছাড়া না হইয়া যায় সেইজন্য ইংরেজ সরকার নিজ হাতে শাসনভার গ্রহণ করিয়া একটি **ভারত শাসন আইন** পাস করিল। ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি হইল। ভারতের শাসন বিষয়ে পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্ববদ্ধ একজন ক্যাবিনেট সদস্যকে ভারত সচিব হিসাবে নিযুক্ত করা হইল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে আরও শক্ত করার জন্য ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে **ভারত কাউন্সিল আইন** পাস করে। এই আইনবলে বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও বাংলায় আইনসভা গঠিত হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতবাসীর বিভিন্ন দাবি লইয়া আন্দোলন শুরু করে। তাই ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আবার একটি ভারত কাউন্সিল **আইন** পাস করে। এই আইন বলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে আরও পাঁচজন সদস্য গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হয়। জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা প্রদেশিক আইনসভার বেসরকারী সদস্যদের মনোনীত করিবার ব্যবস্থা হয়।

স্বাধীনতাপ্রেমিক ভারতবাসীরা ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের চাপেই ১৯০৯ সালে **মর্লে-মিণ্টো সংস্কার আইন** পাস করা হয়। ব্রিটিশ সরকার ভাবতে ব্রিটিশ শাসনকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য কতিপয় রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিত; যেমন, (১) স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা বুঝিয়া এক প্রদেশের কিছু জায়গা কাটিয়া লইয়া অপর প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিত। (২) ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে দাঙ্গা বাঁধানোর মতো অবস্থার সৃষ্টি করিত, (৩) ভেদনীতি অবলম্বন করিত। ১৯০৫ সালে বঙ্গ দেশকে বিভক্ত করা হয়; এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে সমগ্র দেশে আন্দোলন গর্জিয়া ওঠে। এই বিপল্ব মুখর জাতিকে স্তুতি বাক্য শুনাইবার জন্য ১৯০৯ সালে ভারত সচিব মর্লে এবং ভারতের ভাইসরয় মিণ্টো একটি আইন রচনা করেন। ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইনটি পাস করে। ১৯১২ সালে বঙ্গদেশকে আবার সংযুক্ত করা হয়। ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। দিল্লীকে পাঞ্জাব হইতে আলাদা করিয়া গভর্নর জেনারেলের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচননীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। বঙ্গদেশকে একটি গভর্নর শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হয়। কিন্তু কোনদায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার পত্তন হয় নাই। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

২) রাজনৈতিক কৌশল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত ব্রিটিশকে সাহায্য করে। ব্রিটিশ সরকারও প্রতিশ্রুতি দেয় যে যুদ্ধশেষে ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভুলিয়া যায়। কংগ্রেস আবার আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝিয়া ১৯১৯ সালে আবার একটি ভারত শাসন আইন পাস করা হয়। এই সময়ে ভারত সচিব ছিলেন মন্টেগু আর ভাইসরয় ছিলেন চেমস্‌ফোর্ড। এই দুইজনের নামেই অর্থাৎ মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন নামে-১৯১৯ সালের আইনটি পরিচিত হয়। এই আইন অনুসারে কেন্দ্রে একটি আইনসভা স্থাপন করা হয়। ৮টি গভর্নর শাসিত প্রদেশে ৮টি আইনসভা স্থাপন করা হয়। প্রতিটি প্রদেশে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রাদেশিক শাসন বিষয়গুলিকে **হস্তান্তরিত** বিষয় ও **সংরক্ষিত** বিষয়—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবগারি ইত্যাদি বিষয়। নির্বাচিত মন্ত্রিগণ এই বিষয়গুলি দেখাশোনা করিত আর আর্থিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, এইগুলি ছিল গভর্নরের পরিষদের হাতে। ইহারই নাম **দ্বৈতশাসন**। আবার সমগ্র শাসনের বিষয়গুলিকে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রে কোন দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হয় নাই। কংগ্রেস এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে আর একটি ভারত শাসন আইন পাস করে।

৩) মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন

এই আইনে বলা হয় যে, (১) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। প্রদেশগুলিকে আরও স্বাতন্ত্র্যাধিকার দেওয়া হইবে। (২) কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হইবে। (৩) একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠিত হইবে। (৪) সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে। (৫) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা ও সিন্ধুকে গভর্নর শাসিত প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়। মোট প্রদেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১টি। প্রত্যেক প্রদেশেরই একটি করিয়া আইন পরিষদ থাকিবে এবং একজন করিয়া গভর্ণর থাকিবেন। এই আইন বলে প্রদেশে ও কেন্দ্রে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিবে। সমগ্র ভারতের ১১টি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। ইহার একদিকে থাকে **যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য** আর অন্যদিকে থাকে **অযুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য**। যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য গঠিত হয় ১১টি প্রদেশ ও যে সকল দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে তাহাদের লইয়া আর যাহারা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে না তাহাদের লইয়া অযুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য গঠিত হইবে। আলোচ্য আইন অনুসারে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে তিনটি তালিকায় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বণ্টিত হয়। যথা, (১) **যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা**, (২) **অযুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা**, এবং (৩) **যুগ্ম তালিকা**। ইহা ছাড়া অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অধীন থাকে। ভারতবাসী এই আইনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই, কারণ ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা ইহাতে ছিল না।

(৪) ১৯৩৫ সালের আইন

১৯৩৯ সালে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ভারত ব্রিটিশকে সাহায্য করে নাই। তাহারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হয় এবং ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মিঃ এর্টলী। তাহারা দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। ভারতের নিজস্ব সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা হয়।

১৯৪৭ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসেন। মিঃ এট্লী ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতের শাসন ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই ভারতের স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পাস করা হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ঃ এই আইনে স্থির হইল যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ভারত ও পাকিস্তান দুইটি ডোমিনিয়ন হিসাবে স্বীকৃত হইবে। আরও স্থির হইল, দেশীয় রাজ্যগুলি এই দুইটি ডোমিনিয়নের যে কোন একটিতে যোগদান করিতে পারিবে। দেশীয় রাজ্যগুলির উপর হইতে ইংরেজরাজের সার্বভৌমত্ব লোপ পায়। অন্তবর্তী সরকারের অবসান হয়। ভারতে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার পত্তন হয়। ভারত ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করে। ভারতবর্ষ, ভারত ও পাকিস্তান—এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। এই আইনে ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদকে সার্বভৌম বলা হয়। আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমেই গভর্ণর জেনারেলকে কাজ করিতে হইবে। প্রদেশগুলিতেও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার পত্তন হয়।

গণ পরিষদ (Constituent Assembly)ঃ ১৯৪৬ সালের মে মাসে ক্যাবিনেট মিশন যখন ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব দেন তখনই একটি গণপরিষদ গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ইহার পর গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির আইনসভার সদস্যগণ ২৯৬ জন সদস্য গণপরিষদে নির্বাচিত করেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস পায় ২১১টি আসন আর মুসলিম লীগ পায় ৭৩টি আসন। রাজন্যবর্গের জন্য নির্দিষ্ট ৯৩টি আসনের কোন নির্বাচন হয় নাই। গণপরিষদের প্রধান কাজ হইল ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করা। ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর হইতে মুসলিম লীগের সদস্যগণ আর গণপরিষদে যোগদান করে নাই। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের গণপরিষদকে সার্বভৌম গণপরিষদ বলিয়া ঘোষণা করে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গণপরিষদ ভারতের সংবিধানের খসড়া প্রকাশ করে। ১৯৪৯ সালের ২৬শে

(৫) সংবিধান রচনার ইতিহাস

নভেম্বর পাকাপাকিভাবে সংবিধান গ্রহণ করিলে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উহাতে স্বাক্ষর দেন। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ইহা বলবৎ হয়।

স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সংবিধান অনেক পরিশ্রমের পর জন্মলাভ করিল। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল নেহরু, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, কে. এম. মুন্সী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর, আচার্য কৃপালনী, টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখকে সংবিধানের জনক বলা হয়।

ভারতের সংবিধানের উৎস ঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতের জন্য যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিকল্পনা করা হয় বর্তমান সংবিধান সেই কাঠামোকে অনেকটা অনুসরণ করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হইতে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা ও মৌলিক অধিকারকে অনেকটা গ্রহণ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতির বিষয়টির ভিত্তি ইইল আইরিশ ও নূতন ব্রহ্মদেশের শাসনতন্ত্র। ক্যানাডার শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে ভারতের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীকৃত চরিত্র। ভারতের শাসনতন্ত্রের পার্লামেন্টীয় চরিত্রটি গৃহীত হইয়াছে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা হইতে। এইভাবে বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের নিকট হইতে কিছু কিছু অংশ লইয়া এবং ভারতের নিজস্ব চরিত্রকে বজায় রাখিয়া বর্তমান সংবিধান প্রণীত হইয়াছে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি (Nature of Indian Constitution) ঃ সবদেশের সংবিধানের একটা নিজস্ব প্রকৃতি থাকে। এই প্রকৃতির অর্থ সংবিধানটি কি জাতের অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক-না-প্রজাতান্ত্রিক। সংবিধান রাজতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক যাহাই হউক না কেন দেখিতে হইবে সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয়-না-সুপরিবর্তনীয় ? কারণ ইহাও সংবিধানের প্রকৃতি নির্দেশ করে। সংবিধান লিখিত-না-অলিখিত তাহাও ইহার প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়। আবার আধুনিক যুগে সংবিধানের অনেক প্রকৃতিভেদ লক্ষ্য করা যায় ; যেমন, যুক্তরাষ্ট্রীয়, এককেন্দ্রিক, পার্লামেন্টীয়, মন্ত্রিসংসদ চালিত, গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক, রাষ্ট্রপতিশাসিত সংবিধান। এই ধরণগুলির মধ্যে কোন্ ধরণের সংবিধান কোন্ দেশ তাহার চরিত্র অনুসারে গ্রহণ করিয়াছে তাহাও দেখিতে হইবে, কারণ সংবিধানের প্রকৃতি ইহা হইতে জানিতে পারা যায়। কোন দেশ হয়ত এই ধরণগুলির মধ্যে এক ধরণের সংবিধান গ্রহণ করিয়াছে আবার কোন দেশ হয়ত ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে মিলাইয়া এক সংবিধান গ্রহণ করিয়াছে।

(৬) প্রকৃতি

(৭) মিশ্র প্রকৃতির

ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় এবং প্রকৃতিতে রাজতান্ত্রিক, গণতন্ত্রের যে নিয়মবিধি তাহা প্রায় সবই আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সংবিধান গৃহীত হইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হইয়াছে।

ভারতে আগে ছিল রাজতন্ত্র। ব্রিটিশেরা এদেশ দখল করিয়াও রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখিয়াছে। ব্রিটিশ রাণী বা রাজাই ছিলেন ভারতের রাণী বা রাজা। বর্তমানে ভারত স্বাধীন। ভারত আজ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সংবিধানে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে সামাজিক অসাম্যের উপর। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে সামাজিক অকল্যাণ বৃদ্ধি করিতে না পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ফলে এই শাসন-তন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া এক নব্য শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছে।

ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি হইল প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয়। ভারতে পার্লামেন্টীয় সংবিধান গৃহীত হইয়াছে। আবার পার্লামেণ্টের সদস্যদের লইয়া মন্ত্রিসভাও গঠিত হয় ফলে ইহা মন্ত্রিসংসদচালিত সংবিধানও বটে। রাষ্ট্রের শাসক প্রধান হইলেন রাষ্ট্রপতি। অতএব—রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থাও ইহাকে বলা যায়। এখানে সংবিধানের ও বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই, পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ভারতের সংবিধান লিখিত তবে ইহার সব অংশই দুষ্পরিবর্তনীয় নহে। ভারতের পার্লামেন্ট দ্বি-পরিষদীয় এবং এখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর নহে, কারণ শাসনবিভাগ বিচারকদের নিয়োগ করে আর আইন সভার সদস্যগণই শাসন বিভাগের মন্ত্রি পরিষদ গঠন করে। বহুদলীয় ব্যবস্থাও এখানে বর্তমান তাই ভারতের শাসনতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রভিত্তিক। অতএব শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি হইল রাষ্ট্রপতি শাসিত, পার্লামেণ্টীয় গণতান্ত্রিক, মন্ত্রিসংসদ পরিচালিত, প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র।)

উপসংহারে বলা যায়, ভারত একটি বিশালকায় দেশ। লোকসংখ্যাও ইহার প্রভূত। দেশজোড়া ইহার সমস্যা। গরীব ও কৃষি প্রধান দেশ হিসাবেই ভারত পরিচিত। ব্রিটিশ ভারতকে কাঁচামালের যোগানদার হিসাবেই ব্যবহার করিয়াছে। নিজেদের প্রয়োজনেই প্রভূত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইহাকে শিল্পোন্নত করে নাই। ভারত হইতে কাঁচামাল লইয়া গিয়া উহাকে শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত করিয়া ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ ইহাকে বিদেশের বাজারে চালান দিয়াছে। ভারতকে সে কোনদিনও বিদেশের বাজার দখলের সুযোগ দেয় নাই। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ভারতের গরীব দেশবাসীর কথা, ইহার কৃষি ব্যবস্থার কথা, জমিদার, জোতদার এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা, শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কথা এবং ভৌগোলিক ঐশ্বর্যের কথাস্মরণে রাখিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ভারতে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তবে বিবর্তনের মাধ্যমে অনেক সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যকে কার্যকর করা

হইতেছে। সুতরাং ইহাকে আধা সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা যায়। আবার পুঁজিতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা যেহেতু সম্পূর্ণভাবে আজও উচ্ছেদ করা হয় নাই, সেইহেতু ইহাকে আধা পুঁজিতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাও বলা চলে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগুলিও যেহেতু পুরাপুরি মান্য করা হয় নাই সেইহেতু ইহাকে আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাও বলা হয়। অতএব এখানে আধা সমাজতান্ত্রিক আধা পুঁজিতান্ত্রিক ও আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পত্তন হইয়াছে। এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায়, বিভিন্নদল কর্তৃক বিভিন্ন রাজ্যের সরকার গঠন করিবার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায়, সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি অতিশয় দুষ্পরিবর্তনীয় না হওয়ায়, কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা লিখিতভাবে বণ্টিত হওয়ায়, নির্বাচনের মাধ্যমে যে কোন দলের সবকার গঠন করিবার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট হওয়ায একনায়কতন্ত্রের পথ রুদ্ধ হইয়াছে এবং গণতন্ত্রের পথ প্রসারিত হইয়াছে।

আবার গোড়ায় যে শাসনতন্ত্রের চরিত্র ছিল তাহার কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে উন্নতিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য সরকার ধীরে ধীবে শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে। পুরাপুরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নীতি অনুসৃত হয় নাই। বিশালকায় ভারতের রাজ্যগুলিকে পুনর্গঠন করিয়া ' যুক্তরাষ্ট্রীয শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সামন্তশাহী নৃপতিবর্গের অধীনে যে সকল রাজ্যগুলি ছিল সেই সকল দেশীয় রাজ্যগুলিকে একে একে ভারত-ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। পর্তুগীজদের ঔপনিবেশ গোয়া, দমন ও দিউকে ভারতের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। ইহার পর ১৯৭৫ সালে সিকিমকে ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করিয়া সিকিমের রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার গোড়াপত্তনের জন্য সরকারী মালিকানায় বহু ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে। বহু শিল্পকে জাতীয়-করণ করা হইয়াছে।

ভারতের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি

(Salient features of the Constitution of India)

প্রত্যেক দেশের সংবিধানেরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। ইহার কারণ সংবিধান রচিত হয় জাতির চরিত্র, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতে। কোন এক জাতি বা দেশ অপর কোন এক জাতি বা দেশের সহিত সকল বিষয়ে সমান হইতে পারে না। জাতিতে জাতিতে বৈষম্য থাকিবেই। আবার সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে এক একটি দেশ বা জাতিকে এক এক ধরণের অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। যেমন, ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী দেশে সংবিধান যেরূপ হয়, সমাজতন্ত্রের দেশে সেরূপ হয় না।

সমাজ ব্যবস্থার উপর যে শ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করে সেই শ্রেণীর স্বার্থের কথাই সংবিধানে প্রতিফলিত হয়। সমাজের উপর যদি মজদুরশ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করে তবে সংবিধান মজদুর শ্রেণীরই স্বার্থবাহী হইবে। আবার ধনীকশ্রেণী যদি সমাজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তবে সংবিধান ধনিকশ্রেণীরই স্বার্থবাহী হইবে। ভারতের সংবিধানও ভারতের পার্থক্য-পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক চরিত্র অনুসারে অন্যান্য দেশের সংবিধান হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে এবং কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বব গণপরিষদ কর্তৃক ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় আর উহা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী কার্যকর হয়। নিচে ভাবতের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া গেল ঃ

(১) বৈশিষ্ট্যের কারণ

(১) **লিখিত (Written)** ঃ ভারতের সংবিধানের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল ইহা লিখিত। আবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবিধানের আয়তনের তুলনায় ইহা অনেক বড়ো। ইহা বিষয়বহুল ও জটিল। এই সংবিধানে প্রথমে ৩৯৫টি ধারা (Articles) এবং ৮টি তালিকা (Schedules); পবে আরও কিছু অনুচ্ছেদের সাথে কিছু অংশ এবং ২টি তালিকা সংযুক্ত হইয়াছে। আবাব দীর্ঘ ২৮ বৎসরে ৪০ বার সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে এবং নূতন করিয়া আবার একটি অধ্যায় যুক্ত হইবে। এখানে তুলনীয়ভাবে বলা যায় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে আছে মাত্র ৭টি অনুচ্ছেদ, অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে আছে ১৪৭টি অনুচ্ছেদ। এখন প্রশ্ন উঠে, ভারতের সংবিধান এত বড়ো ও জটিল কেন ? উত্তর বোধ হয় এই যে,

(ক) সংবিধানের প্রণেতৃবর্গ অন্যান্য দেশের সংবিধানের অসুবিধাগুলিকে স্মরণে রাখিয়া এই সংবিধান রচনা করিবার সময় ইহাকে আয়তনে বড়ো কবিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(খ) এই সংবিধানে বিভিন্ন ধরণের শাসন-ব্যবস্থার মিশ্রণ হইবার ফলে ইহা বৃহদাকার ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সংবিধান রাষ্ট্রপতির শাসন-ব্যবস্থা, পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-বাবস্থা, এককেন্দ্রীক শাসন-ব্যবস্থার মিশ্রণ বিশেষ। সেই জন্য ইহা এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

(গ) বিভিন্নস্তরের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হইল সংবিধান। সেজন্য সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে সংবিধানেরও বহু সংশোধন ও পরিবর্তন হইয়াছে। ফলে ইহার আয়তন বাড়িয়াছে এবং জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

(ঘ) আবার সংখ্যালঘুশ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলে সংবিধানের আয়তনও বাড়িয়া গিয়াছে।

(ঙ) মৌল আইন ছাড়াও কতকগুলি শাসন পরিচালনা বিষয়ক আইন ইহাতে যুক্ত হওয়ায় জটিলতাও বাড়িয়াছে।

(২) **প্রস্তাবনা (Preamble)** ঃ ভারতীয় সংবিধানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, এই

সংবিধানের গোড়াতেই একটি প্রস্তাবনা যুক্ত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি **সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** (**Sovereign Democratic Republic**) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে বহিঃশাসন হইতে মুক্ত ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করিবার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতকে সাধারণতন্ত্রী বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই যে সকল শাসন ক্ষমতার অধিকারী তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। এক কথায় ইহা রাষ্ট্রপতি শাসিত পার্লামেণ্টীয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রীক শাসন-ব্যবস্থা। আবার ভারত যদিও কমনওলেথের সদস্য কিন্তু ইহা ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য দেখাইতে বাধ্য নহে।

(৩) **যুক্তরাষ্ট্রীয়ঃ** ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। ভারতীয় সংবিধানও ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়াছে। এই ক্ষমতা বণ্টন হইয়াছে ইউনিয়ন, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকার মাধ্যমে। ভারতীয় পার্লামেণ্টই ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকারী। আর যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকারী হইল পার্লামেণ্ট এবং রাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলী। অবশ্য, যদি কখনও পার্লামেণ্টের আইনের সহিত বিধানমণ্ডলীর আইনের সংঘর্ষ বাধে তবে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনই গৃহীত হইবে। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার একমাত্র অধিকারী রাজ্য বিধানমণ্ডলী বটে, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে পার্লামেণ্ট প্রয়োজনবোধে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করিতে পারে। কানাডার মতো অবশিষ্ট বিষয়গুলির ক্ষেত্রে (**Residuary Powers**) অর্থাৎ যে তিনটি তালিকার উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী হইল পার্লামেণ্ট। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের সংবিধান কেন্দ্রকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী করিয়াছে।

(৪) **কেন্দ্রপ্রবণতাঃ** ভারতীয় সংবিধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার কেন্দ্রপ্রবণতা। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, ইউনিয়ন সরকারের অঙ্গরাজ্যকে নির্দেশ দিবার ক্ষমতা এবং ইউনিয়ন সরকারের আইন বিষয়ক, শাসন বিষয়ক ও আর্থিক সম্পর্কের বিষয়ের মধ্য হইতেই সংবিধানের কেন্দ্রপ্রবণতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। নিচে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইলঃ

(ক) রাষ্ট্রপতি রাজ্যের রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন এবং তিনিই রাজ্যপালকে অপসারণ করিতে পারেন। আবার প্রয়োজন হইলে তিনি অঙ্গরাজ্যের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে অর্পণ করিতে পারেন।

(খ) অঙ্গরাজ্যের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত আইনকে তিনি বাতিল বা বেআইনী ঘোষণা করিতে পারেন।

(গ) প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে।

রাজ্য সরকার যদি এই নির্দেশ অমান্য করে তবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বাতিল করিয়া সংশ্লিষ্টরাজ্যের শাসন ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করিতে পারে। আবার কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলি সকল প্রকার আর্থিক সাহায্য পাইয়া থাকে। কেন্দ্র অর্থসাহায্যের দিক হইতে রাজ্যগুলিকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। তাই আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সংবিধান কেন্দ্রপ্রবণ। আবার কর ব্যবস্থার মাধ্যমেও কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করগুলি কেন্দ্রের অধীন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি হইল এইরূপ যে, কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল হইবে না। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রতিপালিত হয় নাই। এখানে অঙ্গরাজ্যগুলি বিভিন্ন দিক হইতে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া আপৎকালীন সময়ে বা জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কিত সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অকার্যকর করিয়া রাখিতে পারেন। তাই বলা হয়, ক্ষমতা বন্টনের দিক হইতে ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও কেন্দ্রিকতার দিকেই ইহার ঝোঁক প্রবল। কানাডার মতোই ব্রিটিশ ভারতের এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল রাজ্যে বিভক্ত করিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকৃত করা হইয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করিয়া শাসন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছে।

(৫) **সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় কায়দায় ক্ষমতা বণ্টন যাহাতে বারংবার পরিবর্তিত হইতে না পারে, তাহার জন্য সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় করা হইয়াছে। ক্ষমতাবন্টনের কোন ধারাকে পরিবর্তন করিতে হইলে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির সম্মতি প্রয়োজন। ক্ষমতা বণ্টন সম্পর্কে কোনও বিলকে প্রথমে পার্লামেন্টের ভোট প্রদানকারী সদস্যদের ⅔ অংশ ভোটাধিক্যের এবং মোট সদস্যের অধিকাংশের সমর্থন করিতে হইবে। ইহারপর ঐ বিলকে অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানমন্ডলীর অর্ধেকের দ্বারা গৃহীত হইতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য সংশোধনের ক্ষেত্রে শুধু পার্লামেন্টের মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং ভোটদাতা সদস্যদের ⅔ অংশের দ্বারা সংশোধন প্রস্তাব পাস করাইয়া লইলেই চলিবে। এই ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলীর সম্মতির প্রয়োজন হয় না। আবার এমনকি অঙ্গরাজ্যের দ্বিতীয় পরিষদের প্রতিষ্ঠাও উহার বিলোপ সাধন সম্পর্কিত বিলের মতো বিলগুলিও সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতেই পাস করা যাইতে পারে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তা উভয়েরই সংমিশ্রণ।* ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সুপরিবর্তনীয়তা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের দুষ্পরিবর্তনীয়তার সমন্বয় সাধন করিয়াছে ভারতীয় সংবিধান। ভারতের শাসনতন্ত্রকে দুষ্পরিবর্তনীয় এই জন্যই বলা হয় যে, সাধারণ আইনসভা সাধারণ

* "The Constitution of India Combines flexibility with rigidity."

আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে অনেকক্ষেত্রেই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। কিন্তু ভারতের সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো চূড়ান্ত রূপে দুষ্পরিবর্তনীয় নহে। ভারতীয় সংবিধানকে সংশোধন করিতে হইলে সংশোধন প্রস্তাবটিকে বিলের আকারে পার্লামেন্ট সভার দুইটি কক্ষেরই দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে গৃহীত হইতে হইবে। আবার এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সমগ্র পার্লামেন্টের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী হওয়া চাই। ক্ষমতা বণ্টন, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রভৃতি সম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাবগুলি পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইবার পর অর্ধেক অঙ্গরাজ্যের আইন সভাগুলির সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। এই ভাবে বিলের আকারে সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া সংশোধনী বিল আইনের মর্যাদা পায়।

(৬) **সুপ্রীম কোর্ট** : যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য এবং শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টই এই সর্বোচ্চ আদালত। নাগরিকগণেব অধিকারগুলিকে বলবৎ করে এই সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা. কর্তৃক প্রণীত সংবিধান বিরোধী আইনকে বাতিল করিতে পারে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মতো ক্ষমতাশালী নহে এবং ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ বিচারালয়েব মতোও নহে। এই দুই দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের ক্ষমতাব মাঝামাঝি ক্ষমতাধিকারী হইল ভারতের সপ্রীম কোর্ট।

(৭) **ঐক্যের প্রতীক** : ভারতীয় সংবিধান সারা দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সারা ভারতের জন্য এক নাগরিকত্ব, প্রত্যেকের জন্য সমান অধিকার, একটিমাত্র সুপ্রীম কোর্ট, একই দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইন এবং একটিমাত্র সর্বভারতীয় কৃত্যক ভারতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে।

(৮) **মৌলিক অধিকার** : ভারতীয় সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো কতকগুলি মৌলিক অধিকারকে স্বীকার করা হইয়াছে। এই অধিকারগুলি হইল: (১) স্বাধীনতার অধিকার, (২) সাম্যের অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার, (৫) সম্পত্তির অধিকার, (৬) ধর্মীয় অধিকার (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার,। এই অধিকারগুলি অবশ্য অবাধ নয়। ইহার উপর কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। যেমন, নিবর্তনমূলক আটক আইন দ্বারা সরকার প্রয়োজনবোধে নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে। ১৯৫৭ সালে সুপ্রীম কোর্ট একটি মামলার রায়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংবিধানের ৩৬৮ ধারা অনুসারে সংবিধান সংশোধন করিয়া মৌলিক অধিকার খর্ব করা যাইবে না। অবশ্য, সংবিধানের ৩৮তম সংশোধন আইন বলে রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা বহাল থাকাকালে মৌলিক অধিকার কার্যকর নাও হইতে পারে। অবশ্য, ইহা ঠিক যে রাষ্ট্র স্বীকৃত নাগরিকদিগের মৌলিক অধিকার হইতেই রাষ্ট্রকে চিনিতে পারা

যায়।* সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। সব কিছুরই মালিক রাষ্ট্র নিজে, ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে। ভারতে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই দুইদেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন ব্যবস্থা চালু আছে। সব কিছুরই মালিক রাষ্ট্র নয়। সুতরাং এই দুই দেশে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা চালু আছে। সুতরাং মৌলিক অধিকারের কষ্টিপাথরে দেশের অর্থব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থাকে চিনিতে পারা যায়।

(৯) **নির্দেশমূলক নীতি ঃ** আয়ারল্যাণ্ড ও অন্যান্য আরও কয়েকটি দেশের সংবিধানের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, নাগরিকগণের কর্মে অধিকার, বেকার, বার্ধক্য, অঙ্গহানি ও পীড়িত অবস্থায় সরকারী সাহায্য পাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। অবশ্য, এই অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। আর মৌলিক অধিকারসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।

(১০) **পার্লামেণ্টীয় ঃ** ইংল্যান্ডের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থায় একজন আনুষ্ঠানিক শাসকপ্রধান থাকিবেন কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল এক মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে অর্পিত হইবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন আনুষ্ঠানিক শাসক প্রধান। আর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিমন্ডলীই প্রকৃত শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিদের দায়িত্ব এখানে যৌথ।

(১১) **শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুকরণে ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। সংবিধানই সকল ক্ষমতার উৎস। সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যকে সংরক্ষিত করিবে।

(১২) **এক নাগরিকত্ব ঃ** ভারতীয় সংবিধানে এক নাগরিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-নাগরিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতে এক নাগরিকত্ব স্বীকৃত হওয়ায় নাগরিকগণের আনুগত্য একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি। ফলে আনুগত্য বিভক্ত হয় নাই। অঙ্গরাজ্যের স্বতন্ত্র কোন নাগরিকত্ব নাই।

(১৩) **ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঃ** সংবিধান জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককেই সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়াছে। ভারত কোন ধর্মের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করে না—"ইহা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র" (Secular State)। ভারত ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রও নয় আবার ধর্মরাষ্ট্রও নয়।**

(১৪) **মিশ্র ব্যবস্থা ঃ** ভারতের নূতন সংবিধান সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-

* "A State is known by the system of right it maintains".—Laski

**"The State is neither religious, nor irreligious but is wholly detached from religious dogmas and activities and thus neutral in religious matter."

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কতকগুলি সুযোগ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারাও সংবিধানের রচয়িতাগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন সংবিধানের রচয়িতাগণ ডাইসি, মিল প্রমুখের মতবাদকে অনেক পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আইভর জেনিংস বলেন যে, ডাইসি প্রমুখের লেখার মধ্যে যে "সাংবিধানিক আইনের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই ভারতের সংবিধানটি প্রভাবান্বিত হইয়াছে।"*

(১৫) **বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ** ভারতীয় সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নকে পরিহার করিয়াছে বটে, কিন্তু বিশাল ভারতের কতিপয় শ্রেণী অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাদের উন্নতির জন্য ৩০ বৎসরের জন্য কতকগুলি সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। মূল সংবিধানে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ১০ বৎসরের জন্য স্বীকৃত হয় কিন্তু পরে ৮ম সংশোধন আইনের দ্বারা আরও ১০ বৎসর বাড়াইয়া ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পর আরও ১০ বৎসর বাড়াইয়া ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত করা হয়। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা তফসিলভুক্ত উপজাতিদিগের জন্য সরকারী চাকুরীতে অগ্রাধিকার প্রদান ও আইন সভায় নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে। আবার অর্থ সাহায্য দিয়া তফসিলভুক্ত এলাকাগুলির শাসন-ব্যবস্থা এবং তফসিলী উপজাতির কল্যাণসাধন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তফসিলী উপজাতির কল্যাণসাধন এবং তফসিল ভুক্ত এলাকার উন্নতি সম্পর্কে তদারক করিবার জন্য একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন, আর সংরক্ষণ ব্যবস্থাগুলিকে ঠিক মত বলবৎ করা হইতেছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন বিশেষ কর্মচারীও নিযুক্ত হয়।

(১৬) **দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ঃ** নূতন সংবিধান অনুসারে গণ-সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে। বর্তমানে দেশীয় রাজ্য বলিয়া আর কিছু নাই। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(১৭) **প্রথা ঃ** ২৮ বৎসর হইল সংবিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কতকগুলি প্রথা জন্মলাভ করিয়াছে। প্রথাগত ভাবেই রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল মন্ত্রিদের পরামর্শ মতো কাজ করেন। এসম্বন্ধে বাধ্যবাধকতার উল্লেখ সংবিধানে নাই।

উপসংহারে বলা যায় উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্মরণ রাখিয়া ভারতের সংবিধানকে বিচার করা উচিত।

* "The constitution is dominated by a view of Constitutional law, which most Constitutional lawyers now regard as outmoded—a view which derives from the works of Albert Dicey".—Dr. Jennigs

সারসংক্ষেপ

শাসনতন্ত্রের ইতিহাস সুরু হইয়াছে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার যুগ হইতে। শাসনতন্ত্র হইল মৌলিক আইন। আদর্শ শাসনতন্ত্র লিখিত ও সুস্পষ্ট। শাসনতন্ত্র সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত, যথা, (১) লিখিত ও অলিখিত, (২) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়।

ভারতের সংবিধানের জন্ম হয় ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী। ইহার প্রকৃতি প্রজাতান্ত্রিক আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়। ইহার বৈশিষ্ট্য: (১) লিখিত, (২) প্রস্তাবনা (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয়, (৪) কেন্দ্রপ্রবণতা, (৫) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়, (৬) সুপ্রীম কোর্ট (৭) ঐক্যের প্রতীক, (৮) মৌলিক অধিকার, (৯) নির্দেশাত্মক নীতি, (১০) পার্লামেন্টীয়, (১১) শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য, (১২) একনাগরিকত্ব (১৩) ধর্ম-নিরপেক্ষতা (১৪) মিশ্র ব্যবস্থা (১৫) বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ, (১৬) দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি, এবং (১৭) প্রথা।

প্রশ্নাবলী

১ শাসনতন্ত্র বলিতে কি বুঝ?

(What is meant by Constitution ?)

২। লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

(Distinguish between written and unwritten Constitution)

৩। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

(Distinguish between Rigid and Flexible Constitution)

৪। ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

(Explain the nature of Indian Constitution)

৫। ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(Discuss the salient features of the Indian Constitution)

অতিরিক্ত পাঠ্য

ভদ্র চাঁদ ভট্টাচার্য—ভারতের শাসন ব্যবস্থা

Gettel, R G,—Political Science Ch XV

১০ | সরকারের বিভিন্নরূপ ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র
(Forms of Government and Indian Federation)

(সরকারের বিভিন্ন রূপ—এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি—রাষ্ট্রপতি শাসিত ও পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা, ভারতীয় সরকারের প্রকৃতি ; রাষ্ট্রপতি শাসিত—না পার্লামেন্টীয় ? রাজতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারত।)

[Forms of Government—Unitary and Federal, Nature of the Indian Federation—Presidontial and Parliamentary ; Nature of the Indian Government, Presidential or Parliamentary ? Monarchy—Republic—India as a Republic.]

রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Forms of State and Government) : ইতিহাসের বিবর্তিত চাকায় বিঘূর্ণিত হইয়া দেশকাল ভেদে রাষ্ট্র ও সরকার বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। মূলগতভাবে সকল রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্য এক। রাষ্ট্র প্রায় সকল সময়েই একই উপাদানে গঠিত। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি সকল রাষ্ট্রেরই উপাদান। প্রত্যেকরাষ্ট্রেই নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে লইয়া সরকার গঠিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের গঠন পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হইতে পারে কিন্তু তাহাদের কর্তব্য একই, যথা—আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করা। অবশ্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সাদৃশ্য থাকিতে পারে, আবার এক দেশের সরকারের সহিত অন্য দেশের সরকারেরও সাদৃশ্য থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন সকল বৈষম্য দেখা যায় যে, তাহা মূলগত বিভেদেরই ইঙ্গিত দেয় ; যেমন, রাশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উপাদান একই। এই দুই দেশের সরকার একই রকমেরই ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু এই দুই-দেশের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। সব রাষ্ট্রের উপাদান এক হইলেও সরকারের গঠনপদ্ধতি কতকগুলি পার্থক্যের ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী বিভাগ অপরিহার্য। কোন এক দেশের জনসমষ্টি যখন রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হইয়া সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান গঠন করে। তখন তাহাকে রাষ্ট্র বলে। এইভাবে সংগঠিত জনসমষ্টির মধ্যে যাহারা রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা অর্থাৎ আইন, শাসন, বিচার ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহাদিগকে একত্রে সরকার বলা হয়। সুতরাং রাষ্ট্র আর সরকার এক নয় বরং ইহাদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই পার্থক্যের জন্যই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ও সরকারের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অবশ্য, এই বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন না। অ্যারিস্টট্ল বলিয়াছেন যে, সরকার রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। সরকারের মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) রাষ্ট্র ও সরকারের প্রকারভেদ

অতএব সরকারের গঠন অনুসারেই রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ করা উচিত। সরকারের গঠন পদ্ধতিকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের গঠন আলোচনা করা অবাস্তব। সরকারের প্রকৃতি ছাড়িয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ মূল্যহীন। তাই এক শ্রেণীবিভাগের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্নরূপ আলোচনা করা যায়। একদল বলেন, রাষ্ট্র ও সরকারের আলাদাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা অপরিহার্য। আর একদল বলেন, উভয়ের শ্রেণী বিভাগই একই সাথে করা যায়। এই দুইটি মতবাদেরই কিছুটা যৌক্তিকতা আছে। এই কারণে পৃথকভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ আবার একই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগের আলোচনা অপরিহার্য।

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ঃ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল যে ভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, প্রায় সকলেই পরের যুগে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। হয়ত দেশকাল ভেদে তাহা সামান্য কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই কম। অ্যারিস্টটল তিনটি সূত্র প্রয়োগ করিয়া গ্রীক রাষ্ট্রগুলিকে ভাগ করিয়াছিলেন। এই সূত্রত্রয় হইল ঃ (১) সংখ্যাগত অর্থাৎ সার্বভৌমিকের সংখ্যা কত—একজন—না—অল্প কয়েকজন—না অনেকজন? (২) আদর্শমূলক সূত্র—রাষ্ট্রক্ষমতা কাহার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে—শাসক-না-শাসক শ্রেণী—না—জনগণের জন্য? (৩) অর্থনীতিমূলক সূত্র—এই পর্যায়ে দেখিতে হইবে—শাসকশ্রেণী ধনী--মধ্যবিত্ত-না-গরীব? আবার এই শ্রেণীর মধ্যে কোনগুলি স্বাভাবিক আবার কোনগুলি বিকৃত তাহাও দেখানো হইয়াছে। অ্যারিস্টটল এই সূত্র অনুসারে নিম্নলিখিত ছয়শ্রেণীতে রাষ্ট্রকে ভাগ করিয়াছিলেন ঃ

সার্বভৌমিকের সংখ্যা	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
কতিপয় লোকের শাসন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র বা মুখ্যতন্ত্র
বহুজনের শাসন	গণতন্ত্র	জনতাতন্ত্র

এই শ্রেণীবিভাগকে ব্যাখ্যা করিয়া দেখা যায় যে, রাজতন্ত্রে সার্বভৌমিক একজন। ইনি আদর্শ সদ্গুণের অধিকারী। রাজা সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণে তাঁহার ক্ষমতা ব্যবহার করেন। ইহার একজনের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার স্বাভাবিক রূপ। আর ইহার বিকৃত রূপ হইল স্বৈরতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্রে রাজা বা একনায়ক আদর্শভ্রষ্ট হন। ফলে শাসন-ব্যবস্থা বিকৃতরূপ ধারণ করে। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় একক স্বৈরাচারী আপন স্বার্থে সরকার চালান। অ্যারিস্টটল এই শাসনব্যবস্থাকে তীব্র-নিন্দা করিয়াছেন।

অভিজাততন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে কয়েকজনের হাতে। যে অভিজাতগণ শাসন পরিচালনা করেন তাঁহারা নানা সদ্গুণের অধিকারী হন। সকলের মঙ্গলের জন্যই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। গুণগত অভিজাততন্ত্র হইল কয়েকজনের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের নজির। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারিগণ গরীব নন, তাঁহারা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। ইহাই এই ব্যবস্থার স্বাভাবিকরূপ। আর ইহার বিকৃত রূপ হইল ধনিকতন্ত্র বা মুখ্যতন্ত্র। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারী সম্প্রদায় কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কাজ করেন। অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বার্থপর অভিজাতগণ সকলেই ধনিক শ্রেণীর—ইহাই এই ব্যবস্থার বিকৃত রূপ।

আবার সার্বভৌম ক্ষমতা যখন অনেকে ব্যবহার করে তখন তাহাকে বলা হয় **গণতন্ত্র**। গণতন্ত্রের আরও দুইটি রূপ আছে—একটি স্বাভাবিক রূপ আর একটি বিকৃতরূপ। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক রূপে জনগণ সকল জনগণের মঙ্গলের জন্যই শাসন পরিচালনা করে। অ্যারিস্টট্‌লের মতে গণতন্ত্রে শাসকসম্প্রদায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হয়; গণতন্ত্রের বিকৃত রূপ হইতেছে **জনতাতন্ত্র**। এই শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অধিকাংশই সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনা করে কিন্তু তাহারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেন।

সমালোচনা : (১) সমালোচকগণের মতে অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ বর্তমান যুগে অচল, কারণ তিনি শুধু গ্রীক নগর রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে ঐরূপ ছোট রাষ্ট্র নাই, রাষ্ট্রের আয়তন এখন বড়ো। আবার অ্যারিস্টট্‌লের আমলের রাজতন্ত্র বর্তমানে আর নাই, বর্তমানের রাজতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক মাত্র।

(২) অ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই।

(৩) অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ সংখ্যানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তিনি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাহার স্বাভাবিক ও বিকৃত রূপ বর্তমানকালের দৃষ্টিকোণ হইতে মূল্যহীন।

(৪) অ্যারিস্টট্‌ল যে গণতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানের গণতন্ত্র পরোক্ষ গণতন্ত্র।

উপসংহারে বলা যায় অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগের দোষ ত্রুটি থাকিলেও এই শ্রেণীবিভাগ রাষ্ট্রচিন্তা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কোন শ্রেণীবিভাগই অ্যারিস্টট্‌লকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে নাই।

পরবর্তীকালে ব্লুণ্টস্‌লি ও জেলিনেক প্রমুখ অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেন। গেটেল অবশ্য বলেন যে, সরকারের বিভিন্ন রূপের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ করা যায়। কারণ একমাত্র সরকারের বিভিন্নরূপ অনুসারেই রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য

নির্দেশ করা যায়। কিন্তু এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করিলে তাহা রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ হইবে না, তাহা হইবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Forms of Government) : সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগের সন্ধান পাওয়া যায় ম্যারিয়ট এবং ডঃ লিককের লেখার মধ্যে। ম্যারিয়ট অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগকে মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাকে আধুনিক কালোপযোগী করিবার জন্য দুইটি নীতি অনুসরণ করেন; যথা, (১) শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক **বন্টননীতি** (Territorial Distribution), (২) শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের **সম্পর্কনীতি**। প্রথমনীতি অনুসারে সরকারকে **যুক্তরাষ্ট্রীয়** ও **এককেন্দ্রিক**—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। আর দ্বিতীয় নীতি অনুসারে সরকারকে **পার্লামেণ্টীয়** ও **রাষ্ট্রপতি শাসিত**—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ডঃ লিকক ম্যারিয়টের শ্রেণীবিভাগকে আরও স্পষ্ট করিয়া যে শ্রেণীবিভাগ করেন তাহাকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যায়।
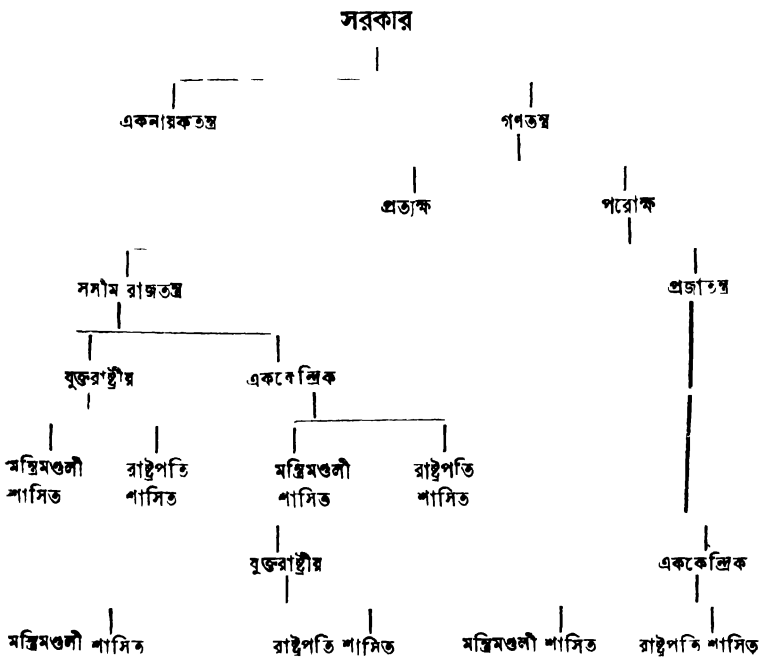
লিককের শ্রেণীবিভাগে দেখা যায় যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আবার একনায়কতন্ত্রে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই

ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগকে সাজানো যায় ঃ

এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আধুনিক রাষ্ট্রকে প্রথমতঃ স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। তারপর আবার এই তিন বিভাগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। আধুনিক শ্রেণীবিভাগে প্রধানতঃ তিনটি নীতির উপর নির্ভর করা হইয়াছে। যথা—(১) সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারীর সংখ্যানীতি, (২) রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি, এবং (৩) শাসন-ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন নীতি। নিম্নে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেণীবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল ঃ

আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Modern State and Government) ঃ আধুনিককালে রাষ্ট্র ও সবকারকে এক অর্থে ধরা হয় না। যেমন, ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা হইল রাজতান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনগণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা হয়। এখানে শাসন-ব্যবস্থার ক্ষমতা কাহার হস্তে তাহার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের চরিত্র ঠিক করা হইতেছে। শাসন-ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসন-ব্যবস্থার পরিচালনাভার যেহেতু জনগণের হস্তে সেইহেতু রাষ্ট্রের চরিত্র ও গণতান্ত্রিক হইয়াছে। সরকার রাষ্ট্রের অঙ্গ। এই অঙ্গের মধ্যে রাষ্ট্র মূর্ত হইয়া উঠে। সরকারের চরিত্রানুসারে যেহেতু রাষ্ট্রের চরিত্র ঠিক করা হইতেছে সেইহেতু আধুনিক চিন্তাবীরগণ নিম্নলিখিতভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ একসঙ্গে করিয়াছেন। পরপৃষ্ঠায় শ্রেণীবিভাগের ছকটি দেওয়া গেল।

আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Modern State and Government)
স্বৈরতন্ত্র (Despotism)
একনায়কত্ব (Dictatorship)
গণতন্ত্র (Democracy)
রাজতান্ত্রিক (Monarchical)
সামরিক (Military)
অভিজাততান্ত্রিক (Aristocracy)
ব্যক্তিকেন্দ্রীক (Personal)
দলগত (Party)
শ্রেণীগত (Class)
প্রজাতন্ত্র (Republic)
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)
যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)
এককেন্দ্রিক (Unitary)
যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)
এককেন্দ্রিক (Unitary)
মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)
মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)
মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত (Parlia-mentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)
মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)

(ক) **স্বৈরতন্ত্র (Despotism) ঃ** স্বৈরতন্ত্রে শাসক থাকে একজন এবং তিনি স্বেরাচারী হন। ইহা ঠিক একনায়কত্বের সমার্থবোধক নয়, কারণ একনায়কত্বের সহিত জনমতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রে তাহা থাকে না। স্বৈরতন্ত্রকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা, (১) রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, (২) সামরিক স্বৈরতন্ত্র এবং (৩) অভিজাততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র ।

(১) **রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র ঃ** রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একজনই থাকেন রাষ্ট্রনায়ক। তিনিই একনায়ক। এই এক নায়ক রাজা যদি স্বেচ্ছাচারী হয় তবে তাহাকে রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র বলা হয়। ভারতবর্ষের মহম্মদ্-বিন্-তোগলককে রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের নজির হিসাবে দেখানো যায়। এই শাসন-ব্যবস্থায় রাজার আদেশই আইন। রাজাই বিচারক। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনি। জনগণের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে না। রাজা যদি নীতিভ্রষ্ট হন তবে স্বেচ্ছাতন্ত্র চরমে পেঁছাইবে। এই শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল, (১) রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ শাসন ভার ন্যস্ত থাকে একজন রাজার উপর। (২) তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। (৩) তাঁহার আদেশই আইন।

(১) বৈশিষ্ট্য

আবার রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যায় ; যথা (১) রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, (২) নির্বাচিত রাজতন্ত্র এবং (৩) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নেপালেব রাজতন্ত্রকে রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র বলা যায়। আর প্রাচীন ভারতে, রোমে ও পোল্যান্ডে নির্বাচিত রাজতন্ত্রের উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্তমান ইংল্যান্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে। নির্বাচিত রাজতন্ত্রে গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধাগুলির অধিকাংশই নাগরিকগণ পাইয়া থাকে। আর নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে শাসনক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। রাজা শুধু নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রের নায়ক। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে।

(২) ত্রিবিধ রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা :
(১) স্বৈরতন্ত্র
(২) নির্বাচিত
(৩) নিয়মতান্ত্রিক

রাজতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits & Defects of Absolute Monarchy) ঃ রাজতন্ত্রকে যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইল তাহার মধ্যে চরম রাজতন্ত্র বা রাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রেরই নামান্তর। কারণ ইহাতে রাজা হয় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নচেৎ তাহার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজতন্ত্রে রাজা চরম ক্ষমতার অধিকারী হন এবং ইচ্ছা করিলে রাজা স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। এই চরম রাজতন্ত্রের গুণাগুণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) **চরম রাজতন্ত্রের সপক্ষে** যুক্তি হইল—সমাজ একদিনেই সুসভ্য হয় নাই। সমাজকে সভ্য করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল শৃঙ্খলা ও আনুগত্য। বর্বর-সুলভ স্বেচ্ছাচারিতার যুগে রাজতন্ত্র মানুষকে আনুগত্য ও শৃঙ্খলা-পরায়ণতার

শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সুসংবদ্ধ সমাজ জীবনকে গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। তাই **জন স্টুয়ার্ট মিল** বর্বরদের জন্য রাজতন্ত্রকেই উপযুক্ত শাসন-ব্যবস্থারূপে গণ্য করিয়াছিলেন। আবার রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করার জন্যই সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে জনসাধারণকে আনুগত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা সহজতর হইয়াছিল। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজা জনগণের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিয়া বর্বর মানুষকে সুসভ্য করিতে সাহায্য করিয়াছেন।*

আবার **জাতীয় রাজতন্ত্র (National Monarchy)** জাতীয় ভাবের সৃষ্টি করিয়া সমাজে যে প্রভূত সংস্কার সাধন করিতে সক্ষম হয় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের অধীনে ইউরোপের সংস্কারের মধ্যে।

(ক) **ট্রিট্‌সকে** রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেন এই কারণে যে, রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সাধারণতঃ সরল হয় এবং শাসননীতি ও শাসনকার্য পরিচালনায় ঐক্য বজায় থাকে। কিন্তু এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও রাজা যখন উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন অধিকার করেন তখন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, রাজা সুযোগ্যভাবে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারিবেন। আবার রাজা ইচ্ছা করিলে স্বেচ্ছাচারীও হইতে পারেন, কারণ তাঁহার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করার মতো অন্য কোন ক্ষমতা নাই।

ত্রুটি (Demerits) ঃ (ক) চরম রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজপদ প্রাপ্তি ঘটে। ফলে সুশাসন দৈবের উপর নির্ভর করে। সেন্ট অগাষ্টিন বলেন ঃ অজ্ঞ রাজা হইলেন মুকুটধারী গাধা ("an illiterate King is a crowned ass".—St. Augustine)। সুশাসনের জন্য রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করা যায় কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে যিনি রাজা হইবেন তিনি সুযোগ্য শাসক নাও হইতে পারেন। লীককের ভাষায় বলা যায়, "উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে কবি অথবা গণিতবিদের ন্যায় অকল্পিত।"

(খ) চরম রাজতন্ত্রে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রজাবর্গের আর কোন স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে না। ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বার বার প্রজাবর্গ বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়াছে।

(গ) ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান বলেন যে, "উত্তম স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বশাসন শ্রেয়" ("Better bad Government under self-Government than good Government under alien dictatorship.")। সরকারের কাজ হইল নাগরিকদের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। রাজতন্ত্রে জনগণকে রাষ্ট্রকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। ফলে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সুনাগরিক সৃষ্টি হয় না। তাই স্বশাসনকে শ্রেয় বলা হয়, কারণ স্বশাসনে নাগরিকগণ রাষ্ট্রকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে

* "Despotism is a legitimate mode of government for dealing with the barbarians provided the end be their improvement and the means be justified by actually effecting that end,"—J. S. Mill.

পারে এবং রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠে, জনগণ সচেতন হয়। আরও মহাকবির ভাষায় বলা যায় "নিগুর্ণ স্বধর্ম শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ"।

উপসংহারে বলা যায়, প্রাচীনকালে বর্বরসুলভ মানুষকে আনুগত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য প্রজাপালক রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হইত। কিন্তু প্রাচীনকালে রাজাকেও কোন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হইত। কখনো কখনো রাজাকে তাহার কাজের জন্য ধর্মের নিকট দায়ী থাকিতে হইত। মহাভারতের শান্তি পর্বে রাজাকে স্বৈরক্ষমতা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা প্রদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজাকে ধর্মের নিকট দায়ী থাকিতে হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। ম্যাকিয়াভেলীর রাজাকে নীতি বিরোধী কাজ করিবার পরামর্শ দান রাষ্ট্র দর্শনে কোন দিনও সমর্থিত হয় নাই। রাজাকে প্রজাপালক হইতে হইবে, প্রজার ইচ্ছায়ই রাজা কাজ করিবেন। তাই রামকেও প্রজার ইচ্ছায় সীতাকে বনবাসে পাঠাইতে হইয়াছিল।

নির্বাচিত রাজতন্ত্রে রাজা নির্বাচিত হন। ইহা প্রায় আধুনিক গণতন্ত্রের মতোই, তাই পৃথকভাবে আর ইহার আলোচনা করা হইল না। রাজা জনগণকর্তৃক নির্বাচিত হন। মাত্র জনগণের ইচ্ছায়ই তাহাকে শাসন করিতে হইবে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) **সামরিক স্বৈরতন্ত্র (Military Dictatorship or Junta)** ঃ বর্তমানে প্রায়ই কোন এক সেনানায়কের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (Coup) সংঘটিত হইতে দেখা যায়। এই বিদ্রোহে জয়লাভ করিলে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা তাহার হাতেই চলিয়া আসে। পূর্বেকার সরকারের বহু লোককে হত্যা করিয়া তিনি স্বেচ্ছাচারী শাসক হিসাবে পরিগণিত হন। জনগণের সমর্থন সহসা তিনি চান না। অবশ্য, অভিজাততন্ত্রের আওতায় সামরিক চক্রীদল (clique or zunta) কর্তৃক শাসনভার করায়ত্ত করার উদাহরণ বর্তমানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা এবং বাংলাদেশে সামরিক চক্রীদল ক্ষমতা দখল করিয়াছে।

(৩) **অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)** ঃ প্রাচীন গ্রীসে যে অভিজন (aristos) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শাসন বর্তমান ছিল তাহাকেই বলা হইত অভিজাততন্ত্র। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যখন সর্বসাধারণের কল্যাণে শাসন করিতেন তখন বলা হইত অভিজাত-তন্ত্র। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যখন ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করিতেন তখন শাসন-ব্যবস্থা যে বিকৃতরূপ ধারণ করিত তাহাকে বলা হইত মুখ্যতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র (oligarchy)। অভিজাততন্ত্র বলিতে শুধু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন বুঝায় না। রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মগত এবং ধনগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কোন এক সামাজিক শ্রেণী যখন রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে তখনই অভিজাততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায়ও দেখা যায়, শাসন-ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয় মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা। অর্থাৎ, মাত্র কয়েকজন

লোকের নেতৃত্বেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সুতরাং, গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তবে সুস্পষ্ট সীমারেখার নির্দেশ না করা গেলেও বলা যাইতে পারে যে, জনগণের শাসন-ক্ষমতাকে এবং শাসন কর্তৃত্বকে অবিশ্বাস করিয়া যদি শুধু অল্প কয়েকজনের শাসনকর্তৃত্বে বিশ্বাস করা হয় তবে অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি জনগণের শাসনক্ষমতা ও শাসন-কর্তৃত্বের উপর অটুট বিশ্বাস রাখিয়া অল্প কয়েকজনের শাসনে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অভিজাততন্ত্রে স্বৈরশাসনও প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থে ধনিকগোষ্ঠী স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের স্বার্থ পূরণ করে।

অভিজাততন্ত্রের গুণাগুণ ঃ অভিজাততন্ত্রের সপক্ষের যুক্তিকে মিলের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। মিল বলেন ঃ "শাসনকার্যে স্থায়ী উদ্যমশীলতা ও দক্ষতার দিক দিয়া ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য শাসন-ব্যবস্থাসমূহের অধিকাংশই হইল অভিজাততন্ত্র" (. "The Governments which have been remarkable in history for sustained ability and vigour. . .have generally been aristocracies.") অভিজাততান্তিক শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যা অপেক্ষা গুণের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অল্প কয়েকজন দক্ষ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলিয়া ইহা গণতন্ত্র অপেক্ষা কাম্য শাসন-ব্যবস্থা।

ত্রুটি ঃ অভিজাততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটির অন্ত নাই। **প্রথমতঃ** কারলাইল (Carlyle) যদিও বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দ্বারা শাসিত হওয়াই মূর্খের চিরন্তন সম্মান ("It is the everlasting privilege of the foolish to be governed by the wise.")। কিন্তু জনসাধারণ নিজেদেরকে মূর্খ বলিযা মনে করে না এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হওয়াকেও সম্মানের বলিযা মনে করে না।

দ্বিতীয়তঃ, অভিজাততন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার জনসাধারণকে মূর্খ বলিয়া ধরিয়া লইলে এই মূর্খ ব্যক্তিদের দ্বারা কখনই প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারে না। কারণ মূর্খদের জ্ঞানী ও অজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। অতএব সুশাসক নির্বাচন করা খুবই শক্ত।

তৃতীয়তঃ, অভিজাততন্ত্রে শাসকবর্গ যে রাষ্ট্রযন্ত্রকে কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত করিবে তাহার কোন সর্ত নাই। তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই কায়েম করে ; সাধারণতঃ তাহাই হইয়া থাকে। সর্বোপরি অভিজাততন্ত্র রক্ষণশীল হইতে বাধ্য। এই রক্ষণশীলতার জন্য ইহা প্রগতির অন্তরায় হইয়া বিপ্লবকে ডাকিয়া আনে। ফলে ইহা অস্থায়ী হয়।

উপসংহারে বলা যায়, অভিজাততন্ত্রে শাসন-ব্যবস্থা যদি স্থায়ী হয় এবং ইহা যদি সমাজের কল্যাণে সচেষ্ট হয় তবে নিশ্চিন্তভাবেই ইহা শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা। কিন্তু যেহেতু অভিজাতগণ যে জনকল্যাণে কাজ করিবে এমন কোন সর্ত নাই সেহেতু এই শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট মন্তব্য করা যায় না।

(খ) **একনায়কত্ব** (**Dictatorship**) ঃ পরবর্তী অধ্যায়ে একনায়কত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর তাহার আলোচনা করা হইল না।

(গ) **গণতন্ত্র** (**Democracy**) ঃ পরবর্তী অধ্যায়ে গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর তাহার আলোচনা করা হইল না। তবে এই অধ্যায়ে গণতন্ত্রের দুইটি শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করা হইল। এই দুইটি শ্রেণী বিভাগ হইল (১) **প্রজাতন্ত্র** এবং (২) **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র**।

(১) **প্রজাতন্ত্র** (**Republic**) ঃ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। ইহার এক ভাগে ধরা হয় **প্রজাতন্ত্র** আর অপরভাগে ধরা হয় **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে**। প্রজাতন্ত্রের আবার দুইটি রূপ আছে। ইহার একটি হইল **এককেন্দ্রিক শাসন**-ব্যবস্থা আর অপরটি হইল **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন**-ব্যবস্থা। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা আবার পার্লামেণ্ট বা মন্ত্রিসংসদ শাসিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাও পার্লামেণ্ট বা মন্ত্রিসংসদ পরিচালিত হইতে পারে। আবার এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থাও হইতে পারে। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করিব। এখন দেখা যাক প্রজাতান্ত্রিক সরকার বলিতে কি বোঝায়।

(৩) প্রজাতান্ত্রিক সরকার কাহাকে বলে

প্রজাতন্ত্র শব্দটির অর্থ কি? পেইন (Thomas Pain) বলেন, জনকল্যাণকামী সরকাব মাত্রই প্রজাতান্ত্রিক সরকার। আবার জেলিনেক বলেন, রাজতান্ত্রিক সরকারের বিপরীত সরকারকেই প্রজাতান্ত্রিক সরকার বলা যাইতে পারে। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের লক্ষণ হইল এই সরকার কোন এক ব্যক্তির করায়ত্ত হইবে না। কিছুসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত হইবে এই সরকার। আর এই সরকারকে জনকল্যাণকামী হইতে হইবে। ডুগুই (Duguit) বলেন যে, নির্বাচনমূলক সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান বংশগত নয় এমন সরকারকেই প্রজাতান্ত্রিক সরকার বলা হয়। আবার ম্যাডিসন বলেন যে, প্রজাতান্ত্রিক সরকার হইল এমন সরকার যে সরকার জনগণ হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতা পাইয়া থাকে এবং ইহার শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় এমন লোকদের দ্বারা যাহারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা যতদিন সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারিবে ততদিন ক্ষমতায় আসীন থাকিবে।* গার্ণার আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, "ম্যাডিসন ঠিকই বুঝিয়াছেন যে, বংশগত অধিকার বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক ধারণার সহিত তাল রক্ষা করিতে পারে না। যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক নীতিটিই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ধারণার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।"*

* "A Republic is a Government which derives all its powers directly or indirectly from the great body of the people and is administered by persons holding their offices during pleasure, for a limited period or during good behaviour."—Madison.

এখন দেখা যাক্ প্রজাতন্ত্রের এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

বৈশিষ্ট্য ঃ (১) প্রজাতন্ত্রে রাজার কোন স্থান নাই ।

(২) উত্তরাধিকারসূত্রে বংশগতভাবে কেহ রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হইবে না ।

(৩) ইহা হইবে জনকল্যাণকামী শাসন-ব্যবস্থা ।

(৪) জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীই সরকার গঠন করিবে এবং জনকল্যাণেই তাহারা কাজ করিবে ।

(৫) চিরস্থায়ীভাবে কেহ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া রাখিতে পারিবে না—সরকারের রদবদল হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এক একটি সরকার গঠিত হইবে । এবং তাহারা যতদিন জনগণ ইচ্ছা করিবে ততদিন ক্ষমতায় আসীন থাকিবে । এই সরকার গণতন্ত্রের গুণাবলীর ধারক ও বাহক ।

দোষ ও গুণ ঃ (১) প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায জনগণ যেহেতু রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে সেহেতু জনগণের মানসিক উন্নতি হয় ।

(২) শাসন-ব্যবস্থা জনগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে বলিয়া সুশাসন সম্ভবপর হয় ।

(৩) প্রজাতন্ত্রে একজন যিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন তিনিও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন । অতএব প্রজাতন্ত্রের অর্থ হইল গণরাজতন্ত্র ।

(৪) প্রজাতন্ত্রে বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা থাকে না ।

(৫) সর্বশেষে বলা যায় জনকল্যাণই যখন এই শাসন-ব্যবস্থার সর্ত তখন প্রকৃত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর কিছু বলিবার থাকে না । কারণ যে রাষ্ট্রব্যবস্থা জনকল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয় সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট ।

ত্রুটি ঃ (১) প্রজাতন্ত্রে যদি অজ্ঞ ও মূর্খের সংখ্যাই বেশী হয় তবে প্রজাতন্ত্র অজ্ঞদের রাজত্ব হইবে এবং শাসন-ব্যবস্থাও দুর্বল হইতে বাধ্য ।

(২) প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহা অলীক । কারণ, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন যে প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতা তাহা জনসাধারণের নাই ।

উপসংহারে বলা যায়, প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সকল গুণাবলী লক্ষ্য করা যায় এবং গণতন্ত্রের দোষগুলিও এই শাসন-ব্যবস্থায় দেখা যায় ।

(২) **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র** (**Constitutional Monarchy**) ঃ গণতন্ত্রকে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় তার এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় প্রজাতন্ত্র আর অপরশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ।

(৪) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

রাজতন্ত্রে রাজাই রাষ্ট্রের প্রধান । তাই অনেকে রাজতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান । একনায়কতন্ত্রে জনমতের সহিত রাষ্ট্রক্ষমতার সম্পর্ক থাকে । কিন্তু রাজতন্ত্রে থাকে না । অবশ্য এই রাজতন্ত্র হইল স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র । কিন্তু রাজতন্ত্রের

আবার প্রকারভেদ আছে, যথা **স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র**, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং নির্বাচিত রাজতন্ত্র। পূর্বে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিক ও নির্বাচিত রাজতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হইল এমন শাসন-ব্যবস্থা যেখানে নামে মাত্র একজন রাজা থাকেন। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান বটে, কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। রাজার নামে এই প্রতিনিধিগণই শাসন পরিচালনা করেন। এই প্রতিনিধিগণই আবার তাহার মধ্য হইতে কয়েকজনকে মন্ত্রি হিসাবে নির্বাচিত করিয়া লন এবং এই মন্ত্রিগণই রাষ্ট্র শাসন করেন রাজার নামে। রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তবে মন্ত্রিদের পরামর্শ মতোই কাজ করিয়া থাকেন। ইহাই প্রকৃত পক্ষে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে। এই এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা আবার মন্ত্রিসংসদ পরিচালিত বা রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হইতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিশিষ্ট্যগুলি নিচে দেওয়া হইল ঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ (১) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজাই রাষ্ট্রপ্রধান।

(২) রাজা বংশগতভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতালাভ করেন।

(৩) গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে যে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় বা রাজা যে মন্ত্রিপরিষদকে নিযুক্ত করেন তাহারা রাজার নামেই কাজ করেন—রাজা শুধু নাম সর্বস্ব রাষ্ট্র প্রধানের ভূমিকা অবলম্বন করেন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা পরিচলনা করেন মন্ত্রিগণ।

(৪) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা।

ত্রুটি ঃ (১) নিয়মতান্ত্রিকরাজতন্ত্রে যদিও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু রাজা, রাণী ও রাজ প্রাসাদের ভরণপোষণের জন্য দরিদ্র জনগণকে প্রভূত করের বোঝা বহণ করিতে হয় ফলে অনাবশ্যক খরচ বাড়ে।

(২) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র একটি রক্ষণশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রগতির দাবিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা যায় না।

(৩) বংশগতভাবে রাজা সিংহাসনারোহণ করেন। যদি দেখা যায় একটি অজ্ঞ, মূর্খ রাজা বংশগতভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন পান তবে তাহাকেই বৈদেশিকদের আতিথেয়তা করিবার জন্য হাজির করিতে হইবে। ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্মানজনক হয় না। নির্বাচিত রাজার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন উঠে না, কারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সম্মতিতে যে রাজা রাষ্ট্রপ্রধান হইবেন তিনি অজ্ঞ, মূর্খ হইতে পারেন না।

গুণাবলী ঃ (১) গণতন্ত্রের প্রায় সব কয়টি গুণাবলীই নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পাওয়া যায়।

(২) জনগণই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে। রাজা থাকেন নামে শাসকপ্রধান। ইংল্যাণ্ড নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উদাহরণ। ইংল্যান্ডের রাণী নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান।

(৩) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পার্লামেন্ট বা মন্ত্রিসংসদ চালিত শাসন-ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পার্লামেন্টের সদস্য হন এবং এই সদস্যদের মধ্য হইতেই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদই শাসন পরিচালনা করেন রাজার নামে। ফলে জনগণ যেহেতু তাহাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে, আবার তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে সেইহেতু নিযমতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়।

উপসংহারে বলা যায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেই গণতন্ত্রের সকল সুবিধা পাওয়া যায় সুতরাং ইহা একটি উত্তম শাসন-ব্যবস্থা।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা
(Unitary and Federal Forms of Government)

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা —এই দুইটি রূপের মধ্যে পার্থক্য করা হয় **আঞ্চলিক ক্ষমতাবণ্টনের** ভিত্তিতে। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তি বলিতে বুঝায়—প্রত্যেক বড় বড় জাতীয় রাষ্ট্রে দুইটি সরকার থাকে—ইহার একটি হইল জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার আর অপরটি হইল আঞ্চলিক সরকার। এই দুই সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা ভাগাভাগি করা হয়। (১) ভৌগোলিক কারণে আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টিত হইতে পারে, (২) স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রক্ষার্থে, (৩) রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসারকল্পে, (৪) গণতান্ত্রিক আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য এবং (৫) আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার জন্য শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন হইতে পারে।

শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন আবার দুইটি পদ্ধতি অনুসারে হয় ; যথা—(ক) **বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি** এবং (খ) **ক্ষমতাবন্টন পদ্ধতি**। বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র দ্বারা সর্বত্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং সরকার আঞ্চলিক সরকার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করে। যে শাসন-ব্যবস্থায় **বিকেন্দ্রীকরণ-নীতি** অনুসৃত হয় তাহাকে **এককেন্দ্রিক শাসন**-ব্যবস্থা (Unitary) বলে। আর **ক্ষমতা বন্টন নীতি** অনুসারে শাসনতন্ত্র দ্বারা যদি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার সৃষ্ট হয় এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয় তবে শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন**-ব্যবস্থা (Federal)।

(১) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary forms of Government)ঃ দুইটি পাশাপাশি রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে বা কোন বিজয়ী রাষ্ট্র বিজিত কতকগুলি রাষ্ট্রকে তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে। এই

রূপে রাষ্ট্রে জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারই পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। প্রয়োজনবোধে জাতীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারগুলিকে পুনর্গঠিতও করিতে পারে। আঞ্চলিক সরকারকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক সরকারের বিলোপও করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ প্রাধান্যের জন্য স্ট্রং (C. F. Strong) বলেন, সংবিধান মতো এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটি সরকার ও একটি আইন সভা থাকে। এই সরকার হইল কেন্দ্রীয় সরকার আর আইন সভা হইল কেন্দ্রীয় আইন সভা। *

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান উদাহরণ হইল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের শাসন-ব্যবস্থা। ইংল্যান্ডের আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি (Characteristics and natute of Unitary form of Government) : (১) এককেন্দ্রিক শাসনে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। কেন্দ্রের আইন ও নির্দেশ পালন আঞ্চলিক সরকারগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক। এইজন্য ডাইসি বলেন যে, এককেন্দ্রিক শাসনে একই কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা আইনগত সর্বপ্রধান কর্তৃত্বের স্বাভাবিক ব্যবহার হইয়া থাকে।**

(২) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত ও অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে পারে।

ফ্রান্সের উদাহরণে বলা যায়, ফ্রান্সের সকল আঞ্চলিক সরকারই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। অগ্ বলেন : "বস্তুতঃ, ফ্রান্সে একটি মাত্র সরকার আছে এবং তাহা হইল কেন্দ্রীয় সরকার।"

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাগুণ : (Merits) (ক) গুণ (১) এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে ইহা হয় শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা। এই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অপরাপর রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

(২) এই শাসন-ব্যবস্থায় একই নীতি ও আইন সমগ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থায় অনুসৃত হয় বলিয়া শাসনপদ্ধতি কার্যকর করা খুব সহজ ও দ্রুত হয়।

(৩) এই শাসন-ব্যবস্থায় রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আইন ও কার্যপদ্ধতি অনুসৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

(৪) এই ব্যবস্থায় অর্থের ব্যয়ও কম হয়, কারণ দ্বিবিধ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন ইহাতে হয় না।

---

* "The essence of a Unitary State is that the power of the Central Government is unrestricted, for the Constitution...does not admit any other law making body than the Central one."—C. F. Strong

** "The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power." —Dicey

ত্রুটি (Demerits) : (১) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক শাসনকে অস্বীকার করা হয়। ফলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ সমাধিস্থ হয়।

(২) কেন্দ্র আঞ্চলিক খুঁটিনাটি বিষয় সঠিকভাবে উপলব্ধি করিয়া কোন আইন পাস করিতে পারে না।

(৩) কেন্দ্র হইতে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলিয়া আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

উপসংহারে বলা যায়, উপরোক্ত ত্রুটিগুলি এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হইলেও যদি সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ও জাতীয়তা অভিন্ন হয় তবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

এককেন্দ্রিক	যুক্তরাষ্ট্রীয়
(১) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়।	(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভক্ত হয়।
(২) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের আইন ও নির্দেশের অধীন থাকে।	(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল নয় বা কেন্দ্রও আঞ্চলিক সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়।
(৩) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত বা অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় হইতে পারে।	(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে হইবে।
(৪) এককেন্দ্রিক শাসনে কেন্দ্র আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে।	(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একে অপরের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করিবে না।
(৫) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বন্টিত হয় না।	(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বণ্টিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal form of Government) : স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার রক্ষার্থে, রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসারকল্পে, গণতান্ত্রিক আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র রক্ষাকল্পে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি রাষ্ট্র যখন ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে একটি অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে তখনই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। **ক্ষমতা বণ্টন নীতি** অনুসারে শাসনতন্ত্র

দ্বারাই জাতীয় (Federal Government) ও আঞ্চলিক সরকার সৃষ্ট হয় এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। হোয়ারে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের নীতি বলিতে আমি মনে করি ইহা হইল ক্ষমতা বণ্টনের সেই পদ্ধতি যাহাতে সাধারণ সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি প্রত্যেকেই স্ব স্ব সীমার মধ্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।"* কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্র যুক্ত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে পারে।

(১) যুক্তরাষ্ট্র কি ?

ডাইসি বলেন ঃ "যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র বলিতে বোঝায় এমন এক শাসন-ব্যবস্থা, যেখানে কেহ কাহারো অধীন নহে এবং অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা বণ্টিত হয়। আর প্রত্যেকের ক্ষমতার উৎস ও নিয়ামক হইল শাসনতন্ত্র।" **

কতিপয় স্বাধীনরাষ্ট্র যুক্ত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে পারে। আবার ক্ষমতা বণ্টননীতি অনুসারে শাসনতন্ত্র দ্বারাই জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার সৃষ্ট হয় এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই সংবিধান কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার সৃষ্টি করে এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করিয়া দেয়। এইভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হয় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার কেহ কাহারও অধীন হয় না।*** তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতা পরিবর্তন করিতে হইলে সংবিধানকে সংশোধিত করিয়া লইতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের ইতিহাস ঃ স্ট্রং-এর মতানুসারে দুইটি পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে—ইহার একটি হইল **অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি (Integration by Absorption)**। এই পদ্ধতিতে বিজিত রাষ্ট্র বিজয়ী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে অথবা প্রবল জাতীয়ভাবের বশবর্তী হইয়া দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল **যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি (Federal Method)**। এই পদ্ধতি অনুসারে কতিপয় রাষ্ট্র মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড

* "By federal principle I mean the method of dividing powers so that the central and regional Governments are each within a sphere, coordinate and independent."—K. C. Wheare.

** "Federalism means the distribution of the forces of the State among a number of coordinate bodies, each originating in and controlled by the constitution."—Dicey

*** "In Federal Constitution the powers of Government are divided between a Government for the whole country and Governments for parts of the country in such a way that each Government is legally independent within its sphers,'—K. C. Wheare

সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাষ্ট্রসকল স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখে। ডাইসি যে যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, (১) যুক্তরাষ্ট্র আকারে ক্ষুদ্র হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একটি ভৌগোলিক সান্নিধ্য বজায় থাকিবে ; (২) এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এমন একটা জাতীয়ভাব থাকিবে যাহাতে জাতীয় ঐক্য সাধিত হইতে পারে ; (৩) এই জাতীয় ভাবের জন্য তাহাদের মধ্যে একটি মিলনের স্পৃহা থাকিবে , (৪) কিন্তু তাহারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়া মিলিত হইবে না। যে রাষ্ট্রে এইরূপ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহাই যুক্তরাষ্ট্র।

(২) যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস

যুক্তরাষ্ট্র গঠনে একদিকে মিলনের ইচ্ছা ও আর একদিকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ইচ্ছা রাষ্ট্রগুলির কেন হয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে হোয়ারে বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, বহিরাক্রমণ প্রতিহত করিবার প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিবার ইচ্ছা মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে একই রাষ্ট্রের অধীনে মিলিত হইতে উদ্বোধিত করে। অবশ্য, ভাষা, ধর্ম ও উদ্ভবগত ঐক্যের প্রভাব আছে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে। আবার যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তাহারা আবার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চায়। ইহার কারণ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আগে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। এই স্বাতন্ত্র্যকে রাজ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়া নিজেদের সত্তাকে লুপ্ত করিতে চায় না। আবার অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত, ভাষাগত, উদ্ভবগত ও ধর্মগত পার্থক্যের প্রভাব এবং ভৌগোলিক ব্যবধান অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে প্রেরণা যোগাইয়াছে। আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পার্থক্যের জন্যও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

৩) যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কারণ

যুক্তরাষ্ট্র দুইটি পদ্ধতিতেও সৃষ্টি হইতে পারে ; যথা, একটি হইল **কেন্দ্রাভিগামী (Centripetal)** আর অপরটি হইল **কেন্দ্রাতিগ (Centifugal)**। জাতীয় ঐক্য সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিলে কেন্দ্রাভিগামী শক্তি কার্যকর হয়। যেমন, ১৩টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিলিত হইয়া প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। আবার বর্তমানের ঝোঁক হইল কেন্দ্রাতিগ শক্তির দিকে। এই শক্তির প্রভাবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় ; যেমন, কানাডা ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) যুক্তরাষ্ট্রে দুই স্তরের সরকার লক্ষ্য করা যায় ; যথা, (ক) কেন্দ্রীয় সরকার (Federal Government), (খ) অঙ্গরাজ্য সরকার (State Government)।

(২) এই দুইটি সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিখুঁতভাবে বণ্টিত হয়।

(৩) এই দুই স্তরের সরকার কেহ কাহারও অধীন হইবে না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় **শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য** স্বীকৃত হইবে। শাসন-তন্ত্রই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেয়।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে। তাহারা কেন্দ্রেরও নাগরিক এবং অঞ্চলেরও নাগরিক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **দ্বৈত নাগরিকত্ব** (**Dual Citizenship**) স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নাগরিকত্বের দায় ও অধিকারে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(৬) শাসনক্ষমতার বণ্টন নির্দিষ্ট হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের **শাসনতন্ত্র লিখিত** হইয়া থাকে।

(৭) আবার শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্বের জন্য ইহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় করা হয়।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রে নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া মতবিরোধ সৃষ্টি হইলে **নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী** তাহার নিষ্পত্তি করেন। একই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে (Federal Court) **শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক** (Interpreter and Guardian of the Constitution) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

(৯) যুক্তরাষ্ট্র এক অখণ্ড সার্বভৌমিকতা সম্পন্ন রাষ্ট্র। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারকে মিলাইয়াই যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্ট হয় তাহাই যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির কোন সার্বভৌমিকতা নাই। কেহ কেহ বলেন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অখণ্ড হইলেও এখানে সার্বভৌমিকতার একটি বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক আইন সভাই অসার্বভৌম আইনসভা (Non Sovereign Lawmaking body)। কারণ, এখানে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক **হোয়ারেকে** অনুসরণ করিয়া বলা যায়, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বলিতে এককভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অক্ষমতাকেই বুঝানো হয়। আবার কেহ শাসনতন্ত্রকেই সার্বভৌম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণাগুণ (Merits) ঃ লর্ড ব্রাইসের মতে যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক ভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা এমন ভাবে হইয়া থাকে যাহাতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে এবং আঞ্চলিক অভাব অভিযোগের পূর্তি হয়।

(২) যুক্তরাষ্ট্র এই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও সামরিক ও অর্থবলে বলীয়ান হয় এবং স্বাধীনতাও সংরক্ষণ করে।

(৩) ইহা জাতীয় সংহতি সাধন করিবার প্রকৃষ্টতম উপায়। বিভিন্ন জাতি যখন একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এক জাতীয় সংহতি সাধিত হয়।

(৪) এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি এবং কেন্দ্রাতিগশক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইতে পারে।

(৬) আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হওয়ায় জনসাধারণ রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং আগ্রহান্বিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র থাকিবার ফলে ক্ষমতা ও অধিকার নির্দিষ্ট হয়।

(৭) এই ব্যবস্থায় শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে চালিত হয় এবং আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যও থাকে; কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাজের চাপ কম থাকে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

ত্রুটি ((Demerits) ঃ (১) এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল দুই স্তরের সরকারী ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে।

(২) ডঃ ফাইনার বলেন যে, এই ব্যবস্থায় অর্থনীতি, শিল্পবিজ্ঞান, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যাহত হয়।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আইনের বৈচিত্র্য, অধিকার ও কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে এক্তিয়ারগত সমস্যার সৃষ্টির ফলে প্রভৃত মামলা মোকদ্দমা হইয়া থাকে। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রভৃত বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা মোকদ্দমা হইয়া থাকে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া গতিশীল সমাজের সহিত ইহা সমতারক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। আবার এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে পরস্পর বিরোধী আইনও প্রণীত হইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অপরাপর সমবায় রাষ্ট্রের পার্থক্য ঃ (ক) **রাষ্ট্র সমবায় ঃ** পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইতে পারে। তবে এই পদ্ধতিগুলি অনুসারে মিলনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র যে সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া গঠিত হয় সেই সকল বৈশিষ্ট্য আলোচ্য রাষ্ট্রগুলিতে থাকে না। কতকগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয় **রাষ্ট্র সমবায়**। এখানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া একটি রাষ্ট্র সমবায় সৃষ্টি করে হলের ভাষায়, রাষ্ট্র সমবায় হইল, "বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে কতক পরিমাণে তাহাদের কার্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য বিসর্জন দিতে সম্মত হইয়াছে এরূপ কতকগুলি রাষ্ট্রের সমবায়।"* ওপেনহাইম বলেন, "রাষ্ট্র সমবায় হইতেছে পূর্ণ-

* "A Confederation is a union of States which consent to forego permanently part of their liberty for certain specific objects."

সার্বভৌম কতিপয় রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সন্ধির দ্বারা গঠিত এমন এক সংঘ যাহা সদস্যরাষ্ট্রগুলির উপর কোন দাবী করিতে পারে না।"*

নিম্নে যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হইল ঃ

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য

যুক্তরাষ্ট্র	রাষ্ট্র-সমবায়
(১) যুক্তরাষ্ট্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র।	(১) রাষ্ট্র সমবায় হইল অনেক রাষ্ট্রের সমাবেশ।
(২) ইহার ভিত্তি হইল শাসনতান্ত্রিক আইন।	(২) ইহার ভিত্তি হইল পারস্পরিক চুক্তি।
(৩) ইহাতে উভয় সরকারই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বপ্রধান।	(৩) ইহাতে সংযোগী রাষ্ট্রগুলিই প্রধান।
(৪) যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী।	(৪) রাষ্ট্র-সমবায় অস্থায়ী।
(৫) যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির বাহির হইয়া যাইবার আইনসঙ্গত অধিকার নাই।	(৫) রাষ্ট্র-সমবায়ের অঙ্গরাজ্যগুলির সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার আছে।
(৬) যুক্তরাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়।	(৬) রাষ্ট্র-সমবায়ের অঙ্গরাজ্যগুলি স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পায়।
(৭) যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত নাগরিকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে।	(৭) রাষ্ট্র-সমবায়ের কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মাধ্যমে নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারে।

(খ) **যুক্তরাষ্ট্র ও শক্তিমৈত্রী (Federation and Alliance)** ঃ আক্রমণমূলক উদ্দেশ্যে (Offensive) অথবা প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে (Defensive) অথবা শক্তির সমতা বিধানকল্পে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখনই **শক্তিমৈত্রীর** সৃষ্টি হয়। এই শক্তিমৈত্রী আবার ক্ষুদ্র আঁতাত (Little Entente) নামেও পরিচিত। এই মৈত্রীর ফলে যোগদানকারী রাষ্ট্রের

* "A Confederacy consists of a number of full sovereign states linked together for the maintenance of this external and internal independence by a recognised international treaty into a union with organs of its own, which are vested with a certain power over the member states but not over the citizens of these states —Openheim.

সার্বভৌমিকতা নষ্ট হয় না। ইহার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইতালি, জাপান ও অস্ট্রিয়া এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি শান্তিমৈত্রী চুক্তি হইয়াছিল। স্বার্থের সংঘাতের ফলে ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। পূর্ববর্ণিত রাষ্ট্রের সহিত ইহার বিশেষ সম্পর্ক নাই।

(গ) **ব্যক্তিগত ও প্রকৃত রাজ্যসংঘ** (**Personal and Real Union**) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনাকালে আরও দুইপ্রকারের শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহাদের একপ্রকার হইল **ব্যক্তিগত রাষ্ট্র-বন্ধন** (**Personal Union**) আর অপর প্রকার হইল **প্রকৃত রাষ্ট্র-বন্ধন** (**Real Union**)। ব্যক্তিগত রাষ্ট্র-বন্ধনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার, যুদ্ধ ও বিবাহ প্রভৃতির ফলে দুইটি স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা একই নৃপতির অধীনে চালু থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংল্যান্ড ও হ্যানোভার ছিল একই নৃপতির অধীনে। এই ধরনের ব্যবস্থায় দুইটি রাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত করিতে পারিত।

(ঘ) **প্রকৃত রাজ্যসংঘের** (**Real Union**) ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজস্ব সার্বভৌমিকতা বজায় রাখিয়া নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। ইহাকে রাজ্য-সমবায়ও বলা হয়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্ব স্ব রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজ্যসংঘে একটি মাত্র সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হয়। সাধারণত রাজতন্ত্রের অধীনেই রাজ্যসংঘ গঠিত হইতে পারে। ১৯১৫ সালে এক চুক্তির দ্বারা নরওয়ে সুইডেনের নৃপতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার হস্তে বৈদেশিক ব্যাপার পরিচালনাসংক্রান্ত ভার অর্পণ করিয়া এইরূপ রাজ্যসংঘ গঠন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ (**Variations of the Federal form**) ঃ ভিন্ন ক্ষমতা বণ্টনের নীতি, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতির বিভিন্নতা এবং শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। শাসন-ক্ষমতা বণ্টনের দিক হইতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি পদ্ধতিতে শাসন-ক্ষমতা বণ্টিত হয় ; যথা—(১) শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাকে অঙ্গরাজ্যগুলিকে প্রদান করার পদ্ধতি ; (২) শাসনতন্ত্র দ্বারা অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলিকে কেন্দ্রকে প্রদান করার পদ্ধতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পদ্ধতিতে এবং কানাডায় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শাসন-ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদের কারণ

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্যও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের উদাহরণ প্রাসঙ্গিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালত। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক।

সুইজারল্যাণ্ডের আদালতের শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে ক্ষমতা অতিশয় সীমাবদ্ধ। ইহা আইনসভা প্রণীত কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নেও কেন্দ্রীয় আইনের ব্যাখ্যার ক্ষমতা আদালতের নাই। উহা অর্পণ করা হইয়াছে প্রেসিডিয়ামের হস্তে।

আবার সংবিধান পরিবর্তন প্রণালীও সকল যুক্তরাষ্ট্রে এক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সম্মতি ব্যতীত সংবিধানের কোন পরিবর্তন করা যায় না। সুইজারল্যাণ্ডে গণউদ্যোগের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব আসিতে পারে। এইভাবে উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ করা যায়।

আবার **আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা** বলিয়াও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ করা হয়। অধ্যাপক হোয়ারের মতে অনেক শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি সংবদ্ধ হয় কিন্তু বাস্তবে তাহা কার্যকর হয় না। আবার এমন অনেক শাসন-ব্যবস্থা আছে যেখানে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কার্যকর হয় কিন্তু শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে হোয়ারে বলেন, যে সকল শাসনতন্ত্র ও শাসন-ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি প্রধান হইলেও যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন নহে সেগুলিকে আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় (Quasi-Federation) শাসনতন্ত্র বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদান কি ভারতে বর্তমান? (Are those conditions present in India ?) : ১৯৫৬ সালের রাজ্য-পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ১৪টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। বর্তমানে রাজ্যের সংখ্যা হইল ২২টি আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৯টি। অঙ্গরাজ্যগুলির **ভৌগোলিক ঐক্যের** উপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সাফল্য। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে এবং লাক্ষা ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জকে বাদ দিলে অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে অনেকটা ভৌগোলিক ঐক্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আবার পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদান সহজতর হওয়ায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। ভৌগোলিক ঐক্যের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সুদৃঢ় হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন **জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত এবং অর্থনৈতিক ঐক্য**। ভারতবর্ষে এই সকল বিষয়ে কোনরূপ ঐক্য নাই। কিন্তু শত শত বৎসর ধরিয়া একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করার ফলে ভারতবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালী, চিন্তাধারা এবং অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবন একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। আবার ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে এক-নাগরিকত্ব প্রবর্তন করিয়া এবং সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া শত শত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের আর একটি শর্ত হইল **জাতীয়তাবোধ**। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবোধ নাই বলিয়া মন্তব্য করা হয়। কিন্তু ইহাকে অভ্রান্ত বলা

চলে না। কারণ দিন দিনই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ব্রিটিশ আমলে বিভেদমূলক নীতি (Divide and Rule) অনুসৃত হওয়ায় জাতীয়তা বোধ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক মতভেদ দূরীকরণের জন্য আঞ্চলিক পরামর্শ সভা গঠন করিয়াছেন এবং প্রায়ই দেখা যায় রাজ্যগুলির শাসনকর্তাদের সম্মিলিত বৈঠকের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সকল ব্যবস্থার মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে জাতি-বিভেদ তিরোহিত হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য আঙ্গিক রাজ্যগুলির সমানাধিকার, পার্লামেন্টে সমান প্রতিনিধিত্ব, রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদের ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমতার একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সমতার একান্ত অভাব। মধ্য-প্রদেশ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের লোকসংখ্যা, আয়তন ও সম্পদ অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা বেশী। ফলে পার্লামেন্টে এই সকল রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যাও অনেক বেশী। এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায়, ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে আঙ্গিকরাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের অথবা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সর্বশেষে বলা যায়, নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষ যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন ভারতবাসীদের রাজনৈতিক শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয় নাই। কিন্তু স্বাধীনতা পাইবার পর এই দিক হইতে বিশেষ ভাবে প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে। নাগরিকদের শিক্ষার উপরই নির্ভর করে দায়িত্ববোধ ও কর্মপটুতা বৃদ্ধি পাওয়া-না-পাওয়া। আবার নাগরিকদের কর্মপটুত্বের উপরই নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য। ভারতবর্ষ এই দিক হইতে দিন দিনই সাফল্যলাভ করিতেছে। অতএব আশা করা যায় ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করিবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ (Future of Federalism)ঃ বর্তমানে প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড ও কানাডা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আর অপর দিকে আঙ্গিক সরকারগুলি হীনবল হইয়া পড়িতেছে। এই কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁকের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ, আর্থিক সংকট, বৃহৎশিল্প ও অধিকতর উৎপাদন, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি, আর্থিক পরিকল্পনা এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যাদির প্রসার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিতে অধিক সাহায্য করিতেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে পুনর্গঠিত করা এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়ে ভীত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের শক্তিশালী করার জন্য সমস্ত শক্তি ও অর্থকেন্দ্রে পুঞ্জীভূত করিতেছে। ব্যাপক বেকারাবস্থা, দুর্ভিক্ষ ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে জাতিকে বাঁচানোর জন্য বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি

এবং বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ।

আবার সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, ধনতন্ত্রের প্রসারে মূলধন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত ও পুঞ্জীভূত হইয়া পড়ায় প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ফলে ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িতেছে। এতদ্ব্যতীত ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ব্যাপক বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে। পুঁজিপতিরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়া এবং দেশের অভ্যন্তরে বলপ্রয়োগ ও সমাজকল্যাণকর কার্যাবলীর মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার সংকট হইতে মুক্তি পাইতে চান। কেন্দ্রীয় সরকার শক্তির সাহায্যে গণ-আন্দোলনকে দমন করিয়া পুঁজিতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে চান।

উপরোক্ত কার্যগুলি করার জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করা। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে আঙ্গিকরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে নিঃশেষ হইয়া যায়। এই কারণে অনেক লেখক যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করেন। অবশ্য হোয়ারে প্রমুখ মনে করেন যে, যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি আবার আঙ্গিকরাজ্যগুলিরও শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির কথা ধরা যাইতে পারে। এই ক্যাণ্টনগুলি তাহাদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে।

পরিশেষে বলা যায়. বর্তমান সমস্যাসংকুল সমাজে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি এই কেন্দ্রীয় শক্তি পরিচালিত হয় তবেই মঙ্গল।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের পূর্বসর্ত (Conditions of Success of Federalism)ঃ মিলকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে পারা যাইবে কিনা অথবা প্রবর্তিত হইলে উহা রক্ষা করিতে পারা যাইবে কিনা তাহা নির্ভর করে (ক) এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা জনসাধারণের আছে কিনা এবং (খ) ইহাকে কার্যকর করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের আছে কিনা, তাহার উপর। ডাইসি, হোয়ারে এবং স্ট্রং প্রমুখ এই ধারণা পোষণ করেন যে, জাতীয় ঐক্যের সহিত অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সামঞ্জস্য বিধান করার উপরই নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য। তাহা হইলে দেখা প্রয়োজন কিভাবে এই সামঞ্জস্য-বিধান করা যায়। প্রথম প্রয়োজন সম্পর্কে হোয়ারে বলেন, "তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে চাহিবে কিন্তু এককেন্দ্রিক হইতে চাহিবে না" ("They must desire to be united, but not be unitary")। জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হইতে চায় কারণ বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য, অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, আবার ভৌগোলিক সান্নিধ্য, রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রনৈতিক দৃঢ়তার জন্যও ঐক্যবদ্ধ হইতে চায়।

কিন্তু জনসমাজ তাহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের পার্থক্যের জন্য, ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য, জাতীয় সংস্কৃতি বজায় রাখিবার জন্য এবং বহুদিন ধরিয়া স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া স্বাতন্ত্র্যে অভ্যস্ত হইয়া পড়ায় তাহা বজায় রাখিবার জন্য এককেন্দ্রিক হইতে চাহে না।

পরিশেষে বলা যায়, যোগ্যতার উপরই নির্ভর করে জাতীয় সার্বভৌমত্বের সহিত অঙ্গরাজ্যগুলির সার্বভৌমত্বের সামঞ্জস্য বিধান করা। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্ব। অবশ্য ঐক্যের ইচ্ছা দৃঢ় হইলে ঐক্যবদ্ধ হইবার যোগ্যতাও জন্মগ্রহণ করে। একজাতীয়তাবোধ ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রেরণা সৃষ্টি করে। আবার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার দ্বারাই এই ঐক্যবদ্ধ হইবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যগুলি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। সর্বোপরি স্মরণ রাখিতে হইবে, আঙ্গিক-রাজ্যগুলির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার উপরই নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of Indian Federation):

(ক) **ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ**ঃ ভারত বিশালকায় দেশ, ইহার লোকসংখ্যা বিপুল। নানা বৈচিত্র্যে ভরা এই দেশ। বহু ভাষাভাষী, বহু সংস্কৃতিসম্পন্ন, বহু জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত এই দেশ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীনে থাকার দরুণ বৈদেশিক শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়, একই ধাঁচের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। আবার ভাষাগত, উদ্ভবগত, ধর্মগত পার্থক্য, ভৌগোলিক দূরত্ব, আর্থিক স্বার্থের সংঘাত, আঞ্চলিক স্বার্থ স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে।

(১) একদিকে মিলনের আকাঙ্ক্ষা (desire for union) আর অপরদিকে পৃথক থাকিবার ইচ্ছা (desire for separateness), এই দুইটি মনোভাবের সমন্বয় সাধন করিবার জনাই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার সুস্পষ্ট ইচ্ছা" আবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চাওয়ার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার রূপ কল্পনা করা যায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন (unity in diversity) হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি।* ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কাম্য, তাহার কারণ ভারতবাসী এই

(১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ

* 'Federal government is appropriate for group of states or communities if, at one and at the same time, they desire to be united under a single independent government for some purposes and to be organised under independent regional governments for others."—K. C. Wheare.

বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন ঘটাইতে চায়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য মোটেই রক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে কোন সম্প্রদায়ই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া সকলেই মিলিত হইয়া যায়। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায়ই প্রত্যেকটি সম্প্রদায় নিজেদের সরকারের মাধ্যমে নিজস্ব সত্তা ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়।

(২) বৈচিত্র্যের মধ্যেই সৌন্দর্যের বাস, স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের মধ্য দিয়াই এক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। একই ধরনের চালচলনে একঘেয়েমির সৃষ্টি করে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "কোন সম্প্রদায়কে তাহাদের নিজেদের সরকার ব্যতীত অন্য কোন সরকারের শাসনাধীনে থাকিতে বাধ্য করা আর একটি নারীকে যে পুরুষ তাহাকে ঘৃণা করে, তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা একই কথা।" এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জোরপূর্বক বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক সরকারের অধীন করিয়া রাখা হয়।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যই যখন কোন সম্প্রদায় আত্মবিকাশের দাবিতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া বাঁচিতে চায় তখন সে দাবিকে উপেক্ষা করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিটি সম্প্রদায়কে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বাঁচিতে সাহায্য করে। অবশ্য অনেকে এই কথা বলেন যে, আজ যখন অনেকে এক পৃথিবীর কথা ভাবিতেছে তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নামে বিভেদ সংরক্ষণের নীতিকে ইতিহাসের পশ্চাদগামী পদক্ষেপ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে না। স্বতন্ত্র সরকার গঠন করিলেই যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় উন্নত ও আত্ম-নির্ভরশীল হইবে এমন কথা বলা যায় না। বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এত বেশী নির্ভরশীল হয় যে, তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের বংশবদ হইয়া পড়ে। আবার এই বিভিন্ন সরকারের আত্মনির্ভরশীল হইবার মতো অর্থনৈতিক সঙ্গতি নাও থাকিতে পারে। আবার শত শত সম্প্রদায়ের নিজস্ব সরকার গঠন করিলেও সমস্যার সমাধান হইবে না; কারণ তখন হয়ত দেখা যাইবে যে, একই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে বহু জাতি এমনভাবে মিশিয়া বাস করিতেছে যে, তাহাদিগকে পৃথক করিতে বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তাই এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে শ্রেয় মনে করা হয়।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বনাম এক-কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা সমগ্র রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া দেয় না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিতেই যেখানে আছে ঐক্যের প্রয়োজন সেখানে ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে, আর যেখানে বৈচিত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন সেখানে বৈচিত্র্য রক্ষা করিতে হইবে।

ভারত এই আদর্শের ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ডাকে যখনই প্রয়োজন হইবে হইবে ঐক্যবদ্ধ হইতে

পারা যাইবে। আবার সংবিধান কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে ক্ষমতাবণ্টনের দ্বারা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখা যাইবে।

(৩) বহু ভাষাভাষী, বহু সংস্কৃতিসম্পন্ন, বহু জাতি উপজাতি অধ্যুষিত এই দেশ ভারত। একদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব আবার অপরদিকে সারা ভারতে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা, এই দুই বৈপরীত্যের মধ্যে মিলনসেতু রচনা করা সম্ভব একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে। তাই ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টাকে কার্যকর করিবার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

(৪) ভারতে সামগ্রিক উন্নতির জন্য, সামাজিক নিরাপত্তার জন্য, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রয়োজন অংগরাজ্যগুলির ঐক্যবদ্ধভাবে ও স্বেচ্ছামূলকভাবে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়িয়া তোলা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ও স্বায়ত্ত-শাসনের সুযোগ-সুবিধার জন্য এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

(৫) সর্বশেষে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন জাতীয় ঐক্য এবং রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্বের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করিয়া থাকে। বহুদিন ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিবার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতবাসী বলিয়া একটি ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের কথা কেহ ভাবে নাই। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন আজ উঠিয়াছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলনের মধ্যেই তাহা পরিষ্কার হইয়াছে। আবার ভারতের বিরাটত্বও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।* বর্তমান যুগে গণতন্ত্রকে কার্যকর করিতে হইলে বিরাটকায় দেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাই কাম্য।

(খ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্র (Character of Indian Federation): (১) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন পদ্ধতি (Formation of the Indian Federation): যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুইটি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রাচীন পদ্ধতি আর অপরটি নবীন পদ্ধতি। **প্রাচীন পদ্ধতি** অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল অঞ্চল যোগদান করিবে তাহারা স্বাধীনই থাকিবে।

(৩) প্রাচীন পদ্ধতি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যায়, কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্র যখন তাহাদের কিছুটা স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া স্বেচ্ছামূলকভাবে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠন করিবে তখনই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। কিন্তু যে সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছামূলক যোগদানের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল, সেই সকল স্বাধীন রাষ্ট্র তাহাদের সকল স্বাধীনতা বিসর্জন দিবে না।

* "the Constitution makers of independent India were in no doubt that the country, owing to the vastness of its territory and the variety of its people could not be efficiently governed as a unitary state" —C H Alexandro Wicz.

তাহারা যে-সকল অধিকার বিসর্জন দিবে না, সেই সকল অধিকারগুলির ক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবে।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। ১৭৭৭ সালে এক চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ১৩টি রাষ্ট্রের এক রাষ্ট্রসমবায় গঠিত হয়। ১৭৮১ সালে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক এই চুক্তিপত্রটি অনুমোদিত হয়।

৪) নবীন পদ্ধতি: কানাডীয় পদ্ধতি

আবার **নবীন পদ্ধতি** অনুসারে অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে চুক্তি না করিয়াও যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের স্বাধীন নয় এমন প্রদেশগুলি লইয়াও যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। আবার একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে ভাঙিয়াও যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। যেমন, ক্যানাডার প্রদেশগুলি লইয়া বিনা চুক্তিতেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। রাশিয়ার জারের রাজত্বকালীন এককেন্দ্রিক দেশটিকে ভাঙ্গিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। তাহা হইলে প্রাচীন পদ্ধতিতে অনেকগুলি রাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে একত্রিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে, আবার নবীন পদ্ধতিতে একটি বিরাট দেশকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য প্রদানের জন্য শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য ভাঙিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে।

৫) মিশ্র পদ্ধতি

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতিটি পুরাপুরি প্রাচীনও নয় আবার পুরাপুরি নবীনও নয়। প্রাচীন ও নবীন—এই দুই পদ্ধতির চরিত্রই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে কোন চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয় নাই। ফলে অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য কিছুটা বিসর্জন দিয়া এবং অবশিষ্টটা রক্ষা করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। ইহা নবীন পদ্ধতি অর্থাৎ ক্যানাডীয় পদ্ধতি অনুসারে ব্রিটিশ ভারতকে কতকগুলি "ক" শ্রেণীর আংগিক রাজ্যে পরিবর্তিত করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনে প্রাচীন পদ্ধতি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিও কিছুটা অনুসৃত হইয়াছে। যেমন ব্রিটিশশাসিত ভারত সরকারের ক্ষমতা-বহির্ভূত দেশীয় রাজ্যগুলিকে 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর আংগিক রাজ্যে পরিবর্তিত করিয়া পূর্বতন ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে এক নূতন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

(৬) ভারতীয় পদ্ধতি

১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ভারত একটি শক্তিশালী এককেন্দ্রিক ব্রিটিশশাসিত উপনিবেশ ছিল। ভারতসরকার কেন্দ্র হইতে সমগ্র দেশের শাসন পরিচালনা করিতেন। ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারত কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল বটে, কিন্তু এ-সকল প্রদেশগুলির কোন স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ছিল না। **প্রাদেশিক গভর্নরগণ** কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে যতটা ক্ষমতা পাইতেন তাঁহারা তাহাই ভোগ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ৬০০টি দেশীয় রাজ্য (Indian State) ছিল, যে রাজ্যগুলি নৃপতিবর্গ কর্তৃক

---

*"A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of state rights".—Dicey.

শাসিত হইত বটে, কিন্তু ইহাদের স্বাধীনতা ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ। কারণ ইহারা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শাসন প্রবর্তন করিতে পারিত কিন্তু বৈদেশিক ক্ষেত্রে ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীন ছিল। আবার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ব্রিটিশ রাজশক্তি দেশে শৃংখলা রক্ষার নামে প্রয়োজনবোধে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলি এবং দেশীয় রাজ্য-গুলিকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৯৩৫ সালের পূর্বে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট বিশেষ। ইহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। সুতরাং একটি প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়ায় তাহা হইল—স্বাধীন নয়, কোন স্বাতন্ত্র্যাধিকার নাই এমন প্রদেশ-গুলিকে লইয়া কি পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য ক্যানাডার অনুকরণে একই আইন দ্বারা প্রদেশগুলিকে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অংগরাজ্যে পরিণত করা হয়, আবার ঐ প্রদেশগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ একই আইন দ্বারা ভারতের সমস্ত শাসনক্ষমতা ব্রিটিশ রাজশক্তি স্বয়ং গ্রহণ করে এবং প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করিয়া সরাসরি ক্ষমতা প্রদান করে। আর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকেও স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতা প্রদান করে। ফলে প্রদেশগুলি আইন-প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী হয়। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহারা স্বেচ্ছামূলকভাবে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে এক চুক্তির মাধ্যমে (Instruments of accession) যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন কার্যকর হয় নাই। প্রথমতঃ দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বেচ্ছাধীন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের অধিকার প্রদান করিবার ফলে তাহাদিগকে আর যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করানো যায় নাই। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের একটি সুফল হইল প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি (provincial autonomy)। এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির ফলে ব্রিটিশ ভারত এক যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র গ্রহণ করে। কিন্তু ক্ষমতা বন্টনের যে নীতি অনুসৃত হয় তাহাতে দেখা যায় যে, কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) কেন্দ্রকে ব্যবহার করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য, ইচ্ছা করিলে গভর্নর জেনারেল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে (discretion) এই অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি প্রদেশগুলিকে ব্যবহার করিতে দিতে পারিতেন। আবার প্রাদেশিক গভর্নরের হাতে যে স্বেচ্ছাধীন ও নিজ বিচারবুদ্ধি মতো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাও প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রাধীনই ছিল।

সুতরাং ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে তাহা শুধু নামেই যুক্তরাষ্ট্র ; প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। তবে ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল প্রত্যেক প্রদেশের স্বাতন্ত্র্যাধিকারকে

কিছুটা কার্যকর করা হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য **যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত** গঠিত হয়।

নূতন যুক্তরাষ্ট্রের গঠন : ভারতের নূতন সংবিধান ১৯৩৫ সালের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্তমান সংবিধান গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যে পরিবর্তিত করে আর দেশীয় রাজ্যগুলিকে নানাবিধ উপায়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে রাজী করানো হয়। এখানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কোন চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নাই। ভারতীয় গণপরিষদ প্রদেশগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়াছে। অবশ্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের ব্যাপারে একটা বুঝাপড়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতি পুরাপুরি ক্যানাডীয় নয়। অর্থাৎ এককেন্দ্রিক ভারতকে ভাঙিয়া যুক্তরাষ্ট্র করা হয় নাই। দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কিছুটা মার্কিনীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির অর্থাৎ বুঝাপড়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এইখানেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবত্ব।

পূর্বে ভারতের গঠনটি এইরূপ ছিল : (১) **ব্রিটিশ ভারত** : ইহাতে ৯টি গভর্নর শাসিত প্রদেশ ছিল ; এবং ৫টি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ ছিল। আর ছিল (২) **দেশীয় রাজ্য** : ইহার সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০টি। পূর্বে এই দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত ব্রিটিশরাজের যে সম্পর্ক ছিল তাহাকে বলা হইত 'প্যারামাউন্টসি' অর্থাৎ এই দেশীয় রাজ্যগুলির বৈদেশিকব্যাপারে এবং প্রতিরক্ষাব্যাপারে কোন নিজস্ব ক্ষমতা ছিল না। এই দুই পর্যায়ে ইহারা ব্রিটিশরাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ব্রিটিশরাজ তাহাদের এই 'প্যারামাউন্টসি' তুলিয়া লয় ("As from the appointed day the suzerainty of His Majesty over the Indian States lapses..." (S7 (1) (b) of the Indian Independence Act, 1947)। ফলে এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে এমন একটি ভৌগোলিক অবস্থাবসম্মুখীন হইতে হয় এবং এমন একটি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয় যে ইহাদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করিয়া আর কোন উপায় থাকে না। ব্রিটিশরাজের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বহু দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করে। কতকগুলি দেশীয় রাজ্য পূর্বতন প্রদেশগুলির সঙ্গে মিশিয়া যায় আবার কতকগুলি দেশীয় রাজ্য একত্রিত হইয়া রাজ্য সম্মেলন (Union of States) গঠন করিল। যেমন, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি রাজ্য রাজ্য-সম্মেলন গঠন করিল। আর হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীরের মতো বৃহদায়তন বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে রহিয়া গেল। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যাহারা স্বতন্ত্র রহিয়া গেল এবং যাহাদের সম্মেলনের ফলে উদ্ভূত রাজ্য সম্মেলনগুলি গঠিত হয়, তাহাদিগকে ভারতীয় সংবিধানে 'খ' শ্রেণী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর মণিপুর, ত্রিপুরা ও হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যকে 'গ' শ্রেণীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে রাখা হয়। সুতরাং সংবিধান ভারতীয়

ইউনিয়নের রাজ্যগুলিকে 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিনটিশ্রেণীতে প্রকাশ করে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখা হয়। অবশ্য, ইহার পর ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন এবং সংবিধানের সপ্তম সংশোধন আইন দ্বারা রাজ্যগুলির গঠনে অনেক পরিবর্তন সাধিত করিয়া 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর বিলোপ করা হয়। অংগরাজ্যের সংখ্যা ১৪টি করা হয় এবং পরে বোম্বাই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় রাজ্যের সংখ্যা হয় ১৫টি; তারপর নাগাভূমিকে অংগরাজ্যের মর্যাদা দিবার ফলে অংগরাজ্যের সংখ্যা হয় ১৬টি। অবশ্য সম্প্রতিকালে পাঞ্জাব বিভক্ত হইবার ফলে হরিয়ানা নামক রাজ্যের সৃষ্টি হওয়ায় অংগরাজ্যের সংখ্যা হইল ১৭টি। ১৯৭০ সালের ২রা এপ্রিল মেঘালয় নামক আর একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৭১ সালে প্রধানমন্ত্রী হিমাচল প্রদেশকে অংগরাজ্য হিসাবে ঘোষণা করায় এবং ইহার পর ত্রিপুরা, মণিপুর এবং সিকিমকে অংগরাজ্যের মর্যাদা দিবার ফলে অংগরাজ্যের সংখা হইয়াছে ২২টি। আর কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আছে ৯টি অঞ্চল।

(২) **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি**ঃ (১) ভারতীয় সংবিধানের ১নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, ভারত একটি রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন হইবে ("India, that is Bharat, shall be a Union of States.")। সংবিধানে ইউনিয়ন শব্দটি ব্যবহার করিবার ফলে অনেকে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া আখ্যায়িত করিতে চান না। কিন্তু এই যুক্তিকে অনেকে আবার স্বীকার করেন না, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও এই ইউনিয়ন শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। এমনকি সোভিয়েত সোস্যালিস্ট ইউনিয়নেও এই 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। সংবিধানের খসড়া কমিটির (Drafting Committee) সভাপতি ডঃ আম্বেদকরের মতে **ইউনিয়ন শব্দটি** ব্যবহারের দুইটি উদ্দেশ্য আছে; যেমন, (ক) "ভারতীয় ইউনিয়ন" অংগরাজ্যগুলির মধ্যে চুক্তির ফলে যে গঠিত হয় নাই এবং (খ) কোন অংগরাজ্যের যে ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার নাই—"ইউনিয়ন" শব্দটির দ্বারা তাহাই সূচিত করিতেছে। অবশ্য, ভারতীয় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র শব্দটি ব্যবহার না করা হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি স্বীকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধানের বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ভিত্তিতেই গঠিত হইয়াছে। নিম্নে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবিধানের বিচার করা হইল ঃ

(২) অধ্যাপক হোয়ারে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বলিতে আমি মনে করি ইহা হইল ক্ষমতা বণ্টনের সেই পদ্ধতি যাহাতে সাধারণ সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি প্রত্যেকেই স্ব স্ব সীমার মধ্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।"* আবার ডাইসিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র বলিতে বুঝায় এমন এক শাসন-ব্যবস্থা যেখানে কেহ

*"By federal principle I mean the method of dividing powers so that the general and regional governments are each within a sphere coordinate and independent".—K. C. Wheare.

কাহারও অধীন নহে এবং অংগরাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা বণ্টিত হয়। আর প্রত্যেকের ক্ষমতার উৎস ও নিয়ামক হইল শাসনতন্ত্র।* এই সংজ্ঞা অনুসারে ভারতেও আঞ্চলিক ভিত্তিতে ক্ষমতাবণ্টিত হইয়াছে ; জাতীয় সরকার এবং অংগরাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হইয়াছে। সংবিধানের ২৪৫ (১) **অনুচ্ছেদে** বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় পার্লামেণ্ট সমগ্র ভারত ও ভারতের যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে। আবার অংগরাজ্যের আইনসভা অংগরাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে।** সংবিধানের ২৪৬ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট **"ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত** (Union List) বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইউনিয়ন তালিকায় ৯৭টি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর রাজ্যের আইন সভা **রাজ্যতালিকাভুক্ত** (**State list**) বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই তালিকায় বর্তমানে ৬৫টি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আবার **যুগ্মতালিকাভুক্ত** (**Concurrent list**) বিষয়ে উভয় আইন সভায়ই আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যুগ্মতালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ৪৭টি বিষয়। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনের সহিত যদি অংগরাজ্যের অসংগতি দেখা দেয় তবে অংগরাজ্যের আইন যতটা পর্যন্ত অসংগত ততটা পর্যন্ত বাতিল হইয়া যাইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ক্যানাডীয় সংবিধানে বর্ণিত যুগ্মতালিকায় মাত্র তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ক্ষমতাবণ্টনের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বলা যাইতে পারে। শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এখানে ক্ষমতা বণ্টিত হইয়াছে।

(৭) ক্ষমতা বণ্টন

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত হয় এবং সংবিধানই দেশের চরম আইন। যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। ভারতের সংবিধানের কোথাও সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইনরূপে বর্ণনা করা হয় নাই বটে, কিন্তু সংবিধানের ১৩ (১) **অনুচ্ছেদে** বলা হইয়াছে যে, সংবিধান চালু হইবার পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত আইন দেশে প্রচলিত ছিল তাহা যদি সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের বিরোধী হয় তবে যতদূর পর্যন্ত বিরোধ ততদূর পর্যন্ত উহা অকার্যকর হইবে।*** আবার সংবিধানের ১৩ (২) **অনুচ্ছেদে** বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র এমন কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না যাহার

(৮) সংবিধানের প্রাধান্য

*"Federalism means distribution of the forces of the State among a number of coordinate bodies, each originating in and controlled by the Constitutions."—Dicey.

** "Subject to the provision of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India and the legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State."—Art. 245 (1)

*** "All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency, be void."—Art 13 (1)

ফলে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত অধিকারগুলি বাতিল হইয়া যায় বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।* আবার সংবিধানের ১৩ (৩) **অনুচ্ছেদ** অনুসারে রীতি-নীতি ও প্রথাগুলিকে আইনের অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। অবশ্য, নরাশু আপ্পামা বনাম বোম্বাই রাজ্য মামলার বিচারের রায় দানকালে বিচারপতি চাগলা এই মন্তব্য করেন যে, "ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথাগুলি মৌলিক অধিকারের বিরোধী হইলে রীতিনীতি ও প্রথাগুলি বাতিল হইয়া যাইবে।" রাষ্ট্রপতি এবং অংগরাজ্যের রাজ্যপালদিগকে শপথ গ্রহণ করিতে হয়। এই শপথের সময় তাঁহাদিগকে সংবিধানের ৬০ এবং ১৫৯ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে বলিতে হয় যে, তাঁহারা সংবিধান রক্ষা করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতে সংবিধানকে অমান্য করা যায় না এবং সংবিধানের প্রাধান্য এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সংবিধানের প্রাধান্য, ভারতে ইহা স্বীকৃত হওয়ায় ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার নিয়মানুসারে যুক্তরাষ্ট্রে একটি নিরপেক্ষ যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আদালত থাকে। সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য, সংবিধানের ভাষ্য দিবার জন্য, আন্তঃঅঙ্গরাজ্যের বিবাদ মীমাংসার জন্য, কেন্দ্রীয় ও অংগ-রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদের মীমাংসার জন্য একটি **নিরপেক্ষ বিচারালয়ের** প্রয়োজন। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এইরূপ একটি নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। সংবিধানের **১৩১ অনুচ্ছেদ** অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট আন্তঃঅংগরাজ্যের মধ্যে বিবাদ মূল এলাকার মধ্যে বিচার করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও অংগরাজ্য সরকারের মধ্যে বিবাদের বিচারও এই এলাকাতেই হয়। ১৪১ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক কোন ঘোষিত আইন ভারতের সকল বিচারালয়ে প্রয়োজ্য।** ১৪৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি আইন সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করিতে পারেন। আবার বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতাও এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্য ভারতে কার্যকর হওয়ায় ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রে দুই স্তরের সরকার থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তাহা আছে। একটি হইল অংগরাজ্যের সরকার আর অপরটি হইল কেন্দ্রীয় সরকার।

(৬) আর যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার বণ্টন নির্দিষ্ট হইবার জন্য লিখিত সংবিধানের প্রয়োজন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে হইবে। ভারতীয়

---

* "The State shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."—Art. 13 (2)

** "The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory."—Art 141.

সংবিধান খুব বেশী দুষ্পরিবর্তনীয় না হইলেও যে সমস্ত অংশ দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া প্রয়োজন, সংবিধানের সেই সমস্ত অংশ দুষ্পরিবর্তনীয়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের কোন অংশের পরিবর্তন করিতে হইলে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়।

(৮) যুক্তরাষ্ট্র এক অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র, কিন্তু আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাও অখণ্ড এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকেও অস্বীকার করা হয় নাই। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়।

কেন্দ্রপ্রবণতা ঃ (ক) **আইন বিষয়ক** ঃ ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সংবিধানের ঝোক কেন্দ্রিকতার দিকেই প্রবল। অর্থাৎ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের লক্ষণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পুরাপুরি না হইলেও অনেক পরিমাণে বিদ্যমান। ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টিত হয় দুইটি পদ্ধতিতে ঃ একটি পদ্ধতি অনুসারে সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষণ করে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলিকে কতকগুলি ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত হয়। প্রথম পদ্ধতিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় অনুসৃত হইয়াছে আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ক্যানাডায় অনুসৃত হইয়াছে। অবশ্য, যুগ্মক্ষমতার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা উভয় রাষ্ট্রেই অনুসৃত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল ক্ষমতাকে একক বলা হয় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলির যুগ্মক্ষমতা (Concurrent Power) রহিয়াছে। ক্যানাডায় কৃষি ও বহির্দেশ হইতে লোক আগমন সম্পর্কিত ক্ষমতাকে যুগ্মক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই দুইটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিকে পুরাপুরি অনুসরণ করা হয়। ভারতীয় সংবিধানে তিনটি বিস্তৃত তালিকা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাহা হইল (১) ইউনিয়ন তালিকা, (২) অঙ্গরাজ্যের তালিকা এবং (৩) যুগ্মতালিকা। এই তিনটি তালিকা দ্বারা নির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হইয়াছে। আর এই তিনটি তালিকার বহির্ভূত অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের এইরূপ তিনটি তালিকার মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টিত হইয়াছিল এবং গভর্নর জেনারেল অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারকে ব্যবহার করিতে দিতে পারিতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অস্ট্রেলিয়ায় এবং সুইজারল্যান্ডে অবশিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে অঙ্গরাজ্যসমূহ। ক্যানাডায় অবশিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতীয় সংবিধানের ২৪৮(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় আইন সভার হাতেই অর্পিত হইয়াছে।

(৯) ভারতীয় সংবিধানে অভিনব ক্ষমতা বণ্টন নীতি

সুতরাং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ কম ক্ষমতা ভোগ করে। সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন

প্রণয়ন করে না, কিন্তু সংবিধানের ২৪৯(১) **অনুচ্ছেদ** অনুসারে রাজ্যসভা যদি উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যের . অংশের ভোটে এমন প্রস্তাব পাশ করে যে জাতীয় স্বার্থে পার্লামেণ্টের রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করা সমীচীন, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট ক্ষেত্র বিশেষে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হইয়াছে কিনা তাহা বিচারের ভার কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে। ভারতের রাজ্যসভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অঙ্গরাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত নয়। কয়েকটি বড় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ একত্রে সমগ্র সভার অংশ সদস্য হইলে তাহারা ভোটে আইন পাস করিয়া ছোট ছোট রাজ্যসমূহের ক্ষতি করিতে পারে আবার কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার যদি বিভিন্ন দল কর্তৃক গঠিত হয় তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রবল।

(খ) সংবিধানের ২৫০(১) **অনুচ্ছেদ** অনুসারে যখন জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকে তখন কেন্দ্রীয় আইন সভা ভারতের জন্য বা ভারতের যে কোন অংশের জন্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছে। অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ ক্ষমতা নাই।

(গ) আবার সংবিধানের ২৫২(১) **অনুচ্ছেদ** অনুসারে দুই বা ততোধিক রাজ্য যদি রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়কে কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে তবে কেন্দ্রীয় আইন সভা ঐ বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১০৩ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় আইন সভা প্রণীত আইনকে অংগরাজ্যের বিধানসভা সংশোধন অথবা প্রত্যাহার করিতে পারিত কিন্তু বর্তমান সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনকে অংগরাজ্যের আইনসভা প্রত্যাহার বা সংশোধন করিতে পারে না [২৫২(২) **অনুচ্ছেদ**]।

(ঘ) সংবিধানের ২৫৩ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে আন্তর্জাতিক চুক্তিকে কার্যকর করিবার জন্য পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ১৯৩৫ সালের সংবিধান আন্তর্জাতিক চুক্তিকে কার্যকর করিবার জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার যদিও কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করিয়াছিল কিন্তু এই আইন প্রণয়নে যদি রাজ্যতালিকায় হস্তক্ষেপ করিতে হইত বা কোন রাজ্য জড়িত হইয়া পড়িত তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গভর্নরের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত। বর্তমানে আর কেন্দ্রীয় আইন সভাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয় না।

(খ) **শাসন পরিচালনা বিষয়ে কেন্দ্রপ্রবণতা** : (১) ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। সংবিধানের ২৫৬ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে প্রত্যেক অংগ-রাজ্যের কার্যপালিকা শক্তি কেন্দ্রীয় আইন সভা প্রণীত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সংবিধানের ২৫৭(২) **অনুচ্ছেদ** অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের সহিত অংগরাজ্যের শাসনবিভাগ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে এবং

প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এই সম্পর্কে নির্দেশ দান করিতে পারে। কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুসারেই রাজ্য সরকারকে কাজ করিতে হইবে। সংবিধানের ২৫৭(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে সামরিক কারণে অথবা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং রাজ্যের রেলপথ সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিতে পারে। ৩৬৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন অঙ্গরাজ্য যদি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করে তবে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন।* কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারের **কর্মচারীদের** কর্তব্যভার অর্পণ করিতে পারে [২৫৮(২) **অনুচ্ছেদ**]। সংবিধানের ৩ ধারা অনুসারে পার্লামেণ্ট অংগরাজ্যের সীমানার পরিবর্তন, নামের পরিবর্তন এককভাবেই করিতে পারে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মতামত গ্রহণ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা বাধ্যতামূলক নয়। পার্লামেণ্ট কোন রাজ্যের অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে বা দুই বা তাহার বেশী রাজ্যকে একত্রিত করিতে পারে বা কতিপয় রাজ্যের কিছুটা অংশ লইয়া নূতন রাজ্য সৃষ্টি করিতে পারে। এই বিষয়ে রাজ্যসমূহ অতিশয় দুর্বল। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বেরুবাড়ী অঞ্চলকে আইন পাস করিয়া পাকিস্তানকে দিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল ; আসামের পাহাড়িয়া অঞ্চলকে লইয়া মেঘালয় রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

(২) সংবিধানের ১৫৫ এবং ১৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অংগরাজ্যের রাজ্যপালকে নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে রাজ্যপাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি যখন ইচ্ছা করিবেন তখনই অংগরাজ্যের রাজ্যপালকে পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিবেন অথবা পদচ্যুত করিতে পারিবেন। চাকুরীর তাঁহার এইরূপ সর্ত তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যের শাসনপরিচালনা করিতে পারেন না। এখানে তুলনীয়ভাবে বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নর অর্থাৎ রাজ্যপাল জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সুতরাং তাঁহাকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে হয় না। অস্ট্রেলিয়ায় গভর্নর মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজশক্তি কর্তৃক নিযুক্ত হন। একমাত্র ক্যানাডায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন গভর্নর বা রাজ্যপাল।

(৩) সংবিধানের ২০০ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত বিলকে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতির এই সম্মতি লওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়, তথাপি এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকেন। রাষ্ট্রপতি

*Where any state has failed to comply with, or to give effect to, any directions given in the exercise of the executive power of the union under any of the Provisions of this constitution, it shall be lawful for the President to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution.—Art. 365.

ইচ্ছা করিলে সম্মতি নাও দিতে পারেন। ফলে বিলটি বাতিল হইয়া যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে কোন আইনও প্রনয়ন করিতে পারে না।

(৪) সংবিধানের ৩৫৬ এবং ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া অংগরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারে ; এখানে তুলনীয়ভাবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র অংগরাজ্যের সরকারকে অচল করিয়া দিয়া অংগরাজ্যের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হস্তে গ্রহণ করিতে পারে না।

(৫) আবার সমগ্র ভারতের জন্য কেন্দ্র পরিচালিত একটি মাত্র নির্বাচন কমিশন এবং রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগ কমিশন (Public Service Commission), নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থা এবং ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার পার্লামেন্টের ক্ষমতা হইতে সুস্পষ্ট হয় যে, শাসন-ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠিটি কেন্দ্রের হস্তে। এই সকল বিষয়ে রাজ্যগুলির ক্ষমতা নাই।

(৬) আবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান নীতি হইল অংগরাজ্যসমূহকে সমান মর্যাদা দান। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভার উর্ধ্বতন কক্ষ ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট অংগরাজ্যগুলির স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিবার কোন সুযোগ পায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আইনসভার উর্ধ্বতন কক্ষ অর্থাৎ জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত (The Soviet of Nationalities) ছোট বড় নির্বিশেষে অংগরাজ্যের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রে দুইটি আইনসভা থাকে। একটি উর্ধ্বতন কক্ষ আর অপরটি নিম্নতন কক্ষ। উভয়কক্ষেরাজ্য গুলি হইতে সমান সখ্যক প্রনিনিধি প্রেরিত হয়। কারণ প্রত্যেক অংগরাজ্যকে সমান মর্যাদা এই সম প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে দেওযা হয়। আর নিম্নতন কক্ষ গঠিত হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে। জনসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া নিম্নতন কক্ষ গঠিত হয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। ইহার নিম্নতন কক্ষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। আর উর্ধ্বতন কক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভা (Council of States) সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয় না। জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্যকে এই কক্ষে তাঁহার ইচ্ছামতো মনোনীত করেন। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নীতি ভারতে অনুসৃত হয় নাই। ফলে বৃহদায়তন বিশিষ্ট অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধির পরিমাণ ক্ষুদ্ররাজ্য অপেক্ষা অধিক থাকায় ক্ষুদ্ররাজ্যগুলির স্বার্থ রক্ষিত হইবার কোন ব্যবস্থা ভারতে গৃহীত হয় নাই।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং নাগরিকদিগকে দ্বৈত নাগরিকতা (Duel citizenship) প্রদান করা হয়। ইহার অর্থ নাগরিকগণ একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক আবার স্ব স্ব অংগরাজ্যের নাগরিক। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ দ্বৈত নাগরিকতা প্রবর্তন করা হইয়াছে। ভারতের নাগরিকতা অখণ্ড অর্থাৎ একক। এখানে দ্বৈত নাগরিকতা স্বীকৃত হয় নাই।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১৬ এবং ৬০ (ক) ধারায় বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলির স্বতন্ত্র সংবিধান থাকিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অংগরাজ্যগুলি তাহাদের সংবিধানকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারে। ভারতে এইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই অর্থাৎ অংগরাজ্যগুলির কোন নিজস্ব সংবিধান নাই। সমগ্র ভারতের জন্য একটিমাত্র সংবিধান আছে এবং সেই সংবিধানে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পৃথক সংবিধান আছে।

(৯) সংবিধানের ১২৩* এবং ২১৩ ধারা অনুসারে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স অথবা জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের সংবিধানে এরূপক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও গভর্নরদিগকে দেওয়া হয় নাই।

(১০) ভারতীয় সংবিধান অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মতো দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। বরং ইহাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা যাইতে পারে। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণালীটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে সংবিধান প্রণালী বর্ণিত হইযাছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের সংশোধনী আইন পূর্ণ হয় অংগরাজ্যগুলির সম্মতির দ্বারা (Ratification)। আবার অংগরাজ্যগুলি যে কিভাবে সম্মতি দিবে তাহা সংবিধানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেমন (১) কংগ্রেস প্রয়োজনবোধে পৃথকভাবে প্রতিনিধিসভার এবং সেনেটের উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। আবার অংগরাজ্যগুলির ॰ অংশের বিধানসভা কংগ্রেসকে সংশোধন প্রস্তাব আলোচনার জন্য এবং সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে। এই জাতীর সম্মেলন সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। অংগরাজ্যগুলির সম্মতি প্রদানের সাধারণ নিয়ম হইল অংগরাজ্যের বিধানসভার ¾ অংশের সমর্থনলাভ। সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের ১২০ ধারা অনুসারে সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের সংশোধন করিতে হইলে ৫০,০০০ নাগরিকের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন প্রয়োজন এবং গণভোটের মাধ্যমে সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র সংশোধন প্রণালী কোন কোন ক্ষেত্রে দুষ্পরিবর্তনীর। ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত, পার্লামেণ্টে

* "If at any time, except, when both Houses of Parliament are in session. the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to require."—Article 123 (1). Constitution of India.

রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতেই সংবিধান সংশোধিত হইতে পারে ; অর্থাৎ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা। সংবিধানের উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার যে কোন কক্ষেই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে এবং উহাদের জন্য অংগরাজ্যের আইনসভার সম্মতি প্রয়োজন হয় না। এইরূপ সংশোধনী বিল পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষের ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে এবং মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিলেই উহা আইনে পরিণত হইবে। এইরূপ সংশোধনের পর্যায়ভুক্ত হয় রাজ্যগুলির পুনর্গঠন রাজ্যগুলিতে দ্বিতীয় কক্ষের প্রবর্তন, রাজ্যগুলির কোন অঞ্চল ছেদ করা ইত্যাদি। ইহা হইতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয় যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলি এত দুর্বল যে, তাহাদের সম্মতি ব্যতীতই কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের অংগচ্ছেদ করিতে পারে। অবশ্য ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন বা সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট, পার্লামেণ্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে সাধারণ প্রণালীর সংগে অংরাজ্যগুলির আইনসভার অর্ধেকের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। সুতরাং ভারতীয় সংবিধান সমগ্রভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যের সম্মতি ব্যতীত উহাদের রদবদল করা যায় না।

(১১) ভারতীয় সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টের যে ক্ষমতা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, সংবিধানের সুপরিবর্তনীয়তার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কার্যকে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছামতো নাকচ করিতে পারা যায়। যেমন, সম্পত্তির অধিকারকে বারবার আইন পরিবর্তন করিয়া সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১২) সংবিধানের ৩৫২ এবং ৩৫৬ ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা এবং ১২৩ ধারায় বর্ণিত অর্ডিনান্স জারি করিবার ক্ষমতা হইতে দেখা যায় যে, অংগরাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ৩৫৬ ধারাঅনুসারে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিবার ক্ষমতা আছে, আবার ৩৫২ ধারা অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। এই শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা অংগরাজ্যের সকল ক্ষমতা নাকচ করিয়া দিয়া নিজ হস্তে অংগরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থাকে স্থগিত রাখিতে পারেন। এখানে তুলনীয়ভাবে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়াতে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু অংগরাজ্যের সহিত কেন্দ্রের যেভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হইয়াছে তাহা নাকচ করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে জরুরী অবস্থায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

(গ) **আর্থিক বিষয়ে কেন্দ্রপ্রবণতা :** (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে অংগরাজ্যগুলি যাহাতে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিতে পারে এমন অর্থসংস্থানের সূত্র প্রদান করিতে হইবে। অর্থাৎ অংগরাজ্যকে আর্থিক ব্যাপারে খুব কমই যাহাতে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হইতে হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথায় সরকারের উপর যদি অংগরাজ্যসমূহকে নির্ভরশীল হইতে হয় তাহা হইলে অংগরাজ্যের আর কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে করধার্যের অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে অংগরাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিতে পারে। অবশ্য, অংগরাজ্যগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে কর ধার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। আবার অংগরাজ্য ও ইউনিয়নের মধ্যে আদায়ীকৃত করের ভাগাভাগি করিবার ভার কেন্দ্রের হস্তেই অর্পিত হইয়াছে। কেন্দ্র কি পরিমাণ অনুদান রাজ্যসমূহকে দিবে এবং কতকগুলি কর হইতে আদায়ীকৃত অর্থের কি পরিমাণ অংগরাজ্যগুলিকে প্রদান করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকার একটি ফিনান্স কমিশন গঠন করে। কেন্দ্রীয় সরকার তাহার ইচ্ছামতো এই কমিশন গঠন করে আবার এই কমিশনের সুপারিশও কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়।

(খ) এতদ্ব্যতীত সংবিধানের ৩৬০ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরী অবস্থা (Financial Emergency) ঘোষণা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অভিরুচি অনুসারে রাজ্যসরকারগুলিকে আর্থিক নীতি গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। সুতরাং দেখা যায় আর্থিক বিষয়ে অংগরাজ্যগুলি কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। তাই বলা হয় যে, কেন্দ্র আর্থিক বিষয়ে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত করিয়াছে।

(গ) সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১৭ ধারা অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংগরাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ অধিকার অংগরাজ্যগুলিকে প্রদান করা হয় নাই। অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের মতো ভারতকে অবিচ্ছেদ্য অথবা অভংগনীয় বলিয়াও অভিহিত করা হয় নাই। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো অংগরাজ্যগুলিকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার অধিকারও প্রদান করা হয় নাই। এখানে সংবিধানের ৩ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অংগরাজ্যগুলিকে যদৃচ্ছা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে পারে এবং ইহা করিতে অংগরাজ্যের সম্মতিরও প্রয়োজন হয় না। এই সকল কারণেই অধ্যাপক হোয়ারে প্রমুখ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পুরাপুরি যুক্তরাষ্ট্র বলিতে নারাজ। ডঃ আম্বেদকর ও অধ্যাপক হোয়ারে ভারতকে একটি আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ('quasi-federal') বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতে কেন্দ্রকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করা হইয়াছে। আর অংগরাজ্যগুলিকে দুর্বল করা হইয়াছে। তাই অনেকে বলেন ভারতে এক-

কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের ঝোঁক খুবই প্রবল। অধ্যাপক হোয়ারে ভারতের শাসন-ব্যবস্থাকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র বলিতে রাজি নন। ইহার কারণ ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিশয় শক্তিশালী। তিনি বলেন, "ভারতের শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বরং বলা যায়।"* এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা যেভাবে কেন্দ্রীভূত হয়, আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রের আইন ও নির্দেশের যেভাবে অধীন থাকে এবং কেন্দ্র যেভাবে আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, ভারতেও অনুরূপভাবে কেন্দ্র আঞ্চলিক সরকারের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে। তাই হোয়ারে প্রমুখ ভারতকে আধাযুক্তরাষ্ট্রীয় (Qusi-federal) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার কারণ ঃ (১) ভারতীয় সংবিধান মূলতঃ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া রচিত হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে ভাঙিয়া যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করিয়া রাখিবার পক্ষে ছিল। তাই ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। সেই ভারতশাসন আইনকে অনুকরণ করিবার ফলে বর্তমান সংবিধানও কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিয়াছে।

(২) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যখন গঠিত হয় তখন সারা দেশে হিন্দু ও মুসলমানগণ দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল এবং মুসলমানদিগের পাকিস্তানের দাবি স্বীকৃত হইবার পর আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য আর কোন প্রবল চাহিদা বড় একটা থাকে না। ফলে জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক দল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যাঁহারা এই সংবিধান রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেন্দ্রকেই অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছেন।

(৩) ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে যাহাতে সমগ্র দেশের জন্য পরিকল্পনা কার্যকর হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হইয়াছে।

(৪) ভারত বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান ভারতের এক পরম শত্রু দেশে পরিণত হয় এবং যে কোন সময়ে নানা অজুহাতে দাঙ্গা বাধাইতে পারে, যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে; বিশেষতঃ কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তানের সহিত ভারতের বিবাদ চলিতে থাকায়, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ রূপের কথা স্মরণে রাখিয়া, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র চীনের শক্তি, দেশজোড়া নানা সমস্যার সমাধানের জন্য এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াই শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিয়াছেন।

(৫) অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার অধিকার স্বীকৃত হয় নাই বটে, কিন্তু অঙ্গরাজ্যগুলি ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত হইবার দাবি লইয়া গৃহ-

---

* 'A unitary state with subsidiary federal features rather than federal state with unitary features.'—K. C. Wheare.

যুদ্ধ সুরু করিতে পারে এমন সম্ভাবনা ভারতে বিদ্যমান। যেমন, বর্তমানে পাঞ্জাবকে ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত করিবার দাবি লইয়া দাংগা-হাংগামা হইয়াছে, অনুরূপভাবে যে কোন সময়ে ভাষার ভিত্তিতে অংগরাজ্যগুলিতে গোলযোগের সম্ভাবনা আশংকা করিয়া সংবিধানের প্রণেতৃবর্গ কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিয়াছেন।

(৬) জনকল্যাণের জন্য এবং আণবিক যুগে জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

(৭) যুদ্ধ, যুদ্ধের ভীতি, আর্থিক সংকট, পরিবহণ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি, বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতি করিবার প্রয়োজনীয়তা, পুনর্বাসন সমস্যা এবং খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সকলপ্রকার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। কারণ দায়িত্বের বোঝা অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্রেরই বেশী।

(৮) আবার দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিবার প্রয়োজনে এবং বৈদেশিকদিগের ঔপনিবেশগুলির মধ্যে যেগুলি ভারতের মধ্যে তখনও অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, যেমন, গোয়া, দমন, দিউ এবং ফরাসী ঔপনিবেশগুলিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

(৯) ভারতকে যদি বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয় তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংগরাজ্যগুলির পক্ষে এককভাবে সেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে কেন্দ্রপ্রবণ হইয়াছে।

সর্বশেষে বলা যায়, ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হইয়াছে। তবে ইহা আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় কিন্তু প্রকৃতিতে এককেন্দ্রিক (Federal in form, unitary in spirit)।

পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

(Parliamentary and Presidential Governments)

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা (১) পার্লামেণ্টীয় সরকার এবং (২) রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার। পার্লামেণ্টীয় সরকারে তত্ত্বের দিক হইতে ব্যবস্থা-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, আর রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে তাহা থাকে না।

পার্লামেণ্টীয় বা মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত সরকার (Parliamentary or Cabinet Government) ঃ শাসনবিভাগ পরিচালনার প্রকৃত কর্তৃপক্ষ (Real Executive)

যদি আইনসভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন থাকেন তাহা হইলে তাহাকে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা বা মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। নিম্নে এই শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া গেল ঃ

পার্লামেণ্টীয় বা মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এই শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণত একটি **নামসর্বস্ব শাসক** (**Titular Head**) বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Head) থাকেন। তিনি আইনগতভাবে শাসক, কিন্তু প্রকৃত শাসনভার অর্পিত থাকে মন্ত্রিসভার উপর। তিনি এই মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই কারণে মন্ত্রিসভাকে বলা হয় প্রধান শাসকের উপদেষ্টা। কিন্তু মন্ত্রিসভার উপদেশই শাসন কর্তৃপক্ষের প্রকৃত আদেশ। শাসকপ্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আদেশকে আইনসিদ্ধ করেন মাত্র। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হইলেন এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উপযুক্ত উদাহরণ। নিয়মতান্ত্রিক শাসক রাষ্ট্রপ্রধান বটে, কিন্তু সরকারের মধ্যে প্রধান নহেন। ইহাদের সম্মান ও মর্যাদা আছে কিন্তু কর্তৃত্ব নাই। ফলে ইহাদের দায়িত্বও নাই। প্রকৃতপক্ষে, নামসর্বস্ব শাসক রাষ্ট্রের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ হিসাবে সর্বসমক্ষে উপস্থিত থাকেন। তিনি বহু আনুষ্ঠানিক কার্যও সম্পাদন করেন।

(২) এই ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, পার্লামেণ্টের নিকট মন্ত্রিসভাব যৌথভাবে (**collective**) এবং ব্যক্তিগতভাবে (**Individual**) দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্ব **আইনগত** (**Legal**) ও **রাষ্ট্রনীতিগত** (**Political**)। সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়-দায়িত্ব মন্ত্রিমণ্ডলীর। যৌথ দায়িত্বের অর্থ হইল যদি কোন একটি বিশেষ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আইনসভায় আনয়ন করা হয় এবং তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাস করানো হয় তবে সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীকেই পদত্যাগ করিতে হইবে। আর ব্যক্তিগত (Severally) দায়িত্বশীলতার তাৎপর্য হইল কোন দপ্তরের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে অনাস্থা প্রস্তাব আসিলে শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণকে কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকিতে হয়। এই সকল কারণে ইহাকে **দায়িত্বশীল সরকার** (**Responsible Government**) বলা হয়।

(৩) এই শাসন-ব্যবস্থায় সমালোচনা, সমস্বার্থ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার ফলে সাধারণতঃ দেখা যায়, একই দলের সদস্যবৃন্দ লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অবশ্য, একদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে অনেক সময় অপরাপর দলের সহিত একত্রিত হইয়াও সম্মিলিত মন্ত্রিসভা (Coalition Minister) গঠিত হয়।

(৪) এই মন্ত্রিসভার গঠন সম্পর্কে ল্যাস্কি বলেন, "ইহা হইল বিধানসভায় ক্ষমতার অধিষ্ঠিত দলের একটি কমিটি" (A committee of the party in power in the Lagislative Assembly.)। মন্ত্রিসভার সভ্যদের বিধানমণ্ডলীর

কোন-না-কোন কক্ষের সভ্য হইতে হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতাকে রাষ্ট্রপ্রধান (Head of the State) প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত হন।

(৫) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী একদিকে যেমন পার্লামেণ্টের নিকট **দায়িত্বশীল** থাকে, তেমনি আবার অপরদিকে মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেণ্টের নায়ক হিসাবে কাজ করে। কারণ, পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের যাঁহারা নেতা তাঁহারাই আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফলে, বর্তমানে মন্ত্রিসভার নায়কত্ব (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে ল্যাস্কি পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—(ক) মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রিত পার্লামেণ্ট ; যেমন, ব্রিটেন আর (খ) পার্লামেণ্ট নিয়ন্ত্রিত মন্ত্রিসভা, যেমন, ফ্রান্স।

(৬) জেনিংস, ম্যারিয়ট প্রমুখ লেখকদের মতে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য হইল **প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব** এবং **বিরোধী দলের অস্তিত্ব** ("opposition is a definite and essential part of the Constitution")।

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ ঃ (১) এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থা-বিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে যোগসূত্র থাকায় এক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসন-কার্য পরিচালিত হয়।

(২) জনসাধারণের সম্মতির ভিত্তিতেই এই শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা যায়। জনপ্রতিনিধিগণই মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন। ফলে **জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণও** বজায় থাকে।

(৩) সহজ ও সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন্ত্রিমণ্ডলীর রদ-বদল করা যায় বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা **সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা** করিয়া চলিতে সমর্থ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রয়োজনবোধে ইংল্যাণ্ডে চেম্বারলেনের বদলে চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করিয়া ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল শুধু এই শাসন-ব্যবস্থার জন্যই।

(৪) **দলীয় ব্যবস্থা** এই শাসন-ব্যবস্থার একটি অংগ বলিয়া দলীয়-ব্যবস্থাধীনে যে **রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার** প্রসার ঘটে তাহাও এই শাসন-ব্যবস্থার অপর আর একটি গুণ।

(৫) আবার এই শাসন-ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রকে বজায় রাখিয়াও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৬) ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, ইহাতে দায়িত্ব নির্ণয় করা সহজ, কারণ, মন্ত্রিগণই আইন প্রণয়ন ও শাসনের জন্য দায়িত্ববদ্ধ।

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি ঃ (১) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় যেহেতু ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয় সেইহেতু কেহ কেহ বলেন যে, এই ব্যবস্থায় স্বাধীনতা বিপদাপন্ন হয়। কিন্তু এই সমালোচনা ক্ষমতা-পৃথকী-

করণের প্রতি একটা অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ হইতে বলা যায়, ক্ষমতা-পৃথকীকরণ ব্যতীতও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে।

(২) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ জনগণের মনোহরণ করিয়া ভোট সংগ্রহে পটু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা শাসন ব্যাপারে দক্ষ হইবেন এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না।

(৩) লর্ড হিউয়ার্ট (Lord Hewart) তাহার 'নয়া স্বৈরাচার' (New Despotism) গ্রন্থে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমান দলীয় শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা এরূপ কঠোর হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রতিনিধিবর্গ দলীয় নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণ করিতে বাধ্য। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার ফলে **মন্ত্রিসভার স্বৈরাচারিতা** প্রতিষ্ঠিত হইযাছে বলা যাইতে পারে।

(৪) এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকার্যে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে। কারণ মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরদানে এত ব্যস্ত থাকেন যে, নিজ দপ্তরের কাজ করার জন্য তাঁহাদের আর বিশেষ সময় থাকে না।

(৫) পরিশেষে বলা যায়, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা **স্থিতিশীল নহে।** সুশাসনের জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত সরকারী নীতি। কিন্তু, অনবরত মন্ত্রিসভা পরিবর্তিত হওয়ায় সরকারের স্থায়িত্ব এবং সবকারী নীতির স্থায়িত্ব রক্ষিত হয় না।

উপসংহারে বলা যায়, অভিযোগ যতই তীব্র হউক, এই ব্যবস্থা আজ প্রায় সর্বদেশে স্বীকৃত হইয়াছে বলা যাইতে পাবে। ক্ষমতা-পৃথকীকরণের দিক হইতে যে সমালোচনা করা হয় তাহা বর্তমানে যথার্থ নয়। কারণ, দেখা গিয়াছে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ হইতে সহযোগিতা অনেক পরিমাণে কাম্য বলিয়া বিবেচিত। আবার গতিশীলতাই সমাজের ধর্ম। অতএব ইহাকে স্থিতিশীল বলিয়া যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন।

পার্লামেণ্টীয় সরকারের সফলতার সর্তাবলী : বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কাম্য শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতেছে। তবে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। নিম্নে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের সর্তাবলী দেওয়া গেল :

(১) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সুগঠিত বিরোধী দলের অস্তিত্বের উপর। বিরোধী দল না থাকিলে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে যেহেতু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে সেই কারণে আইনবিভাগের সহায়তায় শাসনবিভাগ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। একদলীয় ব্যবস্থায় তাই বিরোধী দল না থাকার দরুণ শাসনবিভাগ স্বৈরাচারী হইয়া উঠে ; ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, এবং শুধু দলেরই স্বার্থ সাধিত হয়।

(২) বিরোধীদলকে সুসংগঠিত হইতে হইবে। অসংগঠিত বিরোধীদল সুসংগঠিত সরকারী দলকে সমালোচনা করিয়া সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে না।

(৩) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সফলতার আর একটি সর্ত। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকারী দল এবং বিরোধীদল উভয়ই ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে। আর বহু দল থাকিলেই কোন দলই আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে না। ফলে সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়। সভ্যদের দল পরিবর্তন, সম্মিলিত সরকার গঠন প্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। তাই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায়ই পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সফলতার একটি সর্ত। এই কারণেই ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাকে সফল করিয়াছে আর ফ্রান্সের বহু দলীয় ব্যবস্থা উহার পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়াছে।

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের জনসমর্থনের পার্থক্য কম হওয়া পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের একটি সর্ত। সরকারী দলের সহিত বিরোধী দলের জনসমর্থনের পার্থক্য যদি কম থাকে তবে বিরোধী দলের সরকার গঠনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা থাকে। ফলে তাহাদের সমালোচনা সরকারী দলকে সংযত করিতে পারে কিন্তু জনসমর্থনের পার্থক্য যদি খুব বেশী হয় তবে সরকারী দল বিরোধী দলের সমালোচনায় আর ভয় করিবে না।

উপসংহারে বলা যায়, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় ত্রুটি যাহাই হউক না কেন বর্তমান দিনের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থাই কাম্য।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক শাসন-বিভাগ নিয়ন্ত্রণ (Control of the executive by Legislature): পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় এমন এক শাসন-ব্যবস্থা যাহা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবে ("Parliamentary Government does not mean Government by Parliament but Government responsible to Parliament.")। নিম্নে পার্লামেণ্ট যে সকল উপায়ে মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে তাহার উল্লেখ করা হইল:

(১) পার্লামেণ্টের ইচ্ছার উপরই মন্ত্রিপরিষদের গঠন নির্ভরশীল। পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

(২) পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদ কাহাদের লইয়া গঠিত হইবে তাহা প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে সুপারিশ করিয়া লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে মন্ত্রিপরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাশীল থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ যতদিন পার্লামেণ্টের আস্থাশীল থাকিবে ততদিনই মন্ত্রি-পরিষদ কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য, দুই সাধারণ নির্বাচনের অন্তবর্তী-কালেই এই নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু থাকিতে পারে।

(৩) পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সদস্যই শাসন সম্পর্কে প্রত্যেক মন্ত্রীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে এবং জাতির স্বার্থসম্বলিত খবরাখবর জানিতে চাহিতে পারে। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পার্লামেণ্ট মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং জনসমক্ষে মন্ত্রীদের কার্যাবলীকে তুলিয়া ধরিতে পারে।

(৪) পার্লামেণ্ট মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনা করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি বা রাণী বা রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তৃতার উপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে ক্যাবিনেটের সাধারণ নীতির উপর বিতর্ক হইতে পাবে এবং এই সময় সাধারণ নীতির সমালোচনা করা যাইতে পারে। এইভাবে তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে মন্ত্রীদের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ ধার্য করা হয়।

(৫) পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের নেতা যে কোন সময় মন্ত্রিপরিষদেব বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। এই অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিতে পারিলে মন্ত্রিপবিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। সুতবাং অনাস্থা প্রস্তাব আনযনেব ভয় দেখাইয়া সরকারকে সংযত করা যায।

(৬) পার্লামেণ্ট কোন বিষয়ে প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিপরিষকে তাহা কার্যকর করিতে বলিতে পারে। আইন পাস করিয়া মন্ত্রীদের কার্য নিরূপণ করিতে পারে। আর সভ্যদের দল পরিবর্তন বন্ধ করিতে পারে।

(৭) পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রে দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইবে। এই নীতি অনুসাবে দায়িত্বহীন নিযমতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানকে এমন এক মন্ত্রিপরিষদেব মাধ্যমে কাজ করিতে হইবে, যে মন্ত্রিপরিষদের উপর পার্লামেন্টের আস্থা থাকে। মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেন্টের আস্থা হারাইলে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ কবিতে হয়। মন্ত্রিপরিষদ তাহার কাজের জন্য যৌথভাবে তথা ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকে। মন্ত্রিমণ্ডলীই রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টা এবং কর্মকর্তা। মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য-দিগকে আইন সভার সদস্য হইতে হইবে।

(৮) মন্ত্রিপরিষদ বাজেট রচনা করেন। কিন্তু তাহা পার্লামেন্টকে দিযা পাস করাইয়া লইতে হয়। পার্লামেণ্ট বাজেট না-মঞ্জুর করিয়া বা বাজেটের অর্থ বরাদ্দ হ্রাস করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পাবে। বাজেট না-মঞ্জুর হইলে মন্ত্রি-মণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। বাজেট পাসের মাধ্যমে পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের কাজের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে।

(৯) যে কোন সমযেই পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপবিষদেব কোন একজনের বিরুদ্ধে নিন্দা-সূচক প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভাকে সংযত রাখিতে পারে।

সমালোচনা : ক্যাবিনেট কর্তৃক পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ

(Control of the Parliament by the Cabinet)

প্রথমতঃ, সমালোচকগণ বলেন পার্লামেন্টের এত ক্ষমতা নাই ; বরং মন্ত্রি-পরিষদ রাষ্ট্রের প্রধানকে দিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া পার্লামেন্টকে দিয়া যদৃচ্ছা কাজ করাইয়া লইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্টকে পরিচালনা করে মন্ত্রিপরিষদ। পার্লামেন্টের কার্য-সূচী তৈয়ারী করে মন্ত্রিপরিষদ। প্রয়োজনবোধে কার্যসূচী রদবদল করিয়া মন্ত্রিসভার অভিপ্রেত কাজের অগ্রাধিকার দিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রধান তাঁহার মন্ত্রিপরিষদকে শক্তিশালী করিবার জন্য নানাভাবে পার্লামেণ্টে নিজের লোকজনকে মনোনয়ন করিয়া তাঁহার নিযুক্ত মন্ত্রিসভাকে শক্তিশালী করিয়া লইতে পারেন।

চতুর্থতঃ, বর্তমান আইন বড় জটিল আইন। পার্লামেণ্ট দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই জটিল আইনের আলোচনা করিতে পারে না, তাই তাহাকে অন্যান্য শাসন-বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানকে আইন প্রণয়নের অধিকার অর্পণ করিতে হয়। এইপ্রসংগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে র‍্যামসে মুঁওর বলেন: কিছুটা বিপুল পরিমাণ কাজের চাপ বৃদ্ধির জন্য, কিছুটা ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, কিছুটা হিসাব প্রদানের কার্যধারার ভয়াবহ ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করিবার জন্য কমন্সসভা তাহার কার্য করিতে দিন দিনই অক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছে।

পঞ্চমতঃ, নির্বাচনের বিপুল খরচ, অধিকাংশ আসনগুলিকে একজন সভ্যের আসনে পরিণত করার এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করিবার ফলে পার্লামেণ্টে একটি মাত্র দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া পার্লামেণ্টের সভ্যগণকে দলের নেতৃত্বকে অনুসরণ করিতেই হয়। নচেৎ পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত না হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই সকল কারণে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ক্যাবিনেট বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে, যাহার ফলে পার্লামেণ্ট অনেক হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। আবার সভ্যগণের বক্তৃতা করিবার সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য, সভ্যগণের আলোচনার অধিকার খর্ব করিবার জন্য ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই দেখা যায়, ক্যাবিনেটের হুমকী এবং প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার ভয় প্রদর্শন এই দুইটি পন্থার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন কার্য শাসন-বিভাগই করিয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ, পার্লামেণ্টের সময়ের বড় অভাব। আবার জটিল সমস্যার দ্রুত মীমাংসা করিবার মতো যোগ্যতাও পার্লামেণ্টের নাই। আবার আইনকে গতিশীল করিবার জন্য এবং সময়ের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য শাসন-বিভাগের হাতে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। আবার শাসনবিভাগ জরুরী অবস্থার নামে অনেক সময় জরুরী আইন প্রণয়ন করিয়া লয়। পার্লামেণ্টের সময়ের অভাবের জন্য আইনের মৌলিক নীতিগুলি ঘোষণা করিয়া আইনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা শাসনবিভাগের হাতে অর্পণ করে। এই অর্পিত ক্ষমতা বলে শাসনবিভাগ আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে (Delegated legislation)।

সপ্তমতঃ, বর্তমান দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার ফলে দলের নির্দেশেই শাসনবিভাগকে কাজ করিতে হয়। পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে সরকারী দলের একজন বেতনভুক হুইপ থাকেন। হুইপের নির্দেশেই পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সভ্যগণকে চলিতে হয়। সভ্যগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিয়া হুইপের নির্দেশেই সভ্যগণকে কাজ করিতে হয়। পার্লামেণ্টে আলোচনা চালাইবার সময় স্থির

করা এবং কি কি বিষয়ের উপর আলোচনা হইবে তাহার সূচী নির্ধারণ করা, আর জাতীয় চরিত্রের বিলগুলি উত্থাপন করার দায়িত্ব ক্যাবিনেটের। ক্যাবিনেট এই সকল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টের সমর্থন পাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যাবিনেট সকল ব্যাপারে সর্বেসর্বা।

উপসংহারে বলা যায়, মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের নিকট ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথ-ভাবে দায়িত্ববন্ধ। তাহাদের কাজের জন্য তাহাদিগকে পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি হইতে হয়। পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিলে মন্ত্রি-পরিষদকে বিদায় লইতে হয়। পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে পারে, সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা ছাঁটাই করিতে পারে, ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। এইভাবে ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

(Presidential form of Government)

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি তাঁহার শাসন সংক্রান্ত নীতির জন্য এবং কোন কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন নহেন। এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসনবিভাগ পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে গঠিত হয়। এই ব্যবস্থা এককেন্দ্রিকও হইতে পারে আবার যুক্তরাষ্ট্রীয়ও হইতে পারে। এই শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ থাকিতেও পারে আবার নাও থাকিতে পারে। যদি মন্ত্রিপরিষদ থাকে তবে মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নহেন, মন্ত্রিগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। শাসন-বিভাগের চরম কর্তৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্রপতি নিজেই। রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এই শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুসৃত হয়।

(২) মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য নহেন। ফলে তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তাঁহারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকটই দায়ী। কাজেই মন্ত্রিসভার সদস্যকে অপসারণ করার অধিকার আইনসভার নাই।

(৩) রাষ্ট্রপতিও আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তিনি জনসাধারণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য, রাষ্ট্রপতি সংবিধান ভঙ্গ করিলে এবং কোন দুর্নীতিমূলক কার্য করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায়।

(৪) এই শাসন-ব্যবস্থায় আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। তথ্যাগতভাবে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না। তবে ভিটো (Veto) প্রয়োগ করিয়া আইন প্রণয়ন বন্ধ রাখিতে পারেন। এই শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ : (১) এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল স্থায়িত্ব। এই স্থায়িত্বের জন্য অনুসৃত নীতি ও কার্যধারার মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্নতা বিদ্যমান থাকে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও সুনাম বৃদ্ধি পায়। আবার শাসকগণকে নির্বাচকদের মনোহরণ কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় না বলিয়া শাসনকার্য শৃষ্ঠুভাবে হইতে পারে।

(২) এই ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য। রাষ্ট্রপতি অপর কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়াই ক্ষিপ্রতার সহিত জরুরী প্রয়োজনে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় তাহা সম্ভব নয়।

(৩) বহু দল ও বহু স্বার্থ যেখানে বিদ্যমান সেখানে এই শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর। কারণ, বহুদল প্রথায় পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে কিন্তু আলোচ্য ব্যবস্থায় বহু দল থাকা স্বত্বেও শাসনযন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে না।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি : (১) এই শাসন-ব্যবস্থা পূর্ণক্ষমতা-পৃথকীকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্যবস্থাবিভাগ ও শাসনবিভাগ পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে। মার্কিন শাসনযন্ত্রেব ইতিহাস আলোচনা করিলে এই ধরণের বহুসংঘর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

(২) এই শাসন-ব্যবস্থায় স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। আইনসভার প্রতি রাষ্ট্রপতির যেহেতু কোন দায়দায়িত্ব নাই অর্থাৎ বাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার যেহেতু কোন উপায় নাই সেইহেতু রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন।

(৩) ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় অন্ততঃ একটি গুণ লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইল দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা অতিশয় সহজতর। কিন্তু বাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভা কমিটিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পৃথক পৃথক ভাবে কমিটিগুলি আইন প্রণয়ন কার্যে রত থাকে। এইভাবে দায়িত্ব বিভিন্ন কমিটিগুলির মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

(৪) আবার আইন প্রণয়ন-কমিটিগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ পরিপূর্ণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করে বলিয়া সমগ্র দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না।

(৫) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় দায়িত্ব নির্ণয় করা কঠিন। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় যেহেতু মন্ত্রিপরিষদই আইন প্রণয়নকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে এবং শাসন-বিভাগেরও কর্তৃত্ব মন্ত্রীদেরই থাকে, সেইহেতু দায়িত্ব নির্ণয় করা কঠিন নয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের সহিত আইন-বিভাগের কোন সম্পর্ক থাকে না। তাই দায়িত্ব নির্ণয় করা কঠিন।

(৬) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় কমিটি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন কার্য সাধিত হইয়া থাকে, সেইজন্য জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা আঞ্চলিক স্বার্থের দিকেই

বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ কমিটিগুলি অনেক সময় আঞ্চলিক স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখে।

(৭) এই শাসন-ব্যবস্হায় বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার ব্যাখ্যার ভার বিচার-বিভাগের হাতে অর্পিত হয়। ফলে বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পার্লামেণ্টীয় সরকার বনাম রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

(১) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থা-বিভাগের সহিত শাসন-বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।	(১) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থা-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ বর্তমান থাকে।
(২) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান থাকেন।	(২) রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্হায় রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসক-প্রধান।
(৩) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্হায় পালামেণ্টই সার্বভৌম।	(৩) রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্হায় আইনসভাকে সাব চলে না।
(৪) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্হায় মন্ত্রিমণ্ডলী থাকেন। মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন।	(৪) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্হায় সাধারণতঃ কোন মন্ত্রিমণ্ডলী থাকে না এবং রাষ্ট্রপতি তাঁহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকেন না। তাঁহার দায়িত্ব জন-সাধারণের নিকট।
(৫) পার্লামেণ্ট মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্হাসূচক প্রস্তাব পাস করিলে মন্ত্রি-মণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়।	(৫) আইনসভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ইম্‌পিচমেণ্ট অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্হাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে না।
(৬) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্হায় পার্লামেণ্ট অর্থবরাদ্দের মাধ্যমে, মন্ত্রি-সভারপরিবর্তনের মাধ্যমে, মন্ত্রিমণ্ডলীর কাজের সমালোচনা করিয়া এবং মন্ত্রি-গণের কাজের তদারক করিয়া মন্ত্রি-মণ্ডলী অর্থাৎ শাসন-বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।	(৬) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্হায় আইনসভা সরাসরি রাষ্ট্রপতির উপর নিয়ন্ত্রণ ধার্য করিতে পারে না। তবে রাষ্ট্রপতির কার্যাবলীর কিয়দংশ আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ থাকে বলিয়া রাষ্ট্রপতি যদৃচ্ছা কাজ করিতে পারেন না।

পার্লামেন্টীয় সরকার বনাম রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

পার্লামেণ্টীয় সরকার	রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার
(৭) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা অস্থায়ী এবং বহুদলীয় ব্যবস্থায় ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। কারণ বহুদলীয় ব্যবস্থায় ঘন ঘন মন্ত্রিসভার রদবদল হইয়া থাকে।	(৭) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী ও নিশ্চিত হইয়া থাকে, কারণ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না।
(৮) পার্লামেণ্টই সার্বভৌম, সুতরাং দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা সহজ। মন্ত্রিপরিষদ কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকে।	(৮) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় দায়িত্ব নির্ণয় করা সহজ নয়। ক্ষমতা পৃথকীকরণ করিবার ফলে দায়িত্ব নির্ণয় করা কঠিন। ব্যবস্থা-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে বিরোধিতার ফলে কুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা দেখা দেয়।
(৯) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা সময়ের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। প্রয়োজনবোধে শাসন বিভাগের রদবদল করা চলে।	(৯) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শাসন-বিভাগের রদবদল করা সহজ নয়।

পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ কতদূর বর্তাইবে তাহারই উপর নির্ভর করে ইহার সাফল্য। এই প্রসংগে স্ট্রং বলেন যে, শাসনবিভাগকে হয় এমনভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্ববদ্ধ হইতে হইবে যে. পার্লামেণ্টের আস্থা হারাইলে শাসনবিভাগকে পার্লামেণ্ট পদচ্যুত করিতে পারে, নচেৎ, সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার মাধ্যমে ইহাকে অতিদ্রুত নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয় ("The executive is either responsible to Parliament which has the power to remove it, should it lose the confidence of that body, or it is subject to some more remote check, as for example, by means of a periodical presidential election."—Strong)। তাই বলা হয়. বর্তমানে জনগণের নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই গণতান্ত্রিক সরকারকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যায়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় ধার্য করা যত সহজ রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় ধার্য করা তত সহজ নয়।

ভারত-সরকারের প্রকৃতি—রাষ্ট্রপতি শাসিত-না-পার্লামেন্টীয়? (Nature of the Indian Government—Presidential or Parliamentary?) ঃ—ভারত-সরকারের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় ভারতের সংবিধান হইতে। ভারতে **যুক্তরাষ্ট্রীয়**

শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থা চরিত্রে **পার্লামেন্টীয়** তবে **রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার** লক্ষণও নানা জায়গায় ছড়াইয়া আছে।

"**পার্লামেন্টীয় শাসন**-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় এমন এক শাসন-ব্যবস্থা যাহা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবে।* ভারতে পার্লামেণ্টের **সদস্যদের** মধ্য হইতেই মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়। এই মন্ত্রিমণ্ডলী তাহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্ববন্ধ থাকেন। পার্লামেণ্টের অনাস্থাসূচক প্রস্তাবে মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিদায় লইতে হয়; মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে, বিতর্ক ও সমালোচনা ও নিন্দাসূচক প্রস্তাবের মাধ্যমে, সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, বাজেটের বরাদ্দ অর্থ নামঞ্জুর করিয়া পার্লামেণ্ট মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং অংগরাজ্যের আইনসভার সদস্যগণ ভারতের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অনুসারে দলীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করার যে নিয়ম এবং বিরোধীদল গঠন করার যে নিয়ম তাহা ভারতে কার্যকর হইয়াছে। ভারতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠদল হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে আর জন সংঘ, সমাজতন্ত্রীদল প্রভৃতি দল বিরোধী দল গঠন করিয়াছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে যেমন কংগ্রেস সরকার গঠন করিয়াছে তেমনি অন্যান্য দলের নেতৃত্বে পার্লামেণ্টে একটি বিরোধী দলের মোর্চা গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা পার্লামেণ্টীয়, কারণ পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে ভারতে একজন **নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান** আছেন, তিনি হইলেন **রাষ্ট্রপতি**। আবার ভারতে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন যাহারা যৌথভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ি, রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ি থাকেন না। মন্ত্রিসভার পরামর্শ মতো, যেহেতু রাষ্ট্রপতিকে কাজ করিতে হয় সেইহেতু তাঁহার নিজস্ব কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে বিদ্যমান থাকায় ভারতে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

(১) ভারত সরকার পার্লামেণ্টীয়

স্বর্গত ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতের পার্লামেণ্টকেই সার্বভৌম বলিয়া গিয়াছেন ("We have a Parliament which is Sovereign".—Nehru)। ইহা সত্য যে, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের পার্লামেণ্ট সার্বভৌম। কারণ ভারতের পার্লামেণ্ট কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নির্দেশে আইন পাস করিতে বাধ্য নহে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সীমিত হইয়াছে। পার্লামেণ্ট যদৃচ্ছা সংবিধান সংশোধন করিতে পারে না। সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারকে পার্লামেণ্ট সংশোধন করিয়া পরিবর্তন করিতে পারে না। আইন প্রণয়ন ব্যাপারে পার্লামেণ্টকে নিরংকুশ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

* "Parliamentary government does not mean Government by Parliament but government responsible to Parliament."

রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে পার্লামেণ্টকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। উহার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন। ভারতের পার্লামেণ্টকে সংবিধান নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই কাজ করিতে হয়।

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। অংগরাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ ভাগি করা হইয়াছে। কি কি বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে তাহা সংবিধান ঠিক করিয়া দিয়াছে। আবার অংগরাজ্য কি কি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে তাহাও নির্দিষ্ট হইয়াছে। তিনটি তালিকায় অংগরাজ্য ও কেন্দ্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সব বিষয়েই পার্লামেণ্ট আইন পাস করিতে পারে না। ভারতের আদালত পার্লামেণ্টের সংবিধান বহির্ভূত কাজকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

গ্রেটব্রিটেনে পার্লামেণ্ট আইনগতভাবে সার্বভৌম। একজন লেখক বলিয়াছিলেন ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট পুরুষকে নারীতে এবং নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর সবকিছুই করিতে পারে। ("Parliament can do everything but make a woman a man and a man a woman.")।

(২) ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট

ডাইসির মতে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট সব আইন পাস করিতে পারে এবং সংশোধন করিতে পারে। আদালত পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন আইনকে বাতিল করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস অসার্বভৌম আইনসভা। ইহা ভারতেরই মতো। ইহার কারণ আমেরিকার কংগ্রেস প্রণীত আইন সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করিতে পারে।

ভারতের পার্লামেণ্ট সংবিধান নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে চরম ক্ষমতার অধিকারী। তবে ৩৯তম সংবিধান সংশোধন আইন পাসের পর বলা যায় পার্লামেণ্ট যদৃচ্ছা আইন প্রণয়ন করিতে পারে, বিচার বিভাগের রায় আইন পাসের মাধ্যমে বাতিল করিতে পারে।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ঠিক রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা নয়, কারণ মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য, তাহারা আইনসভার নিকট তাহাদের কাজের জন্য দায়ি থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণতঃ মন্ত্রিসভা থাকে না, যদি বা থাকে তবে তাহারা আইনসভার সদস্য হন না এবং তাহাদের কাজের জন্য তাহারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকটই দায়ি থাকেন। তাহারা আইনসভার নিকট দায়ি থাকেন না। ভারতের রাষ্ট্রপতি আইন সভার একটি অংগ। কারণ পার্লামেণ্টে আইন পাসের পর সেই আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে পার্লামেণ্টে বক্তৃতাও করিতে পারেন। বাজেট উত্থাপনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পূর্বনির্দিষ্ট আদেশেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন না। তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতিও পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী নন।

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তত্ত্বগতভাবে

রাষ্ট্রপতিই সার্বভৌমিকতার আধার আর বাস্তবক্ষেত্রে মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতেই সকল শাসন-ক্ষমতা বর্তমান।*

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে ভারতের সংবিধানে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে তথ্যগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় রাষ্ট্রপতি একদিকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, আবার তিনি জরুরী প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্স বলিয়া খ্যাত বিশেষ আইন প্রণয়নও করিতে পারেন। তিনিই বিচারপতিদের নিয়োগ করেন এবং প্রাণদণ্ড মকুব প্রভৃতি বিচারবিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন। আবার প্রয়োজনবোধে তিনি পার্লামেণ্ট ভাঙিয়াও দিতে পারেন এবং রাজ্যবিধানসভা ও রাজ্য মন্ত্রি-মণ্ডলীকে ভাঙিয়া দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করিতে পারেন। শাসন বিভাগের মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ আইনসভার সদস্য এবং পরিচালক। জিলাশাসক একাধারে ফৌজদারী মামলার বিচার করেন এবং তিনিই আবার জিলার শাসনকর্তা। সুতরাং দেখা যায় যদিও বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু শাসনবিভাগও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকল বিভাগের উপরই ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে। আইনসভাও আইন পাসের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সুতরাং ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি এখানে প্রযুক্ত হয় নাই। তবে সংবিধানের সামগ্রিক ঝোঁক ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিরদিকে।

(৩) রাষ্ট্রপতি শাসিত

(৪ ক্ষমতা পৃথকী-করণ * কাযকর

সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতো নন। যদিও উভয়দেশের রাষ্ট্রপতিই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন তবুও ভারতের রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বাস্তব ও প্রকৃত ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রপতি। ভারতের রাষ্ট্রপতি অনেকটা ইংল্যাণ্ডের রাণীর মতো নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। মূলত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টীয় ধাঁচের শাসন-ব্যবস্থাই ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে। অবশ্য পরিষ্কারভাবে ভারতে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয় নাই, আবার পরিষ্কারভাবে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয় নাই। রাষ্ট্রপতি সংবিধান মতো কাজ করেন। দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ লইয়া রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। সংবিধানের ৭৪ এবং ৭৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবার জন্য, এবং কাজে পরামর্শ দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। এই মন্ত্রিপরিষদ তাহাদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতিকে যেহেতু সংবিধান অনুসারে কাজ করিতে হয় এবং তাহাকে দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে হয় সেইজন্য তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধানে পরিণত হইয়াছেন। উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান।

* The form of Government at the centre is the parliamentary system of Government. The president occupies the same position as the king under Kin[g] Constitution —S. Mukherjee.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যেমন আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না, ভারতের রাষ্ট্রপতিও তেমন পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে পারেন না। ভারতে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রপতির শাসন-ব্যবস্থাকে মিশাইয়া এক প্রকার অভিনব শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। একদিকে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন আবার রাষ্ট্রপতিও পার্লামেণ্টকে ভাঙিয়া দিতে পারেন। ইহা একপ্রকার ভারসাম্যের নীতির মতো। ভারতে প্রকৃতপক্ষে দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদের শাসন ব্যবস্থার সহিত স্থায়িত্বের (Stability and responsibility) জন্য রাষ্ট্রপতির মতো নিয়মতান্ত্রিক শাসকের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রের সহিত অঙ্গরাজ্যের শাসনবিষয়ক সম্পর্ক আছে। সমগ্র ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব যদিও কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের হাতে অর্পিত হইয়াছে তথাপি এই ক্ষমতা কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের শাসনবিভাগের মধ্যে বণ্টিত হওয়ায় উভয় সরকারের মধ্যে দায়িত্বও বণ্টিত হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান এমন সব ক্ষমতা দিয়াছে যাহার ফলে তিনি ইচ্ছা করিলে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা পার্লামেণ্টকে ভাঙিয়া দিয়া সংবিধানের অনেক অংশকে অকার্যকর রাখিয়া শাসন পরিচালনা করিতে পারেন। অবশ্য, এইরূপ অবস্থা ছয়মাস পর্যন্ত চলিতে পারে, ইহারপর পুনরায় পার্লামেণ্ট ডাকিতে হইবে, মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইবে। তবে রাষ্ট্রপতির এরূপ ক্ষমতা ব্যবহার করার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে। রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মতোই কাজ করিতে হয়। মন্ত্রিসভা রাখিতেই হইবে। তাই বাস্তবে ভারতে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রজাতন্ত্র ঃ প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারত (Repulic ঃ India as a Republic) ঃ রাজাবিহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার নাম প্রজাতন্ত্র। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সজোরে ঘোষিত হইয়াছে যে, আমরা ভারতবাসী, ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে গঠন করিবার পবিত্র শপথ গ্রহণ করিতেছি।* ভারত ছিল ব্রিটিশ রাজের অধীনে একটি ঔপনিবেশ। ফলে স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে ভারতে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে ভারত নিজেকে প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিল, অর্থাৎ ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় রাজার আর কোন অধিকার রহিল না। এমনকি বহু দেশীয় রাজন্যবর্গ যাহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিল তাহাদের অধীনে যে অঞ্চলগুলি ছিল সেখানেও রাজতন্ত্র লোপ পাইল। ভারতে প্রায় ৬০০ দেশীয় রাজ্য ছিল। নবাব, রাজা, মহারাজাদের দ্বারা উহা শাসিত হইত। কিন্তু তাহারা ভারতে যোগদান করার সাথে সাথে সেই দেশীয় রাজ্যগুলিতেও রাজতন্ত্র লোপ পাইল।

* "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic—Preamble to the Constitution of India.

প্রস্তাবনায় 'সার্বভৌম' শব্দটি ব্যবহার করিবার পশ্চাতে যুক্তি হইল এই যে, ভারত রাষ্ট্র যে আভ্যন্তরীণ সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আনুগত্য লাভে সমর্থ এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্ক যে স্বাধীনতার তাহাই বোঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ ভারত যে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে আপননীতি অনুযায়ী কার্য করিতে সমর্থ তাহাই প্রস্তাবনায় পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে। আবার যে 'গণতন্ত্র' শব্দটি প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার দ্বারা বোঝানো হইতেছে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণই নিয়ন্ত্রণ করিবে। এখানে একজনের কর্তৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে না। অর্থাৎ এক রাজা বা একনায়কের আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। জনগণের কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জনকল্যাণকামী সরকার মাত্রই প্রজাতান্ত্রিক সরকার। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা জনগণ কর্তৃক পরিচালিত, ইহা জনকল্যাণকামী হইতে বাধ্য। রাজতান্ত্রিক সরকারের বিপরীত যদি প্রজাতান্ত্রিক সরকার হয় তবে ভারতে যেহেতু কোন রাজা নাই, রাণী নাই সেইহেতু ভারতে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রজাতান্ত্রিক সরকার কিছু সংখ্যক লোক লইয়া গঠিত হয়, ইহা কোন এক ব্যক্তির করায়ত্ত হয় না। ভারতেও কিছু সংখ্যক লোক লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইয়াছে, রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতিও জনগণকর্তৃক নির্বাচিত হন। সরকার কোন এক ব্যক্তির করায়ত্ত নহে। আবার রাষ্ট্রপ্রধান বংশগতও নহে। জনগণ হইতেই সরকার ক্ষমতা পায়। শাসকবর্গের ক্ষমতায় থাকা জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই তাহারা নির্বাচিত হন। ফলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রজাতান্ত্রিক। ভারতে রাজতন্ত্র বা বংশগত রাষ্ট্রপ্রধানের স্থান নাই। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। অবশ্য, কেহ কেহ বলেন, 'খ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের শাসকপ্রধান সংবিধানগত ভাবে ছিলেন একজন রাজ প্রমুখ (Raj Pramuk)। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজা অথবা বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের দ্বারা নির্বাচিত কোন একজন রাজা এই পদ পাইতেন। অবশ্য, তাহাতে রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি থাকা চাই। কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠন আইন দ্বারা রাজপ্রমুখের পদ তুলিয়া দিয়া 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যে রাষ্ট্রপতি রাজ্য-শাসক হিসাবে রাজ্যপালকে নিযুক্ত করেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপালকে সদর-ই-রিয়াসৎ (Sadar-I-Riyasat) বলা হয়। রাজ্যের আইনসভার সুপারিশ-ক্রমে এবং রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতির ভিত্তিতে ইনি নিযুক্ত হন। অর্থাৎ বর্তমানে রাষ্ট্রপতিই তাহাকে নিযুক্ত করেন সুতরাং কোথাও রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। শেষ পর্যন্ত চোগিয়াল রাজতন্ত্রকেও উচ্ছেদ করিয়া সিকিমের জনগণ ভারতে যোগদান করিয়া সিকিমকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ২২তম অংগরাজ্যে পরিণত করিয়াছে।

সমালোচকগণ বলেন যে, ভারত যেহেতু কমনওয়েলথের সভারাষ্ট্র সেইহেতু ভারতকে ব্রিটিশ রাণীর নেতৃত্ব স্বীকার করিতে হয়, ফলে ভারতের সংবিধান

প্রজাতন্ত্রী নয়। কিন্তু এই বক্তব্য যুক্তি নির্ভর নয় ; কারণ, (১) ভারত যদিও কমনওয়েলথের সভ্য তথাপি ভারত ব্রিটিশ রাণীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে না। ভারতের সংবিধানে ইংল্যান্ডের রাণীর কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রপতির নামেই দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে সকল কাজ করা হয়। রাষ্ট্রপতিই নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান, বৃটিশ রাণী নন।

(২) কমনওয়েলথের সভ্যপদ স্বেচ্ছামূলক। ভারত যেকোন মুহূর্তে সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে। স্বেচ্ছামূলক বন্ধন কোন বন্ধন নয়। ইহাতে কোন আইনগত বাধা নাই। ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং কমনওয়েলথের সভ্য থাকায় ভারতের সার্বভৌমিকতা ক্ষুন্ন হয় নাই বা ভারতে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

(৩) কমনওয়েলথের সভ্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ভারতের উপর বৈদেশিক নীতির কোন চাপ সৃষ্টি করিতে পারে না। ১৯৬৭ সালে ইজরায়েলের সহিত আরবের যুদ্ধ বাধিলে ভারত ইজরায়েলকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করে আর ব্রিটিশ ইজরায়েলকে সমর্থন করে।

(৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বেচ্ছামূলক সভ্যপদের দ্বারা যদি ভারতের সার্বভৌমত্ব নষ্ট না হইয়া থাকে তবে কমনওয়েলথের সভ্য হওয়াতে ভারতের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয় নাই, বরং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত লাভবান হইয়াছে।

(৫) পূর্বে কমনওয়েলথের নাম ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ আর বর্তমানে ইহার নাম হইয়াছে কতিপয় জাতির কমনওয়েলথ (Commonwealth of Nations)। ইহার নিয়মকানুন অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন কমনওয়েলথ-এর সদস্যদের ব্রিটিশ রাণীর প্রতি আনুগত্য দেখাইতে হইত কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে ; ভারত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ রাণীর প্রতি আনুগত্য না দেখাইয়াই সদস্য থাকিতে পারিবে। বর্তমানে ইহার সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়, স্বেচ্ছাকৃত। যে কোন সময় ভারত সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে ভারত কমনওয়েলথ-এ থাকা সত্ত্বেও ইহার সার্বভৌমত্ব কোন প্রকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সারসংক্ষেপ

সরকারের বিভিন্ন রূপ: সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে স্বাভাবিকরূপ ও বিকৃতরূপের পরিপ্রেক্ষিতে স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, বণিকতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতাতন্ত্র—এই ছয় ভাগে অ্যারিস্টটল সরকার ও রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। লীকক শ্রেণীবিভাগ করেন। আধুনিক শ্রেণীবিভাগ হয় সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারকারীর সংখ্যা, আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে—রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, গণতন্ত্র ; যুক্তরাষ্ট্রীয়, এককেন্দ্রিক পার্লামেন্টীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থা রূপে আধুনিক শ্রেণী বিভাগ হয়।

আঞ্চলিক ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে প্রভেদ করা হয়।

ক্ষমতা পৃথকীকরণনীতি অনুসারে গণতান্ত্রিক সরকারকে (১) পার্লামেণ্টীয় ও (২) রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে বিভক্ত করা হয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি হইল ইহা একটি আধা যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় সরকারের প্রকৃতি হইল ইহা পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত উভয় প্রকারের মিশ্রণ বিশেষ। ভারত একটি প্রজাতন্ত্র। রাজাবিহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম প্রজাতন্ত্র।

প্রশ্নাবলী

১। তুমি কিভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবে?

(How would you classify forms of Governments?)

২। রাজতন্ত্রের দোষ ও গুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the merits and demerits of Monarchy)

৩। পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি তুমি পছন্দ কর? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

(Which of the two types of Government Parliamentary and Presidential do you prefer? Give reasons for your answer)

৪। যুক্তরাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণের বিবরণ দাও।

(Explain the chief features of Federation and point out its merits and demerits.)

৫। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ কর।

(Distinguish a Federal union from a Unitary State)

৬। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the nature of Indian Federation)

৭। ভারতের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি বর্ণনা কর।

(Discuss the nature of Indian Government.)

৮। প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারত রাষ্ট্রের বর্ণনা দাও।

(Describe India as a Republic)

অতিরিক্ত পাঠ্য

ভট্টাচার্য ভট্টাচার্য—ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

K. C. Wheare—Federal Government

Finer—Theory and Practice of Modern Government.

Garner—Political Science and Government

১১ | গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

(Dictatorship and Democracy)

(গণতন্ত্র—ইহার প্রকারভেদ—দোষগুণ—গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্তাবলী—একনায়কতন্ত্র—দোষগুণ)

[Dimocracy—its different forms—merits and demerits—conditions for the success of democracy—dictatorship—merits and defects]

আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন রূপের দ্বিতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র ও তাহার বিভিন্ন রূপ, গণতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য এবং গণতন্ত্রের বিভন্ন রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের দ্বিতীয় পর্যায়ে একনায়কতন্ত্রকে ধরা হয়। নিম্নে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

গণতন্ত্র

(Democracy)

গণতন্ত্রের ইতিহাস (History of Democracy) ঃ 'গণ' শব্দের অর্থ জনগণ আর 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ তাহাদের শাসন। অতএব গণতন্ত্র বলিতে বোঝায় জনগণের শাসন। ইংরেজী Democracy শব্দটিও 'Demos' শব্দ হইতে আসিয়াছে। Demos শব্দের অর্থ 'people' অর্থাৎ জনগণ। অতএব ব্যুৎপত্তিগতভাবে ধরিলে 'গণতন্ত্র' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয় এমন শাসন-ব্যবস্থাকে যে শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। "গণতন্ত্র" নূতন নয়। প্রাচীনকালেই ইহার জন্ম হইয়াছে। মানুষের গোষ্ঠীজীবন আরম্ভ হইলে প্রত্যেককেই শাসনক্ষেত্রে সমানাধিকার দেওয়া হইত। পরে মানুষ যখন উপজাতিতে সংঘবদ্ধ হইল তখন উপজাতীয় প্রধান ব্যক্তিদের লইয়া একটি পরিষদ গঠন করিয়া পরিষদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করিত। গোষ্ঠী জীবনে মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনের আওতায় ছিল আর উপজাতীয় স্তরে মানুষ যে পরিষদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাকে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে **উপজাতীয় গণতন্ত্র (Tribal Democracy)** পরোক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই গঠিত হইত।

পরবর্তীকালে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এই সময়ে বণিক শ্রেণী ধনবলে বলীয়ান হইয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। জনসাধারণের অধিকার নামমাত্র স্বীকৃত হয়, কার্যত বণিক শ্রেণীর নির্দেশে ও তাহাদের স্বার্থেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এই

শাসন-ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক গণতন্ত্র (Commercial Democracy) হিসাবে ধরা যাইতে পারে। সক্রেটিসের আমলে এথেন্সে আবার যে ধরণের গণতন্ত্র লক্ষ্য করা যায় তাহাতে শাসন ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই ছিল। তাই ইহাকে শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্রও (Proletarian Democracy) বলা হইয়া থাকে। এই সময়েও ক্রীতদাস শ্রেণীর কোন অধিকার ছিল না। এথেনীয় গণতন্ত্রে সকল মানুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হইল। ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হইল। সাম্যবাদ জগতে স্বীকৃত হইল। নারী পুরুষের সহিত সমান মর্যাদা ভোগ করিতে লাগিল। স্বাভাবিক আইনের প্রচার চলিতে লাগিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যাধিকার প্রবর্তনের জন্য প্রচার শুরু হইল। এইরূপ অবস্থায় গণতন্ত্র মধ্যযুগীয় ভাবধারার সীমা অতিক্রম করিয়া এক উদার দর্শনের আওতায় আসিয়া পড়িল। গণতন্ত্র আজ তাহার সংকীর্ণ এলাকা পার হইয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

গণতন্ত্র কাহাকে বলে

রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে গণতন্ত্রকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে। গণতন্ত্র বলিতে শুধু সরকারের রূপ বা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই বুঝায় না। গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সামগ্রিক সমাজ জীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ, রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র রূপ এবং শাসন-ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট রূপ। আবার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে গণতন্ত্র হইল একটি জীবনদর্শন। বর্তমানে গণতন্ত্র বলিতে একটি অর্থব্যবস্থাকেও বুঝানো হয়। তাহা হইলে গণতন্ত্র হইল একটি মহৎ আদর্শ, একটি বিশেষ সমাজ-চেতনা, একটি বিশেষ ধরণের জীবনধারণ পদ্ধতি। অবশ্য গণতন্ত্রের অর্থ যাহাই হউক সাম্যের উপরই ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য, অর্থনৈতিক-ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাম্যই গণতন্ত্রের মূল কথা।

(১) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

আবার সকল রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক মতবাদেই যুগধর্ম প্রতিফলিত হয়। প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতার যুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন যুগের সামাজিক চরিত্র গণতন্ত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ায় গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণাটি অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে গণতন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা যাহা সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক সাম্য ও রাজনৈতিক সাম্য। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থাকে বলা হয় গণতান্ত্রিক সমাজ (Democratic Society)।

গণতন্ত্রে ব্যক্তির অংশগ্রহণ অবারিত। গণতন্ত্রে কর্মনীতি শেষ পর্যন্ত সমগ্র জনতার ইচ্ছার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ শুধু শাসন-ব্যবস্থা মাত্র নহে,

সমাজের যে কোন সংগঠনেই গণতন্ত্রের নীতিকে প্রয়োগ করিলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে ; যেমন, (১) সকলের মতামতের ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালিত হইবে, (২) সংগঠনের সদস্যদের সংগঠনের কাজে অপ্রয়োজনীয় বাধা নিষেধ আরোপ করা হইবে না, সংগঠন পরিচালনার ব্যাপারে সকলের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন আছে, এই পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার সকলেরই সমান, (৩) প্রত্যেকের অধিকারকে কার্যকরী করিবার সুযোগ দিতে হইবে, (৪) কাহার মূল্য কতখানি তাহা যুক্তি দিয়া, বুদ্ধি দিয়া একে অপরকে বুঝাইয়া সমষ্টিগত শ্রেষ্ঠ মতটি বাহির করিতে হইবে, (৫) প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার থাকিবে ; কেবলমাত্র সমষ্টির সামগ্রিক স্বার্থের সর্বোত্তম রূপায়নের প্রয়োজনে শক্তিমূলক বাধা আসিবে। সেইজন্য ডেলাইল বার্ণস (C. Delisle Burns) বলেন, যে সমাজে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, যেখানে প্রত্যেকে নিজের কাজের দায়িত্ব অনুভব করে, যেখানে প্রত্যেকেই যৌথ জীবনে কিছু চিন্তা রাখিয়া যায় তাহাকেই গণতান্ত্রিক সমাজ বলা যায়। শুধু বাহুবল লইয়াই লোকে আসে না ; নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাহা অনন্য তাহারই কিছুটা দিবার ক্ষমতা প্রত্যেকের আছে বলিয়া ধরা হয় এবং প্রত্যেকে নিজে তাহা অনুভব করে ; গণতন্ত্র এক ধরণের—মানুষের সমাজ নয়, সমান মানুষের সমাজ, কারণ প্রত্যেকে সমাজের অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় অংশ।*

(২) গণতান্ত্রিক সমাজ

গণতন্ত্রের এই আদর্শগত তাৎপর্য হইতেই গণতন্ত্র শব্দটির বিভিন্ন প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিলে দাঁড়ায় **গণতান্ত্রিক সমাজ**।

(৩) গণতান্ত্রিক আদর্শ

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থা জনসম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং "সমষ্টিগত ইচ্ছার" প্রতিফলন সে রাষ্ট্রে দেখা যায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি লোকের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়। এই অধিকার স্বীকৃত হইলে রাষ্ট্রের উপর জনগণের কর্তৃত্ব বজায় থাকে। রুশো যে গণতন্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই ধরণের গণতন্ত্র। তাহার মতে সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছায় পরিচালিত যে কোন রাষ্ট্রকেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে।

(৪) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনসাধারণের হস্তে। অতএব জনগণ তাহাদের

* "A society in which reason governs the contact of men and one in which each man feels responsibility for his action is also a society in which everyman contributes some thought and feeling to the common life. No man gives only the force of his arm ; but each is, regarded as capable and each feels himself capable of adding something unique out of his own personality. Democracy as an ideal is, therefore, a society not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole" —C. Delisle Burns.

ইচ্ছানুসারে যে-কোন প্রকারের সরকার গঠন করিতে পারে। এই কারণেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত রাজতন্ত্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (ইংল্যান্ড), অভিজাততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে "জনগণের শাসন" (Rule of the people) প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার অর্থ জনগণ রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের অধিকারী হইবে। অবশ্য, বলা হয় যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু যে-কোন প্রকার সরকার গঠিত হইতে পারে সেইহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে "জনগণের দ্বারা শাসন" (Rule by the people) নাও হইতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রের অর্থকে আব্রাহাম লিংকনের ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করা হয়ঃ গণতন্ত্র হইল জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার এবং জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার ("Government of the people, by the people, and for the people.")। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আব্রাহাম লিংকনের যে সংজ্ঞা তাহা গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর গণতান্ত্রিক সরকার এক নয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ইংল্যান্ডের রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের হস্তে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, এইজন্য ঐ রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা যাইতে পারে; কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক।

(৫) গণতান্ত্রিক সরকার

আবার অনেকে সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের কথা ছাড়া শিল্প-ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের কথা (**Industrial Democracy**) বলিয়া থাকেন। ইহার অর্থ হইল শ্রমিক যেহেতু ধনোৎপাদনের মূল উৎস, সেইহেতু খনি, কারখানা প্রভৃতির মালিক হইবে শ্রমজীবি জনসাধারণ। আর উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের ভার তাহাদের উপরই ন্যস্ত করা উচিত। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সমাজে ধনী-নির্ধনের বৈষম্য তিরোহিত হইবে এবং এক **অর্থনৈতিক গণতন্ত্র** (**Economic Democracy**) **প্রতিষ্ঠিত হইবে।**

(৬) শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Democratic Government)ঃ শাসন-ব্যবস্থার রূপ হিসাবে যে গণতন্ত্র তাহাকে বলা হয় গণতান্ত্রিক সরকার (Democratic Government)। 'গণতন্ত্র' শব্দটি আজ গণতান্ত্রিক সরকারকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন সংজ্ঞার নির্দেশ দিয়াছেন। লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক সরকার হইল, সেই সরকার যেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদিগের অধিকাংশের শাসন বর্তমান; এই যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদিগের সংখ্যা আবার কমপক্ষে অধিবাসীদের তিন-চতুর্থাংশের সমান হওয়া প্রয়োজন। নাগরিকদিগের বাহুবল এবং ভোটের অধিকার মোটামুটি সমপরিমাণ হইতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন বলেনঃ গণতান্ত্রিক সরকার হইল "জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন" ("Government of the people, by the people, and for the people.")। **লিংকনের মতে**

গণতন্ত্রে জনসাধারণের সরকার (**Government of the people**) গঠিত হইবে ; **জনগণের দ্বারাই** (**By the people**) এই সরকার গঠিত হইবে এবং **জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই** (**for the people**) এই সরকার গঠিত হইবে। রুশো গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণকালে বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতায় সকলের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইবে। রুশো ও আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞানুসারে দেখা যায়, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা জনসাধারণের হস্তগত হইবে। লর্ড ব্রাইসও অনুরূপভাবে অধিবাসীদের বৃহত্তর সংখ্যা অর্থাৎ ¾ অংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা লইয়া আজ পর্যন্ত বহু তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে UNESCO-এর বিশেষজ্ঞগণ এই মত পোষণ করেন যে, জনগণের শাসনব্যবস্থা বলিতে বুঝায় সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্য। অবশ্য, সুইজি প্রমুখ লেখক সম্প্রদায় বলেন যে, গণতন্ত্রে জনগণই সরকারের উৎস এবং সরকারকে জনগণ হইতে পৃথক করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে ডাইসির মতটিই অধিক কার্যকর। বাস্তবে গণতন্ত্র হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। রাষ্ট্রকার্যে সকলেই অংশগ্রহণ করিতে পারে না। ভোটাভুটির মাধ্যমে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

অবশ্য, আজ জনসাধারণ যাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয় কিছুকাল পরে জনসাধারণ তাহাদের সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে অর্থাৎ এক নির্বাচনে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল পরবর্তী নির্বাচনে তাহারাই সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাই প্রকৃতপক্ষে জনমতের উপরই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। রুশো এই জনমতকে **সাধারণ ইচ্ছা** (**general will**) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বদাই সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপেক্ষা করিয়া শাসন পরিচালনা করিতে পারে না, কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠকে বেশী উপেক্ষা করিলে তাহারা এমন জনমত গঠন করিবে যাহাতে পরবর্তী নির্বাচনে বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে তাহা হইলেও শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় না। তাই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয়েই **সম্মতি দিয়া থাকে** (**rule based on consent**)। সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতকেও শ্রদ্ধা করিতে হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্মত হইলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন চালাইতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে আলাপ আলোচনা, বুঝাপড়ার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। বার্কার গণতন্ত্রকে "আলাপ-আলোচনার পদ্ধতিতে সরকার" ("a system of government by discussion") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার জনগণের দ্বারা যে সরকার গঠিত হয় তাহাকে ঐকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও

(১) গণতন্ত্রী সরকারের প্রকৃতি

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করে। গণতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের কাজের সমালোচনা করিয়া জনমতকে তাহার পক্ষে আনে। সংখ্যাগরিষ্ঠকে কাহারও মত উপেক্ষা না করিয়া সকলের মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হয়।

সর্বশেষে বলা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে যদি শাসন পরিচালিত হয়, যে শাসন ব্যবস্থায় সকলেই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তবেই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃত শাসন-ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে।

বর্তমান যুগ গণতান্ত্রিকতার যুগ। এই যুগের শাসকবর্গ গণদেবতাকেই পূজা করে। আবার গণদেবতাও রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থাকে সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করিতে সহায়তা করে। সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন সকল মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত করা। কিন্তু একমাত্র গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব। এই সকল সংজ্ঞা হইতে গণতন্ত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Democracy) (১) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সকলের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে (Resting on public opinion)।

(২) গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে বুঝায় যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন।

(৩) স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর নাগরিক হইবার যোগ্যতা থাকিতে পারে না।

(৪) সমগ্র অধিবাসীর অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশের যোগ্য হইতে হইবে।

(৫) রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হস্তে থাকিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাকে কার্যকর করার সুযোগ দিতে হইবে।

(৭) বার্ণস বলেন যে, গণতন্ত্রে প্রত্যেকেই সমাজের অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় অংশ। ইহা হইল সমান মানুষের সমাজ।

(৮) গণতন্ত্র শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধও নয়। শক্তি প্রয়োগ করা হইবে শুধু সামগ্রিক স্বার্থকে বজায় রাখিবার জন্য। এখানে ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় বটে, তবে তাহা সমষ্টিগত স্বার্থ ও স্বাধীনতার অঙ্গীভূত হইয়াই মূর্ত হইয়া উঠে।

গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন রূপ (Forms of Democratic Government) ঃ গণতান্ত্রিক সরকারকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ যথা, (ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ; (খ) পরোক্ষ গণতন্ত্র।

(ক) **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy)** ঃ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় নাগরিকগণের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়া শাসনকার্য পরিচালনা

করা। প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় নাগরিকগণ একত্রে মিলিত হইয়া আইন প্রণয়ন করে, আইনকে কার্যকর করে এবং আইনভঙ্গকারীর বিচার করে। এরূপ শাসন-ব্যবস্থা বর্তমানে বিরল; কারণ, বর্তমানের বৃহদায়তন রাষ্ট্রের কোটি কোটি জনসমষ্টিকে একত্র কোথাও মিলিত করিয়া আইন প্রণয়ন, প্রণীত আইনকে বলবৎকরণ এবং আইনভঙ্গকারীর বিচার করা সম্ভব নয়। অবশ্য, বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের ৫টি ক্ষুদ্রাকৃতি ক্যান্টনে (Cantons) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানীয় সরকারের পরিচালনায় এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমানে কোটি কোটি জনসমষ্টিবিশিষ্ট রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করা সম্ভব না হইলেও 'গণভোট', 'গণউদ্যোগ', ও 'পদচ্যুতির' মতো কতকগুলি ব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুফল লাভ করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সারকথা হইল প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে অর্পিত হইবে। 'গণভোট', 'গণউদ্যোগ' ও 'পদচ্যুতি'র মতো অধিকার যদি শাসনতন্ত্র দ্বারা স্বীকৃত হইয়া শাসন-ব্যবস্থাকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা যায় তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলিলে অযৌক্তিক হইবে না।

(১) মন্তব্য

অবশ্য, বর্তমানে বৃহদায়তন রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিবিধ অসুবিধার জন্য পরোক্ষ গণতন্ত্র বলিয়া পরিচিত এক প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। নিম্নে পরোক্ষ গণতন্ত্রের আলোচনা করা হইল ঃ

(খ) পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect Democracy) ঃ জন স্টুয়ার্ট মিলকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হইল এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা যেখানে, "সমগ্র জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন-ক্ষমতা ব্যবহার করে" ("It is a form of Government where..."the whole people or some numerours portion of them exercise the governing power through deputies, periodically elected by themselves.")।

মিল প্রদত্ত উপরোক্ত সংজ্ঞা এবং এই প্রসঙ্গে আরও কতিপয় সংজ্ঞার আলোচনা হইতে পরোক্ষ গণতন্ত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Indirect or Representative Democracy) ঃ (১) এই শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আইন-প্রণেতৃবর্গ ও শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। অবশ্য, শাসকমণ্ডলী যদি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত না হয় তবে তাহা-দিগকে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল হইতে হইবে।

(২) যে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকমণ্ডলী নির্বাচিত হইবে তাহা ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) নির্বাচনে স্বাধীনভাবে ভোট দিবার অধিকার স্বীকৃত হইবে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকারের উপর যথাসম্ভব কম বাধানিষেধ থাকিবে।

(৪) নির্বাচন প্রসঙ্গে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গতিবিধির স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা এবং সমালোচনা করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতির স্বীকৃতি দিতে হইবে।

(৫) আবার কেহ কেহ এই ধারণা পোষণ করেন যে, একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৬) শাসনবিভাগের কর্মকর্তাগণ হয় জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবে নচেৎ আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে শাসকবর্গকে মনোনীত করা যাইতে পারে।

অবশ্য যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল তাহা সকল প্রকার প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে দৃষ্ট হয় না ; তথাপি এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মান হিসাবে ধরা হইয়াছে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) : উদারনৈতিক গণতন্ত্র গণতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট রূপ। সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক উদার নীতি জন্মলাভ করে। ইহাই উদারনৈতিক (Liberal Democracy বা Political liberalism)। সমাজতান্ত্রিক যুগের শেষের দিকে যখন উৎপাদনের কলাকৌশল উন্নত হয়, পণ্যের বাজার প্রসারিত হয় তখন নূতন বুর্জোয়া শ্রেণী বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর নেতৃত্বে মানবিক অধিকারের দাবিতে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এই বিপ্লবের পর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক উদারনৈতিক নীতি অনুসৃত হয়। ইহাকেই রাষ্ট্রনৈতিক উদারনীতি বা উদারনৈতিক গণতন্ত্র বলা হয়। ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রসার লাভ করে। এই মতবাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাগণ হইলেন লক, বেন্হাম, মিল ও এ্যাডাম স্মিথ।

(২) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্ম

আবার উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রাষ্ট্রাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় এবং ১৭৯১ সালের ফরাসীবিপ্লবের অধিকারের ঘোষণায়। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষই সমানাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সুখসন্ধানের অধিকার আছে। ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণায় বলা হয় যে, রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, অহস্তান্তরযোগ্য অধিকারকে সংরক্ষণ করা, স্বাধীনতা,

(৩) ইংল্যাণ্ড, ফরাসী ও আমেরিকার বিপ্লবের ঘোষণায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বাণী প্রচারিত হয়

সম্পত্তি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অধিকার এই সকল অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আরও প্রচার করা হয় যে, শাসিতের সম্মতির উপরই সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এই নীতি অনুসারে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। (২) শাসিতের সম্মতিতেই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩) প্রত্যেক মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। (৪) ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করা। (৫) রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। (৬) রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। (৭) প্রত্যেকের চুক্তি করিবার অধিকার, সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার, সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার, গতিবিধির অধিকার সংরক্ষণ করা। (৮) আর উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আইনের অনুশাসন (Rule of Law) প্রচলিত থাকিবে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে না। এ্যাডাম স্মিথ বলেন যে, অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য হইতেই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি বাহির হইয়া আসিবে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলেই দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি মানুষই তার স্বাধীনতাকে খুঁজিয়া পায়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে সকল অধিকার প্রয়োজন রাষ্ট্রকে তাহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়। বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। উদারনৈতিক গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায় কিন্তু **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য** প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষপাতী নয়। ফলে সমাজতন্ত্রের সহিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Democratic Government) ঃ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলিতে বর্তমানে পরোক্ষ গণতন্ত্রকেই মনে করা হয়। এই শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, (ক) স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বে (**Doctrine of Natural Rights**), (খ) হিতবাদীদের ও (গ) ভাববাদীদের ধারণায় গণতন্ত্রের সারকথার সন্ধান পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেক মানুষই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

(৪) বিভিন্ন মতবাদে গণতন্ত্রের স্থান

গণতন্ত্র হইল এই নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার একটি উপায়। হিতবাদীরা প্রচার করিয়াছিলেন যে, সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক মঙ্গলসাধন (Greatest good of the greatest number) করাই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এই ধারণার মধ্যেও গণতন্ত্রের মৌলিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আদর্শবাদীদের ধারণায় গণতন্ত্রই এমন

পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম যেখানে মানুষ আত্মোপলব্ধি করিবার সর্বাধিক সুযোগ লাভ করে। গণতন্ত্রে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করে। নিজেরাই নিজেদের সরকার গঠন করিয়া স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

গণতন্ত্রের গুণাবলী ঃ (১) বার্কারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, গণতান্ত্রিক সরকার হইল, "আলাপ-আলোচনার পদ্ধতিতে সরকার।"* সকলের আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় সেই সরকারের দৃষ্টিতে সব কিছুই ধরা পড়ে। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুরই উন্নতি গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে হইতে পারে।

(২) মিলকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাতেই জনগণের মানসিক উন্নতি হইতে পারে। সুশাসন ছাড়াও জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাধীনে হইতে পারে।

(৩) বেন্থাম বলেন যে, সুশাসনের সমস্যা হইল শাসক ও শাসিতের স্বার্থকে এক ও অভিন্ন করিয়া তুলিয়া সর্বাধিক জনগণের সর্বাধিক মঙ্গলসাধনের সমস্যা। শাসিতকে শাসক করিয়া তুলিতে পারিলেই এই সমস্যার সমাধান করা যায়। গণতন্ত্রেই একমাত্র শাসিতকে শাসকের পদে উন্নীত করা যায়।

(৪) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে বিপ্লবের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়। সরকার যদি জনগণেরই হয় তবে জনগণ বিপ্লব বা বিদ্রোহ করিবে কাহার বিরুদ্ধে ?

(৫) ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "সরকারের উদ্দেশ্য যদি জনসাধারণের হয়, তবে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ এই উদ্দেশ্যসাধনের অপরিহার্য সর্ত।" একমাত্র গণতন্ত্রেই জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

(৬) গণতন্ত্র সকল মানুষকে সমান অধিকার দান করে; সকল মানুষকে আত্মোপলব্ধির সমান সুযোগ প্রদান করে। মানুষ গণতন্ত্রের আওতায় রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দায়িত্বশীল হইয়া উঠে।

গণতন্ত্রের ত্রুটি ঃ প্লেটোর সময় হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনাগুলিকে নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১) উইলী (M. M. Willey) বলেন যে, গণতন্ত্র হইল অজ্ঞ ও অক্ষমের শাসন। ইহাকে স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থাও বলা যায় না। ক্ষণভঙ্গুরতাই ইহার প্রকৃতি। কিন্তু এই সমালোচনা যথার্থ নহে। বহু বৎসর ধরিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(২) এমিল ফ্যাগুয়েট (Emile Faguet) গণতন্ত্রকে অকর্মণ্যতার মন্ত্র (Cult of Incompetence, বলিয়া অভিহিত করেন। লেকীকে অনুসরণ করিয়া

* "Democracy. is a system o[illegible]nment by discussion."

বলা যায়, গণতন্ত্র হইল দরিদ্রতম, সর্বাধিক অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য ব্যক্তির শাসন-ব্যবস্থা। কারণ গণতন্ত্র হইল সর্বাধিক লোকের শাসন এবং অকর্মণ্য লোকের সংখ্যাই আবার সর্বাধিক।* কিন্তু অজ্ঞকে বিজ্ঞ করার জন্যই তো গণতন্ত্র প্রয়োজন।

(৩) আরও বলা হয় যে, গণতন্ত্র যেহেতু অজ্ঞদের শাসন-ব্যবস্থা এবং এই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরা যেহেতু চরিত্রে রক্ষণশীল, সেইহেতু গণতন্ত্রও এক রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা, ফলে এই শাসন-ব্যবস্থা নিত্য নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। ইহা প্রগতির পথে এক মস্তবড়ো বাধা।

(৪) ফ্যাগুয়েট বলেন, গণতন্ত্রে নেতৃত্বের চরিত্র ক্রমে অবনত হইয়া পড়ে এবং নেতৃত্ব সামগ্রিকভাবে দুর্বল হয়। আবার বর্তমানের জটিল সরকারকে পরিচালনা করিবার জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাহা জনগণের নাই। জনগণ নিজেদের ক্ষমতাকেই নিজেদের মতামত বলিয়া মনে করে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, জনসাধারণ তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিতেও অক্ষম।

(৫) গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বলিয়া যে এক স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহা অলীক; কারণ, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন যে প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতা তাহা জনসাধারণের নাই।

(৬) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণতঃ কতকগুলি স্বার্থান্বেষী বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসমূহের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে সামাজিক চেতনাও প্রসারলাভ করিতে পারে না। আবার ইহা পুঁজিবাদকে প্রশ্রয় দেয় বলিয়াও অনেকে মন্তব্য করেন।

(৭) সর্বশেষে বলা যায়, জীববিজ্ঞানের ধারণানুসারে সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে বলিয়াই গণতন্ত্রে সভ্যতার পশ্চাৎগামী লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু জীববিজ্ঞানের এই ধারণা অভ্রান্ত নয়। কারণ জীববিজ্ঞানিগণ মানুষে মানুষে যে গুণগত পার্থক্যের কথা বলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যে গুণাবলীর কথা বলেন তাহা তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কারণ সমাজের একজন উচ্চস্তরের লোকের সন্তান যে গুণসম্পন্ন হইবেই এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অবশ্য, যদি তাহা হয় তবে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর জোরে হয় না। তাহারা অধিকতর সামাজিক সুবিধা পায় বলিয়াই অধিকতর গুণসম্পন্ন হয়।

উপসংহারে বলা যায়, আক্রমণ যতই তীব্র হউক না কেন, গণতন্ত্র আজ বিশ্বের সর্বস্বীকৃত, সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই তাহার আসন করিয়া লইয়াছে। সমালোচনা তীব্র হইবার কারণ গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতা রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে মনে করিয়াছেন সমাজ-ব্যবস্থা, কেহ কেহ ইহাকে বলিয়াছেন একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, আবার কেহ কেহ ইহাকে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

* "It is government by the poorest, the most ignorant, the most incapable who are necessarily the most numerous"—Lecky.

বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এবং বিভিন্নকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দ্বারা সমালোচনা হওয়ায় সমালোচনাগুলি অযৌক্তিক হইয়াছে। যাঁহারা ইহাকে অজ্ঞদের শাসন বলিয়াছেন তাঁহাদিগের এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, অজ্ঞদের বিজ্ঞ করার জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজন অজ্ঞদের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্তাবলী

(Safeguards of Democracy)

(ক) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শাসকমণ্ডলী একবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হইয়া গেলে, জনসাধারণের হস্তে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করার আর কোন ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু এমন কতকগুলি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে (Direct Democratic checks) যাহার মাধ্যমে পরোক্ষ গণতন্ত্রেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুফল লাভ করা যায়। এই ব্যবস্থাগুলি হইল, (১) **গণভোট (Referendum)** (২) **গণউদ্যোগ (Initiative)** এবং (৩) **পদচ্যুতি (Recall)**।

(১) **গণভোট (Referendum)**ঃ শাসনতন্ত্রে যদি উল্লিখিত থাকে যে, প্রত্যেকটি আইন পাস করিবার পূর্বে আইনের খসড়া জনসমীপে উপস্থিত করিতে হইবে এবং ভোটদাতাদের দ্বারা আইনকে পাস করাইয়া লইতে হইবে তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণই আইন পাস করিতে পারিবে। এইভাবে আইন পাস করানোর পদ্ধতিকেই বলে **বাধ্যতামূলক গণভোট (Obligatory Referendum)**। আবার শাসনতন্ত্রে যদি এইরূপ উল্লেখ থাকে যে, কতকগুলি বিষয়ে খসড়া নির্বাচক গণের আবেদন-সাপেক্ষ জনসমীপে উপস্থিত করিতে হইবে তাহা হইলে এই পদ্ধতিতে আইন পাসের নীতিকে বলা হয় **ঐচ্ছিক গণভোট (Optional বা Facultative Referendum)**।

(২) **গণউদ্যোগ (Initiative)**ঃ গণউদ্যোগ বলিতে বুঝায় নির্বাচকগণের উদ্যোগে আইন-প্রণয়ন। শাসন-তন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচকগণ আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া আইনসভাকে আইন পাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলে আইনসভা যদি উক্ত খসড়াকে নির্বাচকগণের নিকট উপস্থিত করিয়া গণভোটের মাধ্যমে উহাকে আইনে পরিণত করে তবে বুঝিতে হইবে গণউদ্যোগে আইন প্রণীত হইল।

(৩) **পদচ্যুতি (Recall)**ঃ পদচ্যুতি হইল নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই পদচ্যুত করিবার পদ্ধতি। নির্দিষ্ট-সংখ্যক নির্বাচক যদি তাহাদের প্রতিনিধির এইরূপ পদচ্যুতি দাবী করে তবে এই দাবি আইনসভা সকল নির্বাচকগণের নিকট উপস্থিত করিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচক যদি এই দাবি সমর্থন করে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি পদচ্যুত হইবে।

এই তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারা যায়।

(খ) জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন যে, গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে তিনটি সর্ত পালন করিতে হইবে। এই সর্ত তিনটি হইল: (১) গণতন্ত্রকে জনগণের গ্রহণ করিবার ইচ্ছা—ও ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন; (২) গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য জনগণকে সংগ্রাম করিবার সংকল্প গ্রহণ করিবার প্রয়োজন; এবং (৩) জনগণের পক্ষে কর্তব্যপালনে এবং অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এই তিন প্রকার গুণসম্পন্ন লোকদিগকে বার্নস "গণতান্ত্রিক জনগণ" (Democratic people) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(গ) গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের উপর। জনগণ যদি গণতান্ত্রিক হয়, জনগণ যদি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় তবেই গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইবে। জনগণকে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া তোলার জন্য প্রযোজন গণতান্ত্রিক পরিবেশ, যে পরিবেশে মানুষ তাহার ব্যক্তিসত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় একমাত্র তখনই যখন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকার ও সরক্ষণ এবং সাম্যের ভিত্তিতে এই সকল অধিকারের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ করিতে হইলে এই পরিবেশকেও সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই গণতান্ত্রিক পরিবেশের অসম্পূর্ণতার জন্যই গণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

(ঘ) আবার **অর্থনৈতিক গণতন্ত্র** (Economic Democracy) ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে 'অর্থনৈতিক মুখ্যতন্ত্র' (Economic oligarchy) বা পুঁজিবাদের আওতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্র একরূপ অলীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্যই বলা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সহিত মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং গণতন্ত্রও অলীক-ই থাকিবে। সাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই গণতন্ত্র মূর্ত হইয়া উঠে।

(ঙ) আবার গণতন্ত্র যেহেতু সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেইহেতু গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় না। শ্রেণীর অস্তিত্ব যখন স্বীকৃত হয় তখন শ্রেণী সম্বন্ধে প্রত্যেককে সচেতন হইতে হইবে। এখানে শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতনতার অর্থ **সমাজের সম্বন্ধে সচেতনতা**। এই সচেতনতাই গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি সর্ত।

(চ) সর্বশেষে বলা যায়, **সহিষ্ণুতাই** গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তখন সংখ্যালঘিষ্ঠকে সহিষ্ণুতার সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানিয়া চলিতে হইবে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে **সহযোগিতাই** গণতন্ত্রের ভিত্তি।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

(Future of Democracy)

লয়েডের ভাষায় বলা যায়, "গণতন্ত্র তাহার সভ্যদের অলসতার জন্য দিন দিনই পুরাতন হইবার বিপদের সম্মুখীন হইতেছে" ("Democracy is in danger of growing stale through the laziness of its members.")। সুতরাং গণতন্ত্রকে যদি জিয়াইয়া রাখিতে হয় তবে জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। বর্তমান সমাজ অতিশয় জটিল ও সমস্যাসংকুল। এই সমাজের বিভিন্ন সমস্য সম্বন্ধে জনসাধারণ অজ্ঞ। এই অজ্ঞতাই গণতন্ত্রের বিপদের কারণ। আবার পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় যে গণতন্ত্র চালু করা হইয়াছে তাহাও ধনতান্ত্রিক শোষণের যাঁতাকলে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এই শোষণের হস্ত হইতে জনগণকে বাঁচানোর জন্য কেহ কেহ একনায়কত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন কিন্তু তত্ত্বের দিক হইতে দেখা যায়, একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সমাধিস্থ হয়। আবার কেহ কেহ শাসনতান্ত্রিক ও বিবর্তনমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই নূতন সমাজ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতে পান। বর্তমান এই জটিল অবস্থায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়, যেখানে (১) ব্যাপক বেকারী, (২) সুষ্ঠু কর্ম-পরিবেশ ও বিশ্রামের অভাব, (৩) শিক্ষা পাইবার সুযোগের অভাব রহিয়াছে, (৪) সংখ্যালঘুর স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইবার ব্যবস্থা নাই সেখানে আর যাহা কিছু হউক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তবে 'সভ্যতার সংকট' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই আশার বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "**জনসাধারণ অসাধারণ**"। **এই অসাধারণ গণতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবেই।**

রবীন্দ্রনাথ

গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ বলা হয় যে, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীগত একনায়কত্বের অধীন ("All States in the world are in essence class dictatorship")। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে যে ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্র শাসন করে তাহা শ্রেণীগত একনায়কত্বের নামান্তর মাত্র। অবশ্য, পাশ্চিমী গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নেও গণতন্ত্র নাই। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয়, (১) সোভিয়েত ইউনিয়নে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দিয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের পথ রুদ্ধ করিয়াছে ; (২) সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য নাই। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, দল হইল একটি শ্রেণী স্বার্থের প্রতিভূ। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পপতি, জমিদার প্রভৃতি শ্রেণী বিলুপ্ত হওয়ায় সেখানে একটি মাত্র শ্রেণীর অস্তিত্বই বজায় আছে। ফলে একটিমাত্র শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে একটি মাত্র দলই সেখানে আছে। আরও বলা

হয় যে, রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তিসত্তা যখন মূর্ত হইয়া ওঠে তখন ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, আত্মোপলব্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ রাষ্ট্রের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইবে। তাই রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবে। ব্যক্তির ভোটাধিকার, ব্যক্তির জীবনের বৃদ্ধবয়সে অক্ষমতার ভাতা, বেকার ভাতা প্রভৃতি স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় তাহা সত্য নহে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি মাত্র শ্রেণীর যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। এই ধাঁচের একনায়কত্বকে **সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব** বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এবার সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তুলনা করা হইতেছে। প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব শুধু সেখানে যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য তিরোহিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক সাম্য অথবা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে রাষ্ট্র নৈতিক গণতন্ত্রের কোন অর্থ হয় না। বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থায় যে শ্রেণী ধনবলে বলীয়ান তাহারাই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে এবং তাহাদের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। ফলে অপরাপর শ্রেণীর সকল গণতান্ত্রিক অধিকার ধনবলে বলীয়ান শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা গণতন্ত্রের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাৎসী-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্য হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে এবং নেতার আজ্ঞাকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখিয়া তাহাকে মান্য করিতে হইবে, জাতিসত্তার গৌরব প্রচার এবং কুলের অহমিকা প্রচার করিতে হইবে; এবং যুদ্ধের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবিস্তারে বিশ্বাসী হইতে হইবে। ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালে ইটালীতে মুসোলিনির ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়া। ১৯২৩ সালে স্পেনে প্রাইমো ডিরিভেরা, ১৯২৩ সালে পোল্যাণ্ডে পিলসুড্স্কি এবং ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলার শাসনক্ষমতা দখল করেন এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন সময়ে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, পর্তুগাল প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে হয় রাজতন্ত্রের নামে, নয় সম্পূর্ণ নগ্নরূপে স্বৈরাচার ও একনায়কত্ব দেখা দেয়। এশিয়ায় জাপানে জাপানী একনায়কত্ব এবং দক্ষিণ আমেরিকার বহু রাষ্ট্রে অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব (Democracy and Dictatorship) : গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের মধ্যে তুলনামূলক একটি আলোচনা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

(১) এখানে যে গণতন্ত্রের কথা বলা হইতেছে তাহা পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আলোচনা এখানে করা হইতেছে না কারণ বর্তমানে উহা প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। একনায়কতন্ত্র বলিতে এখানে বুঝানো হইতেছে এমন রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে যেখানে রাষ্ট্রনায়ক মাত্র একটি দলের নেতা বা সৈন্যাধ্যক্ষ বা রাজা বা একটি শ্রেণীর নেতা বা সমাজতান্ত্রিক একনায়ক অথবা নাৎসী-ফ্যাসিস্ট একনায়ক।

(১) পরোক্ষ গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্র বিশ্বাস করে জনগণের শক্তিতে এবং গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে বুঝায় জনগণের সম্মতিতে সরকার। চিরস্থায়ী-ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতায় কেহ অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। গণতন্ত্রে সরকার জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয়। আর একনায়কতন্ত্রে সরকার জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয় না। যখন কোন সেনাধ্যক্ষ সেনানীদের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন তখন সেনাধ্যক্ষের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের ক্ষেত্রে একটিমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নায়ক হিসাবে নায়ক রাষ্ট্রে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। একনায়কতন্ত্রের মূল ভিত্তি শক্তি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবিশেষ জোর করিয়া তাহার সিদ্ধান্তকে জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেয়।

(২) গণতন্ত্র সম্মতির ভিত্তিতে সরকার আর একনায়কতন্ত্র শক্তির ভিত্তিতে সরকার

(২) গণতন্ত্রে বহুদলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। কারণ গণতন্ত্র বিরোধী মতের সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। কিন্তু একনায়কতন্ত্র বিরোধী মতের সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় একটি মাত্র দলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির বা দলের আদর্শানুসারে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

(৩) গণতন্ত্র বহুদলের আর একনায়কতন্ত্র এক দলের অস্তিত্বে বিশ্বাসী

(৩) গুচ বলেন, একনায়কতন্ত্রে আইনের অনুশাসনের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতার অনুশাসন প্রবর্তিত হয়। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য অসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায়ই শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আইনের সঙ্গে যদি তাহা সম্পর্কযুক্ত না হয় তবে তাহা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনকই হইবে। কিন্তু গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় আইনের অনুশাসন।

(৪) লর্ড অ্যাকটনের মতে "সকল ক্ষমতা ক্ষমতাধিকারীকে বিকৃত করে, চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে বিকৃত করে" ("All power corrupts and absolute power corrupts absolutely.")। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ককে তাঁহার কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। তিনি অবাধ ক্ষমতা ভোগ করেন। ফলে ক্ষমতাধিকারীকে নিশ্চিতভাবেই বিকৃত করিবে। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ক একজন থাকেন না। বিরোধীদলও থাকে সরকারী কার্যের সমালোচনা করিবার জন্য। ফলে ক্ষমতাধিকারীদের বিকৃত হইবার সম্ভাবনা কম।

(৫) একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্যকে অস্বীকার করা হয় কিন্তু গণতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্যকে স্বীকার করা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকৃত হয় বলিয়া একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সুযোগ প্রায় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু গণতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্যই হইল মানুষের আত্মোপলব্ধির সুযোগ প্রদানের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করা।

(৬) একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহার ফলে উপজাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রে জনসাধারণের উপর জোর করিয়া কিছু চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ গণতন্ত্রে জনমতের সম্মতির ভিত্তিতেই শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয় বলিয়া সরকারকে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা সহজতর হয়। জনগণের ইচ্ছার উপরই সরকারের কার্যকাল নির্ভর করে। একনায়কতন্ত্রে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ক্ষমতার জোরে জনসাধারণের উপর রাষ্ট্রনায়কের সিদ্ধান্তকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয়।

(৭) গণতন্ত্রে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না, কারণ শাসকবর্গকে তাঁহাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট কৈফিয়ত দিতে হয়। আইনসভায় বহু বিতর্কের পর আইন পাস করিতে হয়। একনায়কতন্ত্রে জনগণের নিকট কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে হয় না। আইনসভায় কোন বিষয়ের উপর বিতর্ক করিয়া কাল অতিবাহিত হয় না।

উপসংহারে বলা যায়, গণতন্ত্রে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া যে প্রচার করা হয় তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের অধিকাংশই গরীব এবং সর্বহারা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সরকারই সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র যে দাবি করে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার তাহা ঠিক নয়। কারণ যে শ্রেণী ধনবলে বলীয়ান তাহারাই সরকার গঠন করে। গণতন্ত্রেও দলীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। যে দল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে সেই দলই নায়কত্ব করে। সুতরাং গণতন্ত্রেও দলীয় নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে যে দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তাহাও শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ। আবার একনায়কত্বে যে একটি দল থাকে তাহাও শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ। উভয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়ই শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় গণতন্ত্রেও শ্রেণীগত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র

(Socialism and Democracy)

বর্তমানে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপায়িত করিতে না পারিলে গণতন্ত্র সফল হইবে না। এই কারণেই জগতের বিভিন্নদেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক সমানাধিকারের দাবিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য স্বীকৃত হয়। রুশো যে গণতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন তাহাকে সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছায় পরিচালিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যাইতে পাবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনসাধারণের হস্তে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণেব শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে (Rule of the people) অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা নিয়মতান্ত্রিক বা নির্বাচিত রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হইবে। আব্রাহাম লিঙ্কনেব সংজ্ঞায় গনতন্ত্র হইল জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার, জনগণের জন্য সরকার ("Government of the people, by the people, and for the people")। গণতন্ত্রের এইরূপ সংজ্ঞা গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা জনগণেব হস্তে অর্পিত হইবে। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিকও হইতে পাবে। ইংল্যাণ্ডে জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক।

(১) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইযাছে। বর্তমানে গণতন্ত্র শব্দটি শুধু একটি বিশেষ ধরণের শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় না অথবা রাজনৈতিক সমানাধিকারের অর্থেই শুধু ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সামগ্রিক সমাজজীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ। রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র রূপ এবং শাসন-ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট রূপ। ইহা হইল একটি বিশিষ্ট জীবন দর্শন। বর্তমানে গণতন্ত্র বলিতে একটি অর্থব্যবস্থাকেও বুঝানো হয়। গণতন্ত্র হইল একটি মহৎ আদর্শ, একটি বিশেষ সমাজ চেতনা, একটি বিশেষ ধরনের জীবন ধারণ পদ্ধতি। সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে গণতন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যাহা সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক সমানাধিকারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইহা ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের আদর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে। শুধু রাজনৈতিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যদি সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ধনবলে বলীয়ান

(২) গণতন্ত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা

শ্রেণী ধনবলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ; নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে তাহাকে ব্যবহার করে।

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রে স্বীকৃত হয় এবং নির্বাচনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিককেই দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সমাজে যদি ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর লোকের বাস করিবার সুযোগ থাকে তাহা হইলে নির্বাচন ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বভাবতই ধনিকশ্রেণী দরিদ্রের অভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং যে সরকার গঠন করিবে সেই সরকার ধনিক শ্রেণীরই সরকার হইবে ; তাই গণতন্ত্রের যে মুখ্য উদ্দেশ্য, জনগণের জন্য সরকার গঠন করা, তাহা মিথ্যায় পর্যবসিত হইবে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকারের আদর্শকে কার্যকর করিতে পারে না। ইহার কারণ, ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই রাজনৈতিক সমানাধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে অর্থনৈতিক সমানাধিকার অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে। ল্যাস্কি বলেন ঃ অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র ভিত্তিহীন ("Political democracy is meaningless without economic democracy"—*Laski*)। প্রকৃত গণতন্ত্রের অর্থ হইল সাম্য। এই কারণে কেহ কেহ এই মন্তব্য করেন যে, গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রেই একমাত্র অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক সাম্য এবং রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রকৃত গণতন্ত্রও সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

(৩) রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা। ধনী ও নির্ধন এই দুই শ্রেণীতে সমাজ যদি বিভক্ত হয় তাহা হইলে সমাজে ধনিক শ্রেণী সর্বদাই কর্তৃত্ব করিবে। গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে। সমাজতন্ত্রীরাও মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিতে চায়। কিন্তু অসাম্যের সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সকলে সমান ভাবে পাইবে না। শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে বিশ্বাস করা হয় যে, সকলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইলে খাঁটি জিনিসটি বাহির হইয়া আসিবে (Survival of the fittest)। কিন্তু ধনী ও নির্ধনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইলে সে প্রতিযোগিতায় আর খাঁটি জিনিসটি বাহির হইযা আসিবে না। কারণ এই প্রতিযোগিতায় স্বভাবতঃই দরিদ্র সম্প্রদায় পরাজিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।

(৪) সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র

ল্যাস্কি তাই বলিয়াছেন, প্রত্যেককে সুযোগের সমতা প্রদান করিতে হইবে অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হইলে প্রত্যেককেই সমান সুযোগ প্রদান করিয়া তারপর প্রতিযোগিতা আহবান করিতে হইবে ; নচেৎ

অসাম্যের সমাজে প্রতিযোগিতা সার্থক হয় না। ইহার ফল অতিশয় ভয়ংকর হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রয়োজন সমাজে অসাম্য দূর করা ; যে অসাম্যের কারণে গণতন্ত্র নিষ্ফল হয়, তাহা দূর না করিলে জনগণের সরকার মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। সমাজতন্ত্রও চায় অর্থনৈতিক বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা। সুতরাং উভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই।

(৫) গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে কোন প্রকৃত পার্থক্য নাই

গণতন্ত্রে যে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে ধনোৎপাদনের উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ব্যবস্থায় ধনোৎপাদনের উপায়গুলির মালিকগণ শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থায় পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে। ফলে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর হয় না। সমাজতন্ত্রে ধনোৎপাদনের উৎস এবং উপাদানগুলির মালিক কোন ব্যক্তি বিশেষ হয় না, উহার মালিকানা সমাজ ও রাষ্ট্রের। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থায় পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীস্বার্থের বিকাশ ঘটে এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়াস চলে। রাষ্ট্র শিল্প, কারখানা, ট্রাম, বাস, রেডিও, ট্রেন, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রভৃতির মালিক হয়। মানুষ আর বেকার থাকে না। জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়িত হয়। তাই বিশ্বাস করা হয় যে, গণতন্ত্রকে বাস্তব করিতে হইলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রও চায় সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার। গণতন্ত্র গণদেবতারই পূজা করে। এই গণদেবতাকে বেকারী হইতে মুক্তি দিতে হইবে, সভ্য ও সুস্থজীবন যাপনের উপযোগী বেতন দিতে হইবে, বার্ধক্যে ও বিপর্যয়ে ভাতা দিতে হইবে, শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। তবেই গণদেবতা তুষ্ট হইবে। কিন্তু ইহা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র ছাড়া শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। তাই বলা হয় সমাজতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে না ; ইহা বরং গণতন্ত্রকে পূর্ণ করিবার প্রস্তাব দিয়া থাকে ("Socialism proposes to complete rather than oppose liberal democratic creed:")। আবার কেহ কেহ বলেন সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র পূর্ণ হয় না ("Democracy is not complete without Socialism.")।

(৬) সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রকে পূর্ণ করে, গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে না

উপসংহারে বলা যায়, সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসর্বস্ব নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বড় একটা স্বীকার করা হয় না। সমাজতন্ত্র সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাই বলা হয় রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে সমাজতন্ত্রে নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রের নামে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা এক শাসন-ব্যবস্থাপ্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের এক বিশেষ অবস্থায়

যেমন ধনতন্ত্রের বিকাশ হয় সেইরূপ সমাজতন্ত্রের এক পর্যায়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের যে সকল গুণগুলি আছে তাহার সমন্বয়ে যদি শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় তবেই গণতন্ত্র পূর্ণ হইবে। সমাজতন্ত্রে যেমন রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কষ্টকর, তেমনি গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক সাম্যাধিকার প্রতিষ্ঠা করাও কষ্টকর। লইতে হইবে যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের নায়ক হইবেন একজন। একনায়কতন্ত্রকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়; যথা, (ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Personal), (খ) **আমলাতন্ত্র**, (গ) **দলগত**(Party dictatorship), (ঘ) **শ্রেণীগত** (Class dictatorship), (ঙ) রাজতন্ত্র, (চ) **সমাজতন্ত্র**, এবং (ছ) **সামরিক একনায়কত্ব**।

ইতিহাস (History): একনায়কতন্ত্র নূতন নয়। প্রাচীন গ্রীসে অভিজাত-তন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া শক্তিশালী সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে (zunta) একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। রোমের ইতিহাসেও একনায়কতন্ত্রের নজীর পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে অলিভার ক্রমওয়েল সৈন্যবাহিনীর উপর ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী ও ইতালীতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানীতে হিটলার এবং ইতালীতে মুসোলিনী যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট দলের **দলীয় নায়কত্ব** প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১৭ সালে রুশদেশেও লেনিনের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টির দলীয় নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) একনায়কতন্ত্রের ইতিহাস

একনায়কতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি: গ্রীক্ ও জার্মান রাষ্ট্র-চিন্তাবিদগণ যে দর্শন রচনা করেন তাহা একনায়কত্বের দার্শনিক ভিত্তি। জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেন, রাষ্ট্র পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদক্ষেপ ("State is the March of God on Earth")। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র একটি সদাসচেতন নৈতিক সত্তা ("A self-conscious ethical substance and a self-knowing and a self-actualising individual.")। কাণ্ট্ বলেন, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই উক্তিগুলির মধ্য হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, রাষ্ট্রই প্রধান, মানুষ অপ্রধান। প্রথমে রাষ্ট্র পরে মানুষ। রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে মানুষের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, অধিকার উৎসর্গীকৃত হইবে। মানুষ ছিল পশু। রাষ্ট্রই তাহাকে মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে। গ্রীক্ ও জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। একনায়কত্বের আর একটি দার্শনিক ভিত্তি প্রকাশ পাইয়াছে নীৎসে (Neitzsche), ট্রিটস্কে (Treitschke) প্রভৃতির

(২) রাষ্ট্রকর্তৃত্বের যুক্তি

যুক্তির মধ্যে। নীৎসে এই ধারণা পোষণ করেন যে, প্রত্যেক জাতিকে শান্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া শক্তির সাধনা করিতে হইবে। কারণ দুর্বল কখনও বাঁচিতে পারে না। শান্তির নীতি দুর্বলের নীতি। ট্রিটস্কে রাষ্ট্রকে একটি শক্তির বিমূর্ত রূপ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ উপরোক্ত দার্শনিক ভিত্তিকে স্মরণে রাখিয়া নিম্নে একনায়কতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) একনায়কতন্ত্র বিশ্বাস করে এক নায়ক, এক জাতি, এক রাষ্ট্র। ইহাতে কোন দলগত মতপার্থক্য থাকিবে না। রাষ্ট্রনায়ক হইবেন একজন আর দল থাকিবে একটি। দলের সাহায্যে এবং সামরিক শক্তির সাহায্যে সকল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ (totalitarianism) করিবেন রাষ্ট্রনায়ক। একনায়কতন্ত্রে সামরিক শক্তির সাহায্যে কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করা হয়।

(২) একনায়কতন্ত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রবণতা অত্যধিক। রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে, বৈদেশিকদিগের সহিত সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে, সামরিক দিকে, আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ ও সংস্কৃতি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) একনায়কতন্ত্রে সরকারী নীতি, পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দান করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। রাশিয়ার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য বহু প্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

(৪) একনায়কতন্ত্রে নায়ক তাহার ক্ষমতায় অধিষ্ঠানকে আইনসিদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। দেখা যায় যখনই কোন সামরিক উত্থানের নামে নায়ক বিদ্রোহ করিয়া ক্ষমতা অধিকার করেন তারপরই নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি তাঁহার ক্ষমতাধিকারকে আইনসিদ্ধ করিয়া থাকেন।

(৫) একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিপুণ গুপ্তচর ব্যবস্থা (espionage system) প্রবর্তিত হয়। হিটলারের গ্যাস্টাপো (Gestapo) বাহিনী, সোভিয়েত রাশিয়ার অগপু (Ogpu) এবং মুসোলিনীর কালোকোর্তা বাহিনী (Black Shirt) সংবাদ সংগ্রাহক হিসাবে বিশেষ খ্যাত।

একনায়কতন্ত্র প্রসারের কারণ ঃ একনায়কতন্ত্রের প্রসারের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সংকট এবং বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য বাঁটোয়ারা লইয়া ঝগড়া যুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুদ্ধের মধ্যেই একনায়কতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র (Economic Oligarchy) পাশাপাশি চলিবার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য, আইনের অনুশাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে দেখা দিয়াছে অপরিমেয় হতাশা, তীব্র অসন্তোষ এবং গণতন্ত্রের

উপর অবিশ্বাস। ডঃ গুচ (Gooch) বলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে যখন এইরূপ মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে তখন একনায়কতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে দেখা যায় স্পেনের ন্যায় অনেক রাষ্ট্র সামরিক রাষ্ট্রের নীতিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং এশিয়ায় অনেক দেশে সামরিক একনায়কত্ব (Military Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদঃ একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদ আলোচনা করার পূর্বে একনায়কতন্ত্রের সহিত স্বেচ্ছাতন্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন।

(১) **একনায়কতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্র**

একনায়কতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না, কারণ, একনায়কতন্ত্রের সহিত জনমতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকে কিন্তু স্বেচ্ছাতন্ত্রে তাহা থাকে না। স্বেচ্ছাতন্ত্রে বা স্বৈরতন্ত্রে রাজা, সামরিক নেতা (Junta) অথবা অভিজাত শ্রেণীর হাতেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। অতএব তাহাদিগকে সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না।

(ক) **ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র (Personal Dictatorship)**ঃ ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রে এক ব্যক্তির উপর সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জুলিয়াস সিজার ও সিনসিনেটাস প্রমুখকে একনায়কত্বে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল, মুসোলিনী যদিও ফ্যাসিস্ট দলের নেতা হিসাবে একনায়ক কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই ব্যক্তিগত একনায়কত্বে অভিষিক্ত হন। রাশিয়ার স্ট্যালিন যদিও সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু কাহারও কাহারও মতে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেও ব্যক্তিগত একনায়কত্বে অভিষিক্ত করা হয়। স্ট্যালিনের (Stalin) বিরুদ্ধে ব্যক্তিপূজার (Personality Cult) যে অভিযোগ আনা হয় তাহা হইতেই বুঝা যায় ব্যক্তিগত একনায়কত্ব রাশিয়ায় কতদূর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(খ) **আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)**ঃ অনেক সময় দেখা যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে কার্যতঃ অধিকাংশ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিতে দেওয়া হয়। আমলাদের উপর শাসন পরিচালনার ভার অর্পণ করার নাম আমলাতন্ত্র। গণতান্ত্রিক বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে আইনসভা আইনের মূলনীতি নির্ধারণ করিয়া সরকারী কর্মচারীদের নিকট তাহা প্রেরণ করে তাহাকে কার্যকর করার জন্য। এই আইনকে কার্যকর করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ ব্যক্তিদের লইয়া এক কর্মচারিমণ্ডলী গঠন করা হয়। এই কর্মচারিবৃন্দই প্রকৃতপক্ষে শাসন পরিচালনা করে। দপ্তরশাহী এই শাসন পরিচালনাকেই আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। পরে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হইয়াছে।

(গ) **রাজতন্ত্র**ঃ রাজা যেহেতু রাষ্ট্রের নায়ক সেইহেতু কেহ কেহ রাজতন্ত্রকেও একনায়কতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। একনায়কতন্ত্রে জনমতের সহিত রাষ্ট্র ক্ষমতার সম্পর্ক থাকে কিন্তু রাজতন্ত্রে তাহা থাকে না। অবশ্য নির্বাচিত বা নিয়ম-

তান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সহিত জনমতের সম্পর্ক থাকে। তাই ক্ষেত্রবিশেষে রাজতন্ত্রকে অনেকে একনায়কতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করেন না।

(ঘ) **দলগত ও (ঙ) শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র**ঃ অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্রের অধীন ("All States in the world are in essence class dictatorship.")। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে যে ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্র শাসন করে তাহা শ্রেণীগত একনায়কত্বের নামান্তর মাত্র।

আবার দলগত একনায়কত্ব আর শ্রেণীগত একনায়কত্বকে সমার্থক বলিয়াও কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। কারণস্বরূপ বলা হয়, দল হইল একটি শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ। প্রত্যেকটি দলই যখন এক একটি শ্রেণীর প্রতিভূ তখন যে দল ক্ষমতায় আসীন হইবে তখন সেই দল যে শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ সেই শ্রেণীরই স্বার্থ বজায় রাখিবে। অবশ্য, আবার অনেকে বলেন, দলগত একনায়কত্ব আর শ্রেণীগত একনায়কত্ব এক নয়। কারণ রাষ্ট্র যদি বহু দলের স্বীকৃতি দেয় তাহা হইলে ক্ষমতায় আসীন দল বিরোধী দলকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে জনমতকে বিরোধীদলের সমর্থনে আনয়ন করিয়া বিরোধীদল পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো যদি একটি দলই রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে শ্রেণীগত আর দলগত একনায়কত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না।

(চ) **সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও নাৎসী-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব**ঃ নিম্নে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তুলনা করা হইতেছে—

(১) ইতালীর ফ্যাসিবাদ এবং (২) জার্মানীর নাৎসীবাদের মূল বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্র এবং জাতি। ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। নাৎসীবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় জাতির কর্তৃত্ব।

(৩) আর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মূল বিষয়বস্তু হইল শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয়। অতএব রাষ্ট্রই সব কিছু নয়।

(ক) **ফ্যাসিবাদ (Fascism)**ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২২ সালে ইটালীতে মুসোলিনীর ক্ষমতাদখলের মধ্য দিয়া ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সালে স্পেনে প্রাইমো ডি রি ভেরা এবং ১৯২৩ সালে পোলাণ্ডে পিলসুড্স্কি এবং ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন, এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন সময়ে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, পর্তুগাল প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে হয় রাজতন্ত্রের নামে, নয় সম্পূর্ণ

ঃ ফ্যাসিবাদের জন্ম

নগ্নরূপে স্বৈরাচার ও একনায়কত্ব দেখা দেয়। এশিয়ায় জাপানে জাপানী একনায়কত্ব এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বহু রাষ্ট্রে অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইতালীতে ফ্যাসিস্টদল বিভিন্ন মতবাদের সংমিশ্রণে একটি মতবাদের প্রচার করে। এই মতবাদই ফ্যাসিবাদ। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ হিসাবে ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রবিরোধী, সমাজতন্ত্রবিরোধী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী এবং যুদ্ধের পূজারী। রাষ্ট্রকেই একমাত্র সার্বভৌম বলিয়া ধরা হয় (Primacy of the State is the basis of Fascism)। ফ্যাসিস্ট নায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র সর্বদাই জনগণের সহিত সংপার্কিত থাকিবে, তাহাদের স্বার্থসাধন করিবে। ফ্যাসিবাদ জাতিসত্তার গৌরব প্রচার করে। নিম্নে ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল ঃ

(৫) ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য

(১) ফ্যাসিবাদী ধারণায় রাষ্ট্র সর্বাত্মক সর্বশক্তিমান। রাষ্ট্রই সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবে। রাষ্ট্রই ব্যক্তির সকল ভার গ্রহণ করিবে। ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপরে ব্যক্তি নয়। রাষ্ট্রের প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত হইবে। ব্যক্তির স্বার্থের সহিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সংঘর্ষ বাধিলে রাষ্ট্রীয় স্বার্থই কার্যকর হইবে এবং ব্যক্তির স্বার্থকে ধ্বংস করা হইবে। ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে।

(১) রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য

(২) ফ্যাসিবাদ যুদ্ধের পূজা করে। ইহা শান্তির বিরোধী। ইহার মূলভিত্তি সাম্রাজ্যবাদ। মুসোলিনীর ভাষায় শান্তি হইল ভীরুদের স্বপ্ন (Dream of the cowards)।

(২) যুদ্ধের পূজারী

(৩) ফ্যাসিবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করিতে চায় না। ইহা সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চায় কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করিতে চায় না। আর সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করে; এই কারণে ফ্যাসিবাদ সমাজতন্ত্রের বিরোধী।

(৩) সমাজতন্ত্রের বিরোধী

(৪) ফ্যাসিবাদ বীরের পূজা করে এবং গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে। ইহা পার্লামেন্ট, সংবিধান ও নির্বাচনকে নিরর্থক বলিয়া মনে করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সুপরিচালনার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যেও এমন সুযোগ্য নেতা থাকিতে পারে, যিনি রাষ্ট্রযন্ত্রকে জাতির উন্নতিতে সাম্রাজ্যের বিস্তারে কাজে লাগাইতে পারিবেন।

(৪) গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে

উপসংহারে বলা যায়, ফ্যাসিবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে চায়। নেতার আজ্ঞাকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখিয়া তাহাকে মান্য করিতে চায়, জাতিসত্তার গৌরব গাথায় ইহা মুখর। এবং বিশ্বশান্তিকে ধ্বংস করিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে চায়। ফ্যাসিবাদের কোন ভাবাদর্শ নাই।

তাই জনগণ ইহাকে গ্রহণ করে নাই। মুসোলিনীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীতে ফ্যাসিবাদের সমাপ্তি ঘটে।

(খ) নাৎসীবাদ (Nazism) ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান হয়। নাৎসীবাদের প্রবর্তন করেন হের হিটলার। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর জার্মানীর করুণ দৈন্য ও গ্লানিপূর্ণ অবস্থাই এই মতবাদের অভ্যুত্থানের কারণ। জার্মানগণ মনে করিতেন যে, তাঁহারা আর্যবংশসম্ভূত এবং জগতের শ্রেষ্ঠ নরকুল। তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নাৎসীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

(১) নাৎসীবাদের সারকথা

নাৎসীবাদ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের একাধিপত্য বিস্তারের পক্ষপাতী। এই মতবাদ একদলীয় শাসনে বিশ্বাসী। নাৎসীবাদ অনুসারে রাষ্ট্রই সর্বক্ষমতার অধিকারী, সর্বগ্রাসী। এই মতবাদ একনায়কত্বে বিশ্বাসী।

উপসংহারে বলা যায়, এই মতবাদ যদিও বহুদোষে দুষ্ট কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানজাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একনায়কত্বের। নাৎসীবাদ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। জাতির শ্রেষ্ঠত্বই ছিল এই মতবাদের প্রাণ। জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে সমগ্র জার্মান জাতিকে হিটলার একসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে সকল ব্যক্তি ও সংঘের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে হইবে। ইহা হেগেলের দর্শনের ভিত্তিতেই রচিত। নেতৃপূজা, গণতন্ত্রের ধ্বংসসাধন, ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিসর্জন, যুদ্ধের মহিমা প্রচার, জার্মান জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা, জার্মান সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রভৃতি এই মতবাদ প্রচার করিত। হিটলার বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব করিবার পশ্চাতে এই যুক্তি প্রদর্শন করিতেন যে, একমাত্র জার্মান জাতিই শ্রেষ্ঠ এবং জাতিহিসাবে অপব সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার তাহার আছে। হিটলারের মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু নাৎসীবাদ আজও পশ্চিম জার্মানীতে প্রচলিত আছে।

(ছ) সামরিক একনায়কতন্ত্র (Military dictatorship) ঃ পূর্বে সামরিক স্বৈরতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে সামরিক একনায়কত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। সামরিক একনায়কত্বে কোনও সামরিক একনায়ক অর্থাৎ মিলিটারী জেনারেল প্রমুখকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে দেখা যায়। পাকিস্তানে জেনারেল আয়ুব খাঁ মিলিটারী বিদ্রোহের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া লইয়াছিল। গ্রীসে বর্তমানে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করিয়া মিলিটারী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লাতিন আমেরিকা, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশেও দেখা যায় সামরিক অধিকর্তাগণ বিদ্রোহ করিয়া আইনানুমোদিত সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া লইয়াছে।

অন্যান্য একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপই ইহার গুণাগুণ। এই

শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক একনায়কই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক হইয়া থাকেন। নাগরিকগণের কোন অধিকারকেই স্বীকার করা হয় না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ হিসাবেই সামরিক অভ্যুত্থান হইয়া থাকে।

একনায়কতন্ত্রের মূল্যায়ন ঃ সপক্ষে যুক্তি ঃ (১) নীৎসেকে (Friedrich Neitzche) অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, শক্তিই আরাধ্য বস্তু, দুর্বলতাই পাপ। দুর্বলতা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। গণতন্ত্র মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়, ইহা পুরুষকে নারীতে পরিণত করে। সুতরাং গণতন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া বীরপূজা করাই উচিত।—নীৎসের ধারণায় নেপোলিয়নই আদর্শ পুরুষ। গণতন্ত্র মানুষকে দেয় অনাহারে মৃত্যু আর একনায়কত্ব দেয় সম্মানজনক মৃত্যু। গণতন্ত্রে ব্যবসায়ীদের শোষণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শোষণব্যবস্থার হাত হইতে বাঁচার উপায় হইল বীরের অধীনে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিচালিত করা।

(২) নায়কতন্ত্রে উচ্ছৃংখল জনতার শাসনের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় সুযোগ্য নায়কের সুশাসন।

(৩) একনায়কতন্ত্রে দলীয় বিরোধ থাকে না। কারণ নায়কের সমর্থক ছাড়া আর অন্য কাহাকেও দলগঠন করিবার অধিকার দেওয়া হয় না। ফলে দলীয় বিবাদের সম্ভাবনা নাই।

(৪) একনায়কতন্ত্রে সরকার স্থায়ী হয়। গণতন্ত্রে সরকার অস্থায়ী হয়। বিশেষতঃ বহু দলীয় ব্যবস্থায় সরকার কখনো স্থায়ী হইতে পারে না। এই শাসন-ব্যবস্থা মন্থর গতিতে চলে না। একনায়কের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উহাকে কার্যকর করা অতি দ্রুত হইয়া থাকে।

ত্রুটি ঃ (১) একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শুধু একনায়কই স্বাধীনতা ভোগ করে। জনগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। সাম্য ও স্বাধীনতা মানুষ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে না। ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সকল পথ রুদ্ধ হয়।

(২) একনায়কতন্ত্রে একনায়কের খেয়ালের উপর সবকিছু নির্ভর করে। নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। তাই তাহারা জীবনের স্বাদ পায় না। তাহারা অচেতন পদার্থের মতোই বাস করে।

(৩) একনায়কতন্ত্রে যুদ্ধের বিভীষিকা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। যুদ্ধের ভয়ে জীবন অস্বস্তিকর হইয়া উঠে। বিপ্লবের সম্ভাবনা সর্বত্র বিদ্যমান থাকে।

(৪) একনায়কতন্ত্রে শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়। তাই বিশালকায় দেশের পক্ষে কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। ক্ষুদ্রকায় দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা কাম্য হইলেও বৃহদায়তন বিশিষ্ট দেশে ইহা কাম্য নয়। বিশাল রাজ্যের এক কোণে বসিয়া একনায়ক অতি দূর সীমান্তের কোন খবরই পায় না। ফলে দূর সীমান্ত অঞ্চল অবহেলিত হইতে বাধ্য হয়, এবং

তথায় বিপ্লব সংগঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আবার তাহাকে দমন করিতে গেলে রাজধানী বিপদাপন্ন হইয়া পড়িতে পারে।

(৫) একনায়কতন্ত্রে একনায়কের পারিষদবর্গ লুণ্ঠন করিতে সুরু করে। পারিষদবর্গ ছাড়া একনায়ক রাজ্যশাসন করিতে পারেন না।

উপসংহারে বলা যায়, একনায়কতন্ত্রকে অন্তর্বর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। একটা পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা যখন ভাঙিয়া পড়ে তখন নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অবশ্য, বর্তমানের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, একনায়কতন্ত্র কোন অন্তর্বর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থা নয়। বরং নূতন সমাজ ব্যবস্থাকে কার্যকর করিবার জন্যই ইহাকে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। একনায়কতন্ত্র যদি ব্যক্তিগত না হইয়া দলগত হয় এবং এই দল যদি মানুষের মনে আশার আলো আনিয়া দিতে পারে তবে দলীয় নায়কত্বকে অকাম্য বলা যায় না। সমাজতান্ত্রিক নায়কত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নে যে শাসন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহাকে অকাম্য বলা যায় না।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্র	একনায়কতন্ত্র
(১) গণতন্ত্র বলিতে বোঝায় জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য সরকার।	(১) একনায়কতন্ত্র বলিতে বোঝায় রাষ্ট্রনায়ক মাত্র একজন, বা একটি দলের নেতা বা সেনাধ্যক্ষ বা রাজা বা একটি শ্রেণীর নেতা বা সমাজতান্ত্রিক একনায়ক বা নাৎসী-ফ্যাসিস্ট একনায়ক।
(২) গণতন্ত্রে বহু দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়; কারণ, গণতন্ত্র বিরোধী মতের সহ অবস্থানে বিশ্বাসী।	(২) একনায়কতন্ত্রে কোন বিরোধী দলকে সহ্য করা হয় না, শুধু একটি দলকেই স্বীকার করা হয় অথবা ব্যক্তি বা সেনাধ্যক্ষ নিজের অভিরুচি মতো রাষ্ট্র শাসন করে।
(৩) গণতন্ত্রে সরকার জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয় জনগণের সম্মতিই গণতন্ত্রের ভিত্তি। জোর করিয়া কোন সিদ্ধান্তকে জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় না।	(৩) একনায়কতান্ত্রিক সরকারে জনগণের কোন প্রতিনিধি থাকে না। একনায়কতন্ত্রের মূল ভিত্তি শক্তি। একনায়ক জোর করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেয়।
(৪) গণতন্ত্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই শক্তির প্রয়োজন কম।	(৪) একনায়কতন্ত্রে আইনের অনুশাসনের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতার অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে শক্তির প্রয়োজন হয়।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্র	একনায়কতন্ত্র
(৫) গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ক যেমন থাকে তেমনি বিরোধী দলও থাকে। ফলে ক্ষমতাধিকারীদের বিকৃত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।	(৫) লর্ড এ্যাক্টনের মতে "সকল ক্ষমতা ক্ষমতাধিকারীকে বিকৃত করে, চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে বিকৃত করে। একনায়ক অবাধ ক্ষমতা ভোগ করে এবং তাহাকে কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।
(৬) গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সাম্যকে স্বীকার করা হয়। ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির জন্যই ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।	(৬) একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সাম্যকে অস্বীকার করা হয়। এক-নায়কতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা অস্বীকৃত হয় বলিয়া ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সুযোগ প্রায় নাই বলিলেই চলে।
(৭) গণতন্ত্রে গণদেবতার পূজা করা হয়। গণতন্ত্রে জনগণের উপর জোর করিয়া কিছু চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। সুতরাং জনবিরোধী কাজ করিতে পারে না।	(৭) একনায়কতন্ত্রে একনায়কের পূজা করা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
(৮) গণতন্ত্রে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। কারণ শাসক-বর্গকে তাহাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়। ফলে কাজ বিলম্বিত হয়।	(৮) একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, ফলে রাষ্ট্রের কার্য দ্রুত সম্পাদিত হয় এবং অগ্রগতি তরান্বিত হয়।
(৯) জরুরী অবস্থায় জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হইলে গণ-তন্ত্রের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।	(৯) একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ক একাই তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। তাহাকে কাহারও নিকট কৈফিয়ত দিতে হয় না।

সারসংক্ষেপ

গণতন্ত্র : গণতন্ত্রে সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইল জনগণ। গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার। গণতন্ত্র দুই প্রকার, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করে এবং আইনকে বলবৎ করে। আর পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের গুণ : (ক) পরোক্ষ গণতন্ত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়, (খ) জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার হয়, (গ) শাসক ও শাসিতের স্বার্থকে অভিন্ন করিয়া তোলা হয় ইত্যাদি।

গণতন্ত্রের ত্রুটি : (ক) ইহা ক্ষণভঙ্গুর, (খ) অজ্ঞতের শাসন ইত্যাদি।

গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত : গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে জনগণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করিতে হইবে।

একনায়কত্ব : গণতন্ত্রের অক্ষমতার জন্যই একনায়কতন্ত্রের জন্ম হইয়াছে। একনায়কতন্ত্রের তিনটি রূপ ; (১) রাজতন্ত্র, (২) ফ্যাসিবাদ, (৩) নাৎসীবাদ। কেহ কেহ গণতন্ত্রকে দলীয় একনায়কত্ব বলিয়াও অভিহিত করেন।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র : গণতন্ত্রের সহিত সমাজতন্ত্রের অনেক মিল আছে।

প্রশ্নাবলী

১। "সমাজতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে না বরং উহাকে পূর্ণ করে।" আলোচনা কর।

["Socialism proposes to complete rather than oppose the liberal democratic creed" Discuss.]

২। 'গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ছাড়া পূর্ণ হয় না'। আলোচনা কর।

[' Democracy is not complete without socialism." Discuss"]

৩। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়া এবং গণতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ কর। গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্তগুলি নির্দেশ কর।

[Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which of them would you prefer and why? Point out the conditions essential to the success of Democracy.]

৪। একনায়কতন্ত্র বলিতে কি বুঝ? একনায়কতান্ত্রিক সরকারের গুণ ও দোষ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[What is meant by Dictatorship? Discuss the merits and defects of Dictatorship as a form of Government]

৫। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? ইহার গুণাগুণ নির্দেশ কর। ইহার গুণগুলি কি দোষগুলিকে খণ্ডিত করিতে পারে?

[What are the essential characteristics of Democracy? Indicate the merits and defects of such form of Government Do the merits outweigh its defects?]

অতিরিক্ত পাঠ্য

J. S Mill—Representative Government

Laski—Liberty in the Modern State

C E M Joad—Liberty today.

F. W Coker—Recent Political thought

১২ | সরকারের বিভিন্ন বিভাগ
(Organs of Government)

(সরকারের বিভিন্ন বিভাগ—বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী—ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি—শাসন বিভাগ—একক—যৌথ)

(Organs of Government ; Functions of the different Organs of Government : Theory of Separation of Powers—Executive—Single—Plural)

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ
(Different Organs of Government)

সরকারের কাজ ও ক্ষমতা যাহাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইতে পারে এবং স্বেচ্ছাচারিতা যাহাতে গড়িয়া উঠিতে না পারে সে জন্যই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রশ্ন দেখা দেয়। ক্ষমতা বিভাজন সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের চিন্তাই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে সরকারের তিনটি বিভাগ হইল যথাক্রমে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। আইন বিভাগের কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা ; শাসন বিভাগের কাজ হইল আইনকে কাজে পরিণত করা এবং বিচার বিভাগের কাজ হইল আইনকে ব্যাখ্যা করা এবং আদালতের মাধ্যমে আইনকে প্রয়োগ করা। অ্যারিস্টটলের পরে সরকারের ক্ষমতা বিভাজন সম্পর্কে যাঁহারা বিশেষভাবে অবদান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন ফরাসী দার্শনিক ব্যোঁদা (১৫৩০-১৫৯৬), ইংরাজ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) এবং ফরাসী আইনজ্ঞ মন্টেস্কু। মন্টেস্কু দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করিতেন যে নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রয়োজন। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তাঁহার এই নীতি মার্কিন-সংবিধান প্রণেতাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।*

আইন বিভাগ : সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগের কাজই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে আইন বিভাগের মাধ্যমে সরকারের শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাকে আইনসভাই প্রতিফলিত করিয়া থাকে। অবশ্য রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (রাজা যেখানে স্বৈরাচারী) এবং একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা তুলনামূলকভাবে নগণ্য। এই সব রাষ্ট্রে শাসকরাই যাবতীয় ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আইনসভা

---

*"He did provide such a powerful argument for the separation thesis that the founders of the American Constitution made it a fundamental part of the Presidential system." Dillon, Leiden and Stwart—Introduction to Political Science—P.116

থাকিলেও তাহা স্বৈরাচারী রাষ্ট্র নায়কের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে আইন সভার সার্থক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। আইনসভা হইল জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংগঠিত প্রতিষ্ঠান। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনে আইনসভাগুলির মাধ্যমেই জনসাধারণের সংগঠিত ইচ্ছা ও মতামত প্রকাশিত হয়।

আইনসভার কাজঃ আইনসভা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইয়াছে। আইনসভা গঠন ও ক্ষমতার মধ্যে রাষ্ট্র বিশেষে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আইনসভা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। আইনসভার প্রধান কাজগুলি হইল (১) আইন প্রণয়ন করা; (২) সরকারী আয় ব্যয়ের আলোচনা করা এবং প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য ব্যয় মঞ্জুরী করা; (৩) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ আইন সভার নিকট তাঁহাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকে; (৪) দেশের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার অধিকার আইনসভার উপর ন্যস্ত আছে; (৫) কিছু কিছু রাষ্ট্রে আইনসভা বিচার বিভাগের কার্যও করিয়া থাকে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি
(Theory of Separation of Powers)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সাধারণতঃ ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্কুর নামের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই নীতির প্রভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো আর্জেন্টিনা ব্রাজিল প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ এই নীতির ভিত্তিতে ১৭৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হয়। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের গণপরিষদ তাহাদের অধিকার সম্পর্কীয় সনদে ঘোষণা করেন "যে দেশে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয় নাই সে দেশে কোন সংবিধান নাই ('A Society in which separation of powers is not fixed has no Constitution') একদিকে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও অন্যদিকে নাগরিকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই এই নীতির মূল লক্ষ্য ছিল। সরকারের তিনটি বিভাগ যথাক্রমে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ মণ্টেস্কুর নীতি অনুযায়ী স্ব-স্ব গণ্ডীর মধ্যে কাজ করিবে। এক বিভাগ অপর বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিবে না (Each department is entrusted to a separate body of persons. No one department will have ruling influence over the other.) মণ্টেস্কুর মতে ভয়ের সম্ভাবনা তখনই থাকে যখন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি আরও মনে করিতেন যে বাধীনতা বিপন্ন হয় যদি আইন ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য না থাকে। মণ্টেস্কু ক্ষমতার

অপচয়কে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্যই মূলতঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ 'নীতিকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বা আদর্শ যে সরকার গ্রহণ করিয়াছেন সেই সরকারই একমাত্র স্বাধীন সরকার।*

ইংরেজ আইনজ্ঞ ব্ল্যাকস্টোনও এই নীতির সমর্থক ছিলেন। তাঁহার মতে একই ব্যক্তি যদি একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং পরিচালনা বিভাগের ক্ষমতা লাভ করেন তাহা হইলে ব্যক্তি স্বধীনতা বিলুপ্ত হইবে।

ব্ল্যাকস্টোন

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির আর একজন বড় সমর্থক হইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতিবিদ ম্যাডিসন। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ভীতি তাঁহাকে এই মতবাদের সমর্থনে বলিতে বাধ্য করিয়াছিল—"একই হস্তে যখন সমস্ত ক্ষমতার একীকরণ বা সমন্বয় ঘটে তখন তাহাকে স্বেচ্ছাচারিতার সংজ্ঞা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে" (The accumulation of all powers in the same hands...may justly be pronounced the very definition of tyranny...)

ম্যাডিসন

সমালোচনা ঃ (ক) অখণ্ড সত্তার যুক্তি ঃ তত্ত্বগতভাবে মণ্টেস্কুর অবদান যথেষ্ট মূল্যবান হইলেও আধুনিক কালে এই মতবাদ বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। সমালোচকদের মতে সরকারের একটি অখণ্ড সত্তা আছে। ইহার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এক বিভাগ অপর বিভাগের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। এক বিভাগ অপর বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে এক বিভাগকে সময় বিশেষে অপর বিভাগের কাজ করিতে হয়। যেমন আইনসভা সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু আইনসভার অধিবেশন সারা বছর ধরিয়া হওয়া সম্ভব নয়। আইনসভার অধিবেশন যখন স্থগিত থাকে তখন মাঝে মাঝে জরুরী আইন রচনার প্রয়োজন হয়। আইনসভার বদলে তখন সাময়িকভাবে শাসন কর্তৃপক্ষকেই আইন তৈয়ারী করিতে হয়। এই আইন 'অর্ডিনান্স' নামে পরিচিত। 'অর্ডিনান্স' বা জরুরী আইন এবং আইনসভায় পাস করা আইনের মূল্য একই।

বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা

একই সঙ্গে দেখা যাইতে পারে বিচারপতিদের ভূমিকা। বিচারপতিদের কাজ হইল আইন ঠিকমত প্রযুক্ত হইতেছে কিনা তাহা দেখা। বিচারপতিরা আইনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আইনের অস্পষ্টতা বা দুর্বলতাগুলিকে দূর করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিচারপতিদের ন্যায়-বুদ্ধি প্রয়োগ এবং বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া নতুন আইনের জন্মলাভ ঘটিয়া থাকে। আধুনিককালে আইনসভা ছাড়াও বিচারপতিদের রায় এবং সিদ্ধান্তগুলি আইনের উৎস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

* 'Political Liberty is to be found only in moderate Governments'.
—Montesquieu.

(খ) **ব্যক্তি স্বাধীনতার যুক্তি ঃ** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তাদের সর্বপ্রধান যুক্তি হইল এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। কিন্তু এই যুক্তি যে মূলতঃ দুর্বল তাহা বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—বৃটেনে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয় নাই—শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগ এখানে একই সংগে কাজ করিয়া থাকে—যেমন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা আইনসভার সদস্য হিসাবে আইন রচনা করিয়া থাকেন—তাঁহারাই আবার শাসনকর্তা হিসাবে রাজার নামে দেশ শাসন করিয়া থাকেন। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটিয়াছে। ঐ রাষ্ট্রে তিনটি বিভাগ অনেকাংশে স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই কথা বলা যায় না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা বৃটিশ নাগরিকদেব অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে অলিখিত শাসনতন্ত্র থাকিলেও বৃটিশ নাগরিকেরা তুলনামূলকভাবে তাঁহাদের স্বাধীনতা এবং অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হইল নাগরিকদের চেতনা এবং অধিকার রক্ষার জন্য নিরন্তর প্রয়াস।

(গ) **দক্ষতা হ্রাস ঃ** ম্যাকাইভার প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অত্যধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে সরকারের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। সবকাবেব বিভিন্ন বিভাগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ কবিবাব ফলে তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার বিলুপ্তি ঘটে।

(ঘ) **জৈব-মতবাদের যুক্তি ঃ** রাষ্ট্রের একটি অখন্ড সত্ত্বা আছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের ভিতর দিয়া রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায় জীবদেহের প্রত্যেকটি অংগ পরস্পরের উপব নির্ভবশীল, দেহের অংগগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করিতে গেলে জীবদেহের অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিলেব মতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যকরণ এবং বিভাগগুলির স্ব-স্ব স্বাধীনভাবে কাজ কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। ইহার ফলে এক অচল অবস্থা সৃষ্টি হইবে এবং কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইবে।

(ঙ) **সমান ক্ষমতার যুক্তি ঃ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অন্যতম প্রধান যুক্তি হইল এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি বিভাগ সমান ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাইবে সরকারের তিনটি বিভাগ সমান ক্ষমতা ভোগ করে না। কার্যতঃ আইন সভাই অন্য দুটি বিভাগ অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাব অধিকারী। আইনসভা একদিকে আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে অন্যদিকে ইহা শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। উপরন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক সংস্থা বলিয়া আইনসভার উপর সরকারের আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত কবা হইয়াছে। এই ক্ষমতা থাকার ফলে আইনসভা অপর বিভাগগুলির উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে নীতির প্রয়োগ ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কি পরিমাণে নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলিতে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ** পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা এই নীতি বা আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের মূল কর্তা। যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। তিনি আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইন প্রণয়ন করিবার কোন অধিকারও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। অন্য দিকে বিচার বিভাগ এবং আইনবিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে। কিন্তু সংবিধান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এক বিভাগ অপর বিভাগকে বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যেমন রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের কর্তা—কিন্তু উচ্চপদে তিনি যে সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং যে সমস্ত বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকেন সেগুলি আইনসভার উচ্চকক্ষ সেনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। আবার রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য না হইলেও আইন প্রণয়ন ব্যাপারে বেশ কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি আইনসভায় বক্তৃতা করিতে পারেন আবার মাঝে মাঝে বাণীও প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার ইচ্ছামত বিল পাসে সাহায্য হইয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিযুক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু বিচারপতিদের অপসারণ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নাই। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা রাষ্ট্রপতির আদেশনামাকে বাতিল করিতে পারেন। তেমনি আইন-সভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল করিবার অধিকার বিচারপতিদেরও আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই।

(২) **গ্রেট বৃটেন ঃ** মন্টেস্কু বৃটিশ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করিতেন যে সেখানে তিনটি বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিসভা একাধারে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন অন্যদিকে তাঁহারাই আইনসভার সদস্য হিসাবে আইন প্রণয়নের অধিকারী। পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষের নাম **হাউস অফ লর্ডস্‌**। লর্ড সভা এক দিকে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করেন আবার অপরদিকে তাঁহাদের বিচার করিবার ক্ষমতাও আছে। বৃটেনের রাজা বা রাণী তত্ত্বগতভাবে সমস্ত শাসন ক্ষমতার মালিক—অন্যদিকে তিনি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৃটেনের লর্ড চ্যান্সেলার একাধারে লর্ড সভার সভাপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বৃটেনের প্রধান বিচারসভার বিচারপতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে গ্রেট বৃটেনেও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পুরাপুরি গৃহীত হয় নাই।

(৩) **ভারতবর্ষ** ঃ ভারতবর্ষের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও এখানে বৃটেনের ন্যায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ব্যবস্থা পরিচালিত আছে। তত্ত্বগতভাবে সমস্ত প্রশাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইলেও মন্ত্রিপরিষদই বাস্তবে ক্ষমতা পরিচালনা করেন। মন্ত্রীরা একাধারে সরকার পরিচালনা করেন আবার অন্যদিকে পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে যাবতীয় আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। শাসনবিভাগ এবং আইন বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে—এক বিভাগ অপর বিভাগের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের কর্ণধার—একই সঙ্গে তিনি বৃটেনের রাজার ন্যায় ভারতীয় পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত থাকিলে তিনি জরুরী প্রয়োজনে অর্ডিনান্স জারী করিতে পারেন। ইহাছাড়া রাষ্ট্রপতির কিছু বিচার ক্ষমতা আছে। তিনি বিচারপতিদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি দন্ডিত ব্যক্তিদের দন্ড হ্রাস, মকুব বা দন্ড স্থগিত রাখিতে পারেন। অবশ্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিশেষভাবে গৃহীত প্রস্তাব ছাড়া বিচারপতিদের অপসারণ করিবার কোন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সংবিধানে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।* বিভিন্ন রাজ্যে জেলা ও মহকুমাস্তরে এই নীতি প্রযুক্ত করিবার প্রয়াস চলিতেছে। ইহাছাড়া বিচারপতিগণ যাহাতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের বেতন, নিয়োগ ও পদচ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। বিচারপতিগণের বেতন ও অন্যান্য ভাতা পার্লামেণ্টের বাৎসরিক অনুমোদনের বাহিরে রাখা হইয়াছে।

(৪) **সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র** ঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্যবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে গ্রহণ করা হয় নাই। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং ইহার গঠন পদ্ধতি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাঠামো অপেক্ষা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। সাম্যবাদীদের মতে রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদীরা তাহাদের শোষণ অব্যাহত রাখিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের প্রকৃত ধনতান্ত্রিক রূপকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা তাহাদের সুবিধামত বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়া থাকে। শোষণকে কায়েম রাখিবার জন্য পুঁজিবাদীরা ক্ষমতাকে পৃথকীকরণ করিতে চাহে। সোভিয়েত সংবিধানে দাবী করা হইয়াছে যে তাহারা শোষণের অবসান করিয়া সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে এবং সর্বহারাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সোভিয়েত রাষ্ট্রে তথাকথিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ না হইলেও দায়িত্ব, কর্তব্য এবং শ্রম বিভাগের ভিত্তিতে শাসন-ব্যবস্থা, আইনবিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে বিভাজন করা

* 'The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the publicservices of the State.—Article 50 of the Constitution of India.

হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে সোভিয়েত শাসনতন্ত্র প্রণেতারা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান আইনসভার (সুপ্রিম সোভিয়েতের) হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছাড়াও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে।*

উপসংহার ঃ আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি একটি বিশেষ যুগে মানুষের চিন্তাধারাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। রাজার বা শাসকের স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি কার্যকরী করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে উল্লিখিত নীতির প্রয়োজন অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রকে অধিকাংশ দেশেই কল্যাণ-রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। সাধারণ নাগরিকের কল্যাণে রাষ্ট্রকে নতুন নতুন কার্যক্রম এবং অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মণ্টেস্কু বা ম্যাডিসনের ক্ষমতা 'স্বতন্ত্রীকরণে'র আদর্শ বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ক্ষমতা পৃথকীকরণ না করিলেও কর্মপদ্ধতির স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজন থাকিয়া যাইবে।

শাসন বিভাগ (The Executive) ঃ আইনের মাধ্যমে সংগঠিত জনতার ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের যে বিভাগ কার্যে পরিণত করিয়া থাকে তাহাকে শাসনবিভাগ বলা হয়। বৃহত্তর অর্থে আইনসভা এবং বিচার বিভাগ ছাড়া সরকারের কাজে নিযুক্ত সকল কর্মচারীকেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। এই অর্থে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি হইতে শুরু করিয়া চৌকিদার পর্যন্ত এই পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য সংকীর্ণ অর্থে এই বিভাগের নীতি-নির্ধারণের ব্যক্তিদেরই সরকার বলিয়া গণ্য করা হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। | ইংলণ্ডে রাজা বা রাণী, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার মন্ত্রিপরিষদ শাসন কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে মন্ত্রিপরিষদই রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন এবং এই নীতিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য শাসন বিভাগের দায়িত্ব বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। অধীনস্থ কর্মচারীরা তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতেছে কিনা এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও রাষ্ট্রপরিচালকদের অন্যতম দায়িত্ব।

শাসন কর্তৃপক্ষের শ্রেণী বিভাগ ঃ শাসন বিভাগকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয় (১) ঊর্ধ্বতন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষ, (২) অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ। ঊর্ধ্বতন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষকে আমরা প্রধান, দুইটি ভাগে দেখিতে পাই—যথা,

* 'To concentrate all the levers of power and administration in the hands of the representative organs in such a way as ultimately to subordinate and make fully accountable to the elective organs of the people's state power not only the executive and administrative apparatus, but all other organs of the State as well." L. Srigoryan—Fundaments of Soviet State Law P.237

(ক) নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান, (খ) বাস্তব ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান। নামসর্বস্ব শাসন কর্তৃপক্ষ বলিতে আমরা বুঝি সেই কর্তৃপক্ষ যিনি আইনগত ভাবে রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু বাস্তবে কোন ক্ষমতা পরিচালনা করেন না। কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদই রাষ্ট্রপ্রধানের নামে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। বৃটেনের রাজা বা রাণী এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নাম সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাস্তবে শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ উদাহরণ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রশাসন ব্যবস্থার যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার অধীনস্থ সচিবদের মাধ্যমে পরিচালিত করিয়া থাকেন।

প্রধান শাসকের নিয়োগ পদ্ধতি ঃ রাষ্ট্রের প্রধান শাসক বা কর্মকর্তা নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতির দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন ঃ (১) উত্তরাধিকার সূত্রে নিয়োগ, (২) নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ, (৩) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়োগ। নির্বাচনের আবার দুইটি পদ্ধতি আছে, যেমন (ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন. (খ) পরোক্ষ নির্বাচন।

উত্তরাধিকার সূত্রে নিয়োগ ঃ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রধান কর্তৃপক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা ইংলন্ডে প্রচলিত আছে। ইংলন্ডে একটি বিশেষ পরিবারের প্রথম সন্তানকে সিংহাসনে বসিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় নির্বাচনের কোন প্রশ্ন নাই এবং সিংহাসন অধিকারী আমরণ শাসন কর্তৃপক্ষ থাকিতে পারিবেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন—ব্যবস্থায় রাজা বা রাণীর ভূমিকা একেবারেই নগণ্য শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদেরই উপর ন্যস্ত। রাজা বা রাণীর কোন ক্ষমতা না থাকলেও তাঁহাকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বলিয়া গণ্য করা হয়। রাজা নাম সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান এবং দলাদলির ঊর্ধ্বে থাকেন।

নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান শাসনকর্তার নিয়োগ দুই পদ্ধতিতে হইতে পারে, (১) প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন এবং (২) পরোক্ষভাবে নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচনের দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির প্রধান শাসনকর্তা এবং সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির স্থানীয় শাসকবৃন্দ এইভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

শাসনকর্তা নির্বাচন ব্যাপারে পরোক্ষ নির্বাচন ঃ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনেক রাষ্ট্রেই প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনসভাগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইহা একটি বিশেষ নির্বাচক মন্ডলীতে পরিণত হয় (Eelectoral College)। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Fedcrel Council) আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরোক্ষ পদ্ধতিতে হইলেও দলব্যবস্থায় উহা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরিণত হইয়াছে।

পরোক্ষভাবে প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচনের যুক্তি হইল এই ব্যবস্থায় নির্বাচক-মণ্ডলী (সাধারণভাবে আইনসভা) যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় আইনসভা এবং শাসনকর্তার মধ্যে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া সম্ভব হইতে পারে।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়োগ ঃ এই ব্যবস্থা ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। বৃটিশ ডোমিনিয়নের প্রধান হইলেন ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ সব রাজ্যের শাসনকর্তা বা গভর্নর জেনারেলদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। অবশ্য ইংলণ্ডে রাজা বা রাণী ডোমিনিয়নগুলির মন্ত্রিসভার (Cabinet) সুপারিশের ভিত্তিতেই নিয়োগ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষেও অংগরাজ্যগুলির শাসনকর্তার (Governor) নিয়োগ রাষ্ট্রপতি দ্বারা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শে চালিত হন। প্রসংগত বলা যায় যে, ভারতের অংগরাজ্যগুলি কোন সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে না।

শাসনকর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ ঃ শাসন কর্তৃপক্ষকে আবার দুইভাগে ভগ করা হইয়া থাকে ; যেমন, এককশাসন কর্তৃপক্ষ (Single Executive) এবং বহু পরিচালিত বা সমষ্টিগত শাসন কর্তৃপক্ষ (Plural Executive)।

একক শাসন কর্তৃপক্ষ (Single Executive) ঃ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতা যখন একটি মাত্র ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে তখন তাহাকে একক শাসন কর্তৃপক্ষ বলা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি শাসন ব্যবস্থায় মূল পরিচালক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। তাঁহার অধীনে মন্ত্রীসভা বা সচিববর্গ থাকিতে পাবেন। প্রধান শাসনকর্তা তাহাদের নিয়োগ ও অপসারণের সর্বময় কর্তা। এখানে শাসনকর্তার সহকারীবৃন্দ তাঁহার সহযোগী নহেন—তাহারা কর্মকর্তার অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ। আমরা একক শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টান্ত হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কর্ণধারদের উল্লেখ করিতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের সর্বময় কর্তা। তাঁহার অধীনস্থ সচিববৃন্দকে তিনি নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে পরিচালিত হইয়া থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে নাৎসি জার্মানী (হিটলারী শাসনে) এবং ফ্যাসিবাদী ইতালীতে একনায়কতান্ত্রিক শাসনে শাসনকর্তা সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ; আইনসভা তাঁহাদের কার্যকলাপের ফলে ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিল।

এক ব্যক্তির হস্তে যাবতীয় শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকার ফলে এই ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উহাকে কার্যকরী করা খুব দ্রুত ও সত্বর হইয়া থাকে। শাসন কর্তা অপরের উপর নির্ভরশীল নহেন বলিয়া এখানে শাসনকার্য দৃঢ়তার সহিত পরিচালিত হয় এবং শাসক স্বাধীনভাবে তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার দুর্বলতা হইল এখানে আলোচনা ও মতামত গ্রহণের বিশেষ সুযোগ

থাকে না। তাছাড়া ক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত হইবার ফলে স্বৈরাচারের ও ক্ষমতা অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে।

বহুপরিচালিত বা সমষ্টিগত পরিচালিত শাসন কর্তৃপক্ষ (Plural Executive): শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যখন এক ব্যক্তির উপর না হইয়া একাধিক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয় এবং একাধিক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত কোন.শাসন পরিষদের দ্বারা.শাসন-কার্য পরিচালিত হয় তখন তাহাকে সমষ্টিগত শাসন কর্তৃপক্ষ (Plural Executive) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাও উল্লেখ্য যে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর মতো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পদাধিকারী এখানে নাই। সমষ্টিগত শাসকমণ্ডলীর সব সদস্যই সমক্ষমতা সম্পন্ন। এই ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল সাতজন সদস্য বিশিষ্ট সুইস্ শাসন পরিষদ (Swiss Federal Council)। এই সাতজনের মধ্যে একজন এক বৎসরের জন্য সভাপতি হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ভারত বা বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় কোন উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী নহেন। শাসন পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব উক্ত সাতজন সদস্য সমভাবে বহন করিয়া থাকেন।

একাধিক ব্যক্তির দ্বারা.গঠিত শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা হইল এখানে আলোচনা ও মত বিনিময়ের দ্বারা শাসন ব্যবস্থার নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত হইয়া থাকে। একক শাসন কর্তৃপক্ষের তুলনায় এই ব্যবস্থা অধিকতর গণতন্ত্র সম্মত। ক্ষমতা একজন বিশেষ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না হওয়ার ফলে এখানে স্বৈরাচারী শাসনের সম্ভাবনা থাকে না। অন্যদিকে শাসন ক্ষমতা বহুব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে আলাপ আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। মত পার্থক্যের ফলে স্থির এবং দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না। স্বভাবতঃই এই ধরণের শাসন ব্যবস্থায় দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

শাসন বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Executive):

শাসন বিভাগীয় কার্যাবলী

শাসন বিভাগের প্রধান কার্য হইল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখা এবং নিরাপত্তা স্থাপন করা। স্বরাষ্ট্র বিভাগকে (Home Department) এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। আইন ও শৃংখলা রক্ষা করিবার জন্য পুলিশবাহিনী পরিচালিত করিতে হয়। দেশের আইন শৃংখলা ভংগকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব।

পররাষ্ট্র ও কূটনৈতিক কার্যাবলী: বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্রগুলি নানা ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও মত আদান প্রদান করিয়া থাকে। এই সব কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রগুলিতে দূত নিযুক্ত করিয়া থাকে। এই রাষ্ট্রদূতরাই পররাষ্ট্র সমস্যা, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্য বিষয়ক ও অন্যান্য সমস্যাগুলি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর (External Affairs Department) এই সব কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। শুধু অপর রাষ্ট্রে দূত প্রেরণ নয়, অপরাপর রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্র-

দূত গ্রহণ, যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদন, রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়গুলি এই দপ্তরের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

সামরিক কার্যাবলী: শাসন বিভাগের যিনি প্রধানকর্তা তিনিই সাধারণতঃ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Supreme Command of the Armed Forces) বলিয়া পরিগণিত হন। সর্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি সেনাবিভাগের কর্মচারী নিয়োগ, সৈন্যাধ্যক্ষগণের নিয়োগ ও পদচ্যুতি এবং অন্যান্য সামরিক দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র আক্রান্তের সম্ভাবনা দেখিলে সমগ্র ভারতে জরুরী আইন জারী করিতে পারেন। প্রয়োজন ঘটিলে তিনি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত বা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করিতে পারেন।

অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলী: রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। অর্থের উৎস স্থিরীকৃত করা এবং অর্থ ব্যয় নির্ধারণ করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। অবশ্য করধার্য এবং অর্থ ব্যয় করা সম্পর্কে চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব আইনসভার উপর থাকিলেও আর্থিক ব্যাপারের মূল দায়িত্ব শাসন বিভাগকেই গ্রহণ করিতে হয়। ভারতের সংবিধানে নতুন কর নির্ধারণ, কর ধার্য বা কর হ্রাস করা সম্পর্কীয় কোন প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া সংসদে উপস্থাপন করা যায় না। যে দপ্তর এই দায়িত্ব পরিচালনা করিয়া থাকে তাহাকে অর্থ দপ্তর (Finance Department) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

বিচার বিষয়ক কার্যাবলী: শাসনকর্তৃপক্ষকে বিচার সংক্রান্ত কিছু কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হয়। অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারপতিগণ শাসন-কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্র প্রধানদের উপর দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মকুব, দণ্ড হ্রাস, দণ্ড স্থগিত ও দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

আইন সম্পর্কীয় কার্যাবলী: সাধারণভাবে আইনসভাই আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী। কিন্তু আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন প্রয়োজন বোধে শাসন কর্তৃপক্ষ জরুরী আইন (Ordinance) জারী করিতে পারেন। আইন-সভা কর্তৃক গৃহীত আইনের মতই এই জরুরী আইন সমান কার্যকরী। তাহা ছাড়া শাসন কর্তৃপক্ষ এই জরুরী আইনসভার অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত রাখিতে পারেন। তিনি প্রয়োজনবোধে দেশের নিম্নকক্ষ ভাঙিয়া দিতে পারেন। তাহাছাড়া বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার মতই ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংগ।

ইহাও উল্লেখ্য যে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদই শাসন সংক্রান্ত কাজের জন্য আইনসভায় বিল আনয়ন করে। প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকাংশ আইন সম্পর্কীয় প্রস্তাব মন্ত্রীরাই প্রণয়ন করেন।

শাসনকর্তৃপক্ষের অন্যতম ক্ষমতা হইল আইনসভা কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে

সম্মতি প্রদান। রাষ্ট্রপ্রধান বিলে তাঁহার সম্মতি প্রদান করিতে পারেন। আবার প্রয়োজনবোধে আইনসভার পুনর্বিবেচনার জন্য সম্মতিদানে অসম্মতি জানাইতে পারেন। অবশ্য আইনসভা কর্তৃক পুনর্বার গৃহীত হইবার পর ঐ বিলে সম্মতি দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন।

উপসংহার ঃ আমরা এ পর্যন্ত শাসন কর্তৃপক্ষের গঠন এবং কার্যাবলী আলোচনা করিলাম। দেখা যাইতেছে যে, অতীত যুগের তুলনায় শাসন বিভাগের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর প্রসারতা ঘটিয়াছে। প্রাচীন চিন্তায় রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের কার্য হিসাবে দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করাই প্রধান দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেন। রাষ্ট্রকে সেদিন 'পুলিশ' রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হইত। বর্তমানে রাষ্ট্রকে 'কল্যাণ রাষ্ট্র' (Welfare State) বলিযা অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বর্তমানে বিস্তৃত হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতেছে। শাসন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেই এই সব দায়িত্ব গ্রহণ করা হইতেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই শাসন কর্তৃপক্ষকেই হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। আইনসভা সমস্ত আইন প্রণয়ন করিবার সময় ও সুযোগ পাইতেছেন না। স্বভাবতঃই অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসনকর্তৃপক্ষবাই উপবিধি, নিয়মকানুন প্রণযনের অধিকারী হইতেছেন। **গেটেলের** মতে 'অদূর ভবিষ্যতে শাসনবিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধিব পথে রাষ্ট্রনীতি অগ্রসর হইবে।'*

রাষ্ট্রভৃত্য বা রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দ (Civil Service) ঃ দেশের প্রধান কর্মকর্তা ও মন্ত্রিপরিষদেব অধীনস্থ কর্মচারিগণকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রভৃত্য বা জনপালন কৃত্যক (Civil Service) বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রধান শাসক এবং অপরাপর মন্ত্রিপরিষদের তুলনায় ইহাদের প্রধান পার্থক্য হইল রাষ্ট্রীয় কর্মচারিগণ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। অন্যদিকে প্রধান কর্মকর্তা বা অন্য মন্ত্রিবর্গের পদ সম্পূর্ণ অস্থাযী। দেশের রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তনের ফলে কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই যে কোন সময তাহাদেব পদত্যাগ করিতে হয় (অবশ্য রাজতন্ত্রে প্রধান শাসক রাজা বা রাণী আমরণ শাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পাবেন)। স্বভাবতই সরকারের এই পরিবর্তনের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রভৃত্যগণের গুরুত্ব সর্বাধিক। ইহারা কোন দলভুক্ত হইবেন না। ফলে তাঁহাদের পক্ষে শাসন-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রভৃত্যগণের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দেশের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ সরকারের নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রভৃত্যগণ আইন ও নীতিকে কার্যে রূপান্তরিত করেন। শাসন পরিচালনায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতা মন্ত্রিবর্গকে প্রভূতভাবে সাহায্য করিয়া থাকে।

*"It seems likely that the immediate future of political development will be marked by a further expansion of the powers of the Executive".

নিয়োগ পদ্ধতি (Mode of Appointment) : রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। রাষ্ট্রভৃত্যগণের সততা, কর্মকুশলতা এবং নিজ নিজ কাজে দক্ষতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হওয়া দরকার। ইহাও স্পষ্ট যে, যে সরকার তাহাদের নিয়োগ করিয়া থাকেন তাহাদের পরিবর্তন হইতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকেন। এই রাষ্ট্রভৃত্যরাই দেশের শাসনকার্য সচল রাখিয়া থাকেন। স্বভাবতই তাহাদের নিয়োগ ব্যবস্থাটি এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে শাসনকার্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগের ব্যাপারে শাসন কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই নিয়োগ পদ্ধতি এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পরবর্তীকালে তাহাদের নিজ স্বার্থে রাষ্ট্রভৃত্যগণকে ব্যবহার করিতে না পারেন। গ্ল্যাডস্টোনের আমলে ইংল্যাণ্ডেই সর্বপ্রথম এই নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সুস্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই রাষ্ট্রভৃত্যগণকে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। এই সব পরীক্ষা প্রার্থীদের গুণাগুণ এবং প্রার্থী বাছাই সমস্ত ব্যাপারটাই একটি স্থায়ী সংস্থা বা পরিষদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সংস্থার উপর শাসন কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। সংস্থার সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য নিয়োগ করা উচিত। ইহাতে দেখা প্রয়োজন যে এই সংস্থার পক্ষে উপযোগী, যথার্থ গুণী এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাই যেন এই সংস্থায় সদস্য নিযুক্ত হন। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রভৃত্যগণের ব্যাপারে কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগকারী কমিশন গঠনের ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম হইল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (Union Public Service Commission) এবং অংগরাজ্যের জন্য রাজ্য সার্ভিস কমিশন (State Public Service Commission)।*

সারসংক্ষেপ

[ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল কথা হইল সরকারের তিন প্রকারের কার্য যেমন আইন প্রণয়ন, শাসন কার্য পরিচালনা এবং বিচার ব্যবস্থা এই তিনটি কার্য তিনটি স্বতন্ত্র বা পৃথক বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সহিত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি বিশেষভাবে জড়িত। এই নীতি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—(১) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না; (২) একই ব্যক্তি একটির বেশী বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবে না; (৩) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না।

* "Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State. Article 315 (1) of the Constitution of India.

মতবাদের ইতিহাস : ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদের সূত্রপাত অ্যারিষ্টট্ল করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মতবাদকে বিশেষভাবে পরিবর্তন করেন ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু। ইংরাজ আইনজ্ঞ ব্ল্যাকষ্টোন ও মার্কিন রাজনীতিবীদ ম্যাডিসন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদকে জোরালো করেন। এই মতবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতা এবং ফরাসী বৈপ্লবিকদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

সমালোচনা : বর্তমানকালে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহুদিক দিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে। বাস্তব ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই ক্ষমতা পৃথকীকরণ সম্ভব হয় নাই। প্রায় সকল রাষ্ট্রেই এক বিভাগ অপর বিভাগকে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। প্রয়োজন অনুযায়ী এক বিভাগ অপর বিভাগের দায়িত্ব পালন করিতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ বাঞ্ছনীয় নয় এবং কাম্যও নহে।]

১৩ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও আইন-ব্যবস্থা

(Union Executive and Union Legislative)

[ভারত ইউনিয়ন ও রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা—ভারতের রাষ্ট্রপতি ; ক্ষমতা ও পদমর্যাদা—প্রধানমন্ত্রী ; ক্ষমতা ও পদমর্যাদা—আইন বিভাগ, এক পরিষদীয় ও দ্বি-পরিষদীয়, ভারত ইউনিয়নের আইনবিভাগ, ইহার গঠন এবং কার্যাবলী—আইন প্রণয়ন পদ্ধতি]

[Union and State Executives in India—President of India ; Powers and Position—Prime Minister : Powers and Position of the Prime Minister—Legislative, Uni-Cameral and Bi-Cameral—Union Legislative in India : Its composition and functions—Process of Law Making.]

যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা

(Union and State Executives in India) :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র। এখানে মোট ২২টি অংগরাজ্য এবং ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের নীতি অনুযায়ী এখানে দুই ধরণের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে—ইউনিয়ন বা কেন্দ্র শাসন-ব্যবস্থা (Union Government) এবং রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা (State Government)। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান হইলেও সংবিধান প্রণেতারা ভারতে একটি পার্লামেন্টীয় অথবা মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার (Parliamentary or Cabinet System of Government) প্রবর্তন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় একজন আনুষ্ঠানিক শাসনকর্তা থাকিবেন। তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ এবং রাজ্য বিধান সভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা এক বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবেন। কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী সমেত একটি মন্ত্রিমণ্ডলী থাকিবে। এই মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার সদস্য হইবেন এবং সমস্ত কার্যের জন্য আইনসভার (Parliament) নিকট দায়ী থাকিবেন। সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় কার্যপালিকা শক্তি (Executive Power) রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ যাবতীয় শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের অংগরাজ্যগুলির ক্ষেত্রে পৃথক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা হইলেন রাজ্যপাল (Governor)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অংগরাজ্যের শাসনকর্তাদের রাজ্যপাল বলিয়া অভিহিত করা হয়। মার্কিন শাসন-ব্যবস্থায় রাজ্যপালদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে রাজ্যপাল ৫ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর রাজ্যপালের অস্তিত্ব নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও একজন

নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান। তাঁহার কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সমেত একটি মন্ত্রিমণ্ডলী আছে—বাস্তবে মন্ত্রিমণ্ডলীই রাজ্য শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। মন্ত্রীসভা তাঁহাদের কার্যের জন্য রাজ্যের বিধান-সভার নিকট দায়ী থাকেন।

রাষ্ট্রপতি ঃ

(President)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল রাষ্ট্রপতির পদ। সংবিধানের ৫২ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, 'ভারতে একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন।* ৫৩ ধারায় বলা হইয়াছে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর বর্তাইবে এবং সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা এই শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন।** বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কোন প্রশাসন ক্ষমতাই নিজ দায়িত্বে প্রয়োগ করেন না। তাঁহার মন্ত্রীরাই তাঁহার পক্ষ হইতে যাবতীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতি পদের নিয়োগ ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে হইবে। তিনি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন—অবশ্য তিনি পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারিবেন। কতবার নির্বাচিত হইতে পারিবেন সে সম্পর্কে সংবিধানে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই তবে এখন পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রপতিই দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সংবিধান প্রণয়নকারী কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ আম্বেদকার পরোক্ষ নির্বাচনের সমর্থনে তিনটি যুক্তি দিয়াছিলেন—(১) প্রায় ১৬ কোটি ভোটদাতার ভোট গ্রহণ করা সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের এক বিরাট বাধা, (২) এই ভোট গ্রহণ পদ্ধতি প্রশাসন যন্ত্রের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করিবে, (৩) সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে একজন প্রসাশনিক ক্ষমতাবিহীন নাম সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচন একান্তই অপ্রাস-ঙ্গিক হইবে। এই নির্বাচন পদ্ধতি কিছুটা অভিনব এবং জটিল। রাষ্ট্রপতিকে একটি বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হইতে হইবে। এই নির্বাচক মণ্ডলী পার্লামেন্টে উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হইবে। সংবিধানে আরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে যাহাতে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব একই হারে হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং রাজ্যগুলির সমষ্টিগত ভোট এবং কেন্দ্রের ভোটের মধ্যে যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করা।

---

* "There shall be a President of India."—Article 52 of the Constitution of India.

** The Executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution—Ibid—Article 53 (1)

এই ভোটের ব্যাপারে বিধানসভার প্রত্যেক সদস্য কতগুলি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন তাহা নিম্নলিখিতভাবে স্থির করা হয়। একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। এইবার যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাকে আবার ১০০০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। এইবার যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোট সংখ্যা। যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভাগশেষ ৫০০ বা তাহার অধিক হইয়াছে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের ভোট সংখ্যা একটি করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝান যাইতেছে। ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা হইল ৩,৫০,৭০,০০০ এবং বিধান সভার নির্বাচিত সভ্য সংখ্যা ২৮০ জন। এখন মোট জনসংখ্যাকে সদস্য সংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল হইবে ১,২৫,২৫০; এই ভাগফলকে ১০০০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হইবে '১২৫' এবং ভাগশেষ থাকিবে ২৫০। সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার প্রত্যেকটি সদস্যের ১২৫টি করিয়া ভোট দিবার অধিকার থাকিবে। বিধান সভার ন্যায় পার্লামেন্টেরও প্রতিটি নির্বাচিত সদস্য কতগুলি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন তাহার পদ্ধতিও ঠিক করা হইয়াছে। রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যদের মোট ভোট সংখ্যা নির্ণয় করিয়া ঐ সংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয়কেন্দ্রের নির্বাচিত মোট সদস্যসংখ্যার দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। ভাগফল হইবে পার্লামেন্টের প্রত্যেকটি সদস্যের ভোট দিবার অংক বা ভোট মূল্য। ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে (শ্রী ভি. ভি. গিরির নির্বাচনের সময়) পার্লামেন্টের প্রতিটি সদস্যের ৫৭৬ করিয়া ভোটের অধিকার বা ভোট মূল্য ছিল।

(সংবিধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কি ভাবে ভোট প্রদান করিতে হইবে তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিকে গ্রহণ করিয়াছি। একথা উল্লেখ্য যে আমরা আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র হইতে এই ভোট পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছি। এই ভোট ব্যবস্থায় ভোট দাতা নির্বাচনে যতগুলি প্রার্থী দাঁড়াইবেন ঠিক ততগুলিই পছন্দ (Preference) জানাইতে পারিবেন। পছন্দ প্রার্থীদের নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে ভোটদাতা পরবর্তী পছন্দ নাও জানাইতে পারেন কিন্তু 'প্রথম পছন্দ' তাহাকে জানাইতেই হইবে। তাহা না হইলে তাঁহার ভোটপত্র (ballot paper) বাতিল হইয়া যাইবে। ভোটপর্ব শেষ হইলে পর ভোট প্রার্থীদের মধ্যে কে কত প্রথম পছন্দের ভোট লাভ করিয়াছেন তাহা গণনা করা হয়। এই নির্বাচন ব্যবস্থায় জয়লাভ করিতে হইলে প্রার্থীকে একটি নির্দিষ্ট ভোট সংখ্যা (কোটা) লাভ করিতে হইবে; সমস্ত নির্বাচন প্রার্থীর 'প্রথম পছন্দে'র মোট ভোট সংখ্যাকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ১ যোগ

* In accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot."—Article 55 (3) of the Constitution of India.

করিতে হইবে। এই সংখ্যাকেই কোটা (Quota) বলা হয়। যে প্রার্থী এই 'কোটা' বা তাহার অপেক্ষা বেশী 'প্রথম পছন্দ' ভোট পাইবেন তাহাকেই নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। অন্যদিকে যদি কেহই এই 'কোটা' না পান তাহা হইলে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা কম ভোট লাভ করিয়াছেন তাহাকে নির্বাচন হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং তাহার ব্যালট পত্রগুলি অবশিষ্ট প্রার্থীদের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। এইভাবে ভোট হস্তান্তরের কাজ চলিতে থাকে যে পর্যন্ত না কোন প্রার্থী ঐ 'কোটা' নির্দিষ্ট ভোট না পান।)

পরোক্ষ নির্বাচন কেন ? ভারত একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র। অনেক সমালোচক মনে করেন এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভারতের সংবিধান প্রণেতারা প্রধানতঃ তিনটি চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যাপারে পরোক্ষ ভোট ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। (১) এই বিরাট দেশে একটি পদের জন্য কোটি কোটি লোকের ভোট গ্রহণ করা এক বিরাট শ্রমসাধ্য ব্যাপার, (২) এই ভোট গ্রহণ পদ্ধতি প্রশাসন যন্ত্রের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করিবে, (৩) একজন ক্ষমতাবিহীন নাম সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের জন্য এই ধরণের বিপুল অর্থ ও শ্রম ব্যয় করা একটি নিরর্থক ব্যাপার।

রাষ্ট্রপতিদের পরিচয়ঃ ভারতে এ পর্যন্ত মোট পাঁচজন রাষ্ট্রপতি পদ অলংকৃত করিয়াছেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সংবিধান প্রবর্তন হইবার পর নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের ৬ই মে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ঐ পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৬২ সালে বিশিষ্ট দার্শনিক স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে নির্বাচিত হইয়াছিলেন ডঃ জাকীর হুসেন। ডঃ জাকীর হুসেনকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দুভাগ্যক্রমে ডঃ হুসেন তাঁর কার্যকাল সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ১৯৫৭ সালে তাঁহার পরলোকগমনের পর ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি। ১৯৫৭ সালে বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীফকিরুদ্দিন আলি আহমেদ নির্বাচিত হইয়াছেন।

যোগ্যতাঃ রাষ্ট্রপতিপদ প্রার্থীর জন্য সংবিধান নিম্নলিখিত যোগ্যতা নির্ণয় করিয়াছেনঃ (১) তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, (২) তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই, (৩) তাঁহার লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতা থাকা চাই, (৪) তিনি ভারতসরকার বা কোন রাজ্য-সরকার বা অন্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না (অবশ্য, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল বা কোন মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ব্যক্তি এই নিয়মের আওতায় আসিবেন না), (৫) রাষ্ট্রপতিপদ প্রার্থী সংসদ বা বিধানসভার সদস্য হইতে পারিবেন না (যদি কেহ সদস্য থাকেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইবে।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাণী দপ্তর বণ্টনের কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না।

(৫) ইংলণ্ডের রাণী ঐতিহাসিক সূত্রে 'কমনওয়েলথভুক্ত' রাষ্ট্রগুলির প্রধান (Head of the Commonwealth) বলিয়া অভিহিত হন। ঔপনিবেশগুলির প্রধান হিসাবে তিনি প্রভূত পদমর্যাদা ও সম্মান ভোগ করিয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি এই ধরণের কোন পদমর্যাদা ভোগ করেন না। কিন্তু আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। নজির হিসাবে আমরা পরলোকগত ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও ডঃ জাকীর হুসেনের অবদানের কথা উল্লেখ করিতে পারি।

(৬) ইল্যণ্ডের রাজা বা রাণীর কোন দলভুক্ত হইবার প্রয়োজন হয় না। স্বভাবতই তাঁহাদের পদে 'দল নিরপেক্ষ' রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কাজ করা একান্তই সহজ ব্যাপার। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে একেবারে 'দলনিরপেক্ষ' থাকা বোধ হয় সম্ভব নহে। এ ব্যাপারে লর্ড জেনিংস (Jennings) এর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'রাজা বা রাণীর পক্ষে তথাকথিত 'দল নিরপেক্ষতা' পালন করা যতখানি সম্ভব একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রপতি তাঁহার অতীত দল বা রাজনীতিকে সহজে ত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু রাজার কোন দল নাই—তাঁহাকে একটি বিশেষ যান্ত্রিক পরিবেশে বড় হইতে হইয়াছে।*

ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতবর্ষেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে 'রাষ্ট্রপতি' বলা হয় তিনি একটি বিশেষ নির্বাচক-মণ্ডলীর দ্বারা চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে এই ব্যবস্থার সংগে ভারতীয় সংবিধানে কিছু কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানকে রাষ্ট্রপতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনিও একটি বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলীর (পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যবৃন্দের) দ্বারা ভোটে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া পাঁচ-বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধেও সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির দ্বারা অভিযোগ আনা যায় এবং তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায়। তত্ত্বগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় 'কার্যপালিকা ক্ষমতা' (Executive Power) রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রী সমেত একদল মন্ত্রিমণ্ডলী রহিয়াছেন।

---

* Quoted from A Survey of the Indian Constitution."—Dr. Anil Ch. Banerjee. and K. L. Chatterjee.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবার জন্য বিভাগীয় সচিববৃন্দ রহিয়াছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে দুই দেশের দুই রাষ্ট্রপতির পদের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকিলেও ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে দুইটি পদের মধ্যে গুরুতর বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভারতের সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রপতিকে ইংলন্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায় 'নাম সর্ব্বস্ব' রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ক্ষমতা প্রদান করিতে চাহিয়াছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভাই প্রয়োগ করিবেন। মন্ত্রি-পরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় তিনি দেশের প্রকৃত শাসক নহেন। স্বভাবতই ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিক হইতে দুই পদের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। একথাও বলা যাইতে পারে ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার ন্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির তুলনায় অধিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভোগ করিয়া থাকেন। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একদিকে শাসন বিভাগের কর্ণধার এবং অন্যদিকে তিনি (Head of the state) কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হইলেও তিনি ভারতের কর্ণধার নহেন। প্রধানমন্ত্রীই ভারতের যথার্থ কর্ণধার।

উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President) সংবিধানের ৬৩ নম্বর ধারায় একজন উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President) পদের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষ রাজ্য সভার চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতিও পদাধিকার বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ সেনেটের সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। ইহাতে উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা তিনি অসুস্থ হইলে অথবা কোন কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উপরাষ্ট্রপতি তাহার কার্যভার গ্রহণ করিবেন। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে (পদত্যাগ অপসারণ অথবা রাষ্ট্রপতির কার্যকালের ভিতর মৃত্যু ঘটিলে) উপ-রাষ্ট্রপতির যে পর্যন্ত না নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় সে পর্যন্ত তাহার স্থলাভিষিক্ত থাকিবেন।

নির্বাচন, কার্যকাল ও যোগ্যতা ঃ রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হইতে হইলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা প্রয়োজন ঃ (১) তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, (২) তাহার বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইতে হইবে, (৩) তাঁহার রাজ্যসভার সদস্য হইবার যোগ্যতা থাকা চাই, (৪) তিনি কোন লাভজনক পদে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

উপরাষ্ট্রপতি তাঁহার পদে পাচ বৎসরকাল থাকিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনিও পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারিবেন। সংবিধানের ৬৬ নং ধারা

অনুযায়ী তিনি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ হইতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন।

রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ (President's powers relating to Emergency) সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে তিনপ্রকারের জরুরী অবস্থার ক্ষমতা দিয়াছে, (১) জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা ক্ষমতা (Proclamation of Emergency), (২) অংগ রাজ্যগুলিতে শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা (Proclamation in case of failure of Constitutional Machinery in a State), (৩) আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা (Proclamation of Financial Emergency)

জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা ঃ সংবিধানের ৩৫২ নম্বর ধারায় জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপ্রতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগের আশংকা আছে যাহার ফলে ভারতের কিম্বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে তাহা হইলে তিনি ঐ সম্পর্কে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। এই জরুরী অবস্থা ঘোষণায় তাঁহাকে রাজ্যসরকারগুলির কোন সম্মতি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে হইলে উক্ত রাজ্যের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯৫৭ সালের ৩৮ তম সংবিধান সংশোধনে এব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দিয়াছে। এই সংশোধন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবেন তাহা আদালতে বিচার্য নয়। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টিই চূড়ান্ত।

ঘোষণার মেয়াদ ঃ রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণা সম্পর্কীয় আদেশ পার্লামেন্টের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে। পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ এই ঘোষণা অনুমোদন না করিলে ইহার মেয়াদ দুই মাসের বেশী বলবৎ থাকিবে না। যদি এই ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় পরিষদই অনুমোদন করে তবে ইহা দুই মাসের বেশী বলবৎ থাকিবে। জরুরী অবস্থা কতদিন বলবৎ থাকিতে পারে সে সম্পর্কে কোন সময়-সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে নিম্নলিখিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

(১) এই ঘোষণার সময় কেন্দ্রীয় সরকা যে কোন অংগ রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা কি ভাবে চালিবে তাহার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ জরুরী অবস্থা থাকিলে লোকসভার মেয়াদ পাঁচবৎসরকে এক বৎসর করিয়া বাড়াইয়া লওয়া যাইবে।

(৩) পার্লামেণ্ট যে কোন রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৪) জরুরী অবস্থার ভিতরে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা পরিবর্তন হইতে পারে।

(৫) জরুরী অবস্থা থাকাকালীন মৌলিক অধিকারগুলি অকার্যকর হইতে পাবে। এ সম্পর্কে আদালতে কোন বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাইবে না।

ভারতে এ পর্যন্ত তিনবার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। চীনেব সহিত সীমান্ত সংঘর্ষ উপলক্ষ করিয়া ১৯৬২ সালের ২৬ শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৫৭ সালের ২৬ শে জুন তৃতীয়বার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার ঘোষণা ঃ ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজ্যের রাজ্যপালের বিবরণী হইতে অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হন যে ঐ রাজ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে ঐ রাজ্যের শাসন কার্য সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী চালান সম্ভব নহে তাহা হইলে ঐ রাজ্য সম্পর্কে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা কবিতে পারেন। এই ঘোষণার ফল হিসাবে তিনি ঐ রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা অথবা রাজ্য আইনসভা এবং মহাধর্মাধিকরণ ছাড়া রাজ্যপাল অথবা অন্য যে কোন উচ্চ সরকারী কর্মচারীর কাজ নিজ হাতে তুলিয়া লইতে পারেন ; এই ঘোষণার বলে রাজ্যের আইনসভার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণাকালের ভিতর যদি পার্লামেন্ট বন্ধ থাকে তবে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন সাপেক্ষ ভারতের সঞ্চিত তহবিল (The Consolidated Fund of India) হইতে অর্থব্যয়ের অনুমতিও দিতে পারেন।

ঘোষণার মেয়াদ ঃ রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সামনে উপস্থাপিত করিতে হইবে। ঘোষণার সাধারণ মেয়াদ দুইমাস। পার্লামেন্ট ইচ্ছা করিলে এই মেয়াদের কাল ছয় মাস করিয়া বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসর পর্যন্ত বলবৎ রাখিতে পারেন। ৪৪ তম সংবিধান সংশোধন আইন অনুসারে ইহা ৬ মাসের পরিবর্তে ১ বৎসর করা হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ সংবিধান প্রবর্তনের পর গত ২৬ বৎসরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থার ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবে এই ঘোষণা সর্বপ্রথম বলবৎ করা হইয়াছিল। যুক্তফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালে এই জরুরী ঘোষণার দ্বারা সর্বপ্রথম রাজ্যের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে কেরল রাজ্যে প্রথম এই জরুরী ঘোষণার দ্বারা রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করেন। ইহাও উল্লেখ্য যে ঐ সময় কেরলে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে যে কমিউনিস্ট মন্ত্রিমণ্ডলী ছিল তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জরুরী অবস্থা ঘোষণার দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শিক্ষা বিলকে উপলক্ষ করিয়া কেরল রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমগ্ররাজ্য জুড়িয়া যে আন্দোলন

মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ঐ আন্দোলন শুরু করে এবং রাজ্যের রাজ্যপাল শাসনতান্ত্রিক সংকট সম্পর্কে যে বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন তাহাতে পার্লামেন্টের তীব্র বাদানুবাদ দেখা দেয়।

আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা ঃ সংবিধানের ৩৬০ ধারায় বলা হইয়াছে যে, ভারতে বা ভারতের যে কোন অংশে আর্থিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হইলে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। ঘোষণার পর পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য উহা উভয়কক্ষের সামনে উপস্থাপিত করিতে হয়। এইরূপ ঘোষণা তিন বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিতে পারে।

ঘোষণার ফল ঃ আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন রাজ্যকে নির্দেশ দিয়া আর্থিক সমীচীনতার নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। ইহা ছাড়া ঐ রাজ্যের অর্থবিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত করিবার নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে।

জরুরী অবস্থার সমালোচনা ঃ রাষ্ট্রপতির হস্তে কেন্দ্র বা রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আপৎকালীন অবস্থার আশংকায় অথবা আপৎকালীন অবস্থা অনুষ্ঠিত হইলে যে সমস্ত জরুরী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়।

(১) অনেকে মনে করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা থাকে। এই ঘোষণা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির 'সন্তুষ্টি'ই হইল সর্বাপেক্ষা বড় কথা। এই ঘোষণা সম্পর্কে আদালতের কোন প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই।

(২) অন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির তুলনায় ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব কমই জোর দেওয়া হইয়াছে।

(৩) জরুরী অবস্থা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকিলে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে।

(৪) ঘন ঘন জরুরী অবস্থা ঘোষণার দ্বারা অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

ইহাও ঠিক যে ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয়সংহতি বজায় রাখার জন্য জরুরী ঘোষণার প্রয়োজন ঘটে। স্বৈরাচারিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়া সম্পর্কে বলা হয় যে, এই আশংকা অমূলক। রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান হিসাবেই এই সব ঘোষণা করিয়া থাকেন। মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিবেন। জনপ্রিয় সরকার হিসাবে মন্ত্রগণ পার্লামেন্টের নিকট তাঁহাদের কার্যকলাপের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকিবেন। সুতরাং স্বৈরাচারিতার অবকাশ এখানে কম।

দেশে বিশৃংখলা ও অনাচার দেখা দিলে জরুরী অবস্থার প্রয়োজন আছে। শ্রীবিনোবা ভাবে জরুরী অবস্থাকে 'অনুশাসন পর্ব' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

জরুরী অবস্থার মাধ্যমে কর্মতৎপরতা ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য জরুরী অবস্থার মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া অকার্যকর থাকিলে জনসাধারণের মনে হতাশা ও গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ঃ আমরা ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। তত্ত্বগতভাবে বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হইবে রাষ্ট্রপতি একজন 'প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি'। সে যুগের মুঘল বাদশাদের সঙ্গেই বোধকরি তাঁহার ক্ষমতার তুলনা চলে। কিন্তু সংবিধানের ধারাগুলি আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা একান্তই সীমিত। সংবিধানের ৭৪ (১) ধারায় বলা হইয়াছে "রাষ্ট্রপতির আপন কৃত্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে; ঐ মন্ত্রি-পরিষদের শীর্ষে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন।" * আবার সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী আইনে, ১৯৫৭, বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। দেখা যাইতেছে কার্যপালিকা শক্তির ক্ষেত্রে শুধু রাষ্ট্রপতিই একক নহেন—তাঁহাকে মন্ত্রণা দিবার জন্য একদল মন্ত্রি পরিষদও থাকিতেছেন। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে ৫২ ও ৭৪ নং ধারা সংবিধানের পঞ্চম ভাগের প্রথম অধ্যায়ের ভিতরেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ডক্টর কে. ভি. রাওএর মতে যখন ঐ দুইটি ধারা একই অধ্যায়ের ভিতর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে রাষ্ট্রপতির ন্যায় মন্ত্রিপরিষদও কার্যপালিকা শক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, ইহারা উভয়েই সংবিধানের সৃষ্টি এবং সহ অবস্থানের ভূমিকা গ্রহণ করিবে—যদিও মন্ত্রিপরিষদকে রাষ্ট্রপতিই নিযুক্ত করিবেন; একথাও ঠিক যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ ছাড়া থাকিতে পারিবেন না—তিনি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন বা না করেন। ৫২ এবং ৭৪ নম্বর ধারার 'shall' বা 'অবশ্যই' এই কথাটির ইহাই হইল তাৎপর্য। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রভূত ক্ষমতার মালিক হইলেও এই সব ক্ষমতা তিনি স্বীয় বুদ্ধি অনুযায়ী এককভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। একদল মন্ত্রিপরিষদ তাঁহার ক্ষমতার ভাগীদার হিসাবে রহিয়াছেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ভারতের রাষ্ট্রপতির কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে—আবার বহু ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর সহিত তাহার ক্ষমতার মিল রহিয়াছে—অর্থাৎ সংবিধান প্রণেতারা তাঁহাকে কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের ছাঁচে তৈয়ারী করিতে চাহেন নাই। তিনি মন্ত্রি পরিষদের বা প্রধানমন্ত্রীর শুধুমাত্র একজন ক্রীড়নক নহেন। রাষ্ট্রপতি সংবিধানে কি ভূমিকা গ্রহণ করিবেন তাহা অনেকখানি রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর

* 'There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions.

নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করিবে—আরও নির্ভর করিবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দলব্যবস্থার উপর।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ভারত একটি 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'। ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে একজন নাম-সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান আছেন। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি সীমিত ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রশাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। সংবিধানের ৭৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে 'রাষ্ট্রপতির কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একদল মন্ত্রীমণ্ডলী থাকিবেন।'* ৭৫ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে, 'রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিবেন।' তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতির উল্লেখিত ক্ষমতা থাকিলেও বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির পছন্দ ও মনোনয়নের ক্ষমতা একান্তই সীমিত। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হয়। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রধানমন্ত্রীকে পার্লমেন্টের কোন নির্দিষ্ট কক্ষের সদস্য হইতে হইবে এই রকম কোন নির্দেশ সংবিধানে দেওয়া হয় নাই। তবে এ ব্যাপারে আমরা বৃটিশ প্রথাকেই গ্রহণ করিয়াছি। ইংলণ্ডে সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ কমন্স সভার সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। ১৯০২ সালের পর হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে প্রথম ২ জন প্রধানমন্ত্রী, পরলোকগত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রী-জী লোকসভার সদস্য ছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও লোকসভার সদস্যা—অবশ্য ১৯৬৬ সালে তিনি যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন তখন তিনি রাজ্যসভার সদস্যা ছিলেন—পরবর্তীকালে একটি উপনির্বাচনে লোকসভা হইতে নির্বাচিত হইয়া তিনি উপরোক্ত প্রথাকেই (প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সদস্য হইবেন) স্বীকৃতি দিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা, কার্যকাল ও ক্ষমতা ঃ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতার জন্য কোন নির্দিষ্ট সর্ত বা নিয়মাবলী উল্লেখ করা হয় নাই। তবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রের কর্ণধার বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রধানমন্ত্রীকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি হইতে হইবে। তাঁহার পদের জন্য কর্মকুশলতা, সাহসিকতা, ধী-শক্তি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণাবলী বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহাকে অসাধারণ বাগ্মী হইতে হইবে না তবে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহার দক্ষতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সংবিধানে যদিও লো

* "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice."—Constitution (44th Amendment) 1976.

হইয়াছে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করিয়া থাকেন।* প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা এ ব্যাপারে একান্তই আনুষ্ঠানিক। প্রধানমন্ত্রীই তাঁহার ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মনোনীত করিয়া থাকেন। এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দাবী-দাওয়া এবং সমস্যাগুলিকে স্মরণ রাখিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের দুরূহ কাজ সম্পন্ন করিতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিমণ্ডলী : প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহার সুপারিশেই রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন্ত্রীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। (১) ক্যাবিনেট শ্রেণীর মন্ত্রী (Cabinet Ministers), রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) এবং সহকারী মন্ত্রী (Deputy Ministers)। সমগ্র মন্ত্রিসভার সংখ্যা (Council of Ministers) ৫০ হইতে ৬০ জন। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রী হইলেন ক্যাবিনেটভুক্ত মন্ত্রীরা। ইঁহাদের সংখ্যা ১৫ হইতে ১৭ জন। দলের মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী এবং বিচক্ষণ সদস্যরাই ক্যাবিনেট সদস্য হইবার মর্যাদা লাভ করেন। প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন না হইলে কেহই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। আবার প্রধানমন্ত্রীর আস্থা হারাইলে হয় পদত্যাগ করিতে হইবে অন্যথা অপসারিত হইতে হইবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। যদিও সংবিধানে বিভিন্ন দপ্তর বণ্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে—বাস্তবে প্রধান মন্ত্রীই দপ্তর বণ্টন এবং প্রয়োজন মত পুনর্বণ্টন করিয়া থাকেন। মন্ত্রিসভার বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রধান মন্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি : প্রধানমন্ত্রী হইলেন রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। তাঁহার পরামর্শক্রমেই অন্যান্য মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিয়া থাকেন। প্রধানমন্ত্রী একদিকে রাষ্ট্রপতি ও অপরদিকে মন্ত্রিসভার মধ্যে যোগ সূত্র হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন। সংবিধানের ৭৮ ধারায় রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর তিনটি কর্তব্য উল্লেখ করা হইয়াছে—"(১) যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা সম্পর্কে ও আইন প্রণয়ন সম্পর্কে মন্ত্রিসভার সর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন করা, (২) শাসন ও আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যদি কিছু জানিতে চাহেন তাহা তাঁহাকে জানান, (৩) কোন বিষয়ে যদি কোন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন এবং যদি তাহা মন্ত্রিসভায় আলোচিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বোধ করিলে ঐ বিষয়টি মন্ত্রিসভায়

* 'The Prime Minister shall be appointed by the President and other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister'—Article 75 (1) of the Constitution of India.

উত্থাপন করিতে হইবে।"* প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে তিনি নতুন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন আবার তাঁহার সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কোন বিশেষ মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত করিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই লোকসভা ভাঙিয়া দিতে পারেন। ১৯৭০ সালের ২২শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শ ক্রমে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই (১৯৫৭ সাল পর্যন্ত লোকসভার কার্যকাল ছিল) সর্ব প্রথম লোকসভা ভাঙিয়া দেন এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। সংবিধানের ভাষা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হইলেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী তিনিই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার।

প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্ট: পার্লামেন্টের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়া থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের পক্ষ হইতে সরকারের মূল নীতিগুলির ব্যাখ্যা প্রধানমন্ত্রী করিয়া থাকেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও দলীয় সংহতি রক্ষা করা তাঁহার অন্যতম দায়িত্ব। দলনেতা হিসাবে তিনি বিভিন্ন বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সহযোগী মন্ত্রীদের নানা প্রকার সাহায্য ও পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহার পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙিয়া দিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা: খুব স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিসভার স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার উত্থান পতনের উপরই মন্ত্রিসভার স্থায়ীত্ব নির্ভর করে। বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি 'Key Stone of the cabinet arch' (প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট তোরণের মধ্যমণি)। এ-কথাটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রধানমন্ত্রী যাহাতে এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন সেজন্যই তাঁহার উপর তাঁহার সহযোগী মন্ত্রিদের মনোনয়ন এবং অপসারণের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। সরকারের নীতি গ্রহণ ব্যাপারে, পার্লামেন্টে দলীয় নেতা হিসাবে এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের মধ্য দিয়া এবং জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আজ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। খুব সংগত

* 'It shall be the duty of the Prime Minister—

(a) To communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation.

(b) To furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for: and

(c) If the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.'—Article 78 (a), (b) and (c) of the Constitution of India.

ভাবেই ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছিলেন 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহিত ভারতের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদই যথার্থভাবে তুলনীয়।* সংবিধান প্রবর্তনের পর গত ২৮ বৎসরে যে তিনজন প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন (পন্ডিত নেহেরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং শ্রীমতী গান্ধী) তাঁহারা সকলেই এই বক্তব্যের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অধ্যাপক জে. সি. যোহারীর ভাষায় বলিতে হয়—'তিনি (প্রধানমন্ত্রী) দল এবং সরকারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি।'**

ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে পার্থক্য: পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে দেশের শাসনকার্যে চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণ 'ক্যাবিনেট' সভাই করিয়া থাকেন। ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রিসভার (Council of Minister) মধ্যে পার্থক্য আছে। কেন্দ্রের সকল মন্ত্রিকেই মন্ত্রিসভার সদস্য হইতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রপরিষদের সকল সদস্যই ক্যাবিনেটের সদস্য নন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ৫৫ হইতে ৬০ জন পর্যন্ত হইয়াছে।

'ক্যাবিনেট' একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মন্ত্রিপরিষদ। যদিও ইহার কোন ব্যবস্থা সংবিধানে নাই। আমরা এ ব্যাপারে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণ করিয়াছি। ক্যাবিনেটের সদস্য সংখ্যা ১৪ হইতে ১৭ জন পর্যন্ত করা হইয়াছে। মন্ত্রিসভার প্রধান কর্মকর্তারাই ক্যাবিনেটের সদস্য হইতে পারেন।

বৃটেনে ক্যাবিনেট মন্ত্রিরা যৌথদায়িত্ব (Collective Responsibility) লইয়া শাসনকার্য চালাইয়া থাকেন। ইহার অর্থ হইল দেশ শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব এই ক্যাবিনেট সভার উপর। ক্যাবিনেট দেশ শাসনের মূল নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং সরকার ও দলের উপর প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। মন্ত্রিসভা ক্যাবিনেটের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। আমাদের দেশে আমরা এই যৌথদায়িত্বের নীতি ও প্রথাকে গ্রহণ করিয়াছি। নীতিগত কোন প্রশ্নে কোন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে অথবা সরকারের কোন মূল প্রস্তাব লোকসভা কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে ক্যাবিনেট এবং সেই সঙ্গে সমস্ত মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।***

ক্যাবিনেট সভার নিয়মিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মন্ত্রিসভার নিয়মিত অধিবেশন হয় না।

---

* 'If any functionary under our Constitution is to be Compared with the United States President, it is the Prime Minister and not the President of the Union'. Dr. Ambedkar, Constituent Assembly Debates, Vol. II, 1944-45

** 'He is the most important, and therefore the most powerful person both in his party and in his Government.'—J. C. Johari, India Government and Politics, P. 427

*** 'The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.''—Article 75 (3) of the Constitution of India.

ক্যাবিনেট সদস্যরাই সরকারের শাসনকার্য এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা এই নীতিগুলিকে কার্যে রূপান্তরিত করিয়া থাকেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী তুলনা : ভারত ও বৃটেনের শাসন-ব্যবস্থা অনেকখানি সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় দেশে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে—উভয় দেশের প্রধান শাসনকর্তা (রাষ্ট্রপতি অথবা রাজা বা রাণী) নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান। দুইটি দেশেই প্রধানমন্ত্রি সমেত মন্ত্রীমণ্ডলী যাবতীয় শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সহিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর যেসব সাদৃশ্য আছে—আবার যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে—

(১) ভারতের প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় মন্ত্রিপরিষদের প্রধান (Head of the Council of Ministers)। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। বৃটেনের রাজা বা রাণী কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

(২) বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীকে প্রথাগত হিসাবে পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ হাউস-অফ কমন্সের সদস্য হইতে হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও সাধারণতঃ পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ লোকসভা হইতে নির্বাচিত হন।

(৩) উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীই শাসন ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করেন। উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন।

(৪) উভয় দেশেরই শাসক প্রধান (রাষ্ট্রপতি অথবা রাজা বা রাণী) প্রধানমন্ত্রীর উপদেশক্রমে পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ নির্দিষ্টকাল শেষ হইবার পূর্বেই ভাঙিয়া দিয়া থাকেন।

(৫) উভয় দেশেরই প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনয়ন করিয়া থাকেন। আবার তাঁহার উপদেশ অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান মন্ত্রীদের অপসারণ করিতে পারেন। উপরোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে দুইটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে উভয়ের ক্ষমতার কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

(ক) ভারতের শাসক প্রধান নির্বাচিত ব্যক্তি, কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনসভার সদস্যদের দ্বারা তাঁহাকে নির্বাচিত হইতে হয়। স্বভাবতঃই ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টার ফলেই ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে ডঃ জাকীর হোসেন নির্বাচিত হন। এ সম্পর্কে জে. এস. কুরেসীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'The Prime Minister thus supported his candidature as she was anxious to have a person of her own choice for the presidency.'

ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি শ্রীভি. ভি. গিরির নির্বাচনেও প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। শ্রীমতী গান্ধীর বিরোধীদল (সিন্ডিকেট বলিয়া পরিচিত) রাষ্ট্রপতি হিসাবে শ্রীনিলম সঞ্জীব রেড্ডীকে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর তৎপরতার ফলে তাঁহাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শ্রী ভি. ভি. গিরি রাষ্ট্রপতি হিসাবে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন।*

বৃটেনের শাসক প্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন—এ ব্যাপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কোন ভূমিকা নাই।

(খ) বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রাণীকে তত্ত্বগতভাবে দেশের শাসনকার্য ও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে খবরাখবর জ্ঞাপন করেন। ভারতের সংবিধানে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে তিনটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রপতি যদি প্রয়োজনবোধ করেন প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য হইবে কোন মন্ত্রী এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য রাখিতে হইবে। এই ধরণের কোন দায়িত্ব (শাসক প্রধানের ইচ্ছা অনুযায়ী) বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে পালন করিতে হয় না।

(গ) ভারতের সংবিধানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং জরুরী অবস্থা থাকাকালীন রাষ্ট্রপতির উপর প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্রিসভা এবং তাঁহাদের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী এই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। তুলনামূলকভাবে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এই ধরণের জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাবনা একান্তই সীমিত।

বৃটেনে কোন লিখিত দলিল সংবিধান হিসাবে না থাকায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা ভোগ করিলেও ক্ষমতারদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে ভারতের মত এক উপমহাদেশের কর্ণধার হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করিয়া থাকেন।

রাজ্য শাসন ব্যবস্থা

(The Executives of the State)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২২টি অংগরাজ্য এবং ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে। জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোন অংগরাজ্যের নিজস্ব কোন সংবিধান নাই। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ অবস্থার জন্য নিজস্ব সংবিধান রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অংগরাজ্যগুলিতে শাসন-বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ রহিয়াছে।

সংবিধানের ১৫৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক অংগরাজ্যের জন্য রাজ্যপাল (Governor) থাকিবেন। ইহাও বলা হইয়াছে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা

* Indian Government and Politics—J. C. Johari

রাজ্যপালের উপর ন্যস্ত হইবে।* তিনি সরাসরি অথবা তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীদের দ্বারা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

নিয়োগ ও যোগ্যতা : অংগরাজ্যগুলির রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। প্রসংগক্রমে বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির রাজ্যপাল ঐ রাজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। অন্যদিকে ক্যানাডাতে রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

রাজ্যপাল পাঁচ বৎসরকাল তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির খুশী অনুযায়ী তাঁহার পদে বহাল থাকিতে পারিবেন। প্রয়োজন হইলে তাহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারেন। তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি ভারতীয় নাগরিক হইবেন এবং তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই। তিনি পার্লামেণ্ট অথবা রাজ্য আইন-সভার সদস্য হইতে পারিবেন না। ইহা ছাড়া রাজ্যপাল কোন লাভজনক পদ অধিকার করিতে পারিবেন না। রাজ্যপাল নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণতঃ ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যপাল নিয়োগ করা হইয়া থাকে।

পশ্চিমবাংলায় এ পর্যন্ত যাঁহারা রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই রাজ্যের (পশ্চিমবাংলার) অধিবাসী হইলেও তাহার বিশেষ গুণাবলীর জন্য তাঁহাকে পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল করা হইয়াছিল।

ক্ষমতা ও সংবিধানে রাজ্যপালের স্থান : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাজ্যপালের উপর রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে, রাজ্যপালকে তাঁহার কার্যে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সমেত মন্ত্রিমণ্ডলী থাকিবেন। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযারী অন্যান্য মন্ত্রিদের রাজ্যপাল নিযুক্ত করিবেন। রাজ্যপাল কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary powers) ভোগ করিয়া থাকেন। রাজ্যপাল যখন তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে কোন কার্য করিবেন তখন তিনি মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। কোন বিষয়ে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন কিনা তাহা নিরূপণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রাজ্যপালের উপর দেওয়া হইয়াছে। এ সম্পর্কে কোন বৈধতার প্রশ্ন আদালতে উত্থাপন করা যাইবে না।

স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা : রাজ্যপাল কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাহার স্বেচ্ছাধীন বা ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন সে সম্পর্কে নানা অভিমত লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক পাইলীর মতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন

* 'There shall be a Governor for each State'. 'The Executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with 'the Constitution'. Article 153 and 154 (I) of the Costitution of India.

ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ ঘটিতে পারে। ক্ষেত্রগুলি হইল—(১) মন্ত্রিসভা গঠনে পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের প্রশ্নে (সাধারণ নির্বাচনের পর যখন কোন দল বিধানসভায় একক নিরংকুশ সংখ্যাগ রিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারে তখন রাজ্যপালের এই ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে, (২) মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রশ্নে, (৩) নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে রাজ্যবিধানসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, (৪) মুখ্যমন্ত্রীকে তথ্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে, (৫) বিধানসভায় কোন বিল পাস হইবার পর রাজ্যপাল তাহাতে সম্মতি না দিয়া এই ক্ষমতার বলে তাহা বিধান সভায় পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন, (৬) বিধান সভায় পাস হইয়াছে এইরকম বিলকে রাষ্ট্রপতি বিবেচনার জন্য রাখিয়া দিতে পারেন, (৭) কোন রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হইতেছে না এই মর্মে রাষ্ট্রপতিকে সংবাদ জ্ঞাপন করা এবং রাষ্ট্রপতিকে ঐ রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণার জন্য পরামর্শ দেওয়া (৮) কোন বিষয়ে অর্ডিনান্স জারী করিবার পূর্বে ঐ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে নির্দেশ গ্রহণ, (৯) আসাম রাজ্যের উপজাতি অঞ্চলের প্রশাসন সম্পর্কীয় ব্যাপারে রাজ্যপালের ঐচ্ছিক ক্ষমতা, (১০) কোন মন্ত্রী যদি কোন বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থির করিতে চাহেন তবে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে উক্ত বিষয়টি সমগ্র মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য রাখিবার কথা বলিতে পারেন।

রাজ্যপালের এই ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারটিকে অনেকেই সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচকদের মতে রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিবেন। মন্ত্রিপরিষদই বাস্তবে সমস্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদের কার্যের জন্য যৌথভাবে বিধান সভার নিকট দায়ী থাকিবেন।* অনেকে এ মতও পোষণ করিয়াছেন যে ঘন ঘন ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে রাজ্যপালের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু এ অনুমান করাও ঠিক নহে। রাজ্যপাল যখন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন তখন রাজ্যমন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ না করিলেও তাহাকে রাষ্ট্রপতি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে। তাহাকে কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করিতে হইবে। অর্থাৎ রাজ্যপাল তাহার ঐচ্ছিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। যদি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য কিম্বা রাজ্য রাজনীতির অংশগ্রহণে তিনি একজন অংশীদার হিসাবে তাহার ঐচ্ছিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। প্রয়োজন হইলে তিনি রাজ্যপালকে পদচ্যুতও করিতে পারিবেন।

* This means that the Governor is not a free agent in the exercise of his discretion, if he misuses it either as a result of personal ambitions or as a partisans in the currents and the cross currents of State politics, the President can always check him and if necessary he may even dismiss him." India's Constitution, M V. Pylee P 26.

ঐচ্ছিক বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া রাজ্যপালের অংগরাজ্য শাসনের ব্যাপারে বহু ক্ষমতা রহিয়াছে। অবশ্য এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁহার মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি পরিচালিত হন। বাস্তবে তাঁহার মন্ত্রিসভাই রাজ্যপালের নামে অংগরাজ্যের কার্য পরিচালনা করেন। রাজ্যপালের ক্ষমতাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়— (১) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers), (২) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers), (৩) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers), (৪) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা (Judicial Powers) এবং (৫) স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Powers)।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাজ্যের সমুদয় শাসন কার্য রাজ্যপালের নামে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনের দায়িত্ব সংবিধানে তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে (যদিও বাস্তবে মুখ্যমন্ত্রীই তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন)। রাজ্যপাল এ্যাডভোকেট জেনারেল, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং রাজ্য কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়া থাকেন।

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও রাজ্য আইনসভার এক অচ্ছেদ্য অংগ। তিনি আইনসভার অধিবেশন আহবান করেন এবং অধিবেশন স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। তিনি বিধানসভা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ভাংগিয়া দিতে পারেন। যেখানে রাজ্য আইনসভা দুই কক্ষবিশিষ্ট সেখানে উচ্চকক্ষে (বিধান পরিষদে) কয়েকজন সদস্য মনোনয়ন করিয়া থাকেন। তিনি বিধানসভায় (নিম্নকক্ষে) এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য কয়েকজন সদস্য মনোনয়ন করিয়া থাকেন। পশ্চিম বংগের বিধান সভায় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত দুইজন সদস্যকে মনোনীত করিয়া থাকেন। রাজ্যপাল আইনসভার যে কোন কক্ষে বক্তৃতা করিতে পারেন অথবা বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। আইনসভায় গৃহীত হইবার পর যাবতীয় বিল রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। রাজ্যপাল বিলে অনুমতি দিতে পারেন আবার বিলে স্বাক্ষর না দিয়া ঐ বিল আইনসভায় পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। যদি আইনসভায় পুনরায় ঐ বিলটি সংশোধন সহ অথবা পূর্বের মতই (অপরিবর্তিত অবস্থায়) গৃহীত হয় তাহা হইলে রাজ্যপাল তাহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। সভায় গৃহীত হইয়াছে এই রকম বিল প্রয়োজন হইলে তিনি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে পারেন। ১৯৫৮ সালে কেরালার রাজ্যপাল ডঃ রামকৃষ্ণ রাও সর্বপ্রথম কেরালা বিধানসভায় গৃহীত শিক্ষাবিলে সম্মতি না দিয়া তাহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন। ঐ বিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করায় রাষ্ট্রপতি বিলটি প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য কেরালা সরকারের নিকট প্রেরণ করেন।

আর্ডিনান্স বা জরুরী আইন ঃ আইনসভার অধিবেশন যখন স্থগিত থাকে

তখন রাজ্যপাল জরুরী আইন জারী করিতে পারেন। আইনসভার অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই আইন কার্যকরী থাকিবে। বিধানসভা যদি এই জরুরী আইন অনুমোদন না করে তবে তাহা ছয় সপ্তাহের পূর্বেই বাতিল হইয়া যাইবে।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা : রাজ্যপাল রাজ্যের শাসন ক্ষমতার অধীন কোন ব্যাপারে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড মকুব করিতে পারেন। ঐ সব দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। তবে মৃত্যুদণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন না—কারণ সকল মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের ক্ষেত্রেই ক্ষমাপ্রদর্শনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাজ্যপাল দেওয়ানী আদালতের বিচারক, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি বিচারকদের নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

অর্থবিষয়ক ক্ষমতা : রাজ্যপালের অনুমতি ছাড়া বিধানসভায় কোন অর্থবিল উত্থাপন করা যাইবে না। অর্থবিল সর্বপ্রথম বিধানসভাতেই উত্থাপন করিতে হইবে। রাজ্য বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী প্রতি বৎসর আয়ব্যয়ের যে হিসাব (Budget) পেশ করেন তাহা রাজ্যপালের নামেই করিতে হয়।

রাজ্যপালের ভূমিকা : আমরা এ পর্যন্ত রাজ্যপালের বহুবিধ ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাও বলা হইয়াছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যপাল একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান হিসাবে তাঁহার মন্ত্রিদের পরামর্শ মতই কার্য করিবেন। স্বাভাবিক অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীসমেত মন্ত্রিসভাই রাজ্যের শাসনকার্য রাজ্যপালের নামে পরিচালনা করিবেন। কিন্তু এই সংগে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে রাজ্যপাল সব ক্ষেত্রে মন্ত্রিদের পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য নহেন। সংবিধানের ১৬৩(১) ধারায় যে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Powers) তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে সেইসব ক্ষেত্রে তাহাকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না। ইহাও সত্য যে রাজ্যপাল তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন কিনা সে সম্পর্কে কোন বৈধতার প্রশ্ন আদালতে তোলা যাইবে না। এই বিশেষ ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। অবশ্য তিনি কোন অবস্থাতেই একজন স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিবেন না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সন্তুষ্টির উপর তাঁহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সেজন্য একথা বলিলে ভুল হইবে না যে স্বাভাবিক অবস্থা ছাড়া রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রতিভূ (Agent) হিসাবেই তাঁহার দায় দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন।

মন্ত্রিসভা—মর্যাদা ও কার্যাবলী : (Council of Ministers—Position and Functions) : সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালকে তাঁহার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। রাজ্যপাল বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি

অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে তাঁহাদের কার্যের জন্য বিধানসভার নিকট দায়ী থাকেন। অন্যদিকে তাঁহাদের রাজ্যপালের সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হয়। অবশ্য বিধানসভায় যতদিন তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে ততদিন পর্যন্ত রাজ্যপালের পক্ষে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা সম্ভব নহে। তবে মন্ত্রি-সভা যদি সংবিধান বিরোধী কার্য করেন তাহা হইলে রাজ্যপাল সেই মর্মে রাষ্ট্র-পতিকে জ্ঞাত করাইবেন এবং ঐ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রযুক্ত হইবে। ১৯৫৮ সালে কেরালা রাজ্যে ক্যমিউনিস্ট সরকার (শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে) প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। এছাড়া ক্যমিউনিস্ট বিরোধী দলগুলি সরকারের অপসারণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। অবশেষে রাজ্যপালের বিবরণীর উপর ভিত্তি করিয়া মন্ত্রিসভা ও বিধানসভাকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হইল। 'মন্ত্রিসভা' কথাটি ব্যাখার প্রয়োজন আছে। সমগ্র মন্ত্রিসভাকে 'মন্ত্রিপরিষদ' (Council of Ministers) বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রের মতই রাজ্যে তিন শ্রেণীর মন্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়—(১) ক্যাবিনেট শ্রেণীর মন্ত্রী, (২) রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী (Ministers of State) এবং (৩) সহকারী মন্ত্রী (Deputy Minister)। ক্যাবিনেট শ্রেণীর মন্ত্রিদের লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সকল মন্ত্রীই মন্ত্রিপরিষদের সদস্য—কিন্তু শুধুমাত্র ক্যাবিনেট মন্ত্রিরাই মন্ত্রীসভার সদস্য।

শাসনকার্যের নীতি নির্ধারণ : মন্ত্রিসভার প্রধান কার্য হইল রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ক্যাবিনেট সভা বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রিদের সহিত নীতি কি ভাবে কার্যকরী করা যায় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিভাগীয় মন্ত্রিদের দায়িত্ব হইল এই নীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়ন করা।

আইন রচনা করা : মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেটের প্রধান কার্য হইল শাসন-বিভাগের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আইন রচনা করা এবং সেইগুলি আইন সভারদ্বারা অনুমোদন করান। বিধানসভায় আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রধানতঃ মন্ত্রিরা উত্থাপন করিয়া থাকেন। বিলগুলি যাহাতে সময়মত আইন সভায় আলোচনা ও যথাযথ গৃহীত হয় সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিদের স্পীকারের সহিত বিধানসভার কর্মসূচী রচনা করিতে হয়। এ বিষয়ে বিরোধী দলগুলির সহিত আলাপ-আলোচনারও প্রয়োজন হয়।

সরকারী আয়ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ : মন্ত্রিসভার আর একটি প্রধান দায়িত্ব হইল বিধানসভার দ্বারা সরকারের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের দাবী অনুমোদন করান। মন্ত্রিসভাই প্রতি বৎসর বাজেট তৈয়ারী করে, নতুন করের প্রস্তাব এবং ব্যয়মঞ্জুরীর প্রস্তাব বিধান সভায় রাজ্যপালের নামে উত্থাপন করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া—অর্থাৎ মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়া আইনসভায় কোন অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না।

বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ঃ মন্ত্রিসভা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া থাকে। শাসন কার্য যাহাতে শৃংখলার সহিত পরিচালিত হয়—বিভিন্ন দপ্তর যাহাতে তাঁহাদের দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে পালন করেন মন্ত্রিসভাকে তাহা দেখিতে হয়। সরকারের প্রতিচ্ছবি ও সংহতি মন্ত্রিসভার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister) ঃ সংবিধানে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রধান (There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head.)। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও এক বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহার নেতৃত্বে রাজ্যের সমগ্র শাসন কার্য পরিচালিত হয়। সংবিধানে মুখ্যমন্ত্রীর যোগ্যতা ও তাঁহার ক্ষমতার কোন বিবরণ উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু গত ২৮ বৎসরে বিভিন্ন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদের অধিকারীরা যে সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া এই পদের গুরুত্ব সমধিক প্রকাশিত হইয়াছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পদের যোগ্যতা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর পদের কোন যোগ্যতার কথা উল্লেখ না থাকিলেও ঐ পদের প্রার্থীকে বিশেষ কয়েকটি গুণের অধিকারী হইতে হয়। তাহার মধ্যে সমধিক রাজনৈতিক জ্ঞান, দূরদর্শিতা, নেতৃত্ব এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা প্রয়োজন। তিনি মন্ত্রিসভার স্তম্ভস্বরূপ—তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র মন্ত্রিসভা এবং সরকার পরিচালিত হইবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য করিবার শক্তি তাঁহার থাকা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী একাধারে মন্ত্রিসভার পরিচালক, নেতা এবং পরামর্শদাতা। তিনি মন্ত্রিদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন। মন্ত্রিসভায় তিনিই সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে রাজ্যপাল এবং বিধানসভার সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলেন।

মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল ঃ সংবিধানে বলা হইয়াছে যে শাসন কার্যের পরিচালনা সম্পর্কে মন্ত্রিসভা যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই সেই সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, শাসন কার্যের পরিচালনা ও যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হইতেছে সে সম্পর্কে রাজ্যপাল নিজেই যাহা জানিতে চাহেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁহাকে তাহা জানাইবেন। তৃতীয়তঃ, কোন মন্ত্রী যদি স্বতন্ত্রভাবে কোন বিষয়ের উপর একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যাহা ইতিপূর্বে মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয় নাই—রাজ্যপালের ইচ্ছা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে ঐ বিষয়টি সমগ্র মন্ত্রিসভায় আলোচনার জন্য রাখিতে হয়। প্রসংগক্রমে বলা যায় যে কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অনুরূপ তিনটি দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীকে পালন করিতে হয়।*

মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিযুক্ত করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন মুখ্যমন্ত্রীই করিয়া থাকেন। মন্ত্রিসভার যে কোন সদস্য মন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে রাজ্যপাল অপসারণ

---

* See 78 (a), (b) and (c) of the Constitution of India.

করিতে পারেন। নিয়োগ এবং অপসারণ করিবার এই দ্বৈত ক্ষমতার ভিতর দিয়া মুখ্যমন্ত্রী পদের শক্তি, মর্যাদা ও গুরুত্বের ছবি প্রকাশিত হয়। মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে মুখ্যমন্ত্রী জনসমক্ষে এবং আইনসভায় বিভিন্ন সময়ে বিবৃতি দিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের আইনের ভিত্তিতে বলা হয় মুখ্যমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিসভা-রূপ স্তম্ভের প্রধান মণি (Keystone of the Cabinet arch)। নীতিগত কারণে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভাকেই পদত্যাগ করিতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধনও সরকারের সংহতি রক্ষা মুখ্যমন্ত্রীকেই করিতে হয়। সংবিধান প্রবর্তনের পর পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত মোট পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়াছেন; তাঁহারা হইলেন (১) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, (২) প্রফুল্লচন্দ্র সেন, (৩) শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, (৪) ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, (৫) সিদ্ধার্থ-শংকর রায়। শ্রীরায় ১৯৭২ সালে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে ঐপদে অধিষ্ঠিত আছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পরলোকগত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সারসংক্ষেপ

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। তাই ইহার কেন্দ্রে একটি সরকার আছে—যাহাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আর ২২টি অঙ্গরাজ্যে ও ৯টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ভিন্ন সরকার আছে। রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদকে লইয়া কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ গঠিত হইয়াছে আর অঙ্গরাজ্যে আছে রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদ।

রাষ্ট্রপতি: ভারতের রাষ্ট্রপতি এক বিশেষ নির্বাচন পদ্ধতিতে পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন ৫ বৎসরের জন্য। তাঁহার মাসিক বেতন ১০,০০০ টাকা। তিনি একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান। তিনি পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শ মতো অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ মতো কাজ করেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক। তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা হইল জরুরী ক্ষমতা। জরুরী ক্ষমতা বলে তিনি অঙ্গরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি সেনা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। তবে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী আইন পাসের পর তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হইয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী: ভারতের পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীই শাসন বিভাগ পরিচালনা করেন। তিনি পার্লামেন্টের নেতা, দলের নেতা ও জাতির নেতা।

রাজ্যপাল: প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন। তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাও কিছু আছে। তাঁহার মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসাবেই কাজ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী: প্রত্যেক রাজ্যের আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করা হয়। তিনি বিধান সভার নেতা এবং তিনি অঙ্গরাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন।

প্রশ্নাবলী

১। ভারতের রাষ্ট্রপতি কি ভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন? তাঁহাকে কি ভাবে অপসারিত করা যায়?
(How is the President of India elected? How can he be removed?)

২। "রাষ্ট্রপতি প্রশাসন ব্যবস্থার একজন প্রতীক মাত্র। তিনি শাসন করেন না" আলোচনা কর।
("The President is a mere symbol of Executive authority. He does not govern." Discuss.)

৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা বর্ণনা কর।
(Discuss the position and Powers of the President of India.)

৪। রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতাবলী বর্ণনা কর।
(Discuss the Emergency powers of the President of India.)

৫। ভারতের অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণের শাসনতান্ত্রিক এবং আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার বিবরণ দাও।
(Summarise the constitutional and legislative powers of the Governor of Indian States.)

৬। রাজ্যপালের ক্ষমতা ও দায়িত্ব আলোচনা কর। তিনি কি শুধু নামসর্বস্ব শাসক?
(Discuss the powers and responsibilities of a state Governor in India. Is he a mere figurehead?)

৭। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আলোচনা কর।
(Discuss the discretionary powers of the state Governor.)

৮। রাজ্যপাল ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক আলোচনা কর।
(Discuss the constitutional relationship between the Governor and the Chief Minister.)

৯। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা মূল্যায়ণ কর।
(Give an estimate of the powers and position of the Chief Minister of West Bengal.)

১০। "মুখ্যমন্ত্রী হইল রাজ্যের যথার্থ পালক।" এই উক্তিটি বিশ্লেষন কর।
(" The chief Minister is the real ruler of an Indian State." Examine.

অতিরিক্ত পাঠ্য

ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য—রাষ্ট্রবিজ্ঞান
,, ,, ভারতের শাসন-ব্যবস্থা
Constitution of India—Government of India Publication.

১৪ | ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার বিভাগ

(Legislature & Judiciary)

(আইন বিভাগ—এককপরিষদ বনাম দ্বিপরিষদ বিশিষ্ট আইনসভা—ভারতের আইন বিভাগ ; ইহার গঠন এবং কার্যাবলী—পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা—ইহার গঠন ও কার্যাবলী—আইন পাসের পদ্ধতি—বিচার বিভাগ—বিচার বিভাগের স্বাধীনতা—ভারতের বিচার বিভাগ—আমলাতন্ত্র—ইহার গুরুত্ব ও কার্যাবলী।)

[Legislature, Unicameral and Bicameral—Union Legislature of India, its composition and functions—West Bengal State Legislature, its composition and functions—Processes of Law Making—Judiciary Independence of Judiciary—The Indian Judiciary—Bureaucracy, its importance and function]

আইন বিভাগ

(Legislature)

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সরকারের নীতিনির্ধারণের জন্য একটি আইন বিভাগ আছে। আইন বিভাগে থাকে এককপরিষদীয় অথবা দ্বি-পরিষদীয় আইনসভা। এই কক্ষদ্বয়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সদস্যপদ লাভ করেন। রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতি আইনসভায় নির্ধারিত হয়। এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। আইন অনুসারেই দোষীকে বিচারালয় বিচার করিয়া শাস্তি দেয়, সারা দেশের শাসন চলে।

আইন বিভাগের কার্যাবলী : আধুনিক রাষ্ট্রে আইন বিভাগের গুরুত্বই সর্বাধিক। আইন বিভাগের কার্যবলী রাষ্ট্রের চরিত্র হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। এক-নায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একনায়ক যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই আইনসভা অনুমোদন দিয়া থাকে। আবার পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় আইনসভাই সার্বভৌম। সব কার্যের অনুমোদনদাতা হইল আইনসভা। নিম্নে আইন বিভাগের কার্যবলী বর্ণিত হইল :

(১) আইন প্রণয়ন : আইনসভার প্রধান কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা। জন-গণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে আইনসভা রূপ দেয়। গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়াই আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনসভাপ্রণীত আইনের ভিত্তিতেই শাসন বিভাগ শাসন করে। বিচার বিভাগ মামলার বিচার করে। রাষ্ট্রযন্ত্র যখন যে শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয় তখন সেই শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যই আইন রচনা করা হয়। সার্বভৌমের আজ্ঞাই আইন। জনপ্রতিনিধি কর্তৃক গঠিত আইনসভা এই সার্বভৌমের ইচ্ছাকেই ব্যক্ত করে। আইন নাগরিকের স্বাধীনতা ও শান্তি রক্ষা করে।

(২) **আলোচনা ও বিতর্ক ঃ** আইনসভা দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে এবং সমস্যার সমাধানের পথ নির্ণয় করে। সরকারী বিলের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া প্রস্তাবিত আইনের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোকপাত করে। জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনের পক্ষে আলোচনা করিয়া জনমত গঠন করে। মন্ত্রি-সভার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক এবং নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনিতে পারে।

(৩) **জনমত গঠন ঃ** আইনসভা আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে সুপ্ত জন-মতকে সচেতন করিতে পারে। ইহা জনমতের প্রতিফলনাগার। দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে যে আলোচনা হয় তাহাতে জনমত গঠিত হয়।

(৪) **অর্থসংগ্রহ ও ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর ঃ** বর্তমানে জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মতি ছাড়া কর ধার্য করা যায় না বা সরকারের ব্যয় বরাদ্দ করা যায় না। অর্থাৎ আইন সভাই জাতীয় অর্থভাণ্ডারের রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। আইনসভা যেভাবে বাজেট পাস করিবে শাসন বিভাগকে সেইভাবে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। বাজেট প্রত্যাখ্যাত হইলে শাসন বিভাগকে পদত্যাগ করিতে হইবে। আইনসভা যে খাতে যত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিবে শাসন বিভাগকে সেই খাতে তত টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

(৫) **শাসন পরিচালনার কাজ ঃ** আইনসভা শাসন বিভাগের কাজও করে। আইনসভার সদস্যগণই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মন্ত্রিদের নিয়োগ করে। কারণ আইন সভার অসম্মতিতে মন্ত্রিপরিষদ নিযুক্ত হইলে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা হয়। শাসন বিভাগের অনেক কর্মচারীদের নিয়োগ আইনসভার সম্মতি সাপেক্ষ। সেনেটের সম্মতি লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-পতিকে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন অতএব মন্ত্রিপরিষদীয় বা রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অবাস্তব। শাসন বিভাগ আইনসভা নির্দিষ্ট ব্যয় ঠিক মতো করিয়াছে কিনা তাহা আইনসভা একটি সরকারী হিসাব কমিটি গঠন করিয়া পরীক্ষা করিয়া লয়।

(৬) **বিচার বিভাগীয় কাজ ঃ** আইনসভা বিচার বিভাগের কাজও করে। ভারতের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মহা অভিযোগের বিচার আইনসভাই করে। পার্লা-মেন্টকে কোর্ট অব রেকর্ডস-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। আইনসভা যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনসভার অবমাননা বিষয়ক অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং উহার বিচার করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে।

(৭) **সংবিধান সংক্রান্ত কাজ ঃ** আইনসভা রাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্তন করে, সংশোধন করে এবং অ.১চ রাষ্ট্রে আইনসভাই সংবিধান ব্যাখ্যা করে। সংবিধানকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আইনসভার।

একপরিষদীয় বনাম দ্বি-পরিষদীয় আইনসভা (Unicameral vs. Bi-

camerala Legislature) : রাষ্ট্রের আইনসভার কক্ষ যদি একটিমাত্র থাকে তবে তাহাকে বলা হয় একপরিষদীয় আইনসভা আর আইনসভার যদি দুইটি কক্ষ থাকে তবে তাহাকে বলা হয় দ্বি-পরিষদীয় আইনসভা। যেমন ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা (Parliament) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। ইহার নিম্নকক্ষের নাম 'লোকসভা' আর উর্ধ্বকক্ষের নাম 'রাজ্যসভা'। আবার পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার নাম বিধানসভা (West Bengal State Legislative Assembly)। দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থাপকসভার প্রচলন নূতন নয়। ফরাসীবিপ্লবই আইন পরিষদগুলিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত হইবার মত সংহার সৃষ্টি করিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ইউরোপে এক হইতে চারিপরিষদ সম্পন্ন আইনসভার সন্ধান পাওয়া যায়। একমাত্র ক্রমওয়েলের শাসনকাল ছাড়া ইংলণ্ডে বরাবরই আইনসভা দ্বি-পরিষদ বিশিষ্ট ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট, ফ্রান্স, কানাডা, রাশিয়া ও চীন প্রভৃতিদেশে দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থা চলিয়া আছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রও দ্বিপরিষদ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করিয়াছে। বর্তমানে গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, হণ্ডুরাস এবং পানামায় একপরিষদীয় ব্যবস্থা বর্তমান।

ভারতের একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে এবং দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার বিপক্ষে যুক্তি : (১) কেহ কেহ বলেন সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য আইনসভার দুইটি কক্ষ থাকা উচিত। কিন্তু শাসনতন্ত্র যদি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করে তবে দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রয়োজন কি ? ভারতের সংবিধান সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতির স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সুতরাং উক্ত স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য দ্বিতীয় পরিষদের অর্থাৎ রাজ্যসভার প্রয়োজন হয় না।

(২) ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, অভিজাত বিত্তবানদের আইনসভায় আসন পাইবার নিশ্চয়তা করিবার জন্য দ্বি-পরিষদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মিল যে গুণবান ব্যক্তিদের স্থান নির্দিষ্ট করিবার জন্য দ্বি-পরিষদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে। লোকসভায়ও প্রকৃত গুণীলোক নির্বাচিত হইতে পারে। আবার রাজ্যসভায়ও নির্গুণ লোক মনোনীত হইতে পারে। সুতরাং একপরিষদীয় ব্যবস্থাই যথেষ্ট।

(৩) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় একে অপরের উপর দোষ চাপাইয়া দায়িত্ব স্খালন করিতে পারে। আবার দুই কক্ষের দ্বন্দ্বের ফলে আইন প্রণয়নবিভাগ আইন প্রণয়নে অক্ষম হইয়া পড়ে। তাই একপরিষদীয় ব্যবস্থাই কাম্য।

(৪) অধ্যাপক লাস্কির মতে দ্বিতীয়কক্ষ থাকিলে দ্রুত চলমান জগতে আইন প্রণয়ন বিলম্বিত হয়। আবার দেখা যায় ভারতের উচ্চকক্ষের অর্থাৎ রাজ্যসভার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। যুগ্ম অধিবেশনে ভোটের জোরে লোকসভা সকল আইন পাস করিতে পারে। অতএব রাজ্যসভাকে বিলোপ করিলে ক্ষতি কি ?

(৫) ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। ২২টি অঙ্গরাজ্য লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই ২২টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ৯টি অঙ্গরাজ্যে দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা চালু আছে। অঙ্গরাজ্যে দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা চালু রাখার কোন যুক্তি নাই। গরীব দেশবাসীর উপর এই দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা একটা বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার দেখা যায় প্রায় ৪ কোটি লোক লইয়া পশ্চিমবঙ্গরাজ্য গঠিত হইয়াছে, সেই পশ্চিমবঙ্গ যদি একপরিষদীয় ব্যবস্থার আইনসভাকে চালু রাখিতে পারে তবে অন্যান্য ৯টি অঙ্গরাজ্য কেন পারিবে না।

(৬) অধ্যাপক লাস্কি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা আবশ্যক। তাহার মতে যুক্তরাজ্যের অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

(৭) আবেসিয়েসের মতে, "দ্বিতীয়কক্ষ যদি প্রথমকক্ষের বিরোধিতা করে তবে উহা ক্ষতিকর আর যদি অনুসরণ করে তবে উহা অনাবশ্যক।"* নিম্নকক্ষে জনসাধারণের সার্বভৌম ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয় কক্ষ শুধু জনমতে প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের মতো ভারতের রাজ্যসভা প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে সমানসংখ্যক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত নয়; সুতরাং অঙ্গরাজ্যের স্বার্থরক্ষিত হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বৃহদায়তন অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী আর ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা কম। কারণ বিধানমন্ডলে সদস্য সংখ্যার অনুপাতে কতজন প্রতিনিধি রাজ্যসভায় প্রেরণ করা হইবে তাহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। রাজ্যসভা দুর্বল ও মর্যাদাহীন, বাস বংশ প্রতিষ্ঠান। উপরাষ্ট্রপতি ইহার সভাপতি। লোকসভা প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত আর রাজ্যসভা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে লইয়া গঠিত।

(৯) ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্র, জম্মু ও কাশ্মীর, বিহার, তামিলনাড়ু, গুজরাট, কর্ণাটক, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশের আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। এই কয়টি রাজ্যের আয়তন খুব বড় নহে। লোকসংখ্যাও বেশী নহে। সংবিধান লিখিত ভাবেই অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করিয়া দিয়াছে। অঙ্গরাজ্যের আইন পাসের ক্ষমতাও কম। এক্ষেত্রে একপরিষদ যথেষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হইতে পারে। কারণ, এককক্ষ অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ সিদ্ধ করিবে আর অপর কক্ষ দেশের স্বার্থ সিদ্ধ করিবে। কিন্তু অঙ্গরাজ্যে এই সমস্যা নাই। সুতরাং, অঙ্গরাজ্যে আইনসভার একটি কক্ষ থাকিলেই চলিতে পারে। আর উচ্চকক্ষ যদি নিম্নকক্ষের সহিত একমত হয় তবে দ্বিতীয় কক্ষ অবাঞ্ছিত।

* "If a second chamber dissents from the first, it is mischievous, if it agrees with it, is superfluous"

দ্বি-পারিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে এবং একপারিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার বিপক্ষে যুক্তি ঃ (১) বলা হয় যে, দুইটি পরিষদের দ্বারা যে আইন প্রণীত হইবে তাহা স্বভাবতই সুচিন্তিত হইবে। কিন্তু একপরিষদের দ্বারা আইন প্রণয়ন করিলে তাহা অবিবেচনা প্রসূতও হইতে পারে। একপরিষদের দ্বারা প্রণীত আইন আকস্মিক উত্তেজনা প্রসূতও হইতে পারে। একপরিষদ আইন প্রণয়ন করিলে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন করার জন্য অপর কোন পরিষদ থাকে না ; কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এরূপ ঘটে না। লোকসভা যখন রাজ্য সভায় বিল পাঠায় তখন উহা সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(২) দুইটি পরিষদের ব্যবস্থায় সাধারণের ইচ্ছা প্রকাশিত হইতে পারে। কারণ, দুইটি পরিষদ বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হইয়া প্রবহমান জনমতকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করে। এক পরিষদের ব্যবস্থায় একই সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রবহমান জনমতের সহিত একপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে।

(৩) লর্ডব্রাইস বলেন, আইনসভা যদি একপরিষদ বিশিষ্ট হয় তবে ইহার স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা থাকে আর আইন পরিষদকে যদি দুই সমান ক্ষমতার অধিকারী পরিষদে বিভক্ত করা হয় তবে ইহা স্বৈরাচারী হইতে পারে না। রাশিয়াকে বাদ দিলে প্রায় অধিকাংশ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট পরিষদীয় ব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের দুইটি পরিষদই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। ভারতের রাজ্যসভা লোকসভার তুলনায় দুর্বল, অর্থবিলের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা রাজ্যসভার নাই। সদস্যসংখ্যার দিক হইতে রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা লোকসভার সদস্যসংখ্যার প্রায় অর্ধেক বলা চলে।

(৪) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা শাসন বিভাগকেও এক পরিষদীয় স্বৈরাচারের হাত হইতে রক্ষা করে। একপরিষদের খামখেয়ালের বিরুদ্ধে শাসন বিভাগ দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে তাহার মাধ্যমে আবেদন করিতে পারে।

(৫) দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যায়। জাতীয়স্বার্থে প্রতিভাধর ব্যক্তিকে দ্বিতীয় পরিষদে মনোনীত করা যায়, সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় করা যায়। কিন্তু এক পরিষদীয় ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়।

(৬) বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কাজ বিশেষভাবে বাড়িয়াছে। একপরিষদীয় ব্যবস্থায় সকল বিষয় খুঁটিনাটি ভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করা সম্ভব নয়। এই দিক হইতে দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা সুবিধাজনক। দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় অল্প বিতর্কমূলক বিলগুলিকে প্রথম পরিষদের পরিবর্তে দ্বিতীয় পরিষদে উত্থাপিত করা হয়।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুইটি স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। একটি হইল জাতীয় স্বার্থ আর একটি হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থ। দুইটি স্বার্থকে পূরণ করিবার জন্য প্রয়োজন দুইটি কক্ষের। এককক্ষে থাকিবে অংগ-রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ। আর অপরকক্ষে থাকিবে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্যগণ। প্রথমটি হইল উচ্চপরিষদ আর দ্বিতীয়টি হইল

নিম্নপরিষদ। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। তাই রাজ্যসভা অর্থাৎ উচ্চপরিষদের একান্ত প্রয়োজন।

(৮) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় আইনসভা একপরিষদীয় হইলে অনেক সুবিধা হয়। কারণ, রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার উৎস একটি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় বিভিন্নস্বার্থ চুক্তির মাধ্যমে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সেক্ষেত্রে অনেক স্বার্থকে রূপ দিবার জন্য আইনসভা অন্ততঃ দ্বি-পরিষদীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৯) আইনসভার একটি কক্ষ থাকিলে দেশের জ্ঞানী ও গুণী লোকদিগের আর আইনসভায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, তাঁহারা নির্বাচনের হাঙ্গামায় যাইতে চান না। তাঁহাদের জন্য অন্ততঃ আর একটি কক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় ইউনিয়নের ব্যবস্থা বিভাগ: (Union Legislature of India):

সংসদ বা পার্লামেণ্টে গঠন: ব্যবস্থা বিভাগ বা আইনসভার সংগঠন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। বৃটেনে রাজা বা রাণী পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংগ। রাজাকে ঐতিহাসিক কারণে আইনের উৎস বলিয়া মনে করা হইত। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম) অংশরূপে বিবেচিত হন না। ঐ দেশে কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় আইনসভা সেনেট (উচ্চকক্ষ) ও প্রতিনিধিসভা (House of Representatives) এই দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত।* সংবিধানে কংগ্রেসের উপর আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। ভারতে আমরা বৃটিশ প্রথাকে গ্রহণ করিয়াছি। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা ব্যবস্থা বিভাগকে বলা হয় পার্লামেণ্ট। সংবিধানের ৭৯নং ধারায় বলা হইয়াছে—'কেন্দ্রীয় আইনসভা রাষ্ট্রপতি এবং দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইবে এবং কক্ষ দুইটি রাজ্যসভা (Council of State) এবং লোকসভা বলিয়া অভিহিত হইবে।'

রাজ্যসভার গঠন: রাজ্য সভায় ২৫০ জনের বেশী সদস্য থাকিতে পারেনা। ইহাদের মধ্যে ১২ জনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করিয়া থাকেন। মনোনীত সদস্যদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সত্যেন বসু, সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেতা পৃথ্বীরাজ কাপুর এক সময় রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য হিসাবে ঐ সভার সদস্য ছিলেন। বাকি অনধিক ২৩৮ জন সদস্য অংগরাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যসভার সদস্য হইবেন। এই সদস্যরা পরোক্ষভাবে ঐসব রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation by means of the single transferable vote) পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কেন্দ্র-

* 'There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and the two Houses to be known respectively as the Rajya Sabha and the Lok Sabha.' — Article 79 of the Constitution of India.

শাসিত অঞ্চলে এক একটি বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী রাজ্যসভার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বিতীয় কক্ষে অংগরাজ্যগুলি হইতে সম-সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে—এখানে রাজ্যগুলির আকার কিম্বা লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় না। কিন্তু রাজ্যসভার প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হয়।

যোগ্যতা ঃ রাজ্যসভার সদস্যগণকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে। সদস্য পদপ্রার্থীর বয়স ৩০ হওয়া চাই। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী ব্যক্তি সদস্য হইতে পারিবে না। ভারত সরকার ও রাজ্যসরকারের অধীনে লাভজনক কোন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি সদস্য পদপ্রার্থী হইতে পারিবে না। বিকৃত মস্তিষ্ক এবং দেউলিয়া বলিয়া আদালত কর্তৃক ঘোষিত ব্যক্তি রাজ্যসভার সদস্য হইতে পারিবে না।

আয়ুষ্কাল ঃ রাজ্যসভা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না। প্রতি ২ বৎসর অন্তর ⅓ অংশ সদস্য বিদায় গ্রহণ করেন এবং তাহাদের স্থানে আবার ২ বৎসর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে ⅓ অংশ সদস্য নির্বাচিত হন ; ফলে সকল সদস্য লোকসভার মত একযোগে বিদায় গ্রহণ করেন না।

মনোনয়ন এবং সম-সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের নীতি না থাকার জন্য সমালোচনা ঃ রাজ্যসভার নির্বাচন পরোক্ষপদ্ধতিতে হওয়া, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১২ জন সদস্য মনোনয়ন করার ব্যবস্থা এবং অংগরাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্বের নীতি না থাকার জন্য বিভিন্ন ধরণের সমালোচনা করা হয়।

(১) সমালোচকদের মতে দুইটি কক্ষেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। প্রতিনিধিরা জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচিত হইতেন। ইহা অধিকতর গণতন্ত্র সম্মত ব্যবস্থা।

(২) জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যসভায় প্রতিনিধি নির্বাচননীতির দ্বারা রাজ্যগুলির সমমর্যাদার দাবিকে অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শ বিরুদ্ধ। ইহাতে যে সব রাজ্যে বেশী সংখ্যক জনসংখ্যা আছে তুলনামূলকভাবে তাহাদের গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

(৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১২জন সদস্য মনোনয়ন বাঞ্ছনীয় নয়। ইহার ফলে দুর্নীতি এবং ক্ষমতা বণ্টনের সুযোগ বাড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তিরা ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক পিছন দরজা দিয়া প্রতিনিধি হইবার সুযোগ পান।

উপসংহারে বলা হয় যে, দেশে যে সব গুণীলোক আছেন এবং যাঁহারা দলাদলির মধ্যে জড়িত হইতে ইচ্ছুক নহেন এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনয়ন পদ্ধতির দ্বারা এই পরিষদের সদস্য করা সম্ভব হয়। দেশের গুণী লোকদের পরামর্শ, মতামত, আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। দেশের যথার্থ গুণী এবং সমাজসেবীরা যাহাতে মনোনীত হইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। দলীয় স্বার্থে এই মনোনয়ন ব্যবস্থা ব্যবহৃত হইলে তাহা রাষ্ট্রপতি পদের মর্যাদা হানিকর হইবে। এই সভার প্রতি লোকের আস্থাও কমিবে।

রাজ্যসভার কাজ ঃ (১) রাজ্যসভা পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ। ইহা অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। (২) উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। কিন্তু রাজ্যসভার সদস্যগণ রাজ্যসভার সহসভাপতিকে নির্বাচিত করে। (৩) রাজ্যসভা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে অর্থ বিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে লোকসভার প্রায় সমান ক্ষমতা ভোগ করে। আর অর্থ বিলের ক্ষেত্রেও সংশোধনের জন্য সুপারিশ করিবার ক্ষমতা ইহার আছে। রাজ্যসভা ১৪ দিন পর্যন্ত অর্থ বিলটি আটকাইয়া রাখিতে পারে। (৩) কোন বিলের ব্যাপারে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হইলে রাষ্ট্রপতি দুই কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। (৪) রাজ্যসভা লোকসভার সহিত একযোগে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি, আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রভৃতির অনুমোদন করিতে পারে। (৫) লোকসভা যদি বিচারপতির বিরুদ্ধে ইম্পিচম্যান্ট অভিযোগ আনয়ন করে তবে তার বিচার করে। (৬) লোকসভার সহিত একযোগে প্রস্তাব পাস করিয়া রাজ্যসভা সুপ্রীমকোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে। (৭) রাজ্যসভা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রপতি ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। সুতরাং ৫ বৎসর পর যখন পার্লামেন্টের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে তখন যে সকল অসমাপ্ত বিল পড়িয়া থাকিবে তাহার দায়িত্ব লইবে রাজ্যসভা। (৮) রাজ্যসভা ` অংশ সদস্যের ভোটে রাজ্যতালিকার উপর আইন পাসের সুপারিশ করিলে লোকসভা আইন পাস করিতে পারে।

লোকসভা ঃ লোকসভা ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ সংবিধানের ৮১ (১) ধারা অনুযায়ী ৫২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই সদস্যদের মধ্যে অনধিক ৫০০ জন প্রতিনিধি অংগরাজ্যগুলি হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবে এবং অনধিক ২৫ জন ইউনিয়ন শাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি। সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। ৫,০০,০০০ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এক একটি নির্বাচন এলাকা নির্ধারিত হইবে। প্রত্যেকটি নির্বাচন এলাকা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। ১৯৬২ সালের চতুর্দশ সংশোধন দ্বারা লোকসভার আসন ৫২৫ জন (পূর্বে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে) করা হইয়াছিল। '১৯৫৭ সালের লোক গণনায় দেখা যায় ১৯৫১ সালের তুলনায় লোক সংখ্যা ১০ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার জন্য লোকসভার প্রতিনিধি সংখ্যাও বৃদ্ধি করা উচিত। ৩১তম সংশোধনের মাধ্যমে লোকসভার আসন সংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে পুনর্বন্টন করা হইয়াছে,

অঙ্গরাজ্যগুলি হইতে	—	৫২৪ জন
সিকিম ,,	—	১ জন
কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হইতে	—	১৭ জন
এ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে	—	২ জন
মোট সদস্য সংখ্যা		৫৪৪ জন

(ঘ) রাজ্যসভা ও লোকসভার আসন সংখ্যার বণ্টন ঃ

(রাজ্য নির্বাচিত)		রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা	লোকসভার সদস্য সংখ্যা
১।	অন্ধ্র	১৮	৪১
২।	আসাম	৭	১৪
৩।	বিহার	২২	৫৩
৪।	গুজরাট	১১	২৪
৫।	হরিয়ানা	৫	৯
৬।	মহারাষ্ট্র	১৯	৪৫
৭।	কেরল	৯	১৯
৮।	মধ্যপ্রদেশ	১৬	৩৭
৯।	তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ)	১৮	৩৯
১০।	কর্ণাটক (মহীশূর)	১২	২৭
১১।	উড়িষ্যা	১০	২০
১২।	পাঞ্জাব	৭	১৩
১৩।	রাজস্থান	১০	২৩
১৪।	উত্তরপ্রদেশ	৩৪	৮৫
১৫।	পশ্চিমবঙ্গ	১৬	৪০
১৬।	জম্মু ও কাশ্মীব	৪	৬
১৭।	নাগাভূমি	১	১
১৮।	হিমাচল প্রদেশ	৩	৬
১৯।	মেঘালয়	১	১
২০।	ত্রিপুরা	১	২
২১।	মণিপুর	১	২
২২।	সিকিম	১	১

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। মনোনীত বা নির্বাচিত

১।	দিল্লী	৩	৭
২।	মিজোরাম	১	১
৩।	অরুণাচল	১	১
৪।	পণ্ডিচেরি	১	১
৫।	গোয়া-দমন-দিউ	—	২
৬।	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	—	১
৭।	চণ্ডীগড়	—	২
৮।	লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ	—	১
৯।	দাদ্রা ও নগর হাবেলি	—	১
	উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা	—	১
	ইংগ ভারতীয়	—	২
	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত	১২	২
		২৪৪	৫৩০

পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার যোগ্যতা পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার জন্য প্রার্থীর নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন ঃ

(ক) লোকসভার সদস্য হইতে হইলে প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং তাঁহার বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া প্রয়োজন। রাজ্যসভার সদস্য হইবার ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স ৩০ বৎসর হইতে হইবে।

(খ) তিনি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

(গ) দেউলিয়া ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি পার্লামেণ্টের কোন সভার আসনের জন্য পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(ঘ) কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিলে পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার পক্ষে সেই ব্যক্তি অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(ঙ) পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া পার্লামেণ্টে সদস্য হইবার জন্য বিশেষ যোগ্যতা বা কাহারা পার্লামেণ্টে সদস্য হইতে পারিবে এবং কাহারা পারিবে না তাহ স্থির করিয়া দিতে পারে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পার্লামেণ্টীয় সচিববৃন্দ ও অন্যান অফিসাররা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ পার্লামেণ্টের সদস্যপদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

রাজ্যসভা ও লোকসভার আয়ুষ্কাল ঃ রাজ্যসভা একটি স্থায়ী পরিষদ। একটা নির্দিষ্টকাল অন্তর যেমন লোকসভাকে ভাঙিয়া দেওয়া হয় সেইভাবে রাজ্যসভাকে ভাঙিয়া দেওয়া যায় না। প্রতি দুই বৎসর অন্তর রাজ্যসভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে ৬ বৎসরের ভিতর রাজ্যসভার সকল সদস্যকেই নতুন ভাবে নির্বাচিত হইতে হয়।

রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ

লোকসভার স্থিতিকাল ঃ সাধারণতঃ লোকসভার আয়ুষ্কাল পাঁচ বৎসরের জন্য। তবে নির্দিষ্টকাল পূর্ণ হইবার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। দেশে জরুরি আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হইলে পার্লামেণ্ট এক বৎসর করিয়া লোকসভার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারে।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন ঃ রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহবান এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখিতে পারেন। সময়ান্তরে রাষ্ট্রপতিকে উভয় কক্ষের অধিবেশন আহবান করিতে হয়। দুইটি অধিবেশনের মধ্যে ছয়মাসকাল অতিবাহিত হইতে পারিবে না। পার্লামেণ্টের আইন-কানুন রচনার ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী বিধিগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

স্পীকার ও সভাপতি ঃ পদাধিকার বলে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হইলেন রাজ্যসভার সভাপতি। রাজ্যসভার একজন সহ-সভাপতিও আছেন। তিনি রাজ্যসভার

সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। অন্যদিকে লোকসভার সভাপতিত্ব করেন স্পীকার। একজন ডেপুটি স্পীকারও আছেন। স্পীকারের অনুপস্থিতিকালে ডেপুটি স্পীকার সভায় সভাপতিত্ব করেন ও তাঁহার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার উভয়েই বেতন পাইবেন এবং তাঁহাদের কার্যকালের ভিতর এই বেতনের পরিমাণ কমান যাইবে না।

স্পীকার (Speaker) ঃ ভারতের ক্ষেত্রে লোকসভার সভাপতিকে স্পীকার বলা হয়। ভারতীয় সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে লোকসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই স্পীকারকে ভোটের জোরে মনোনীত করে, রাষ্ট্রপতি তাহাকে নিযুক্ত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্পীকারই দলের নেতা। ভারতে রাজনৈতিক দলের সভ্য হিসাবেই স্পীকারকে লোকসভার সভ্য হইতে হয়। তারপর স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত হইলে তাঁহাকে যতটা সম্ভব দলের সংস্রব এড়াইয়া চলিতে হয়, নচেৎ নিরপেক্ষভাবে তাঁহার পক্ষে কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে লোকসভার কার্য পরিচালনা করেন। স্পীকার লোকসভার কোন আলোচনাতে যোগদান করেন না। তিনি আলোচনা পরিচালনা করেন। কোন বিলের উপর তাঁহার ভোট দিবার অধিকার নাই। কিন্তু কোন প্রশ্নের উপর ভোটাভুটির ফলে যদি দেখা যায় যে উভয় পক্ষেই সমসংখ্যক ভোট পড়িবার ফলে সভার কার্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে তখন স্পীকার নিয়ামক ভোট (Casting Vote) দিতে পারেন।

দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ (১) লোকসভার সভাপতি হিসাবে স্পীকারের প্রধান কাজ হইল লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা ও পরিচালনা করা। এই সভার পরিচালক হিসাবে স্পীকারকে যথেষ্ট সুদক্ষ হইতে হইবে। নিরপেক্ষ স্পীকার সভায় সংখ্যালঘু দলগুলির অধিকার রক্ষায় তৎপর হন। (২) সভায় শান্তিশৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য স্পীকার ইচ্ছা করিলে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। আবার কোন সদস্যকে সভাকক্ষ হইতে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন। তিনি সদস্যপদ স্থগিতও রাখিতে পারেন। (৩) সভার শৃংখলাও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব স্পীকারের। তিনি শৃংখলার প্রশ্নে কর্তব্য নির্ধারণ করেন (Points of order)। সভার নিয়ম কানুনের ব্যাখ্যা তিনিই দিয়া থাকেন। বৈধতার প্রশ্নগুলির মীমাংসা তিনিই করেন। আলোচনা বন্ধের প্রস্তাব (Closure motion) গ্রহণ করা তাঁহার অনুমতি সাপেক্ষ। স্পীকারের নির্দেশেই ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন। (৪) স্পীকারকে রাষ্ট্রপতির সহিত পার্লামেন্টের আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কার্য করিতে হয়। স্পীকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টে প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরণ করেন। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিতে লোকসভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য সভাপতিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন কমিটির সভাপতি তিনিই নিয়োগ করেন। লোকসভায় আগন্তুকদিগের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। লোকসভার শূন্য আসনগুলিতে

নূতন সদস্য প্রেরণ করিবার জন্য আজ্ঞাপত্র স্পীকারই বাহির করেন, বিরোধীদলের নেতৃত্ব তিনিই নির্ধারণ করেন। অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে হুকুমনামা স্পীকারের ভাষায়ই প্রকাশিত হয়। (৫) স্পীকারই কোন বিল অর্থবিল কিনা তাহা ঠিক করিয়া দেন। (৬) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে লোকসভার সদস্য হইতে হইবে। তাহারা পদত্যাগ করিতে পারেন অথবা লোকসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাদিগকে অপসারিত করিতে পারে। অবশ্য, এইরূপ প্রস্তাব পাস করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হইবে। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা ভারত সরকারের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য, অর্থাৎ উহা প্রতিবৎসর পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

সর্বশেষে বলা যায় ভারতে স্পীকারের মর্যাদা অন্যান্য রাষ্ট্রের আইনসভার স্পীকারের মর্যাদা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নয়। স্পীকারকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা (Functions of Parliament): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও এখানে পার্লামেন্টীয় বা মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত ব্যবস্থা প্রচলন করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত আইন বিভাগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। মন্ত্রিবর্গ একাধারে দেশের শাসন পরিচালনা করেন অন্যদিকে তাঁহারা আইনসভার সদস্য হিসাবে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন এবং পার্লামেন্টের দ্বারা তাহা অনুমোদন করান। স্বভাবতই আইন তৈয়ারী করাই পার্লামেন্টের প্রধান কাজ। কিন্তু ইহা ছাড়া পার্লামেন্টকে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিতে হয়। নিম্নে পার্লামেন্টের বিভিন্ন কার্যাবলীর বর্ণনা করা হইল:

সরকার গঠন ও শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা: সংসদীয় গণতন্ত্রে দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রিপরিষদ পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভিতর হইতেই গঠিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীরা পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন, উভয়কক্ষের আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন—তবে তিনি যে কক্ষের সদস্য শুধুমাত্র সেই কক্ষের ভোটাভুটিতে ভোট দিতে পারিবেন। মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers) যৌথভাবে তাঁহাদের কাজকর্মের জন্য লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। লোকসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। বিরূপ সমালোচনার জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ না করিতে হইলেও কোন বিশেষ দপ্তরের মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী এবং ভূতপূর্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (Defence Ministers) ভি. কে. কৃষ্ণমেননের নেহেরু মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ বিরূপ সমালোচনার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। পার্লামেন্ট একদিকে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ

করিয়া থাকে অন্যদিকে মন্ত্রিপরিষদের নীতি ও কার্যাবলীকে অনুমোদন দিয়া থাকে। মন্ত্রীপদে নিয়োগের সময় যদি কেহ কোন কক্ষের সদস্য না থাকেন তাহা হইলে ৬ মাসের মধ্যে তাঁহাকে কোন একটি কক্ষের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে হইবে। ছয়মাস পর্যন্ত কোন সদস্য না হইয়াও তিনি মন্ত্রীপদে থাকিতে পারিবেন।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা : ইউনিয়ন তালিকা ও যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী। যুগ্মতালিকা সম্পর্কে রাজ্যবিধানসভাগুলিও আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্যতালিকার বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণতঃ রাজ্য বিধানমণ্ডলীগুলিই আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। তবে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেও আইন তৈয়ারী করিতে পারে। সংবিধানে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে যদি রাজ্য বিধানসভা এবং পার্লামেণ্টের রচিত আইনের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনই কার্যকরী হইবে এবং রাজ্য আইন-সভা কর্তৃক রচিত আইনটির অসংগত অংশটি বাতিল হইয়া যাইবে। যেমন রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে স্থির করে যে, জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে হইবে তবে পার্লামেণ্ট ঐ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। ইহাও উল্লেখ্য যে অবশিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে (Residuary Powers) পার্লামেণ্ট আইন তৈয়ারী করিবার 'অনন্য ক্ষমতা' ভোগ করিয়া থাকে। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে বিল (নতুন আইন সম্পর্কে) গৃহীত হইবার পর তাহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে সম্মতি দিতে পারেন আবার তিনি তাহা পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্টে ফেরত পাঠাইতে পারেন। পার্লামেণ্ট ঐ বিল পুনরায় গ্রহণ করিয়া (২য় বার পাস করিলে) রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিলে তিনি তাহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

সরকারী আয় ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা : পার্লামেণ্টের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হইল ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কোন কর ধার্য বা সংগৃহীত হইবে না।* সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে এই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ ও ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সঞ্চিত তহবিলে (Consolidated Fund of India) জমা হইবে এবং আইনের নির্দেশ ছাড়া এই অর্থ ব্যয় করা যাইবে না। সরকারী আয় ব্যয় ঠিকমত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য লোকসভা দুইটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি দুইটি হইল (১) কমিটি অন পাবলিক এ্যাকাউণ্টস্ (Committee on Public Accounts), এবং (২) কমিটি অন এস্টিমেট্স্ (Committee on Estimates)। কমিটি দুইটির প্রধান দায়িত্ব হইল সরকারী অর্থ পার্লামেণ্টের নির্দেশ

---

* No tax shall be levied or collected except by authority of law'. (Article 265 of the Constitution of India.)

মত ঠিক ব্যয় হইতেছে কিনা তাহা দেখা। অর্থ অপচয় করা হইলে অথবা বে-আইনী ব্যয় করা হইলে সে সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা। কমিটিগুলির মতামত ও রিপোর্ট পার্লামেণ্টে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়।

জনমত গঠন : সরকারের বিভিন্ন কাজের উপর পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের সাধারণ আলোচনার সময় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমালোচনা হইয়া থাকে। প্রতিদিন সদস্যরা মন্ত্রীদের যে সমস্ত প্রশ্ন করেন তাহার ভিতর দিয়াও সরকারের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। এই সব আলোচনা এবং সমালোচনা নাগরিকদের সুস্থ মতামত গঠন করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ : পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যতম অংশীদার। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের সহিত তাঁহারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিয়া থাকেন। আবার পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের সদস্যরা মিলিত হইয়া উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিয়া থাকেন।

সংবিধান সংশোধন : সংবিধানের ৩৬৮ ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টকে সংবিধান সংশোধন (Amendment) করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য ক্ষমতা : পার্লামেণ্ট কিছু কিছু বিচার সম্পর্কীয় কাজও করিয়া থাকেন। সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ভর্ৎসনাসূচক (Impeachment) প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অযোগ্যতা এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাঁহাদের অপসারণ সম্পর্কে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থিত করিতে পারেন।

বিরোধী দলের ভূমিকা (Role of the Opposition) : সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। সাধারণ নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন সেই দলই দেশের সরকার গঠন করিতে সমর্থ হন ; অনেক সময় কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন না —সেক্ষেত্রে একাধিক দল লইয়া কোয়ালিশন সরকার (Coalition Government) গঠিত হয়। অন্যদিকে পার্লামেণ্টের সংখ্যালঘু দল বা দলগুলি সরকারের বিরোধীতা করিয়া থাকে। বৃটেনে প্রধানতঃ দুইটি দলই শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়— রক্ষণশীল দল (Conservative Party) এবং শ্রমিকদল (Labour Party)— সরকার গঠনের দায়িত্ব এই দুইটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সরকারের কাজ পরিচালনা করা সরকারী দলের প্রধান কাজ। মন্ত্রিপরিষদ তাহাদের কাজকর্মের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। বিরোধী দলের প্রধান কাজ হইল সরকারী দলের দোষত্রুটি ও অক্ষমতাকে উদ্ঘাটন করা। নির্বাচনের সময় সরকারী দল যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহা পালিত না হইলে জনসমক্ষে তাহা তুলিয়া ধরা এবং

সরকার যাহাতে সংবিধান সম্মতভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করেন সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধী দল ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র কল্পনাই করা যায় না। জেনিংসের ভাষায় বলিতে হয় একদিকে যেমন পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রয়োজন, অপর দিকে আবার তেমনি প্রয়োজন হইল সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের।*

তবে সরকারী দল এবং বিরোধীদল উভয়কেই কতকগুলি নিয়ম নীতির দ্বারা চলিতে হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে মানিয়া লইতে হইবে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার পরিচালনা করিবার অধিকার রহিয়াছে। জনসাধারণের সমর্থন এবং রায়ের ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যাহাতে শান্তিপূর্ণ ও আইনসংগতভাবে তাঁহাদের দায় দায়িত্ব পালন করিতে পারেন সে সুযোগ তাঁহাদের দিতে হইবে।

অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে মনে রাখিতে হইবে বিরোধী দল শাসন-ব্যবস্থার আবশ্যকীয় অংশ। সরকারের কাজের সমালোচনা ও ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ করার অধিকার তাঁহাদের রহিয়াছে। স্বভাবতই বিরোধী দল যাহাতে তাঁহাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে পারেন সেই সমস্ত সুযোগ তাঁহাদের দিতে হইবে। বিরোধীদলকেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে যে প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের সরকার গঠনের দায়িত্ব আসিতে পারে। পরিশেষে উভয় দলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে 'সংসদীয় গণতন্ত্রে' শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। কোন পক্ষেরই উচিত হইবে না জবরদস্তি এবং হিংসামূলক কার্যকলাপ গ্রহণ করা। উভয় পক্ষকেই স্মরণ রাখিতে হইবে সে জন সমর্থন ছাড়া কেহই সরকার গঠন এবং শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

ভারতীয় পার্লামেন্টে বিরোধী দলের ভূমিকা (Role of the opposition in the Indian Parliament) ঃ উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন বিচার করিতে হইবে ভারতীয় পার্লামেন্টে বিরোধী দল কতখানি তাঁহাদের সংসদীয় দায়িত্ব পালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই আলোচনায় পার্লামেন্ট বলিতে প্রধানতঃ লোকসভাকেই বুঝাইতেছে। সংবিধান প্রবর্তনের পর ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাও উল্লেখ্য যে, এই পাঁচটি নির্বাচনেই কংগ্রেস দল সভায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দায়িত্ব তাহারাই লাভ করে। অন্যদিকে লোকসভায় একাধিক বিরোধী দলের আসন লক্ষ্য করা যায়। বিরোধীদলগুলির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ

(১) লোকসভার বিরোধীদল একটি সংহত ঐক্যবদ্ধ দল নহে; বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিরোধী দল হিসাবে কাজ করে। এই বিরোধী দলের মধ্যে

* 'Democratic Government demands not only Parliamentary majority but also a Parliamentary minority.'—Jennings.

বামপন্থী দল, সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে গঠিত দল এবং আঞ্চলিক স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবতই বিরোধী দলগুলি দ্বিধা বিভক্ত এবং পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করে।

(২) ভারতে ক্ষমতাশীল দলের (বর্তমানে শাসক কংগ্রেস) সংখ্যাধিক্য বিরোধী দলের এক প্রধান দুর্বলতা। বিরোধী দলগুলি যদি ঐক্যবদ্ধও হয় তাহা হইলেও ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। বৃটেনে ক্ষমতাশীল দল এবং বিরোধী দলের সংখ্যাগত পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং ঐ দেশে সরকারীদলকে বিরোধীদলের ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের আইন সভা: ভারতে মোট ২২টি অংগরাজ্য এবং ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে। পশ্চিমবংগ এই অংগরাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেশ স্বাধীন হইবার সংগে সংগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, বর্তমান পশ্চিমবংগ রাজ্যের জন্ম হয়। প্রাক স্বাধীনতা যুগে পশ্চিমবংগ ও পূর্ববংগ (বর্তমানে স্বাধীন বাংলা দেশ) বৃটিশ ভারতের একটি অখণ্ড প্রদেশ বংলাপ্রদেশ বলিয়া (Bengal Province) খ্যাত ছিল। ইহাও উল্লেখ যে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা দুই কক্ষ বিশিষ্ট ছিল। উচ্চকক্ষের নাম ছিল বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং নিম্ন কক্ষের নাম হইল বিধানসভা (Legislative Assembly)। কিন্তু ১৯৫৭ সালে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার নীতিগত কারণে বিধান পরিষদের বিলোপ সাধন করেন। ঐ সময় হইতে পশ্চিমবংগে শুধুমাত্র একটি কক্ষ বিধানসভা রাজ্যের আইনসভা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সংবিধানে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যের শাসন ক্ষমতা লিখিতভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছে। রাজ্য আইনসভা কি কি বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে তাহাও সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা

গঠন: পশ্চিমবংগ বিধানসভার বর্তমান নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ২৮০। সংবিধান প্রবর্তনের পর এই সদস্যসংখ্যা প্রথমে ছিল ২৩৮ জন পরবর্তীকালে রাজ্যপুনর্গঠন হওয়ার পর সদস্য সংখ্যা ২৫২ জনে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের সময় হইতে ২৮০তে পৌঁছাইয়াছে। সমগ্র রাজ্যকে ২৮০টি নির্বাচনীকেন্দ্রে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। বিধানসভায় রাজ্যপাল ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায় হইতে ২জন সদস্য মনোনীত করিয়া থাকেন। আবার ঠিক হইয়াছে যে, আসন সংখ্যা আরও বাড়াইয়া ২৯৪ জন করা হইবে।

স্পীকার ও সহকারী স্পীকার: বিধানসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে সদস্যগণ একজন স্পীকার (Speaker) এবং একজন সহকারী স্পীকার (Deputy

Speaker) নির্বাচন করিয়া থাকেন। স্পীকারের ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কার্যাবলী লোকসভার স্পীকারের অনুরূপ।

কার্যকাল : বিধানসভার কার্যকাল ৫ বৎসর। তবে রাজ্যপাল ইহার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে পার্লামেণ্ট ইহার কার্যকাল প্রতিবারে একবৎসর করিয়া বাড়াইয়া দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান স্পীকার ও সহকারী স্পীকারের নাম যথাক্রমে শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার ও শ্রীহরিদাস মিত্র। তাঁহারা উভয়েই ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত হন। লোকসভার স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। রাজ্য বিধানসভার স্পীকার প্রায় একই ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভোগ করিয়া থাকেন। ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে তদানীন্তন স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঐতিহাসিক রুলিং দেন তাহা পার্লামেণ্টীয় রাজনীতিতে নতুন নজীর সৃষ্টি করে। ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে রাজ্যপাল সন্দেহ প্রকাশ করেন (ঐ সময় যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত খাদ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করেন এবং ১৭ জন সদস্যসহ 'যুক্তফ্রণ্ট' ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন)। রাজ্যপাল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়কে ১৯৫৭ সালের ২৩শে নভেম্বরের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে বলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঐ তারিখের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন ডাকিতে রাজী না হইলে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেন এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করিয়া একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ২৯শে নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ঐ তারিখে বিধানসভা মিলিত হইলে স্পীকার এক বিবৃতি দিয়া বলেন যে রাজ্যপাল যে ভাবে বিধানসভার রায় না লইয়া যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে অপসারণ করিয়াছেন এবং ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই না করিয়া তাঁহাকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অবৈধ ও সংবিধান বিরোধী। ইহাছাড়া ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের পরামর্শে তিনি যে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন তাহাও অবৈধ কার্য। এই যুক্তিতে স্পীকার অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা বন্ধ করিয়া দেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ক্ষমতা ও কার্য : (১) রাজ্যের সমগ্র অঞ্চলের জন্য বা ইহার কোনও অঞ্চলের জন্য রাজ্য আইন সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে। একমাত্র রাজ্য আইনসভাই "রাজ্যতালিকাভুক্ত" বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কেন্দ্রীয় আইন সভা ও রাজ্য আইনসভা উভয়েই যদি যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়ের উপর এমনভাবে আইন প্রণয়ন করে যে, একে অপরের বিরোধী আইনে পরিণত হয়

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

তবে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনই বলবৎ হইবে। রাজ্যতালিকায় যে ৬৬টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহারা হইল সাধারণ ও রেলপুলিশ, শান্তি শৃংখলা রক্ষা, জেলখানা, নিম্ন আদালতগুলির গঠন পরিচালনা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমি ব্যবস্থা, বনসম্পদ, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, জুয়াখেলা, কৃষি-আয়কর, বিক্রয়কর, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, মাছের চাষ, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আইন সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহা ছাড়া যুগ্মতালিকায় যে ৪৭টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহারা হইল বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির হস্তান্তর, ফৌজদারী আইন, শ্রমিক কল্যাণ, জন্মমৃত্যুর হিসাব, সংবাদপত্র, ছাপাখানা, বই, দেউলিয়া, খাদ্যে ভেজাল, বাস্তুত্যাগীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলি ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সমাজ পরিকল্পনা, দাতব্য চিকিৎসালয়, ঔষধ, বিষ, কারখানা, বিদ্যুৎ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকসংঘ। এই সকল বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইন সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

অবশ্য, রাজ্য আইনসভা যথেচ্ছ আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। কারণ, (১) রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া কোনও বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না। বিশেষতঃ অর্থবিল তাহার সুপারিশ ছাড়া উত্থাপিত হইতে পারে না। (২) আবার হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব করার মতো বিল, আন্তঃরাজ্য নদী উপত্যকা পরিকল্পনা বিদ্যুৎ বা জলের উপর কর ধার্য করার মতো কোন বিল অথবা গণস্বার্থে ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি দখলের বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া আইনে পরিণত হইবে না। (৩) রাজ্য আইনসভার যে কোন আইন হাইকোর্টের ও সুপ্রিম কোর্টের বিচার ক্ষমতার অধীন। (৪) জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া অন্য রাজ্যের কোন সংবিধান নাই। ভারতের একমাত্র সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যেই রাজ্য আইনসভাকে আইন প্রণয়ন করিতে হয়।

রাজ্য আইনসভা যদি কেন্দ্রীয় আইন সভাকে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করে তবে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) **সংবিধান সংশোধনের** ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভা উদ্যোগী হইয়া সংবিধান সংশোধনের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে না। একমাত্র কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট উদ্যোগী হইয়া সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন সভার এইরূপ প্রস্তাব অংগরাজ্যের বিধানমণ্ডলের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইবে। যেমন, মোট রাজ্যের অর্থাৎ ২২টি অংগরাজ্যের অর্ধেক অর্থাৎ ১১টি অংগরাজ্য যদি কেন্দ্রীয় আইনসভার এইরূপ প্রস্তাব অনুমোদন করে তবেই সংবিধান সংশোধিত হইবে।

(৩) মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও রাজ্য আইন সভার আছে। মন্ত্রিসভা রাজ্যের আইনসভা বিশেষতঃ বিধানসভার নিকট তাঁহাদের কাজের

জন্য দায়িত্বসম্পন্ন। রাজ্যের আইনসভার অনাস্থাসূচক প্রস্তাব যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনা হয় এবং উহা যদি পাস হয় তবে মন্ত্রিসভাকে বিদায় লইতে হয়। আইনসভার সদস্যগণ সরকারী কার্যের তীব্র সমালোচনা করিতে পারে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে। বিতর্কের দ্বারা ও মুলতুবি প্রস্তাব আনিয়া মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। বাজেট আলোচনার সময় বাজেটে ধার্য অর্থ বরাদ্দ কমাইয়া দিয়া মন্ত্রিসভার কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সরকারের আয়-ব্যয় এবং অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটা রাজ্য আইনসভার অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণাধীন। রাজ্য আইনসভা আইন পাস করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা দিলেই সরকার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

সরকারকে নিয়ন্ত্রণ

(৪) কর ধার্য ও ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করার ক্ষমতাও আইনসভার আছে। অবশ্য, রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, বিধানসভার পরিষদ পাল ও উপপরিষদ পালের বেতন ও ভাতা, হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা এবং রাজ্যের ঋণজনিত ব্যয় প্রভৃতি বিধানসভার অনুমোদন সাপেক্ষ নহে। এই ব্যয়গুলি রাজ্যের অবশ্য নির্বাহ তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়। এইগুলি ছাড়া অন্য বিবিধ ব্যয়ের জন্য বিধানসভার অনুমোদন প্রয়োজন। অনুমোদিত ব্যয় সঠিক হইতেছে কিনা তাহা তদারক করিবার জন্য বিধানসভার দুইটি কমিটি আছে। অবশ্য, রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া কোন ব্যয় দাবি করা যায় না। তবে করনীতি নির্ধারণ এবং সরকারী কার্যপদ্ধতি স্থির করার বিষয়ে বিধান সভার পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

(৫) শাসন বিষয়ক ক্ষমতাও আইনসভার আছে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্যদের মধ্য হইতেই ক্যাবিনেট গঠিত হয়। ক্যাবিনেটকে অপসারণ করিবার ক্ষমতাও ইহার আছে। বিধানসভা সরকারী কার্যের তদন্ত করিতে পারে। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা রাজ্যপাল তাঁহাকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। আবার বিধানসভার সদস্য নন এমন কোন লোককে রাজ্যপাল যদি মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন তবে তাহাকে ৬ মাসের মধ্যে বিধানসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে হইবে।

শাসন বিষয়ক ক্ষমতা

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীদল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সরকারের কার্যের তীব্র-সমালোচনা করিতে পারে এবং মুলতুবী ও নিন্দাসূচক প্রস্তাবের মাধ্যমে অভিযোগ পেশ করিতে পারে এবং প্রতিকার দাবি করিতে পারে। তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সফল করিবার সমস্ত ক্ষমতা বিধানসভার সভ্যদের আছে। জনসাধারণকে সরকারের কার্যাবলী সম্বন্ধে সচেতন করিয়া জনমত গঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সরকারী কার্যের সমালোচনা করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিধানসভার নিকট যৌথভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।

(৬) বিচার বিষয়েও বিধানসভার ক্ষমতা আছে। বিধানসভার অবমাননার অভিযোগের বিচার করে বিধানসভা।

বিশেষ অধিকার: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্যগণ কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। আইনসভার মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং উহার কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আইনসভার সদস্যগণ এই সকল সুযোগগুলি পান। আইনসভার অভ্যন্তরে আইনসভার সদস্যগণ বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করেন। আইনসভায় কিছু বলিবার জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাইবে না। আইনসভার সদস্যগণ যে সকল কাগজ-পত্র প্রকাশ করেন তাহার জন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায় না। যদি কোন সদস্য গোপন তথ্য প্রকাশ করেন তবে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায় না। আইনসভার সদস্যগণ আইনসভার বাহিরেও বাক্-স্বাধীনতা ভোগ করেন। আইন-সভার অধিবেশনের ৪০ দিন পূর্বে বা পরে দেওয়ানী মামলার দায়ে সদস্যদের গ্রেপ্তার করা যায় না। আইনসভা চলাকালীন কোন সদস্যকে আইনসভার অনুমতি ছাড়া সাক্ষ্য দিবার জন্য আদালতে উপস্থিত করা যায় না। সদস্যদের বক্তৃতা গোপন রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য ক্ষমতা

আইন তৈয়ারীর পদ্ধতি (The Process of Legislation): আইনসভায় যখন কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাব আইন প্রণয়ন করিবার জন্য পেশ করা হয় তখন তাহাকে বিল (Bill) বলা হয়। বিলটি আইনসভায় গৃহীত হইয়া যখন রাজ্যপালের সম্মতি লাভ করে তখন তাহা আইনে (Act of the Legislature) পরিণত হয়। আইনসভা স্থগিত থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল যে জরুরী আইন জারী করেন তাহাকে 'অর্ডিনান্স' (Ordinance) বলা হয়।

অর্থ বিল (Money Bill) ছাড়া যে কোন বিল আইনসভার যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হইতে পারে। বিল সাধারণতঃ দুই প্রকারের—সরকারী ও বেসরকারী বিল। সরকারী বিল শুধু মন্ত্রীরাই উত্থাপন করিতে পারেন। আইনসভায় বিল পাসের তিনটি স্তর বা পদ্ধতি আছে।

বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading): বিল উত্থাপন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনসভার কক্ষের অনুমতি চাহিয়া প্রস্তাব করিতে হয়। এই স্তরে বিলের উপর কোন আলোচনা হয় না। অনুমতি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সদস্য বিলটিকে উত্থাপন করেন। বিল উত্থাপনের পর উহা জন-সাধারণের অবগতির জন্য সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়। রাজ্যপাল বিশেষ ক্ষেত্রে বিল উত্থাপনের পূর্বেই গেজেট প্রকাশ করিবার অনুমতি দিতে পারেন।

বিলের দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading of the Bill): বিলের দ্বিতীয় স্তর বা পাঠ বিলের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করিতে পারেন—(১) বিলটি বিবেচনা করা হউক ; অথবা (২) বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক ; অথবা (৩) জনমত সংগ্রহের জন্য বিলটিকে প্রচার করা হউক। ইহা ছাড়া বিলটিকে উভয় কক্ষের যুক্ত কমিটির নিকট প্রেরণের প্রস্তাব

গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার পরে বিলটির উপর সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু বিলের বিভিন্ন ধারার কোন বিশদ আলোচনা হয় না।

কমিটি পর্যায়ঃ বিলটি কোন কমিটিতে প্রেরণ করা হইলে সেখানে বিলের ধারাবাহিক আলোচনা চলে। কমিটি ঐ আইনসভার নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। কমিটি পর্যায়ে মূল নীতির কোন পরিবর্তন না করিয়া প্রত্যেকটি ধারার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনা করা হয়।

রিপোর্ট পর্যায় (Report Stage)ঃ কমিটিতে আলোচনার পর ঐ বিলের একটি কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। রিপোর্ট ও সংশোধিত বিলটি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়।

বিচার বিবেচনা পর্যায়ঃ বিলটি সংশোধিত আকারে আইনসভার কক্ষে আলোচিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে ঐ বিলের প্রত্যেক ধারার উপর আলোচনা ও ভোটাভুটি গ্রহণ করা হয়। বিলের উপর এই স্তরে সংশোধনও আনা যায়। এইভাবে বিলের দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হয়।

বিলের তৃতীয় পাঠ (Third Reading)ঃ যখন বিলের বিভিন্ন ধারার উপর বিচার বিবেচনা ও ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হয় তখন বিলের তৃতীয় পাঠ আরম্ভ হয়। এই স্তরে বিলটিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্ন লইয়া বিতর্ক হয়। এই স্তরে বিলের কোন নতুন সংশোধন আনা যায় না। এইভাবে এক কক্ষে বিলটি গ্রহণ করা হইলে অপর কক্ষের নিকট পাঠান হয়। অনুরূপভাবে অন্য কক্ষে বিলটি গৃহীত হইলে উহা রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি দিলে একটি নির্দিষ্ট তারিখ হইতে উহা আইনে পরিণত হয়।

অর্থবিল (Money bill)ঃ অর্থবিল শুধুমাত্র বিধানসভায় (নিম্নকক্ষে) উত্থাপন করা যায়। উহা উচ্চ পরিষদে (বিধান পরিষদে) উত্থাপন করা যায় না। অর্থ সম্বন্ধীয় বিল রাজ্যপালের নামে উত্থাপন করিতে হয়। বিধানসভায় বিলটি পাশ হইলে উহা সুপারিশের জন্য বিধান পরিষদে পাঠান হয়। বিলটিকে ১৪ দিনের মধ্যে বিধান পরিষদ সুপারিশসহ বিধানসভায় ফেরৎ পাঠাইবে। বিধানসভা ঐ সুপারিশগুলি গ্রহণ করিতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করিতে পারে। বিলটি যদি ১৪ দিনের মধ্যে বিধান পরিষদ ফেরৎ না পাঠায় তাহা হইলে ঐ বিল আইনে পরিণত হইবে।

বিধান পরিষদ (Lagislative Council)ঃ ভারতের ২২টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যসমেত মোট ৯টি অঙ্গরাজ্যের আইনসভা দুইটি কক্ষ বিশিষ্ট। বাকি ১৩টি অঙ্গরাজ্যের আইনসভা হইল এককক্ষ বিশিষ্ট। আইন-সভার দুইটি কক্ষের নাম হইল যথাক্রমে বিধান পরিষদ (উচ্চকক্ষ) এবং বিধানসভা (নিম্নকক্ষ)। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৫৭ সালে বিধানপরিষদের বিলোপ সাধন করা হয়। যে ৯টি রাজ্যে এখন আইনসভার দুইটি কক্ষ আছে তাহাদের নাম হইল বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ), পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক (মহীশূর), অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর।

গঠনঃ সংবিধানের ১৭১ ধারায় বিধান পরিষদের গঠন ও নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে। বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা বিধানসভার সদস্যসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না—আবার কোন অবস্থাতেই এই সদস্য-সংখ্যা ৪০ জনের

কম হইবে না। বিধান পরিষদের সদস্যদের মধ্যে (ক) এক তৃতীয়াংশ সদস্য পৌরসভা, জেলা পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। (খ) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটে নির্বাচিত হইবেন। (গ) এক দ্বাদশাংশ ( ) সদস্য স্নাতকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন, (ঘ) এক দ্বাদশাংশ ( ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন, (ঙ) বাকী , রাজ্যপাল মনোনীত করিবেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ভিতর হইতেই রাজ্যপাল তাঁহার সদস্য মনোনয়ন দিবেন।

কার্যকাল ঃ বিধান পরিষদ একটি স্থায়ীসভা। ইহাকে ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। তবে এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন এবং ৬ বৎসরের ভিতর সমগ্র বিধান পরিষদের সদস্যগণকেই নতুন করিয়া নির্বাচিত হইতে হয়। তবে এই নির্বাচন পদ্ধতির ফলে পুরাতন ও নতুন সদস্য এ কই সঙ্গে এই পরিষদে লক্ষ্য করা যায়।

যোগ্যতা ঃ বিধানপরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি থাকা প্রয়োজন—(১) ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, (২) বয়স ত্রিশ বৎসরের কম হইবে না, (৩) রাজ্যবিধানসভার ভোটার তালিকাভুক্ত হইতে হইবে, (৪) সরকারের অধীনে কোন লাভজনক পদে নিযুক্ত থাকা চলিবে না, (৫) পাগল ও দেউলিয়া ব্যক্তির সদস্য হইবার যোগ্যতা নাই।

একই সঙ্গে কেহ বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সদস্য হইতে পারিবে না।

চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান ঃ বিধান পরিষদের সদস্যরা তাঁহাদের ভিতর হইতে একজন সদস্যকে চেয়ারম্যান ও আর একজন সদস্যকে ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। সাধারণতঃ কোন ভোটাভুটিতে চেয়ারম্যান বা সভাপতি অংশ গ্রহণ করেন না—কিন্তু উভয় দিকে সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে তাঁহাকে নির্ণায়ক ভোট (casting vote) দিতে হয়। কোরামের (quorum) জন্য সভার শতকরা ১০ জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। চেয়ারম্যান বা সভাপতি পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উপর তাঁহার রুলিং দেন।

অনাস্থা প্রস্তাব ঃ বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনা যায়। এই প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ১৪ দিনের নোটীশ দিতে হয়। অনাস্থা প্রস্তাব মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত হইলে চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করিতে হয়।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ বিধান পরিষদে অর্থবিল ছাড়া যে কোন বিল উত্থাপন করা যাইতে পারে। অন্য বিলেরক্ষেত্রে ঐ বিল পরিষদে পাস হইবার পর উহা বিধানসভায় পাঠাইয়া দিতে হয়। বিধানসভায় ঐ বিল পাস হইবার পর রাজ্যপালের সম্মতি পাইলে উল্লিখিত বিল আইনে পরিণত হইবে। বিধান-সভায় গৃহীত বিলকে বিধান পরিষদ পাস করিতে পারে, প্রত্যাখ্যান করিতে পারে আবার সংশোধিত আকারে ফেরৎ পাঠাইতে পারে। ৪ মাসের বেশী কোন বিলকে আটকাইয়া রাখা যায় না। বিধানসভায় গৃহীত বিল যদি বিধান পরিষদ অনুমোদন না করে তবে বিধানসভা উহাকে দ্বিতীয়বার পাস করিয়া রাজ্যপালের সম্মতি লইয়া উহাকে আইনে পরিণত করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত বিলের উপর বিধান পরিষদ আলোচনা করিতে পারে, কিন্তু তাহা সংশোধন করিতে পারে না।

দুইকক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ঃ কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেণ্টের উভয়কক্ষের মধ্যে যে ধরণের সম্পর্ক রহিয়াছে রাজ্যের দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার মধ্যেও সেইরূপ সম্পর্ক রহিয়াছে। দুইটি কক্ষেব মধ্যে বিধানসভা বেশী ক্ষমতাশালী। তুলনামূলকভাবে বিধান পরিষদ দুর্বল।

(২) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে বিধানসভার নিকট তাহাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী। কোন অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। বিধান পরিষদে ঐ ধরণের কোন প্রস্তাব পাস হইলেও মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয় না।

(৩) অর্থসংক্রান্ত বিল একমাত্র বিধানসভাতেই উত্থাপিত হইতে পারে। বিধান পরিষদ অর্থ সংক্রান্ত বিলকে ১৪ দিন আটকাইয়া রাখিতে পারে আর অন্যান্য বিলকে ৪ মাস পর্যন্ত আটকাইযা রাখিতে পারিবে। বিধানসভার অসম্মতিতে কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না। কোন বিল অর্থবিল কিনা এই প্রশ্ন উঠিলে বিধানসভার স্পীকার যে সিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তুলনামূলক বিচারে রাজ্যের বিধানসভাই বেশী ক্ষমতা ভোগ করে। বিধান পরিবদ শুধুমাত্র বিল পাসের ব্যাপারে কিছু বিলম্ব ঘটাইতে পারে।

বিধান পরিষদ না রাখার পক্ষে যুক্তি ঃ (১) পূর্ব আলোচনার ভিত্তিতে অনেকেই মনে করেন বিধান পরিষদ একটি ক্ষমতাহীন আইন পরিষদ। ইহাদের মতে এই পরিষদ আইন পাসে বিধানসভার কাজে শুধুমাত্র বিলম্ব ঘটায়।

(২) ভারতবর্ষের ন্যায় একটি দরিদ্রদেশে দুইটি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রাখিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। ইহা একটি সামাজিক অপব্যয়।

(৩) বিধান পরিষদ পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। আবার ইহার কিছু অংশ মনোনীত সদস্য হিসাবে থাকেন। পরোক্ষ নির্বাচন ও মনোনয়নের ভিতর দিয়া কিছু স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি এই পরিষদে আসিবার সুযোগ পান। ইহা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিরোধী বলিয়া অনেকে মনে করেন।

(৪) বিধান পরিষদ অনেক সময় বিল পাস করিতে অযথা বিলম্ব ঘটায়। সমাজের অগ্রগতির প্রয়োজনে বহু নতুন আইনের প্রয়োজন হইতেছে। দ্রুত আইন পাস না হইলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। বিধানসভা কোন বিল পাস করিবার পর যদি বিধান পরিষদ বিল পাশ করিতে বিলম্ব করে কিম্বা বিল পাসের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে তাহা হইলে এই বিধান পরিষদ না রাখাই বাঞ্ছনীয়।

(৫) সংবিধানে উচ্চকক্ষগুলির ক্ষমতা অর্থসংক্রান্ত এবং অন্যান্য ব্যাপারে একান্তই সীমিত। যদি বিধান পরিষদগুলি বিধানসভা সমূহের বিনা অনুমোদনে কোন আইন পাস করিতে অসমর্থ হয় সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষগুলি রাখা নিষ্প্রয়োজনীয়।

সংবিধান প্রবর্তনের পূর্ব হইতেই পশ্চিম বঙ্গে আইনসভার দুইটি কক্ষ ছিল। বৃটিশ আমলে এই রাজ্যের আয়তন, লোকসংখ্যা এবং সরকারী আয় অনেক বেশী ছিল—স্বভাবতঃই সেই সময় দ্বিতীয় কক্ষ রাখিবার বিশেষ কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে এই উচ্চকক্ষ তুলিয়া দিবার জন্য অনেকেই মত পোষণ করেন। প্রধানতঃ ব্যয় সংকোচনের জন্যই ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার (বামপন্থীমত সম্পন্ন) বিধানপরিষদ বিলুপ্তি করণ আইন পাস করিয়া এই সভা

তুলিয়া দেন। অন্যান্য রাজ্যেও (যেখানে দ্বিতীয় কক্ষ আছে) এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ইহার ফলে বহু অর্থের সাশ্রয় হইবে এবং তাহা জন-কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হইতে পারিবে।

দ্বি-পরিষদ রাখার পক্ষে যুক্তি ঃ বিধান পরিষদ না রাখা কিম্বা ইহার বিলোপ সাধনের পক্ষে যেমন যুক্তি আছে তেমনি এই ধরণের কক্ষ (দ্বিতীয় কক্ষ) রাখার পক্ষেও অনেকে মত পোষণ করেন। বিধান পরিষদ রাখার সমর্থকদের মতে—

(১) নিম্নকক্ষের অসংযত এবং স্বৈবাচারী কার্যকলাপের প্রতিরোধ হিসাবে দ্বি-কক্ষ রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

(২) দ্বি-কক্ষ ব্যবস্থা থাকিবার ফলে আইন সম্পর্কীয় প্রস্তাবগুলি সতর্কতার সহিত পর্যালোচনা করা যায়।

(৩) এই পরিষদে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আসিবার সুযোগ পাইযা থাকেন। আইন রচনায় ইঁহাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা পাওয়া যায়।

(৪) এই ব্যবস্থায় বেশী আলোচনা করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক শাসনের স্থায়িত্ব নিরন্তর আলোচনা ও মতবিনিময়ের উপর নির্ভর করে।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উচ্চকক্ষ অংগরাজ্যগুলির ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে সাহায্য করিযা থাকে।

(৬) প্রথম কক্ষ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যদি কোন ভুল ত্রুটি করিয়া থাকে দ্বিতীয় কক্ষ আলোচনার দ্বারা তাহাকে সংশোধন করিতে পারে।

বিধানসভার স্পীকার ঃ লোকসভার স্পীকারের মতই প্রত্যেক রাজ্যবিধান সভায় একজন স্পীকার (Speaker) এবং একজন ডেপুটি স্পীকার (Deputy Speaker) আছেন। সদস্যরা নিজেদের মধ্য হইতে ভোট দিয়া স্পীকার এবং সহকারী স্পীকার নির্বাচিত করিয়া থাকেন। বিধানসভা নিরপেক্ষতার সহিত পরিচালনা করিবার ব্যাপারে স্পীকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ স্পীকার সংখ্যাগরিষ্ঠদল হইতেই নির্বাচিত হন। বৃটিশ হাউস অফ কমন্সে নির্বাচনের পর স্পীকার তাঁহার পূর্ব দল হইতে পদত্যাগ করেন। তিনি যাহাতে নিরপেক্ষতার সহিত তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে পারেন সেইজন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশে কেন্দ্রে (লোকসভায়) এবং রাজ্যে আমরা এই নীতি সম্পূর্ণ গ্রহণ করি নাই। ফলে এখানে কোন সদস্য স্পীকার নির্বাচিত হইবার পরেও তাঁহার পূর্ব দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন না। স্পীকার অনুপস্থিত হইলে তাহার কাজ ডেপুটি স্পীকার করিয়া থাকেন। যদি উভয়ই অনুপস্থিত হন তখন একটি নির্দিষ্ট প্যানেল হইতে নির্ধারিত সদস্যরা সভার কাজ পরিচালনা করেন। অধিবেশনের সুরুতেই স্পীকার বিভিন্ন দলের সদস্যদের মধ্য হইতে এই কাজের জন্য ৬ জন সদস্যের এক তালিকা প্রণয়ন করেন।

স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার উভয়ই বেতন, ভাতা, সরকারী গাড়ী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন। স্পীকারের বেতন ও ভাতা বাৎসরিক ভোটাভুটির আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে। স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারকে পদচ্যুত করা যায়। এই ধরণের প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ১৪ দিনের নোটিশ প্রয়োজন। পদচ্যুতি বা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

কার্যাবলী ঃ (১) স্পীকার বিধানসভার অধ্যক্ষ। তাঁহার প্রধান কাজ সভার শৃংখলা বজায় রাখা এবং সুষ্ঠুভাবে বিতর্ক পরিচালনা করা। জটিল এবং বিতর্কমূলক প্রশ্নে স্পীকার অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। (২) সদস্যদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ সম্পর্কে নিয়মকানুন স্পীকার রচনা করিয়া থাকেন। সংখ্যালঘুদলভুক্ত সদস্যরা যাহাতে বিতর্কে সুযোগ পান তাহার ব্যবস্থা তিনিই করেন। (৩) স্পীকার সাধারণত: কোন ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ করেন না কিন্তু উভয়দিকেই যখন সমানসংখ্যক ভোট হওয়ার ফলে অচল অবস্থা দেখা দেয় তখন স্পীকার নির্ণায়ক ভোট (Casting vote) দিয়া ঐ অচল অবস্থা দূর করিয়া থাকেন। (৪) স্পীকার অর্থবিলের সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া থাকেন। কোন বিল অর্থবিল কিনা এ প্রশ্নের মিমাংসা স্পীকারই করিয়া থাকেন। এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। (৫) বিধানসভার সহিত রাজ্যপালের যোগসূত্র হইতেছেন স্পীকার। বিধানসভা রাজ্যপালকে কোন কিছু যদি জ্ঞাপন করিতে চাহেন তাহা হইলে স্পীকারের মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে। (৬) বিধানসভার কোন সদস্য যদি সভার আইন ভংগ করেন কিম্বা স্পীকারের নির্দেশ পালন করিতে রাজী না হন তাহা হইলে প্রয়োজন হইলে স্পীকার ঐ সদস্যকে বিধানসভার রক্ষীবাহিনী লোকের (Sergeant) সাহায্যে সভা হইতে বিতাড়ন করিতে পারেন। স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে কোন আদালত বৈধতার প্রশ্ন তুলিতে পারে না। (৭) বিধানসভায় বিভিন্ন বিল কি ভাবে আলোচনা করা হইবে তাহা এবং বিধানসভার দৈনন্দিন কার্যক্রম সরকার ও বিরোধী দলগুলির সহিত আলোচনা করিয়া স্পীকার নির্ধারণ করেন। সভার অধিবেশন স্পীকারের নির্দেশেই মুলতুবী রাখা হয়। (৮) স্পীকার বিধানসভার বিভিন্ন কমিটির সদস্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। কমিটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল অধিকার সংক্রান্ত কমিটি, নিয়মকানুন সংক্রান্ত কমিটি এবং পরামর্শ দান কমিটি।

উপসংহার ঃ স্পীকারের উল্লেখিত ক্ষমতা ও কার্যাবলী লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে দেশের আইনসভার ব্যাপারে স্পীকার এক বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। তাঁহার নিরপেক্ষ হস্তক্ষেপের ফলেই বিরোধী দলগুলি তাঁহাদের যথাযথ অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। বিভিন্ন বিতর্কমূলক বিষয়ে এবং বৈধতার প্রশ্নে স্পীকারের রুলিং ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টি করিয়াছে। বৃটিশ আমলে ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার তদানীন্তন স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলির এক রুলিয়ের ফলে ক্ষমতাশীন নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়।

বিচার বিভাগ

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। বিচার বিভাগের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে দেশের শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ। সমাজে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির অথবা ব্যক্তির সহিত সরকারের বিরোধ বাধিলে তাহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে বিচার বিভাগ। আইন বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে তাহাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয় বিচার বিভাগকে। বিচার বিভাগ যাহারা পরিচালনা করেন তাঁহাদের বলা হয় বিচারপতি। বিচারপতিগণ শুধু আইনভংগকারী

দোষীকেই শাস্তি প্রদান করেন না ; বিচারপতিগণ প্রয়োজনবোধে প্রকৃত আইনের ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত আইনের যথোপযুক্ত ব্যবহারও করেন। আবার দোষী ব্যক্তির দোষের গুরুত্ব অনুসারে এবং আইন ভঙ্গকারীদ্বারা ক্ষতির পরিমাণ ভেদে বিচার-পতিগণকে বিচার মীমাংসা করিয়া দিতে হয়। দেশের শান্তি-শৃংখলা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য ন্যায় বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

বিচারপতিগণ এই নীতি অনুসরণ করেন যে, একাধিক অপরাধী ব্যক্তি শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইলেও যেন একজন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি না পায়। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান (Equality before the eye of law) এবং আইন দ্বারা সকলের স্বার্থই সমানভাবে রক্ষিত হয়। (Equal protection of law)—এই দুইটি নীতি বিচারালয়ের মাধ্যমে কার্যকর হয়। ছোট বড় সকলেই বিচারালয়ে সমান ব্যবহার পায়। বিচারকগণের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী না থাকিলে বিচারকগণ দুর্নীতি পরায়ণ হইলে ন্যায় বিচার সম্ভব নয় এবং ইহার ফলে দরিদ্র মানুষের উপর অত্যাচারকে রোধ করিবার কোন উপায় থাকে না। আবার বিচার ব্যবস্থা যদি দ্রুত সম্পাদিত না হয় তবে প্রকৃত ন্যায় বিচার আশা করা যায় না ("Justice delayed is Justice denied"), কারণ বিলম্বিত সময়ের ব্যবধানের মধ্যে অনেক প্রভাব ন্যায় বিচারকে ধ্বংস করে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary) : বিচার বিভাগের গুরুত্ব বর্তমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিভাগের কার্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে এই বিভাগের কার্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) বিচার বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনের ব্যাখ্যা করা এবং আইনের প্রয়োগ করা। এখানে আইন বলিতে ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইন, লিখিত শাসনতান্ত্রিক আইন এবং প্রথাগত আইনকে বুঝানো হয়।

(২) বিচার বিভাগের প্রধানতম কার্য হইল আইনভংগকারীর বিচার করা।

(৩) স্থিতিশীল লিখিত শাসনতন্ত্র গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। এই কারণে বিচারপতিগণ অনেক সময় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করেন। বিচারপতিগণের এই রায় (Judgement) ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হয়। এইরূপ আইনকে বিচারকগণ প্রণীত আইন (Judge-made laws) বলা হয়। অতএব দেখা যায় বিচার বিভাগ শুধু আইনের ব্যাখ্যাই করে না, আইন প্রণয়নও করে।

(৪) বিচার বিভাগকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অভিভাবক ও চরম ব্যাখ্যাকর্তা বলা হয়। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বিচার বিভাগ কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

(৫) অনেক দেশে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপতিকে এবং ব্যবস্থাপক সভাকে বিচার বিভাগ পরামর্শ দিয়া থাকে।

(৬) উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও বিচার বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য আছে ; যেমন, (ক) কর্মচারী ও অভিভাবক নিয়োগ, (খ) লাইসেন্স প্রদান, (গ) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা, (ঘ) দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারীর কার্য করা, (ঙ) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে লেখ (writ) বা নির্দেশ জারি করা।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা (Independence and Impartiality of the Judiciary) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর :

(১) **বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি (Appointment of Judges) :** প্রথমতঃ, গুণাবলীর দিক হইতে বিচারকগণকে বিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, মর্যাদাবোধসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, এই গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনপ্রকারের বিচারকগণ নিযুক্ত হয় ; যথা (ক) শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক, (খ) আইনসভা কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে এবং (গ) জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারকগণের নিয়োগপদ্ধতি প্রচলিত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্য-গুলিতে এবং সুইজারল্যাণ্ডের ক্যান্টনে। অধ্যাপক ল্যাস্কি এই প্রক্রিয়ায় নিয়োগ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলেন, বিচারকগণের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবার পদ্ধতি প্রচলিত হইলে পুনর্নির্বাচনে জয়লাভের আশায় বিচারক-গণ ন্যায়বিচারের পথ পরিত্যাগ করিবে। আবার জনপ্রিয়তার উপরই যদি বিচারকের কার্যকাল নির্ভর করে তবে নিরপেক্ষ বিচারপ্রাপ্তির আশা করা যায় না।

এতদ্ব্যতীত দলীয় প্রথায় নির্বাচন হইলে রাজনীতির অশুভ প্রভাব বিচারপতিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিবে। সর্বোপরি বিচারপতির যে সকল গুণ অপরিহার্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে জনসাধারণের নির্বাচিত বিচারপতি সেই গুণগুলির অধিকারী নাও হইতে পারে। কারণ গুণীব্যক্তি জনপ্রিয় নাও হইতে পারেন।

আইনসভা দ্বারা নিয়োগপদ্ধতিও অনুরূপ দোষে দুষ্ট। আইনসভা দ্বারা বিচারপতিকে নিয়োগ করা হইলে স্থানীয় স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, প্রভাবশালীদের চাপ প্রভৃতি বিচারপতির মূল উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবে।

উপরোক্ত অসুবিধার জন্য অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, বিচারকগণ শাসনবিভাগ দ্বারা নিযুক্ত হইলে অনেক পরিমাণে দোষমুক্ত হইতে পারিবেন। অবশ্য, ল্যাস্কি এই পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য সুপারিশ করেন। তাঁহার মতে বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে বিচারকদের নিয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবকে বিচারকদের একটি কমিটির দ্বারা অনুমোদন করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।*

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি সতর্কতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাসন বিভাগের কার্যে ব্যাপৃত কোন ব্যক্তিকে বিচারকের পদে নিয়োগ করা অনুচিত। কারণ ইহাতে যে ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের স্বার্থ জড়িত থাকে সেই বিষয়ের বিচারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার বিচারকগণের যদি কোন রাষ্ট্রনৈতিক পদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে তাঁহারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রনৈতিক পদপ্রাপ্তির আশায় শাসন বিভাগকে সমর্থন করিয়া বিচারকার্য সম্পাদন করিবেন। ফলে নিরপেক্ষতা রক্ষা পাইবে না।

*"... to make appointments on the recommendation of the Minister of Justice with the consent of a standing committee of the judges, which would represent all sides of their work."

(২) **বিচারকগণের কার্যকাল (Judicial Tenure) :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারপতিগণের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিশেষ প্রয়োজন। হ্যামিলটন (Hamilton) বলেন যে, বিচারপতিগণের পদের স্থায়িত্ব সাম্প্রতিক সরকারী ব্যবস্থার অন্যতম উৎকর্ষের নিদর্শক। রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ইহা স্বৈরাচারের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ ; প্রজাতন্ত্রে ইহা জনপ্রতিনিধিদের আতিশয্য ও অত্যাচার রোধ করে। আমেরিকার অংগরাজ্যে ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনে বিচারকদিগের কার্যকাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু কাম্য ব্যবস্থা হইল অক্ষমতা ও অপরাধের কারণ ব্যতীত বিচারপতিদের অপসারণ করা উচিত নয়।

(৩) **বিচারকগণের অপসারণ (Removal of Judges) :** বিচারকগণের পদচ্যুতির পদ্ধতির উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভরশীল। অক্ষমতা ও দুর্নীতির কারণ ছাড়া স্থায়িভাবে নিযুক্ত বিচারকগণকে পদচ্যুত করা যায় না। কিন্তু অক্ষম ও দুর্নীতিপরায়ণ বিচারকের অপসারণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু এই অপসারণের জন্য শাসন বিভাগকে এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে অন্য কোন চাপ এই কার্যকে প্রভাবিত না করিতে পারে। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ হইতে উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে রাজাকে অনুরোধ জানাইলে বিচারককে রাণী বা রাজা পদচ্যুত করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইমপিচমেণ্ট পদ্ধতিতে বিচারককে পদচ্যুত করা যায়। ইমপিচমেণ্ট পদ্ধতি অনুসারে কংগ্রেসের নিম্নতন কক্ষ বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে। এই অভিযোগের বিচার করে ঊর্ধ্বতন কক্ষ। ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের মোট সংখ্যাধিক্য এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ যদি কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে তবে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। ল্যাস্কি বলেন, সপ্ততিতম বৎসর বয়সে বিচারপতির অবসর গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য, নাতিশীতোষ্ণ দেশে আরও কম বয়সে বিচারপতিকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

(৪) **বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা (Salaries and Emoluments of Judges) :** নীতির দিক হইতে বিচারকগণের বেতন ও ভাতা এমন হওয়া উচিত যাহাতে শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার না করেন। বেতন কম হইলে অর্থাভাবে বিচারকগণ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। কার্যকাল, বেতন ও ভাতার হার বিশেষ পরিবর্তিত হওয়া উচিত নয়। কারণ বেতনের হার পরিবর্তনের আশঙ্কা তাঁহাদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারে। আবার শাসনবিভাগের মঞ্জুরির উপরও এই বেতন ও ভাতা ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন নয়।

(৫) **বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Judiciary) :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের উপর। শাসন বিভাগের উপর যদি বিচার বিভাগের বেতন অনুমোদনের ভার অর্পিত হয় এবং বিচারকগণকে নিয়োগের ভার অর্পিত হয় অর্থাৎ শাসন বিভাগের উপর বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার অর্পিত হয়, তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, এই স্বতন্ত্রীকরণ, এই নিয়োগ পদ্ধতি এবং অপসারণ পদ্ধতি সবই নির্ভর করে রাষ্ট্রিক কাঠামোর উপর। ল্যাস্কি বলেন, বিচারপতিগণ উচ্চশিক্ষা পান এবং যে শ্রেণী হইতে তাঁহারা আসেন তাহা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী

এবং যে পরিবেশে তাঁহারা বাস করেন তাহাতে প্রগতিশীল কোন মতবাদ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। আবার শ্রেণী-স্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ হিসাবে যে আইন প্রণীত হয় তাহাকেই বিচাবকগণ বলবৎ করেন। অতএব শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাঁহারা কোন কিছুর কথা চিন্তা করিতে পারেন না। এইদিক হইতে বলা যায় যে, বিচারবিভাগও শ্রেণীস্বার্থকে বলবৎ রাখিবার যন্ত্র বিশেষ। সরকারের এই তিনটি বিভাগের মৌলিক উদ্দেশ্য এক হওয়ায় ইহাদের মধ্যে যে স্বতন্ত্রীকরণ করা হয় তাহাকে ক্ষমতার স্বতন্ত্রী-করণ বলা চলে না।
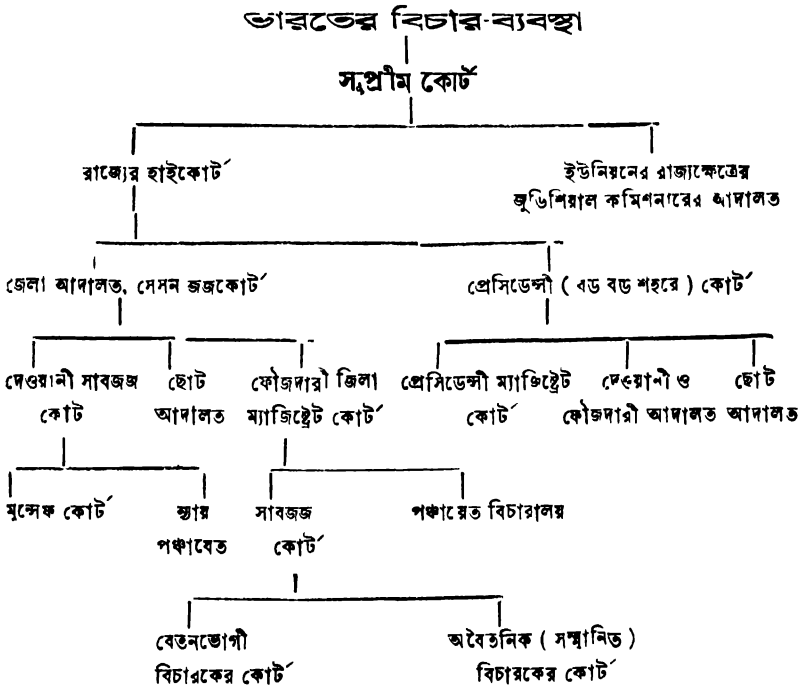
ভারতের বিচার-ব্যবস্থা জগতের অন্যান্য দেশের বিচার-ব্যবস্থা হইতে কিছু স্বতন্ত্র। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশে সাধারণতঃ যেরূপ বিচার-ব্যবস্থার পত্তন করা হয় প্রায় অনুরূপ বিচার-ব্যবস্থা ভারতেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতের বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Salient features of the Indian Judicial system) ঃ (১) ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র ; কিন্তু ইহার একটিমাত্র সংবিধান। অংগরাজ্যের কোন সংবিধান নাই। পৃথক আইনের ব্যবস্থা ভারতে নাই। বিশাল ভারতে সকলের জন্য এক আইন। এখানে নাগরিকতা অখণ্ড। সকল নাগরিকের জন্য একই ধরণের বিচার-ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীদিগের জন্য ফ্রান্সের মতো স্বতন্ত্র বিচারালয় নাই। আইনের চক্ষে সকলেই সমান।

(২) ভারতের বিচার-ব্যবস্থার শৃঙ্খলটি এত বড় যে এক একটি সাধারণ মামলার

বিচার হইতে অনেক সময় কাটিয়া যায়। এতদিন ধরিয়া বিচার চলায় বহু অর্থও ব্যয় হয়। সরকারী খরচায় সকল মামলা চলিবার ব্যবস্থা ভারতে নাই। বেসরকারী ভাবেই দরিদ্র নাগরিকগণকে আইন ব্যবসায়ীদিগকে নিয়োগ করিতে হয়। দরিদ্র একজন গ্রামবাসীর পক্ষে নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণী অনেক সময় দোষী হইয়াও অর্থের জোরে উকিল, ব্যারিস্টারের জোরে এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া মামলায় জয়লাভ করে।

(৩) সর্বভারতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রবর্তিত হয় নাই। সকল অংগরাজ্যে একই আইনানুসারে বিচার করা হয়।

(৪) বিচার ব্যবস্থায়ও কেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার শুনানী হইতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট সমগ্র ভারতের জন্য একমাত্র সর্বোচ্চ আপীল আদালত। প্রত্যেক অংগরাজ্যের উচ্চ বিচারালয় হইতে মামলা সংবিধান নির্দিষ্ট উপায়ে সুপ্রীম কোর্টে আনীত হইতে পারে। অংগরাজ্যের উচ্চ বিচারালয়গুলিকে শেষ-বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টে রবিচারপতিদের নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি।

(৫) আমেরিকায় সুপ্রীম কোর্টের যেরূপ অংগরাজ্যে শাখাকোর্ট আছে, তেমন শাখাকোর্ট ভারতের সুপ্রীম কোর্টের নাই। ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়ও নাই বলিলে চলে। ভারতে জুরীর বিচার আছে তবে জুরিগণের বিচার ক্ষমতা অতিশয় সীমাবদ্ধ। অংগরাজ্যের বিচারকগণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যের বিচারকদিগের মতো জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন না।

(৬) **ভারতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** স্বীকৃত হইয়াছে। মন্তেস্কিউয়ে সরকারের ক্ষমতাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগকে নিজ এলাকায় পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী করিবার পক্ষে যুক্তি দেন। এই তিনটি বিভাগ হইল শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। বিশেষতঃ বিচার বিভাগের বিচারক যদি নির্ভীকভাবে বিচার করিতে পারেন তবেই অবৈধ আইনের অত্যাচার ও শাসনবিভাগের ক্ষমতালিপ্সা হইতে নিরপরাধী নাগরিকগণ রক্ষা পাইবে। আর বিচারকগণ যদি আইন পরিষদ ও শাসকবর্গের ভয়ে ভীত হন তবে ন্যায় বিচার সম্ভব নয় এবং সুবিচারের অবসান হইবে। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি স্বীকৃত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হইয়াছে বটে কিন্তু, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি কার্যকর হইবার ফলে ক্ষমতার-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুফল পাওয়া যায় না। ভারতের সংবিধান ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি স্বীকার করে নাই বটে কিন্তু, সংবিধানে এমন কতকগুলি ধারা যুক্ত হইয়াছে যাহাতে বিচার বিভাগের স্বধীনতা কার্যকর হইতে পারে; যেমন, (১) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা এবং পেন্সন প্রভৃতি অবশ্যনির্বাহযোগ্য ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়। ইহা পার্লামেণ্টের ভোটে পাস করিতে হয় না। ফলে আইন বিভাগ বেতন ভাতা কমানোর ভয় দেখাইতে পারে না; (২) সংবিধানের ২১১ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যে আচরণ করিবেন সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা আইনসভায় হইতে পারিবে না। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের জন্য আইনসভা রাষ্ট্রপতির নিকট অভিভাষণ পাঠাইতে পারে মাত্র। (৩) বিচারপতিদের, বেতন সংবিধানেই নির্দিষ্ট

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

হইয়াছে। আইনসভা যদৃচ্ছা পরিবর্তন করিতে পারে না। একমাত্র জরুরী অবস্থা ছাড়া এই বেতন কমানো যাইবে না। বিচারপতিদের ছুটি, বদলি প্রভৃতি তাহাদের ক্ষতি করিয়া পরিবর্তন করা যাইবে না। (৪) বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন বটে কিন্তু, রাষ্ট্রপতি এই নিয়োগের পূর্বে প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করেন। ফলে এই ব্যাপারে শাসন বিভাগের কোন রাষ্ট্রনৈতিক চাপ কার্যকর হয় না। (৫) রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগকর্তা বটে কিন্তু তিনি বিচারপতিদের যদৃচ্ছা পদচ্যুত করিতে পারেন না। একমাত্র পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী অংশ সদস্যের ভোটে পাস করা যদি এইরূপ কোন প্রস্তাব থাকে যে, কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করা হউক তবেই রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

ভারতের বিচার-ব্যবস্থার সংগঠন : ভারতের বিচার-ব্যবস্থার গঠন শুরু হইয়াছে গ্রামের ন্যায় পঞ্চায়েত হইতে এবং ইহার শেষ হইয়াছে সুপ্রীম কোর্টে। ন্যায় পঞ্চায়েত হইতে সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে সকল বিচারালয় আছে তাহা লইয়াই ভারতের বিচার-ব্যবস্থা। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : (১) ন্যায় পঞ্চায়েত (২) মুন্সেফের কোর্ট, (৩) জিলা জজেব আদালত, (৪) দায়রা জজের আদালত, (৫) হাইকোর্ট এবং (৬) সুপ্রীম কোর্ট। নিম্নে ইহাদের আলোচনা করা হইল :

(১) **ন্যায় পঞ্চায়েত** : গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মিলিয়া একটি 'গ্রাম সভা" গঠন করে। গ্রামসভা একটি 'গ্রাম পঞ্চায়েত' নির্বাচন করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি শাখার নাম "ন্যায় পঞ্চায়েত"। ন্যায় পঞ্চায়েত" হইল বিচার-ব্যবস্থার সংগঠনের মধ্যে সর্বনিম্ন আদালত। ইহার বিচার এলকা দুইটি ; যথা,দেওয়ানী ও ফৌজদারী। সামান্য টাকা মূল্যের বিষয়বস্তুর দেওয়ানী মামলা এই আদালতে হইতে পারে। আর ছোট খাটোফৌজদারী মামলাও এই আদালতে হইতে পারে। ইহার বিচার পদ্ধতি সরল এবং কোন উকিলের প্রয়োজন হয় না। যেখানে ন্যায় পঞ্চায়েত চালু হয় নাই সেখানে নিম্নতম দেওয়ানী আদালত হইল "ইউনিয়ন কোর্ট" এবং ফৌজদারী আদালত হইল "বেঞ্চকোর্ট"।

(২) **মুন্সেফের আদালত** : ন্যায় পঞ্চায়েতের উপরে আছে মহকুমায় অবস্থিত মুন্সেফের আদালত। এই আদালতের দেওয়ানী বিভাগে সাধারণতঃ ১,০০০ টাকা পর্যন্ত বিষয়বস্তুর মামলা হইয়া থাকে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ৫,০০০ টাকার বিষয়বস্তুর মামলাও হয়। যেখানে কোন মহকুমার মুন্সেফের কোর্ট নাই অথচ আদালত আছে তাহাকে বলা হয় "চোকী"। সাধারণতঃ ২,০০০ টাকার বিষয়বস্তুর উপর মামলা সাব জজ বা জিলা জজের আদালতে হইয়া থাকে। মুন্সেফের বা সাবজজের আদালত হইতে জিলা জজের আদালতে আপীল করা যায়। মহকুমা কেন্দ্রে ফৌজদারী মামলার জন্য অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। তিনি ছোট-খাটো ফৌজদারী মামলার বিচার করেন। ফৌজদারী মামলা আরও গুরুতর হইলে মহকুমা সদরে যে বেতন-ভুক ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন তিনি যে পরিমাণ শাস্তি দিতে পারেন তার ভিত্তিতে ইহা-দিগকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া বিচার করেন। ইহা জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানের অধীন।

(৩) **জেলা জজের কোর্ট** : প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলা জজের কোর্ট আছে। বিচারকার্য বিষয়ে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তাহার তত্ত্বাবধানের অধীন ম্যাজিস্ট্রেটগণ হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। খুন ও ডাকাতির মামলার ক্ষেত্রে

ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রাথমিক বিচার করেন। তারপর মামলার গুরুত্ব অনুসারে প্রয়োজন হইলে মামলাটিকে জিলার দায়রা আদালতে (Session court) পাঠাইয়া দেন।

(৪) **দায়রা জজের আদালত ঃ** কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে (City Civil ও Session Court) নামে বিশেষ আদালত আছে। সাব জজ ও জিলা জজের এজলাসে যে ধরণের মামলা হইতে পারে ঐ ধরণের মামলা এই আদালতে হইতে পারে। শহরে প্রেসিডেন্সী আদালত থাকে। মহকুমা কোর্টে যে ধরণের ফৌজদারী মামলা হইতে পারে ঐ ধরণের মামলা প্রেসিডেন্সী কোর্টেও হইতে পারে।

(৫) হাইকোর্ট

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। ইহার অংগরাজ্যে পৃথক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংবিধানের ২১৪ **অনুচ্ছেদ** অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত থাকিবে। পার্লামেন্ট আইন করিয়া একাধিক রাজ্যের জন্য একটি উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন আইন অনুসারে হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করিতে পারিবেন। বিচারপতিগণকে এক উচ্চ বিচারালয় হইতে অপর উচ্চ বিচারালয়ে বদলি করিলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভাতা দিতে হইবে; বিচারপতিগণ একবার নিযুক্ত হইলে ইহাদিগকে সংবিধান নির্দিষ্ট পন্থা ছাড়া পদচ্যুত করা যায় না। অকর্মণ্যতা বা দুষ্কর্মের জন্য সংবিধান নির্দিষ্ট উপায়ে পদচ্যুত করা যায়। রাজ্যপাল এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল এবং উচ্চ আদালতের প্রধান-বিচারপতি ও ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া অংগরাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিদিগকে নিয়োগ করেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অংশ সদস্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। আবার ৬২ বৎসর বয়সের পূর্বে কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে পারেন। সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতিকে কোনও হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অতিরিক্ত বিচারপতি ২ বৎসর পর্যন্ত কাজে বহাল থাকিবেন।

যোগ্যতা ঃ রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি হইতে হইলে কতকগুলি যোগ্যতা থাকা চাই; যেমন, (১) ভারতের নাগরিক হইতে হইবে; (২) অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া ভারতের বিচার বিভাগের কোনপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে, (৩) অথবা অন্তত ১০ বৎসর ধরিয়া উচ্চ আদালতের এ্যাডভোকেট হিসাবে আইন ব্যবসা করিতে হইবে; (৪) বয়স অনধিক ষাট বৎসর হইতে হইবে এবং (৫) যোগ্য ও সৎ নাগরিক হইতে হইবে।

বেতন ও ভাতা ঃ সংবিধানের হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা বলা আছে। পার্লামেন্ট তাহাদের বেতন, ভাতা, ছুটির অধিকার ও পেনসন প্রভৃতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে। বিচারপতিগণ যতদিন কাজে বহাল থাকিবেন তারমধ্যে তাঁহাদের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া বেতন ও ভাতা পরিবর্তনকরা যাইবে না।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Power and functions) ঃ অংগরাজ্যের সমগ্র সীমানাব্যাপীই উচ্চ আদালতের এলাকা। আবার পার্লামেন্ট ইচ্ছা করিলে একটি অংগরাজ্যের উচ্চ আদালতের এলাকার মধ্যে অপর একটি অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করিতে

পারে। যেমন, আসামের উচ্চ আদালতের এলাকার মধ্যে নাগাভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আবার এমনকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে রাজ্যের আদালতের এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কলিকাতা উচ্চ আদালতের (Calcutta High Court) এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। উচ্চ আদালতের ক্ষমতাকে সাধারণতঃ দুইটি এলাকাভুক্ত করা হয় ; একটি আদিম এলাকা আর অপরটি হইল আপীল এলাকা।

(১) **আদিম এলাকার** (**Original Jurisdiction**) অর্থ সরাসরি কোন মামলা দায়ের করিবার ক্ষমতা। পূর্বে কলিকাতা, বোম্বাই ও তামিলনাড়ু এই তিনটি শহরের উচ্চ বিচারালয়ের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অনুষ্ঠিত কোন ফৌজদারী মামলার প্রথম বিচার সরাসরি হইতে পারিত। বড় বড় দেওয়ানী মামলারও বিচার এই সকল উচ্চ আদালতে হইতে পারিত। এই সকল শহরে নগর আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। নগর আদালত প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ফৌজদারী মামলার প্রথম বিচারালয় হিসাবে এই উচ্চ আদালত-গুলি আর কাজ করে না ; দেওয়ানী মামলার আদিম ক্ষেত্রও প্রায় লোপ পায়।

(২) **আপীল ক্ষমতা** (**Appellate Jurisdiction**) আপীলের অর্থ, নিম্নতন কোন বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির উচ্চ আদালতে আপীল করা। ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই উভয় প্রকারের মামলায় নিম্নতন বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার অধিকার উচ্চ আদালতের আছে। দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত প্রথম ও দ্বিতীয়, আপীল আদালত হিসাবে বিচার কার্য করিতে পারে। প্রথম আদালত হিসাবে উচ্চ আদালত যখন কাজ করে তখন আইন এবং মামলার তথ্য সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে। আর দ্বিতীয় আদালত হিসাবে যখন কাজ করে তখন শুধু আইন সম্পর্কিত বিষয়েই বিচার করে। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের উচ্চ আদালতগুলির মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই, তামিলনাড়ু এলাহাবাদ প্রভৃতি উচ্চ আদালতগুলি বিশেষ ক্ষমতাবলে এই সকল আদালতে একজন বিচারপতি দ্বারা বিচার করা মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আদালত আপীল শুনিতে পারে।

(৩) উচ্চ আদালতে ফৌজদারী মামলার আপীল হইতে পারে দায়রা জজকোর্ট, প্রেসিডেন্সী বা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং উচ্চ আদালতের আদিম এলাকায় বিচার করা রায়ের বিরুদ্ধে।

(৪) উচ্চ বিচারালয় রাজ্যের অন্যান্য বিচারালয়গুলির কার্যের তদারক করিবে এবং বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদালতের ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

(৫) যদি কোন মামলার সহিত সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ আইনের বিষয় জড়িত থাকে তবে নিম্নতন কোন আদালতে চলিতেছে এমন মামলাকে হাইকোর্ট উঠাইয়া নিজের নিকট লইয়া আসিতে পারে।

(৬) হাইকোর্ট নিজের অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারে।

(৭) মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য উচ্চ আদালত সংবিধান নির্দিষ্ট আদেশ ও নির্দেশ জারী করিতে পারে এবং সংবিধান প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে উচ্চ আদালতেব যে সকল ক্ষমতা ছিল সেই সকল ক্ষমতাই ভোগ করিতে পারিবে।

(৮) বিভিন্ন আদালতে নিয়োগের ব্যাপারে এবং পদোন্নতি ব্যাপারে রাজ্যপাল আদালতের প্রধান বিচাপতির সহিত পরামর্শ করেন। জেলা আদালত ও অন্যান্য আদালতগুলির নিয়োগ, ছুটি প্রভৃতি মঞ্জুর করা এই আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত।

(৯) এই আদালত সুপ্রীমকোর্টে বিভিন্ন মামলা পাঠাইতে পারে। এই

আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। দশ হাজার টাকার অতিরিক্ত মামলা সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করিবার জন্য উচ্চ আদালত সুপারিশ করে।

মূল্যায়ন ঃ (১) রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এই ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের কোন ক্ষমতা নাই। সম্পূর্ণভাবে বিচারপতিগণ কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের দ্বারা নিয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। অঙ্গরাজ্যের মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ই চূড়ান্ত নয়। কারণ সুপ্রীম কোর্ট এই রায়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে। (৩) তবে আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে হাইকোর্ট যত ভালোভাবে বুঝিতে পারিবে সুপ্রীম কোর্ট তাহা পারিবে না।

(৬) সুপ্রীম কোর্ট

ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল বিচারালয়ের শীর্ষে ইহা অবস্থিত। এই বিচারালয়কে প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রীম কোর্ট বলা হয়। অনধিক ১৩ জন বিচারপতি এবং একজন প্রধান বিচারপতি লইয়া প্রধান ধর্মাধিকরণ গঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধান পার্লামেণ্টকে আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দিয়াছে। প্রথমে বিচারপতি ছিলেন ৭ জন, পরে পার্লামেণ্ট ১৯৫৬ সালে আইন পাস করিয়া বিচারপতিব সংখ্যা ১০ জন করে

গঠন

এবং ১৯৬০ সালে প্রধান বিচারপতি ছাড়া ১৩ জন বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা করে। **১২৮ অনুচ্ছেদ** অনুসারে অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদিগকে নিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি এইরূপ নিয়োগের পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য। অবশ্য, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদিগের সহিতও ইচ্ছা করিলে পরামর্শ করিতে পারেন। শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ রাষ্ট্রপতিই বিচারপতিদিগকে নিযুক্ত করেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই কাজ করিতে হয়। তাই সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারকের নিয়োগের সময় কিছুটা রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব কার্যকর হয়।

ভারতের সংবিধান বিচারপতিদের কার্যকাল নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। তবে-বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজে বহাল থাকিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

কার্যকাল

অবশ্য, বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া ৬৫ বৎসর বয়সের পূর্বে কাজ হইতে বিদায় লইতে পারেন। আবার ইম্‌পিচম্যাণ্ট অভিযোগে বিচারপতিদিগকে পদচ্যুত করা যায়। অসদাচরণের জন্য অথবা অক্ষমতার জন্য পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষই এক বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা পদচ্যুতির প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। এই প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থিত সদস্যদের ২ অংশের দ্বারা সমর্থিত হইলে এবং যদি এই অংশ পার্লামেণ্টের সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী হয় তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে পদচ্যুত করা যাইবে। সংবিধান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের বেতন ভোটনিরপেক্ষ করিয়াছে। প্রধান বিচারপতির বেতন ৫,০০০ টাকা আর অন্যান্য বিচারপতিদের বেতন ৪,০০০ টাকা।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে বিচারপতিকে (১) অবশ্যই ভারতের নাগরিক হইতে হইবে, (২) বিচারপতিকে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর উচ্চ বিচারালয়ের বিচারক হইতে হইবে ; অথবা (৩) উপর্যুপরি দশ বৎসর একধারে একটি বা একাধিক বিচারালয়ে ওকালতি করিতে হইবে এবং (৪) বড় আইনজ্ঞ হইতে হইবে। বিচারপতিগণ অবসর গ্রহণ করিবার পর কোন রাজনৈতিক কোন পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ১৯৫৭ সালের কার্যসংক্রান্ত আইন দ্বারা ঠিক হয় যে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে বা অনুপস্থিতিতে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির কাজ পরিচালনা করিতে পারেন।

যোগ্যতা

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পদমর্যাদা : (১) **যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় :** সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়। ভারতের বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষে ইহা অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের ও অংগরাজ্যের আইন সংক্রান্ত শেষ আপীল আদালত হইল সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্ট সকল আইনের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ বলবৎ করে। অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা বিচারপ্রার্থী যাহাতে কোন বিচারালয়ের ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত না হয় সুপ্রীম কোর্টই বিচারপ্রার্থীর এই অধিকার বলবৎ করে। সুপ্রীম কোর্ট যে রায় প্রদান করিবে তাহা ভারতের সকল বিচারালয়ের নিকট এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। এই বিচারালয় যে আইন ঘোষণা করিবে তাহা সকল বিচারালয় মান্য করিতে বাধ্য। এই ভাবে সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে বিচার-ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও অংগরাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য রক্ষা করিবার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের। 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (*Habeas Corpus*) প্রভৃতি আদেশ ব্যক্তি ও সরকারের উপর জারী করিয়া সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করে।

(২) আইনের ব্যাখ্যাকর্তা এবং অভিভাবক (Interpreter and guardian) : আইনের চৌহদ্দির মধ্যে থাকিয়াই সুপ্রীম কোর্টকে কার্য করিতে হয়। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছামতো মামলার রায় দিতে পারে না অথবা আইনের যৌক্তিকতা বিচার করিবার ক্ষমতাও সুপ্রীম কোর্টের নাই ; আইন ন্যায় বা অন্যায় হউক তাহাকে মান্য করিয়াই সুপ্রীম কোর্টকে মামলার রায় দিতে হইবে। কিন্তু পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনকে লঙ্ঘন করিয়া যাহাতে কেহ বা কোন অংগরাজ্যের বিধানমণ্ডল কোন আইন প্রণয়ন করিতে না পারে এবং কোন সরকার পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন লঙ্ঘন করিয়া নিজের খুশিমত স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে না পারে তাহার বিচার করিবার ভার সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হইয়াছে।

(৩) আপীল আদালত : সুপ্রীম কোর্ট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আপীল আদালত। কোন অংগরাজ্যের হাইকোর্টের সুপারিশে অথবা নিজের অনুমোদনে এই আদালতে নিম্নতন কোন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যায়। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও উহার ব্যাখ্যাকর্তা। ইহা শাসন-বিভাগের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বাধা হিসাবে কাজ করে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারের চারিটি এলাকা আছে ; যথা, (১) মূল এলাকা (Original), (২) আপীল এলাকা (Appellate), (৩) পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction) এবং (৪) নির্দেশ জারী করিবার এলাকা (To issue writ)। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(১) মূল এলাকা (**Original Jurisdiction**) ঃ যে সকল মামলা নিম্নতন আদালতে দায়ের না করিয়া সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত করা হয় সেই সকল ক্ষেত্রকে মূল এলাকার পর্যায়ভুক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং কোন রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে আইনগত অধিকার লইয়া বিবাদ বাধিলে তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সংবিধানের ব্যাখ্যা লইয়াই বিবাদ বাধে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যা করিয়াই বিবাদের মীমাংসা করে। সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলিয়া ইহাকে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক বলা হয়।

(২) আপীল এলাকা (**Appellate Jurisdiction**) ঃ এই বিভাগে মহা-ধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্ট হইতে তিন শ্রেণীর আপীল করা যায়। যথা—(ক) শাসন-তান্ত্রিক, (খ) ফৌজদারী ও (গ) দেওয়ানী।

(ক) **শাসনতান্ত্রিক** ঃ মহাধর্মাধিকরণ যদি কোন মামলায় এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে ইহাতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তবে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা যায়। যদি মহাধর্মাধিকরণ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট যদি নিশ্চিত হয় যে, মামলাটিতে সত্যই সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে ইহা আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি দিতে পারে।

(খ) **দেওয়ানী মামলা** ঃ যে মামলার কোন পক্ষ হারানো সম্পত্তির অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয় তাহাকে দেওয়ানী মামলা বলে। যে মামলার বিষয়-বস্তুর মূল্য অন্ততঃ ২০,০০০ টাকা অথবা যে মামলায় হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলযোগ্য বলিয়া প্রমাণপত্র দিবে সেইসকল মামলায় হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীল করা যায়।

(গ) **ফৌজদারী মামলা (Criminal)** ঃ ফৌজদারী মামলার কয়েকটি ক্ষেত্রে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা যায়। যেমন—(ক) নিম্নতন আদালত হইতে মহাধর্মাধিকরণে আপীল হইবার পর, মহাধর্মাধিকরণ আসামীর খালাসের আদেশ বাতিল করিয়া তাহাকে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলে অথবা মহা-ধর্মাধিকরণ যদি নিম্নতন কোন আদালত হইতে কোন মামলা বিচারের জন্য নিজ হাতে আনিয়া বিচারে আসামীকে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে, অথবা মহাধর্মাধিকরণ যদি সার্টিফিকেট দেয় যে এই মামলার আপীল বিচার সুপ্রীম কোর্টে হওয়া উচিত তাহা হইলে আপীল করা যায়।

(৩) **পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction)** ঃ রাষ্ট্রপতি আইন সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত জানিতে পারেন।

(৪) **সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশ, আদেশ বা লেখ (Writ)** জারি করিতে পারে। বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus), পরমাদেশ (Mandamus), প্রতিষেধ (Prohibition), অধিকার পৃচ্ছা (Quo warranto) এবং উৎপ্রেষণ (Certiorari) ধরণের নির্দেশ বা আদেশ জারী করিতে পারে। এই আদেশে সুপ্রীমকোর্ট মৌলিক অধিকার রক্ষা করে।

(৫) **অন্যান্য ক্ষমতা** ঃ সমস্ত বিচারালয়ের রায়ের সংশোধন করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। সামরিক আদালতের রায়ের সংশোধন করার ক্ষমতা ইহার

নাই। প্রধা. ধর্মাধিকরণের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ইহার আছে। এই উদ্দেশ্যে যে ব্যয় হয় তাহাও লোকসভার ভোটনিরপেক্ষ। সুপ্রীম কোর্ট নিজের অবমাননার দায়ে যে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে।

মূল্যায়ন ঃ তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি কিন্তু তাহা সিনেট বা আইন সভার সম্মতি সাপেক্ষ। ভারতে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। শাসন বিভাগ পুরাপুরি ভাবেই বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম। ইহা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করে। আবার ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ভারতের যে কোন আদালতের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট অংগরাজ্যের বিচারালয়ের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই দিক হইতে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট অতিশয় ক্ষমতার অধিকারী এবং ইহা এক-কেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। অবশ্য, ভারতে পার্লামেন্টকে সুপ্রীম কোর্টের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। পার্লামেন্ট প্রণীত আইন সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করিতে পারে না। আইনের যৌক্তিকতা বিচার করিবার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত ভারতের সুপ্রীম কোর্টের নাই। আবার সংবিধানের অভিভাবক হিসাবেও ইহাকে ধরা যায় না। কারণ পার্লামেন্ট ইচ্ছা করিলেই সংবিধান যদৃচ্ছা পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে। সংবিধানের ব্যাখ্যাও সুপ্রীম কোর্ট যদৃচ্ছা প্রয়োগ করিতে পারে না। কারণ সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা পার্লামেন্টের মনঃপূত না হইলে পার্লামেন্ট সংবিধানকে যদৃচ্ছা সংশোধন করিয়া লইতে পারে। অবশ্য, সুপ্রীম কোর্টের রায় ও ভাষ্য সকল আদালত মান্য করিতে বাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গের বিচার ব্যবস্থা ঃ প্রত্যেক অংগরাজ্যেই যেমন ন্যায় পঞ্চায়েত হইতে সুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত বিচারকার্য সম্পন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গেও তাহাই হইয়াছে। ফলে যে কোন অংগরাজ্যের বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ বিচার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বিচার ব্যবস্থার মতোই অন্যান্য অংগরাজ্যের বিচার ব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের বিচার ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, (১) উচ্চতন বিচার ব্যবস্থা এবং নিম্নতন বিচার ব্যবস্থা। উচ্চতন বিচার ব্যবস্থা হাইকোর্টকে লইয়া গঠিত। (২) আর নিম্নতন বিচার ব্যবস্থার মধ্যে ধরা হয় জিলার বিচার ব্যবস্থা এবং বিভাগীয় বিচার ব্যবস্থা।